যুক্ত বাঙলার শেষ অধ্যায়

যুক্ত বাঙলার শেষ অধ্যায়

কালীপদ বিশ্বাস

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ : স্বাধীনতা দিবস। আগস্ট ১৫, ১৯৬৬
দাম : সাধারণ সংস্করণ ১৫.০০। সচিত্র ২০.০০ টাকা

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা ১২ হইতে
প্রকাশিত ও শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক কর্তৃক সাধারণ প্রেস ১৫ এ ক্ষুদিরাম
বসু রোড কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত

গঙ্গা-পদ্মার মাতৃস্তন্যে লালিত
বাঙালীর উত্তরপুরুষের উদ্দেশে

বি ষ য় সূ চী

ভূমিকা

উনিশ-শ কুড়ি থেকে উনিশ-শ সাতচল্লিশ সাল, ভারতবর্ষের—বিশেষ করে বাঙলা দেশের—পক্ষে ইংরেজ শাসন-যুগের শেষ অধ্যায় বা উত্তরকাণ্ড। প্রাচীন বাঙলার সীমানা কোথা থেকে কোন বিন্দু পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, অথবা ইংরেজ আসবার পূর্বে বাঙালীর সমাজ-বিন্যাসে কী কী বৈশিষ্ট্য ছিল এবং ইংরেজ না এলে স্বাভাবিক ধারায় সে সমাজে কী পরিবর্তন আসতে পারত তা' নিয়ে অনুমান-নির্ভর বিতর্কের মধ্যে না গিয়েও অতি সহজে এটুকু বলতে পারা যায়, যে ইংরেজ-প্রবর্ত্তিত শাসন-ব্যবস্থার কাঠামো এবং সে সম্পর্কে অতীতের সমস্ত রকমধ্যান-ধারণার অবলেপন এই অনধিক ত্রিশ বৎসরের মধ্যে আদিতে বাঙলায় এবং পরিণামে ভারতবর্ষে ঘটেছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় একদিকে যেমন স্বদেশী যজ্ঞে পূত নতুন সামাজিক ও মানসিক ভাবধারাগুলো অজ্ঞেয় সম্ভাবনাপূর্ণ রূপ পাবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছিল, অন্যদিকে সেই ভবিষ্য রূপ-বিন্যাসকে যাতে অচিরে কবরস্থ করা যায় তার জন্য মারাত্মক ধরণের সরকারী অপচেষ্টার প্রস্তুতিও চলেছিল।

এ ভাব ও কর্মধারার মূল উৎসগুলো খুঁজতে গেলে অতীতের সুদূর-পর্বে সীমারেখা বিস্তার করতে হয়। এ গ্রন্থে সে চেষ্টা বিশেষ ভাবে করা হয়নি।

প্রায় জোর জবরদস্তি করে মুখবন্ধ শুরু করেছি শতাব্দীর বিশের কোঠা থেকে। সেদিন একদিকে "সিডিসন কমিটি"র রিপোর্ট অনুসারে ধর-পাকড়ের নতুন বেড়া-জাল যেমন পাতা হয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি আইন-সভা বা বিধান-সভায় সর্বপ্রথম ভোটের জোরে "বাজেটের" কতকগুলো বরাদ্দবিশেষ নাকচ করে দেবার অধিকার দেওয়া হ'ল। সাম্প্রদায়িক ভিত্তির ওপর সভা গঠিত ছিল বলে সে অধিকার গোড়ার দিকে কোন অঞ্চলেই প্রয়োগ হ'তে পারে নি।

প্রতিক্রিয়াও দেখা দিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে—অনেকটা নিয়মতান্ত্রিক ভঙ্গীতে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নতুন আইন-সভাগুলি "বয়কট" করবার নির্দ্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু সে নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করলেন যুগপৎ হিন্দু ও মুসলমান জন-নায়কেরা। কেবল কংগ্রেসী হিন্দুরা তা' মান্য করে আগত নির্বাচন দ্বন্দ্ব থেকে সরে দাঁড়ালেন মাত্র।

গান্ধী-কল্পিত "নন-ভায়োলেন্ট নন-কো-অপারেসন" পোলিটিক্যাল হাতিয়ার রূপে দেখা দিল এ যুগে। সর্বভারতে সে আন্দোলন তীব্র প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করেছিল।

"সিডিসন কমিটি" বসেছিল প্রধানত বাঙলা দেশ এবং আংশিক ভাবে পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রের ওপর নজর রেখে। অতীতের অভিজ্ঞতাই শাসক-কুলকে এ বিষয়ে সচেতন করেছিল।

বিশের কোঠাতে এ তিন অঞ্চলে কিন্তু প্রতিক্রিয়া একযোগে ও সমানভাবে দেখা যায়নি। প্রতিক্রিয়ার প্রচণ্ডতা রূপ পেল পাঞ্জাবে।

কেন? তার উত্তর পড়ে আছে প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের লাভ-লোকসানের খতিয়ানের পাতায় পাতায়, আর পাঞ্জাবীদের বিদেশে অর্জিত নতুন ধরনের অভিজ্ঞতা লাভের মধ্যে। অতীতে কিন্তু সে সংঘাতের বীজ অন্য দুই অঞ্চলের মত বাঙলা দেশের সমাজ-দেহে আত্মগোপন করেছিল এবং তা'কে সমূলে উৎপাটিত করবার জন্যই যুদ্ধকালে শত শত বাঙালী হিন্দু যুবককে অন্তরীণে, দ্বীপান্তরে ও কারাবাসে পাঠাবার ব্যবস্থা শাসকেরা করেছিল। যুদ্ধান্তে নতুন আইনের সাহায্যে ভারতবর্ষের প্রতিটি অঞ্চলে অলক্ষ্যে সে বীজ উপ্ত করবার আয়োজন চলল।

পাঞ্জাবীদের প্রতিবাদ ও জালিনওয়ালাবাগে তাঁদের রক্তস্নানের মধ্য দিয়ে সে প্রতিক্রিয়া উনিশ-শ কুড়িতে সমগ্র ভারতের প্রতি অঙ্গের শিরা-উপশিরায় ছড়িয়ে পড়ল।

হাণ্টার কমিটি বসল। কংগ্রেসের অনুসন্ধান-কমিটিও গঠিত হ'ল।

ইংরেজ শাসকের মানসিক বিকারের চরম অভিব্যক্তি প্রকাশ পেল বৃটিশ মিলিটারী অফিসারদের জবানবন্দীতে। প্রতিশোধ-স্পৃহার আগুন ভস্মাচ্ছাদিত অবস্থায় থেকে গেল। জালিনওয়ালা-বাগের প্রতিশোধ-কাহিনী শেষ হয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দাবানলের মধ্যে যখন সে হত্যাকাণ্ডের নায়ক মাইকেল ও'ডায়ার নিজের দেশেই নিহত হলেন পাঞ্জাবী যুবক-নিক্ষিপ্ত তপ্ত বুলেটে।

ইতিমধ্যে চালু হয়েছে নতুন শাসনব্যবস্থা।

দু'জন জন-নায়ক ঘটনা-পরম্পরায় যুগক্ষণে দেশের পুরোধারূপে দেখা দিলেন—চিত্তরঞ্জন দাশ আর আবুল কাশেম ফজলুল হক। একজন স্বল্পায়ু,অন্যজন দীর্ঘায়ু। দু'জনেই প্রায় সমবয়সী, সমব্যবসায়ী এবং সমচেতনায় উদ্বুদ্ধ বাঙালী।

এঁদের সংঘাতে বাঙলাদেশে যে নতুন আলোড়ন সৃষ্টি হ'ল তারই অপ্রত্যাশিত পরিণতি ঘটল ভারতবর্ষের দ্বিখণ্ডীকরণে এবং বাঙালীত্বের ওপর চরম আঘাতে। যদিও এরা কেউই এ পরিণতি কোনদিনও কামনা করেন নি।

ইতিহাস দুর্বার, প্রতিহিংসাপরায়ণ কিন্তু অভ্রান্ত। প্রসারিত মন ও মুক্ত দৃষ্টি নিয়ে পথ চললে ব্যক্তি হয়ত নিজের ভুলকে অতিক্রম করে সম্ভাবিত আঘাতকে এড়িয়ে যেতে পারে, কিন্তু সমষ্টি-জীবনের পক্ষে তেমনটি অসম্ভব, কারণ ইতিহাস সমাজের ভুল কখনও ক্ষমা করে না।

দ্বিখণ্ডিত হ'ল বাঙলা দেশ, দ্বিধাগ্রস্ত হ'ল বাঙালী সত্তা। কিন্তু এই সর্বগ্রাসী বিচ্ছেদকে অস্বীকার করল—হয়ত ভবিষ্যতেও অস্বীকার করবে একটি প্রবহমান প্রাকৃতিক দান—'আ মরি বাঙলা ভাষা'।

ইংরেজ-যুগের সেই শেষ অধ্যায়ের ইতিহাস প্রধানত এই দুই বাঙালী জন-নায়কের কর্মমুখর জীবনের পর্যালোচনা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই নয়।

আবুল কাশেম ফজলুল হকের সম্পর্কে সমসাময়িক কালের অনেক মন্তব্য ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। থাকা খুবই স্বাভাবিক। তাঁর সম্বন্ধে একটী মন্তব্য খুব তাৎপর্যপূর্ণ এবং অর্থবহ। বারবার বলা হয়েছে তাঁর মধ্যে পরস্পর-বিরোধী গুণের সমাবেশ হয়েছিল (a man of contradictions); সব আলোচনাই তাঁর সম্বন্ধে শুরু হয় এখান থেকে। প্রতিপাদ্য বিচারকালে বুঝতে হবে তাঁর সময়ের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাম্প্রদায়িক ও প্রশাসনিক, বিশেষ করে তাঁর পারিবারিক জীবনের পরিমণ্ডল। যে মানুষকে সমাজে নেতৃত্ব করতে হয়, অনিবার্য কারণে তাঁর অল্পবিস্তর 'man of contradictions' না হয়ে উপায় নেই। শাস্ত্রকার বা দার্শনিককে নিয়ে এ কথা খাটে না।

কিন্তু কেন, কোন্ অনিবার্য কারণে ফজলুল হককে 'man of contradictions'-এর মানসিকতায় পথ চলতে হ'ল? এর উত্তর দেবার চেষ্টা করা হ'য়েছে এ বইতে।

ফজলুলের জন্ম ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। রাজনৈতিক নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে কেবল তিনিই জীবনে একদিকে দেখেছিলেন যেমন বে-সরকারী ইংরেজদের ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন তেমনি অন্যদিকে স্বদেশী যুগের আন্দোলন, নন-কো-অপারেসন, "ভারত ছাড়ো আন্দোলন" এবং সর্বশেষে দেশ-বিভাগের মাধ্যমে স্বাধীনতা-প্রাপ্তি।

তাঁর জন্মভূমি বরিশালের চাখার গ্রামে। পিতা মৌলভী মহম্মদ ওয়াজেদ, সরকারী উকিল। সে কালের সামাজিক ইতিহাসের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা জানেন যে, সে যুগে সামাজিক নেতৃত্ব ক্ষয়িষ্ণু জমিদার-জোতদারদের হাত থেকে আস্তে আস্তে খসে পড়ে উকিল, মোক্তার আর ব্যারিষ্টারদের হাতে এসে পড়ে।

চাখার গ্রাম বরিশালের আরও অনেক গ্রামের মত মুসলমান-প্রধান। গ্রামে এই হক পরিবারটিই একমাত্র আধুনিক শিক্ষায়

আলোকপ্রাপ্ত ও শিক্ষিত। গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত দীর্ঘ খাল, তা'তে সমুদ্রের লোনা জলের প্রাত্যহিক জোয়ার-ভাঁটা। খালের অপর পারে আ-দিগন্ত ধানক্ষেত, বরিশালের একমাত্র কৃষি সম্পদ। পাশেই খলসেখোলা গ্রাম। দুই গ্রামের মধ্যে প্রভূত বৈষম্য। চাখার গণ্ডগ্রাম, মুসলমান-প্রধান। খলসেখোলা আধুনিক শিক্ষায় প্রভাবিত ও শিক্ষিত ব্রাহ্মণ-প্রধান জনপদ।

ফজলুল হক যখন বিদ্যারম্ভ করলেন, স্বাভাবিক কারণেই তখন তিনি খলসেখোলার হিন্দু ছেলেদের মধ্যে সঙ্গী খুঁজেছিলেন। ছেলেবেলার সেই বন্ধুদের স্নেহ, ভালবাসা আর আত্মীয়তা ফজলুল উত্তরজীবনে বৃদ্ধবয়সেও ভুলতে পারেন নি। আহার, বিহার, গল্পগুজব সমস্তই হিন্দু ছেলেদের সঙ্গে।

গ্রামের স্কুল ছেড়ে যেদিন জেলা স্কুলে পড়তে এলেন, সেদিনও মেধাবী বালক ফজলুলকে সমবয়সী ও সমমেধাবী বন্ধু খোঁজ করতে হ'ল হিন্দুসম্প্রদায়ভুক্ত ছেলেদের মধ্যে। সবার মধ্যে প্রথম হয়ে ওপরের ক্লাসে উঠছেন ফজলুল, কিন্তু একটিও স্ব-সম্প্রদায়ের ছেলে পেলেন না যাকে দেখে আত্মগরিমাবোধ করতে পারতেন এবং ভাবতে পারতেন বাঙালী মুসলমান ছেলে বাঙালী হিন্দু ছেলেদের তুলনায় নিকৃষ্ট নয়। জীবনভর নিজেকে সামনে রেখেই তাঁকে এ দাবি প্রতিপন্ন করতে হয়েছিল। গ্রামের পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস-কালে স্ব-সম্প্রদায়ের এ দৈন্য হয়ত ফজলুলের শিশুমনে রেখাপাত করেনি, কিন্তু কৈশোর অতিক্রম করে যখন জেলাস্কুলে পড়তে এলেন তখন অপেক্ষাকৃত পরিণত মনে সে দৈন্য-বোধের প্রতিক্রিয়া ঘটবে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

দ্বিধাগ্রস্ত মন, তবুও আমরণ সামাজিক বাঙালী আবুল কাশেম ফজলুল হক সেদিন নিশ্চুপ বসে থাকেন নি। হিন্দুদের সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন হালকা মেজাজে, আত্মীয়তা বোধ করতেন হিন্দু সঙ্গীদের মধ্যে।

উত্তরকালে যখন ফজলুল হক বাঙলা দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে ঝাউতলার বাড়ীতে নিয়মমাফিক প্রাতঃকালীন সামাজিক আড্ডা-দরবারে মসগুল থাকতেন, তখনকার একটি দিনের ঘটনা। বেয়ারা এসে সেলাম করে তাঁর হাতে ভিজিটিং কার্ড ধরে দিল। নাম পড়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। অর্ধনগ্ন, লুঙ্গীপরিহিত, কব্জিতে মাদুলী বাঁধা, অবিন্যস্ত বিরল কেশে সেই মুহূর্তে চটিটা পায়ে গলিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন। যাঁরা ঘরে বসেছিলেন, তারা তো অবাক! কে এল? লাটসাহেবের দূত নাকি! অল্পক্ষণ পরেই শোনা গেল ফজলুলের অভিমান-ক্ষুব্ধ উচ্চস্বর। সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে উঠতে উঠতে তিনি বলছেন: 'তুই কার্ড পাঠিয়ে দেখা করতে এলি?' উত্তরে শোনা গেল—'কি জানি ভাই, তুই যে এখন প্রিমিয়ার, যদি বে-আদবি হয়ে পড়ে!' ফজলুলের অভিমান তখনও অন্তর্হিত হয় নি, বললেন—'এক মায়ের দুধ খাইনি?' Didn't we suck the same mother's breast? উত্তর নেই। নবাগত ভদ্রলোকটি ফজলুলের আবাল্য হিন্দু সাথী, রাজকর্মচারী—জেলা-জজ।

ফজলুল-চরিত্রে বিপরীত ভাবের সমাবেশ স্কুলে পড়বার সময় থেকে। স্ব-সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে হতাশ হতেন, আর হিন্দু সমাজের বন্ধু-বান্ধবের স্নেহ ভালবাসা বর্জন করতে কাতর হয়ে পড়তেন।

বরিশালের অশ্বিনী দত্ত তখনও আসরে নামেন নি যখন ফজলুল ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে এনট্রান্স পরীক্ষা দিলেন। পরীক্ষার ফল প্রকাশ হবার পর দেখা গেল সমস্ত জেলার মধ্যে প্রথম স্থান দখল করেছেন মৌলভী ওয়াজেদ-পুত্র আবুল কাশেম ফজলুল হক। সোনার মেডেল পেলেন, জেলা স্কলারশিপ পেলেন। কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের সদর দরজা—মুসলমান বলে নয়—নিজের প্রতিভার অধিকারে খুলে ফেললেন।

যেমন গ্রামে, যেমন জেলা-টাউনে, তেমনি ভারতবর্ষের

রাজধানীতে এসেও যুবক ফজলুল হককে নিরুপায় হয়ে বন্ধু বান্ধব খুঁজে বের করতে হ'ল ঐ হিন্দু সম্প্রদায়-ভুক্ত যুবক পড়ুয়াদের মধ্য থেকে। সেদিন বাঙলা, বিহার, আসাম ও ওড়িষ্যার শিক্ষাকেন্দ্র কলকাতাতেও তিনি একটি বাঙালী বা অ-বাঙালী মুসলমান ছাত্রের সংস্পর্শে আসতে পারলেন না যে তাঁর সমকক্ষ মেধাবী ছাত্র না হলেও তাঁর কাছাকাছি এসে দাঁড়াতে পারত। অন্যদিকে প্রেসিডেন্সী কলেজে তিনি যে সমস্ত হিন্দু সতীর্থদের পেলেন তাঁরা পরিণামে তাঁরই মত দিকপাল হিসেবে গণ্য হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, স্যার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র, স্যার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র, স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র, স্যার চারুচন্দ্র ঘোষ, স্যার দ্বারিকানাথ মিত্র, এবং স্যার মন্মথনাথ মুখার্জী। এঁদের সকলের সঙ্গে সমান প্রতিযোগিতায় যুবক ফজলুল ১৮৯৪ সালে একযোগে রসায়ন, অঙ্ক ও পদার্থবিদ্যায় 'Triple Honours' পেয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী লাভ করলেন।

যাঁরা ফজলুল-চরিত্রে বিপরীত ভাবধারার সন্নিবেশ দেখে আশ্চর্য হন, তাঁরা সহজেই এর কার্যকারণ-সম্বন্ধগুলো খুঁজে পাবেন ফজলুলের ছাত্রজীবনের পরিবেশ ও অভিজ্ঞতার মধ্যে। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, সহর থেকে সহরান্তরে যেখানেই তিনি কৈশোরে, যৌবনে, এবং পরিণত বয়সে লোক-নেতা রূপে ভ্রমণ করেছেন, সেখানেই তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন মুসলমান চাষী আর খেটে-খাওয়া মুসলমান মজুর সম্প্রদায়, মুসলমান জোতদার, মুসলমান পণ্ডিত ও মৌলভী। খুব অল্পই চোখে পড়েছে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত তাঁর নিজের মত প্রতিভাধর বাঙালী মুসলমান।

কেন এই অবস্থা? উত্তর খুঁজেছেন এবং সে উত্তর তিনি নিজেই খুঁজে পেয়েছিলেন। সামাজিক অবস্থান্তর কেমন করে সম্ভব তা' চিন্তা করে জীবনভর সেদিকেই তিনি তাঁর বিরাট কর্মপ্রচেষ্টাকে নিয়োগ করেছিলেন। সেকালের বাঙালী মুসলমান সমাজ তাঁকে

'সাম্প্রদায়িক' হতে বাধ্য করেছিল। এ হাতিয়ার অন্যদের কাছে রাজনৈতিক চাল হিসেবে গণ্য হলেও ফজলুলের কাছে ছিল সমাজ-সেবার মূলমন্ত্র।

সেই "সাম্প্রদায়িক" ফজলুল যখন ব্যক্তি-বিশেষ হয়ে পরিচিত হতেন, যখন তাঁকে চাখারের কথা, বরিশাল টাউনের কথা, কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের কথা, হাইকোর্টের কথা মনে করতে হত, তখন তিনি বাঙালী ফজলুলে রূপান্তরিত হতেন।

ফজলুলের এই মানসিক অবস্থার সঙ্গে খানিকটা মিল থাকলেও থাকতে পারত ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের কলকাতা বাসকালীন অভিজ্ঞতার। গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নম্বর পড়ুয়া ছিলেন তিনি তাঁর যুগে। সমগ্র বাঙলা, বিহার, আসাম ও ওড়িষ্যার বাছাই বাছাই ছেলেগুলি এসেছে কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে, কিন্তু বিহারের স্থান কোথায় সেখানে, কেবল একক রাজেন্দ্রপ্রসাদ ছাড়া?—এ প্রশ্ন নিশ্চয়ই তাঁকে সেদিন বিচলিত করে থাকবে, যেমনভাবে বাঙালী মুসলমান সমাজের অবস্থা বিচলিত করেছিল ফজলুল হককে পূর্বযুগে।

নবাব সৈয়দ মহম্মদের কন্যাকে ফজলুল এম. এ. পাস করবার পর বিবাহ করেন। নবাবের পুত্র স্বনামখ্যাত ডাঃ সৈয়দ হোসেন মিশরে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত থাকাকালীন অবস্থায় মারা যান। বি. এল. পাস করবার পর ফজলুল স্যার আশুতোষ মুখার্জীর আর্টিকেল্‌ড্‌ ক্লার্ক হন। ফজলুল যেমন পূর্বযুগে স্যার আশুতোষের সাহায্য পেয়েছিলেন, তেমনি পরের যুগে রাজেন্দ্রপ্রসাদ বাঙালী নবাব সামসুল হুদার আর্টিকেল্‌ড্‌ ক্লার্ক হয়েছিলেন। কী অকুণ্ঠ ভাষাতেই না রাজেন্দ্রপ্রসাদ নবাবের আচার, ব্যবহার ও সাহায্যের কথা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন! এ আদান-প্রদান সেদিন বাঙালী সমাজে স্বাভাবিক ও সহজতর ছিল।

কিছুদিন বরিশালের রাজচন্দ্র কলেজে (১৯০৩-৪) অধ্যাপনা

ও বাঙলা সাহিত্য-চর্চা করে ('বালক' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ১৯০১-৬ এবং 'ভারত সুহৃদ' এর সহ-সম্পাদক ১৯০০-৩) ১৯০৬ সালে ফজলুল ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট হন। ১৯১২ সালে যখন সরকারী চাকরীতে ইস্তফা দেন, তখন তিনি বাঙলা-বিহার-আসামের এসিস্ট্যাণ্ট-কো-অপারেটিভ রেজিষ্টার।

ফজলুল হক কেন অধ্যাপনাকে জীবনের প্রথম ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন? সে প্রশ্নের উত্তর জীবন-ভর নিজেই দিয়ে গেছেন। বুঝতে এতটুকু কষ্ট হয় না যে ফজলুল ধরতে পেরেছিলেন সমাজের গোড়ায় গলদ কোথায় লুকিয়ে আছে। ইচ্ছে করলে সে যুগে তাঁর মত প্রতিভাবান বাঙালী মুসলমান কৃতী যুবক সঙ্গে সঙ্গেই সরকারী চাকরী নিতে পারতেন। তাঁর সহপাঠী নৃপেন সরকার ও ভূপেন মিত্র তো সেই পথেই গিয়েছিলেন। স্ব-ইচ্ছায় ফজলুল অধ্যাপক হলেন—-সমাজ-ব্রত উদযাপনার্থে।

ইতিমধ্যে মোসলেম লীগ প্রতিষ্ঠা করবার দাবি এসে পড়েছে রাজনৈতিক কারণেই। ঢাকার নবাব ডেকে পাঠালেন ফজলুল হককে। সে ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন তিনি। ঢাকায় 'আসান মনজিলে' লীগ প্রতিষ্ঠিত হ'ল। যুবক ফজলুল তখন বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে অন্যতম নায়ক।

ব্যামফিল্ড ফুলারের রাজত্ব তখন চলেছে। বাঙলা দ্বি-খণ্ডিত। কার্জন-সাগরেদ ফুলারের কাছে বাঙালী হিন্দু দুশমন। কাজে কাজেই বাঙালী মুসলমান সম্প্রদায়কে হাতে রাখতে হবে; আর একে ভিত্তি করেই গড়ে উঠল পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজনীতি। সম্পূর্ণভাবে 'সুয়োরানী' ও 'দুয়োরানীর' যুগ তখন।

ফুলার ফজলুলকে ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োগ করলেন। সরকারী অফিসে ঢুকেই ফজলুল বুঝতে পারলেন, বেশীদিন সেখানে থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটেরা তখন যেমন ছিলেন

তার উল্লেখ করে ফজলুল একদিন বাঙলা দেশের আইন-সভাতে তাঁদের গাধার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।

সরকারী চাকরীতে ইস্তফা দেবার পেছনে আরও একটি কারণ কাজ করেছিল। "মর্লে-মিণ্টো" রিফর্ম অনুযায়ী নির্বাচন (১৯১২-১৩) এসে পড়েছে। ফজলুল সে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন এবং সেই সঙ্গে হাইকোর্টে আইন-ব্যবসা শুরু করবেন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

নির্বাচনে তাঁর জয় হ'ল। হাইকোর্টের ফৌজদারী বিভাগে নামকরা উকিল তখন ছিলেন দাশরথী সান্যাল ও মন্মথ মুখার্জী। এঁদের সমপর্যায়ের উকিল হয়েও ফজলুল নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। অন্য সকলে যখন শুধুমাত্র মক্কেলদের স্বার্থসিদ্ধির দ্বারা অর্থ উপার্জনে ব্যগ্র, ফজলুল তখন সমস্ত কিছুর সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্তব্য সাধনে ব্যাপৃত। গারনার ষ্ট্রীটের বাড়ী সেদিন সর্বদাই লোকসমাগমে চঞ্চল। বাঙলা দেশের অজ্ঞাত-কুলশীল গ্রামাঞ্চলের মানুষ, কত অভাজন, হিন্দু-মুসলমান সবাই তাঁর অনুগ্রহপ্রার্থীরূপে তাঁর বাড়ীতে এসে ধরনা দিয়ে পড়ে থাকতেন।

কেমন করে ফজলুল হক ব্যবসা, রাজনীতি ও সমাজসেবা একযোগে চালিয়ে যেতেন, তা চিন্তা করলে বিস্মিত হতে হয়। শুধুমাত্র অসামান্য প্রতিভাবলেই বোধ হয় তিনি এককালে দু'নৌকায় পা' রেখে এগুতে পেরেছিলেন। তবে বেশীদিন তাল সামলাতে পারেন নি। সামাজিক কর্তব্য আর রাজনৈতিক দাবি ব্যবসার গতিকে পথ রোধ করে দাঁড়াল। 'ব্রিফ' পড়তে হবে, নজীর খুঁজতে হবে তো! কিন্তু সে ফুরসৎ কোথায়? একদিকে 'ব্রিফে' যেমন টান পড়ল, অন্যদিকে সমগ্র বাঙলা দেশ থেকে আবুল কাশেম ফজলুল হকের আহ্বান এল।

যুদ্ধান্তে মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে যে সাধারণ

নির্বাচন এল (ভোটার হবার অধিকার তখনও বেশ সীমাবদ্ধ), ফজলুল তা'তে জয়ী হয়ে আবার আইন-সভাতে এলেন। কংগ্রেসের তরফ থেকে চিত্তরঞ্জন দাশও সে নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের নীতি অনুযায়ী শেষ পর্যন্ত নির্বাচন থেকে নাম প্রত্যাহার করতে হ'ল তাঁকে। লিবারেল বা মডারেট পার্টির তরফ থেকে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হাউসে এলেন। তিনি ও নবাব নবাবআলি চৌধুরী মন্ত্রী হলেন "ডায়ার্কিক্যাল" বিধিব্যবস্থায়।

১৯২৪ সালের নির্বাচনে আবার হাউসে এলেন ফজলুল হক। এদিকে স্বরাজ্য পার্টি গঠন করে চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর দলবল নিয়ে একই সভায় উপস্থিত। এবার ফজলুল হক মন্ত্রী। চিত্তরঞ্জন দাশ বিরোধী দলের নায়ক।

মূলত এ যুগের কথা নিয়েই এ গ্রন্থ রচনা।

সরকারী চাকরী নেবার আগে ফজলুল ঢাকাতে মোসলেম লীগের প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছিলেন। চাকরী ছেড়ে দেবার পর তিনি লীগের প্রাদেশিক কাউন্সিলের প্রথম সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ করেন। সে পদ তিনি ১৯১৩ থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত অধিকার করেছিলেন। ১৯১৬-১৯২১ সাল পর্যন্ত তিনি প্রাদেশিক লীগ কাউন্সিলের প্রেসিডেন্টের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যুগটা ছিল একাধিক কারণে বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধঃ হিন্দু বাঙালী যুবকেরা বিনা বিচারে অন্তরীণ: রাউলট বিল অনুযায়ী নতুন করে কড়াকড়ির আয়োজনঃ প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ পাঞ্জাব: মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিফর্ম চালু করার প্রচেষ্টা।

মোসলেম লীগের জন্মকাহিনী যাই হোক না কেন, লক্ষ্ণৌয়ে লীগ-কংগ্রেসের যুক্ত সিদ্ধান্তে এটুকুই প্রমাণিত হ'ল যে সেদিন কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের চিন্তাধারায় খুব বড় বিরোধ ছিল না, যদিও লক্ষ্যের তারতম্য পুরোমাত্রায় বর্তমান ছিল। দু'দলের মধ্যে একটি সব সময়েই গোটা দেশের 'জাতীয় প্রতিষ্ঠান' বলে দাবি জানিয়ে

এসেছে। অপরটি সনাতনী সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচয় দিয়েছে, এবং সে দাবি অস্বীকৃত হলে অপরাধীর মত কুণ্ঠিত হত। উদ্দেশ্য নিয়ে মতান্তর থাকলেও, ১৯১৬-২০ সালে উভয়ের মধ্যে মতৈক্য দেখা গেল। এবং তা' ফলপ্রসূ হ'ল লক্ষ্ণৌয়ে যুক্ত অধিবেশনে। পরিণামে সেখানে যে দলিল গৃহীত হয়, তা'তে মুসলমান সমাজের পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম আবুল কাশেম ফজলুল হক-ই স্বাক্ষর দেন।

প্রতিষ্ঠান দুটোর মধ্যে বড় ধরনের মতান্তর না থাকায়, ফজলুল ১৯১৮ সালে কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী এবং ১৯২০ সালে কংগ্রেসের প্রাদেশিক শাখার বাৎসরিক অধিবেশনের—প্রাদেশিক সম্মেলনের—সভাপতি নির্বাচিত হন। রসুলের দু'বার সভাপতিত্বের (১৯০৬।১৯১২) পর ফজলুলই দ্বিতীয় বাঙালী মুসলমান প্রতিনিধি রূপে প্রাদেশিক কনফারেনসের বাৎসরিক অধিবেশনের সভাপতি হলেন মেদিনীপুরে।

সেদিন তাঁর সভাপতির ভাষণে নতুন কথা শোনা গেল। সরকারী চাকরী করবার অভিজ্ঞতা থাকায় অন্দর মহলে কি ঘটনাপ্রবাহ চলতে থাকে তার স্বরূপ তিনি ছাড়া আর কেউ তেমন করে উপলব্ধি এবং উদ্‌ঘাটন করতে পারেন নি। হিন্দু বাঙালী যুবকদের আটক অবস্থায় যে অকথ্য অত্যাচার ও অনাচার সহ্য করতে হ'ত তা' ফজলুলের সম্পূর্ণ জানা ছিল। মেদিনীপুর অধিবেশনের সভাপতির ভাষণে সেই পুলিসী অত্যাচারের কঠোর সমালোচনা প্রথম শোনা গেল। পুলিসী শাসনব্যবস্থার যে নির্মম চিত্র তিনি তুলে ধরলেন সে অভিভাষণে, তা' একটা কথার কথা হয়ে পড়েছিল সে যুগে। মফস্বলের দারোগা কেমন করে তার রিপোর্ট পাঠাত সে বিষয়ে মন্তব্য করে ফজলুল বলেছিলেন: Case true, no clue, signed Kalimuddin Daroga.

ফজলুলের ছাত্র-জীবন, অধ্যাপকের পদ গ্রহণ, সরকারী

চাকরীতে বহাল ও ইস্তফা, লীগ প্রতিষ্ঠা করা, কংগ্রেস-লীগ মিলনের প্রয়াস, আইন-ব্যবসা করতে গিয়ে রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ, বিধানসভায় নির্বাচন, এবং সর্বোপরি একদিকে বাঙালী মুসলমান সমাজের দাবি পেশ করা আর অপর দিকে বাঙালী হিন্দু সমাজের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা—এই সমস্ত প্রবণতা ও কর্ম-প্রয়াস লক্ষ্য করলে কেন তিনি man of contradictions হতে বাধ্য হয়েছিলেন তা' বুঝতে পারা যায়।

পাকিস্তান কায়েম হলে ফজলুল আবার আইন-ব্যবসাতে ফিরে যান। প্রথমে কলকাতা থেকে প্লেনে যাতায়াত করে ঢাকায় ব্যবসা চালাতেন। পসার জমে উঠেছিল। ঠাট্টা করে বলতেন: আমার ব্যবসার সুবিধের জন্যই পাকিস্তান হয়েছে! কিন্তু মনের কোণে কোথায় ব্যথা তা' অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধব ভিন্ন অপরকে বড় বেশী জানতে দিতেন না।

পাকিস্তানের হর্তা কর্তা ব্যক্তিরা জানতেন, কী ধাতুতে এই মৌলভী ওয়াজেদ-পুত্র গঠিত, তাঁদের সর্বক্ষণ দৃষ্টি পড়ে থাকত এঁর কর্মকাণ্ডের ওপর। হোসেন শহীদ সুরাবর্দী পাকিস্তান কায়েম করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। যখন সত্যি সত্যি পাকিস্তান রূপায়িত হ'ল, তখন সুরাবর্দী রীতিমত ঘাবড়ে পড়লেন। কলকাতার উর্দ্দু বাতচিতে অভ্যস্ত অ-বাঙালী মুসলমান ভোট তো কোন কাজেই আর আসবে না! এদেরই দল বাঁধতে কত সযত্নে সুরাবর্দী আপ্রাণ চেষ্টা করে এসেছেন এতদিন! মীনা পেশোয়ারী তাঁরই বন্ধু ছিলেন। কলকাতা সহরকে পাকিস্তান-ভুক্ত করবার জন্য সযত্নে ও সরকারী সাহায্যে ২৪-পরগণার গ্রামাঞ্চলে আমদানী করেছিলেন উত্তর ভারতের অগুণতি অবাঙালী মুসলমান পরিবার—গুমো হাবড়াতে সে নজীর এখনও পড়ে আছে। কিন্তু সব কিছু ভেস্তে গেল পাকিস্তানের রূপায়নে। চোখে সরষের ফুল দেখতে শুরু করলেন সুরাবর্দী।

আত্মীয় আবুল হাসেম ও শরৎচন্দ্র বসুর সহায়তায় সেই অন্তিমকালে মকরধ্বজ বড়ি স্বরূপ "সভারেন বেঙ্গল"—স্বাধীন বাঙলা—প্রস্তাব নিয়ে আনাগোনা শুরু করলেন গান্ধীজীর দরবারে। বাঙলার শব-দেহে সে ওষুধ কোন কাজেই এল না।

এবার তবে কী করণীয়? সুরাবর্দী চিন্তিত।

ফজলুলের ওপরেও চাপ পড়ছে। তাঁর ঝাউতলার বাড়ী সুরাবর্দী-সমর্থকেরা ঘেরাও করে ফেলেছে। লীগের ছু-বার নামকাটা শত্রু আবুল কাশেম ফজলুল হক অপমানিত ও লাঞ্ছিত। অ-বাঙালী জনতা সুরাবর্দীর নির্দেশে ফজলুলকে বাধ্য করল লীগের মেম্বর হবার জন্য দরখাস্ত করতে। যে লীগকে তিনি সৃষ্টি করেছেন তাকে তিনি পরিত্যাগ করবেন কেন? লীগের খাতা থেকে নিজের নাম কোনদিনই কাটেন নি ফজলুল। সে অপকর্ম করেছিল তাঁরাই যারা মুসলমান স্বার্থের ওপর ভিত্তি করে নিজেদের পোলিটিক্যাল স্বার্থ-সৌধ গড়তে চেয়েছিলেন। সুরাবর্দীর হুকুম ফজলুলকে লীগে যোগদান করতে হবে। অশিক্ষিত অ-বাঙালী জনতার মুখে শোনা সুরাবর্দীর হুকুম মেনে নিলেন তিনি।

পরিণামে সুরাবর্দী-কল্পিত ব্যবস্থা সমস্ত কিছুই ভেস্তে গেল। ফজলুলেরও আজন্ম পালিত আশা আকাঙ্ক্ষার অবসান হ'ল। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টিতে তাঁর কোন মাথাব্যথা নেই। এবার খাঁটি বাঙাল-বাঙালী নিয়ে পথযাত্রা। তারা কে? সে কথা জানতেন কেবল একজনই—আর তিনিই আবুল কাশেম ফজলুল হক। অপর পক্ষে ইংরেজ-সৃষ্ট নাজেমুদ্দিন এবং নিজ স্বার্থসিদ্ধিতে হুঁশিয়ার সুরাবর্দীর সঙ্গে সে বাঙাল-বাঙালীর কোন সহমর্মিতা ছিল না। ফজলুল তাঁর দীর্ঘ জীবনে বিভিন্ন বিপরীত মানসিকতার প্রকোপে পড়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর দিব্য মন দখল করেছিল বাঙালী চাষী মুসলমান, গরীব মুসলমান ও মধ্যবিত্ত মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরা। এরা কোন দিনই ফজলুলের কাছে দাবার বোড়ে হিসেবে গণ্য হননি।

পাকিস্তান কায়েম করতে দেশকে যে ভীষণ অস্ত্রোপচার সহ্য করতে হ'ল সে পর্ব তো শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু এর পরিণাম কী অ-বাঙালী অধ্যুষিত ও চালিত পূর্ব-বাঙলা? নাজেমুদ্দিনের দৃষ্টি সে প্রশ্নের ওপর কোন দিনই পড়তে পারত না, তাঁর স্বল্প রাজনৈতিক জীবন গড়ে উঠেছিল সাহেবদের তত্ত্বাবধানে এবং উর্দ্দু বাতচিত-করা সমাজে।

অপর দিকে কলকাতার পালা হোসেন শহীদ সুরাবর্দীকে শীঘ্রই শেষ করে ফেলতে হ'ল। তাঁর অতীত কলকাতা, নোয়াখালি, পাটনার অগুণতি মানুষের তাজা রক্তে ধুয়ে মুছে গেল, বিশেষ করে গান্ধীজীর অপমৃত্যুর পর থেকেই। যে কলকাতার অ-বাঙালী মুসলমানদের জন্য সেই বিশের কোঠা থেকে তিনি এত খেল খেলেছিলেন, তাঁরাও আর তাঁকে পাত্তা দিতে রাজী নন।

পাকিস্তান কায়েম হয়ে যাবার পর নবাবজাদা লিয়াকত্ আলির কাছ থেকে ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রদেশের অ-বাঙালী মুসলমান জনতা যে ধরণের কদলী-ভোগ পেলেন অতীতে পাকিস্তান দাবি সমর্থন করবার জন্য, তা' তো তখন ঐতিহাসিক ঘটনা। কনষ্টিটুয়েণ্ট এ্যাসেমব্লীতে যোগদান করবার জন্য সব বিধান-সভাতেই—যেমন বাঙলা দেশের বিধান-সভাতে হয়েছিল—মনোনয়ন-পর্ব এসেছিল। মোসলেম লীগের দাবি, নবাবজাদা লিয়াকত্ আলির নির্দেশ অনুযায়ী, মাথায় তুলে নিয়ে এই সব নির্বাচিত মুসলমান সদস্যেরা কেউই সেই কনষ্টিটুয়েণ্ট এ্যাসেমব্লীর অধিবেশনে যোগদান এতদিন করেননি। অজুহাত ছিল মুসলমান সদস্যেরা সে সভায় যোগদান করলে পাকিস্তান দাবি শিথিল হয়ে পড়বে। কিন্তু পরিণামে যখন পাকিস্তান সত্যি সত্যি কায়েম হয়ে গেল এবং নবাবজাদা লিয়াকত্ আলি এবং তাঁরই মতন অন্যান্যেরা সপরিবারে করাচী রওয়ানা হলেন, তখন ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রদেশের অ-বাঙালী মুসলমান জনতা প্রথম ধরতে পারলেন তাঁদের সঠিক অবস্থা। গোদের

ওপর বিষ-ফোঁড়ার মত এল তাদের উদ্দেশে প্রচারিত লিয়াকত্ আলির শেষ ফতোয়া। পাকিস্তান রূপায়ণে ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রদেশের মুসলমানেরা তাঁদের নিজেদের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে যে অপূর্ব সমর্থন এবং অকাতরে সাহায্য দান করেছিলেন, নবাবজাদা লিয়াকত্ আলি করাচী গমনের পূর্বাহ্ণে এবং তাঁর শেষ ফতোয়ায় তাঁদের সেজন্য অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে উপদেশ দিয়ে গেলেন: এখন তোমরা তোমাদের কনষ্টিটুয়েণ্ট এ্যাসেমব্লীতে যোগদান করতে পার, আমাদের কাজ হাসিল হয়েছে। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন।

নবাবজাদার সামনে করাচীর রাজপথ তখন উন্মুক্ত। কিন্তু সুরাবর্দীর অবস্থা বে-সামাল। ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজের প্রতিক্রিয়া তখন কেবল ফুটে উঠতে শুরু করেছে। কলকাতায় অ-বাঙালী মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া বুদ্ধিমান্ সুরাবর্দী নিজেই উপলব্ধি করেছিলেন। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানদের প্রতিক্রিয়াও সহজেই ধরতে পারলেন।

এর পর কী?—সে উত্তরের খোঁজে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে গেলেন। সেখানে তাঁর অভ্যর্থনার কোনই ত্রুটি হয়নি। পাকিস্তানের অন্যতম রূপকার, কলকাতা ও নোয়াখালির মাটি বাঙালীর রক্তে রাঙা করেছিলেন যিনি পাকিস্তানের দাবি আদায় করবার জন্য, সেই সুরাবর্দী হলেন লিয়াকত্ আলির কাছে বেইমান বা দুশমন! ভাবিত হোলেন সুরাবর্দী। ঢাকায় নাজেমুদ্দিন তো লাঠি হাতে বসে আছেন তাঁর অপেক্ষায়। তবে ভবিষ্যৎ কী?

লীগ-নায়কেরা যখন পাকিস্তান কায়েম হওয়ায় পুলকিত, জনতা যখন নতুন ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চিত, তখন অ-প্রসন্ন চিত্তে আবুল কাশেম ফজলুল হক ঢাকায় উপস্থিত। আজন্ম বাঙালী মুসলমান সমাজের সঙ্গে যিনি অঙ্গাঙ্গী হয়ে থাকতেন, তিনি ঢাকায় উপস্থিত হয়েই ধরতে পারলেন জন-চিত্তে কোথায় এবং

কি কারণে দোলা লেগেছে। পূর্ব-বাঙলা কী অ-বাঙালী মুসলমান জনতার শিকার-ভূমি ও গুটিকতক ওপরতলার লোকের খেলার মাঠ?

আবুল কাশেম ফজলুল হকের উপস্থিতি সেদিন পূর্ব-বাঙলার সমাজে কী প্রতিক্রিয়া এনেছিল তার সঠিক ইতিহাস হয়ত কোনদিনই প্রকাশিত হবে না। কিন্তু কী আগ্রহ ভরে বাঙালী মুসলমান মৌলভী ওয়াজেদ-পুত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠ করেছিলেন তার কাহিনী জ্বলন্ত সূর্যের মত দীপ্যমান। কিছুতেই তা' ম্রিয়মাণ হয় না। অভ্যর্থনা জানাল বাঙালী, আর সে ডাকে সাড়া দিলেন ফজলুল হক।

ভাগ্যবিড়ম্বিত হোসেন শহীদ সুরাবর্দী দুর্ভাবনায় পীড়িত হয়ে অবশেষে ধরনা দিলেন আবুল কাশেম ফজলুল হকের দরজায়। যেমন অতীতে ফজলুল হক আশ্রয় দিয়েছিলেন নাজেমুদ্দিনকে, তেমনি পাকিস্তান কায়েম হবার পর এবং সর্বস্থান থেকে, বিশেষ করে কলকাতার অ-বাঙালী মুসলমান সমাজ থেকে তাড়িত হলে সুরাবর্দীকেও সেই দুর্দিনে আশ্রয় দিলেন ফজলুল এবং তাঁকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দিলেন পল্লী বাঙলার মুসলমান সমাজের সঙ্গে। সে সমাজ এতদিন সুরাবর্দীর কাছে কোন পাত্তা পেত না।

নির্বাচন এল। পূর্ব-বাঙলার একমাত্র নির্বাচন। জাদুকরের মত বাঙালদের আবার মন্ত্রমুগ্ধ করলেন ফজলুল। আবার তিনি প্রধানমন্ত্রী।

ফজলুলের প্রতি বাঙালী মুসলমানদের এই আস্থা-প্রকাশ করাচী এবং কলকাতাতে দুটি ভিন্নমুখী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। একটির পেছনে অ-বাঙালী এবং অন্যটির অন্তরালে ছিল বাঙালী মনের ভাবধারা। লীগ কর্তৃক তাড়িত ও লাঞ্ছিত ফজলুল কী করে পূর্ব পাকিস্তানে নিজের অস্তিত্বকে কেবল প্রতিরক্ষা নয় মার-মুখো করে ফেললেন?—এ প্রশ্ন করাচীর কাছে দুর্জ্ঞেয় রহস্য বলে বিবেচিত হয়েছিল। অপরপক্ষে কলকাতার কাছে এই

জন-গণ-মনের অভিব্যক্তি অত্যন্ত স্বাভাবিক বলেই গণ্য হ'ল। বাঙালী তো সর্বদাই এমনি করে তার মনের ঈপ্সিত আকাঙ্ক্ষাকে রূপদান করেছে! চিত্তরঞ্জন দাশ বা সুভাষচন্দ্র বসু যেমন গোটা বাঙলার কাছে নেতৃত্বের দাবি নিয়ে উপস্থিত হতে পারতেন, ফজলুল হকও তেমনি নেতৃত্বের দাবি করতে পারতেন। স্বার্থপর, বে-দরদী জননেতারা ফজলুলের জীবনের এই দিকটিকে কোনদিনই উপলব্ধি করতে পারেন নি। এ ভেড়া পালের আনুগত্য নয়। এ জীবন-বলির প্রতি অকুণ্ঠিত শ্রদ্ধা প্রকাশ।

পূর্ব বাঙলার (পরিণামে পূর্ব পাকিস্তানের) প্রধানমন্ত্রী হয়ে ফজলুল আর একবার তাঁর জীবনের প্রধান কর্মকেন্দ্র কলকাতায় এসেছিলেন। কী অভ্যর্থনাই না তাঁকে দিয়েছিল কলকাতার বাঙালী হিন্দু! সে অভ্যর্থনায় ঘটা তত ছিল না যত ছিল আন্তরিকতা। যতই সে অভ্যর্থনার কারণটি খুঁজেছি, ততই মনে হয়েছে বারে বারে ফজলুল হককে কত না ভুল বুঝেছিল তাঁর রাজনৈতিক শত্রুরা। ফজলুল দেশ বিভাগ চান নি, সে কথা তো সকলেই জানতেন। তবে যে উদ্দেশ্য সাধনেই সে অস্ত্র-প্রয়োগ হয়ে থাকুক না কেন, একবার যখন দেশ-ভাগ হয়ে গেল, তা' যেমন নিজে কোনদিন অস্বীকার করেন নি, তেমনি তা' অগ্রাহ্য করতে কোন ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পাততেও আগ্রহী তিনি ছিলেন না।

তিনি বরাবর অস্বীকার করে গেছেন কেবল একটি বড় রকমের মিথ্যার বেসাতি। দেশ-ভাগের দ্বারা বাঙালীকে, বাঙালী মনের কামনাকে দু' টুকরো করা যায় না, যাবে না—বলেছিলেন তিনি কলকাতার অভ্যর্থনা-সভায় এবং শরৎ বোস একাডেমিতে। সে বক্তৃতা শোনবার সৌভাগ্য আমারও হয়েছিল। কলকাতায় এসে, পুরনো বন্ধু বান্ধবদের মুখগুলো দেখে যৌবনের স্মৃতি তাঁর মনের পটে নিশ্চয়ই ভেসে উঠেছিল। আবেগ সংযত করতে পারেন নি তিনি। তাই অতি সহজেই তাঁর শত্রুরা গোপন চক্রান্তে

বৈদেশিক গোয়েন্দা-সাংবাদিকের মাধ্যমে তাঁর মুখের উক্তি বলে চালিয়েছিল: I do not believe in the political division of India and it is the enemies of India who divided it. ফজলুলের মুখ্য বক্তব্য ছিল বাঙালীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে। সে বিষয়ে কোনই উচ্চবাচ্য শোনা গেল না।

একবার বিকৃত অবস্থায় তাঁর কলকাতার বক্তব্য প্রকাশ পেলে শত্রুরা আর চুপ করে থাকে নি। করাচীর কাঠগড়ায় দাঁড় করান হ'ল ফজলুল হককে। ইংরেজের প্রসাদ-পুষ্ট পরিবারে লালিত এবং ইংরেজ-দত্ত খান বাহাদুর উপাধিতে গৌরবান্বিত বগুড়ার মহম্মদ আলি কাজী-বিচারক এবং বিদেশী সাংবাদিক-চরেরা রাজসাক্ষী। পূর্ব বাঙলার বাঙালী জন-গণ দ্বারা সমর্থিত আবুল কাশেম ফজলুল হক সে বিচারে বেইমান, বিশ্বাসঘাতক, Traitor! প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারণ করে নজরবন্দী করে রাখা হ'ল শের-ই-বঙ্গালকে।

শাসনতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা সেদিন থেকেই ভেঙেছে পদ্মার ও বুড়ী-গঙ্গার দু'পারেই এবং সঙ্গে সঙ্গে অতলে নিয়ে গিয়েছে ইংরেজের উচ্ছিষ্ট-ভোজী মেরুদণ্ডহীনদের।

ফজলুলকে যাঁরা চিনতেন তাঁরাই জানতেন, তিনি লীগের কর্মকর্তাদের বিশেষ পাত্তা কোনদিনই দিতেন না। অহংকারী মোটেই ছিলেন না তিনি, বিদ্যার বড়াই কোনদিনই করেন নি, দেমাগী মেজাজ কোনক্ষণেই দেখান নি, তবুও এদের প্রতি তাচ্ছিল্যভাব বরাবরই পোষণ করতেন।

কেন? সে উত্তর বার বার দেবার চেষ্টা করেছি। আবার দিচ্ছি। ফজলুল মনে প্রাণে ছিলেন তাঁর যুগের শেষ বাঙালী প্রতিনিধি। এঁদের সামাজিক জগৎ যুক্ত হয়ে থাকত বাঙলার মাটির সঙ্গে। চাষী বাঙালী, উকিল-মোক্তার-জোতদার-জমিদার বাঙালী অথবা পণ্ডিত-মৌলভী-শিক্ষক বাঙালী জন্মাবধি সে

মাটিতে বিচরণ করতে ভালবাসতেন। এঁদের সকলেরই সামাজিক মনটা বাঙলা দেশের নদীনালার মত শত-সহস্র ধারায় প্রবাহিত হতে চাইত। অকাতরে নিজেকে নিংড়ে সমাজের কল্যাণে সব কিছু আয়োজন নিবেদন করতে সমুৎসুক ছিলেন সেদিন এই বাঙালীরা। ফজলুলের বৈশিষ্ট্য ছিল এইটুকু যে তিনি ঐ ধারায় সিঞ্চিত করতে চেয়েছিলেন বিশেষ করে বাঙালী মুসলমান সমাজকে, যাতে সে সমাজ বাঙালী হিন্দু সমাজের সঙ্গে সর্ববিষয়ে সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারে। ঋণ করে অভাজনকে সাহায্য করবার প্রবৃত্তির উৎস সেই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই নিহিত ছিল।

যখন নিজের আজন্ম-সঞ্চিত ধ্যান-ধারণা এবং স্ব-সম্প্রদায়ের স্বার্থে নিযুক্ত কর্মপ্রেরণার প্রতি লক্ষ্য রেখে রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বীদের দিকে তিনি দৃষ্টিপাত করতেন, তখনই তাঁর চোখে ধরা পড়ত উভয়ের মধ্যে অবস্থিত বিরাট ব্যবধানের বেড়া। কোথায় তাঁদের ত্যাগ? কোথায় তাঁদের স্ব-সম্প্রদায়ের মঙ্গলার্থে প্রচেষ্টা? কোথায়ই বা সে সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় বা আত্মীয়তা করবার আকাঙ্ক্ষা? প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রতি তাচ্ছিল্য জন্মেছিল ঐ ব্যবধান নিয়ে বিচার-বিবেচনার মাধ্যমে।

বাস্তব দৃষ্টিতে দেখলে ফজলুল হক ঐ সব ধারণায় বদ্ধমূল হয়ে হয়ত ভুলই করেছিলেন। যুগ যে পরিবর্তনশীল, সম্প্রদায়কে যে কুক্ষিগত করা যায় প্রচার-মহিমায়, পরিচয় যে নির্ভর করে প্রকাশ-মাধ্যমকে হাত করে, নেতৃত্ব যে প্রতিষ্ঠিত করা যায় বক্তব্যের ভিত্তির ওপর এবং কৃতকর্মকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে এবং আপন জীবনযাত্রা যে ধরনেরই হোক না কেন তা' যে জনসাধারণ বা স্ব-সম্প্রদায়ের দ্রষ্টব্য একেবারেই নয়—এ সব ধ্যান-ধারণার সঙ্গে ফজলুল হকের কোনই পরিচয় ছিল না বলেই নতুন যুগসন্ধিকালে তাঁকে হঠতে হয়েছিল। কিন্তু তাই বলে আত্ম-প্রতিষ্ঠ আবুল কাশেম ফজলুল হক এদের বড় করে দেখবেন কেন?—দেখেন নি কোনদিনই।

ইতিহাস ঠিক সময়ে এ দ্বন্দ্ব ব্যবধানের ওপর রায় নিশ্চয়ই দেবে। সে রায় কী ভিত্তির ওপর রচিত হবে, সে বিচার কোন পদ্ধতিতে চলবে, তা' নিয়ে আলোচনা আজ নিষ্প্রয়োজন। অনেক রথী ও মহারথীকে ইতিহাস অতি অবজ্ঞার সঙ্গে আস্তাকুঁড়ে কবর দিয়েছে এবং এখনও দিয়ে থাকে। কিন্তু পরার্থে, সমাজের কল্যাণার্থে আত্ম-নিবেদিত জীবন ইতিহাস ভোলে না, হয়ত ভুলতে পারেও না। মৌলভী ওয়াজেদ-পুত্র, বরিশালের খাঁটী বাঙাল-বাঙালী আবুল কাশেম ফজলুল হককেও ভুলবে না।

সদ্য অথবা সুদূর অতীতের মূল্যায়ন যেমন গোটা মানব-সমাজে, তেমনি জাতির জীবনেও যুগে যুগে পরিবর্ত্তনশীল। যা' আজ স্মৃতির ফলকে সুদৃঢ় রেখায় খোদিত, আগামীকালে অতি সহজেই তা' বিস্মৃতির অন্ধকারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কোন প্রচেষ্টাই তা'কে ধরে রাখতে পারে না। অপরপক্ষে, যা' আজ বিস্মৃত-প্রায়, লোক-চক্ষুর অজ্ঞাত, তা' হঠাৎ সামনে এগিয়ে আসে এবং নতুন মূল্যায়ন দাবি করে থাকে।

অনেক বাহ্যিক কার্য-কারণের সমন্বয়ে এবং সমষ্টির আনুকূল্যে এই ধরনের পরিবর্তন এসে থাকে।

যতদূর আজ দৃষ্টিগ্রাহ্য তাতে মনে হয়, বর্তমানে জাতীয় জীবনে চলেছে বিস্মরণের যুগ। এও মনে হয়, এ ধারাও সীমাহীন নয়। যা' স্বাভাবিক কারণে গতিসম্পন্ন তাতেও অকস্মাৎ যেমন বাঁধা পড়ে থাকে, তেমনি মরা গাঙেও বান সময় সময় এসে পড়ে বাইরের বিশ্বের কার্যকারণের ঘাত-প্রতিঘাতে।

ভবিষ্যতে বাঙালীর সামাজিক জীবনে যখন অতীতের স্মৃতিচারণ করবার অবসর আসবে, তখন যুক্ত বাঙলার শেষ পটে কী ঘটেছিল, কা'রা নেতৃত্ব করেছিলেন, কী তাদের আশা বা আকাঙ্ক্ষা ছিল, কী রূপায়ণে তাঁরা ব্যস্ত ছিলেন এবং পরিণামে কী স্থাপনা করে

গেলেন—এ সব প্রশ্নের উত্তর ভাবী কালের বাঙালীকে খুঁজে বের করতে হবেই। তাঁদের সেই অনুসন্ধানের কাজ যাতে একটু সহজসাধ্য হয় তার জন্য এই কাঠামো রচনা।

লেখা শুরু হয়েছিল আবুল কাশেম ফজলুল হকের জীবনকাহিনী নিয়ে। শীঘ্রই সে জীবন অতিক্রম করে যুগ এবং যুগ আলোচনায় সুদূর অতীতের রেখাচিত্রগুলো আপনা থেকেই এসে পড়েছে। "জনতা" সাপ্তাহিকে ধারাবাহিক প্রবন্ধাকারে লেখাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থাকারে রূপান্তরে সে লেখাগুলি অবিকৃত অবস্থায় রাখা যুক্তিযুক্ত মনে করিনি। অনেক পরিবর্ত্তন করেছি এবং গোটা নতুন অধ্যায় ও অংশবিশেষ যোগ করেছি।

ছাপার কাজও অত্যন্ত মন্থর গতিতে চলেছে, ফলে একাধিক নায়ক, যাঁদের নাম এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে, আদিতে আমারই মতন এ পৃথিবীর মানুষ থাকলেও আজ তাঁরা পরলোকে। আজ যে অবস্থা, আদিতেও যদি তাঁদের সেই অবস্থা থাকত, তবে সমালোচনার ভাষার ব্যবহারে ইতর বিশেষ হয়ত হ'ত। কিন্তু সমালোচনার উর্দ্ধে তাঁদের স্থান দেওয়া যেত না।

কাহিনী বর্ণনায় পুনরুক্তি স্থানে স্থানে ঘটেছে। পেশাগত অজ্ঞতা এ অপরাধের অন্যতম কারণ হলেও সবটা নয়। মনে হয়েছে যে-অতীতের কাহিনী নিয়ে এই অবতারণা তা' বর্তমান যুগের বাঙালীর কাছে এত অপরিচিত যে পট-বিন্যাসে পুনরুক্তি না থাকলে বক্তব্যের সবগুলো ইঙ্গিতে ধরা সম্ভবপর নাও হতে পারে।

সাপ্তাহিকে প্রকাশিত লেখাগুলি আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী লিলি ঘোষ গুছিয়ে রেখেছিল, তাই এগুলির সংস্কার ও পরিবর্ধন সাধন এবং প্রকাশন সম্ভবপর হ'ল। সহযোগী ও সুহৃৎপুত্র শ্রীমান্ নিরঞ্জন সেনগুপ্ত লেখাগুলির ওপর একবার চোখ বুলিয়ে দিয়েছিলেন বলে এ প্রকাশনে ভরসা পেয়েছি।

বন্ধু-বান্ধবদের ও অমৃতবাজার পত্রিকার কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে গ্রন্থে দেওয়া ছবিগুলো প্রকাশ করা সম্ভবপর হ'ল। সহযোগী শ্রীশ্যামাদাস বসু দমদম এয়ারপোর্টে তোলা আবুল কাশেম ফজলুল হক সাহেবের ছবিখানি দিয়েছেন। ইহা ঐতিহাসিক ছবি বললেও চলে। কারণ ছবি তোলার একঘন্টা পরে ঢাকার হাওয়াই বন্দরে পৌছলে হক সাহেবকে নজরবন্দী করে রাখা হয়। সহযোগী শ্রীতারক দাশ তেতাল্লিশের মন্বন্তরের ছবিগুলি দিয়েছেন। "পত্রিকা" কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে হোসেন শহীদ সুরাবর্দীর প্রধান মন্ত্রিত্ব কালে কলকাতার বুকের ওপরে সংঘটিত হিন্দু-মুসলমানের "সিভিল ওয়ার" ও দেশ বিভাগের প্রাক্কালে বিধান সভা সম্পর্কীয় ছবিগুলি পেয়েছি। এতদিন পরেও ছবিগুলির ওপর চোখ বুলালে বাঙালী ও বাঙলা দেশ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে ও পরে কী অবস্থার মধ্যে পড়েছিল তার খানিকটা ধারণা সম্ভবপর হয়।

বাজারের দিকে তাকিয়ে অথবা প্রচলিত লৌকিক ধ্যান-ধারণার সমর্থন বা বিরুদ্ধতা করবার মন নিয়ে এ গ্রন্থ রচিত হয়নি। বাঙালী জীবনের কতকগুলো আদিম প্রশ্ন সংবেদনশীল জন-মানসের পুরোভাগে তুলে ধরাই এর মূল উদ্দেশ্য।

১১০।১বি, আমহার্ষ্ট স্ট্রীট
কলিকাতা ৯
মে, ১৯৬

কালীপদ বিশ্বাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

সাঁইত্রিশের নির্বাচন : ফজলুল হকের আবির্ভাব

বেশ কিছুকাল আগের কথা। টিফিনের জন্যে বিধানসভার অধিবেশনের সাময়িক বিরতি মুহূর্ত ; সদস্যদের কেউ কেউ সভাকক্ষ থেকে বেরিয়ে গেছেন, কেউ বা বেরোনোর উদ্যোগ করেছেন।

প্রেস-গ্যালারী তখনও জমজমাট, গল্প-গুজবে বা রিপোর্ট মেলাতে রিপোর্টাররা ব্যস্ত। এমন সময় এক অপরিচিত এবং অবাঙালী ভদ্রলোক সভাকক্ষে ঢুকে একেবারে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক সাহেবের সামনে এসে দাঁড়ালেন। মনে হোল যেন আলাপ জমানোর চেষ্টা করছেন। হক সাহেব খানিকটা নির্লিপ্তভাবেই ভদ্রলোকের কথার উত্তর দিতে দিতে প্রেস-গ্যালারীর পাশের দরজার দিকে এগিয়ে গ্যালারীর কাছে এসে দাঁড়ালেন। যাঁরা তখনও আসনে বসে আছেন তাঁদের দিকে চোখ ফিরিয়ে হক সাহেব ইংরাজীতে ভদ্রলোককে বললেন: আমার জীবন-কাহিনী! তা যদি শুনতে চান, তবে ওদের কাছে যান। আমার চেয়ে ওরা ভাল জানেন ও বলতে পারবেন আমার কথা।—বলে ঢিলে পায়জামার ওপরে সাদাসিদে একটা আচকানে আচ্ছাদিত প্রবীণ ফজলুল হেসে ফেললেন। প্রেস-গ্যালারীর রিপোর্টাররাও হেসে উঠলেন।

তাঁর তরফ থেকে বা সেদিন যাঁরা প্রেস-গ্যালারীতে বসেছিলেন তাঁদের তরফ থেকে সে জীবন-কাহিনী সংগ্রহ করা হয়েছে কি-না জানি নে ; কিন্তু সেই মুহূর্তটি আজও ভুলিনি। এই হচ্ছে দিলদরিয়া মেজাজ ফজলুল হকের চরিত্রের বিশেষত্ব। তাঁর জীবনের সার্থকতা এবং ব্যর্থতাও নিহিত ছিল এইখানে। জীবন-ভোর

কর্মপ্রচেষ্টার পেছনে ছিল একটি নিরভিমান, নিরলস, আত্ম-ভোলা মন যা কিছুতেই সাধারণ দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক বিষিয়ে উঠতে দেয়নি। পুরানো বাঙালী সমাজের আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছিলেন। শিক্ষাদীক্ষা, জীবনযাত্রা এবং সর্বোপরি তাঁর দীর্ঘ আয়ু সে-সমাজে তাঁর আত্মপ্রতিষ্ঠা অতি স্বাভাবিকভাবেই এনে দিয়েছিল।

পিতার আমলের হিন্দু কর্মচারীদের মধ্যে যাঁরা তাঁকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছিলেন তাঁদের কেবল একজন ছিলেন যুবক ফজলুলের পেছনে—যখন সবে তিনি উকিল হয়েছেন। পেছনের এই মানুষটির মৃত্যু হলে, তাঁর বিধবা স্ত্রীকে ফজলুল হক পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বারাণসীধামে এবং যতদিন মহিলা বেঁচে ছিলেন, প্রতিবার পূজোর সময় ফজলুলের নমস্কারটি এসে ঠিক পৌঁছাত ঐ বিধবার কাছে—বছরের খরচ নিয়ে। সেখানে ফজলুল কোনদিন ভুল করেননি। যুবক রাজেন্দ্রপ্রসাদ যেমন বাঙালী সামসুল হুদার কাছে আইন ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা লাভে সাহায্য পেয়েছিলেন, যুবক ফজলুল তেমনি পেয়েছিলেন আশুতোষ মুখার্জির কাছে। এ দেওয়া-নেওয়া ছিল সেদিনকার বাঙালী সমাজের বৈশিষ্ট্য।

"সেকেলে" বাঙালী ফজলুলের জুড়ি সে-কালের বিধানসভায় ছিল না। এক খাজা নাজেমুদ্দিন, অপরিচিত বলেই ফজলুলের কাছে ছিলেন "আপনি।" এ অধিকার হাইকোর্টে সিনিয়ার-জুনিয়ার লোপ করবার ইংরেজী কেতা নয়। এ ছিল একদম সেকেলে বাঙালী সমাজ-ধারা যা ফজলুলের উপস্থিতিতে অস্বীকার করেন নি বা করতে পারেন নি কোন ইঙ্গ-বঙ্গ সাহেবই।

ফজলুল হক মুখ্যমন্ত্রী হলেন, কিন্তু তাঁর ধ্যান-ধারণা পড়ে রইল সেই প্রাচীনকালের সামাজিক বিধি ব্যবস্থার ওপর। যুগ যে পরিবর্তনশীল হয়ে পড়েছে, সমস্যাগুলো যে নতুন রূপ নিয়ে আসছে—যে রূপ অতীত বাঙলায় দেখা দেয়নি কোনদিন—সে বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভবই ছিল। যে আশু কাজের কথা

তিনি ভেবেছেন তাঁর যৌবনকাল থেকেই, সে করণীয় কাজ হ'ল ঋণভারে জর্জরিত বাঙালী কৃষকের মুক্তিদান এবং পরিণামে বাঙালী মধ্যবিত্ত মুসলমান সমাজকে সমশ্রেণী বাঙালী মধ্যবিত্ত হিন্দুসমাজের স্তরে তোলা। এ কাজে বাধা আসবে তিনি জানতেন। কিন্তু সেই বাধা ও তার প্রতিরোধের সুযোগ নিয়ে যে কোন বিজাতীয় শক্তি দুর্বার হয়ে পড়বে এবং পরিণামে দেশটাকে দুখণ্ডে টুকরো করে ফেলবে সে কল্পনাও তিনি সেদিন করতে পারেন নি। একেবারে নির্ভেজাল বাঙালী ছিলেন, যে বাঙালী গত শতাব্দ থেকে শুরু করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কাল পর্যন্ত ইংরেজ সরকারের ভ্রূকুটি ও বাধা অগ্রাহ্য করে, বিশেষ করে পূর্ববাঙলার প্রতিটি নদীর বাঁকে স্থাপন করেছে ইংরেজী স্কুল। যুবক ফজলুল দেখে এসেছেন এই কর্মপ্রচেষ্টা, ধরতে পেরেছিলেন এর অন্তর্নিহিত সামাজিক অনুপ্রেরণা। যাঁরা এ বিদ্যালয়গুলোর প্রতিষ্ঠাতা তাঁরাও ছিলেন ফজলুল হকের পেশাগত সমধর্মী উকিল বা জোতদার। ফজলুল হক মুখ্যমন্ত্রীরূপে অতীত বাঙলার এই ঐতিহ্যের অন্যতম ধারক ও বাহক। তিনি মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু তাঁর হাতে 'হোম' ছিল না, পুলিস ছিল না। সে যুগে এ দুটোই ছিল মুখ্য-বিভাগ। অঙ্ক-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ফজলুল রাজস্ব বিভাগও হাতে নেন নি। মনে পড়ে বিধানসভায় বাজেটে দেওয়া একটি সংখ্যা নিয়ে আলোচনা-কালে ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল একটু বাড়াবাড়ি করলে, সান্যালের প্রত্যুত্তরে ফজলুল্ কেবল বলেছিলেন: নলিনাক্ষ আমাকে অঙ্ক শেখাতে চায় নাকি?—ব্যস্, আর কিছু তাঁকে বলতে হয় নি, সভাকক্ষ হাসিতে ফেটে পড়েছিল।

ফজলুল হক মুখ্যমন্ত্রী হয়েও বেছে নিয়েছিলেন শিক্ষা দপ্তর। নিজের গ্রামে কলেজ, কলকাতায় এবং অন্যান্য স্থানে শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠার পেছনে ছিল তাঁর সেই বাঙালী প্রেরণা। এ প্রেরণা একটু আধটু বিহার ও উড়িষ্যায় দেখা দিয়েছিল বোধ হয় প্রতিবেশী

বলেই, কিন্তু ভারতবর্ষের অন্য কোথাও সে প্রেরণা এত ব্যাপক আকারে দেখা দেয়নি যেমন দেখা দিয়েছিল বাঙলায়। ফজলুল হক মাধ্যমিক শিক্ষা প্রবর্তনে সচেষ্ট হলেন। এ নিয়ে সে যুগে প্রচণ্ড বাগবিতণ্ডা শুরু হয়েছিল। কিন্তু ফজলুল হক 'পথ ছেড়ে' দেন নি। কারণ তাঁর কাছে শিক্ষা বিস্তার, বিশেষ করে বাঙালী মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থা করা ছিল অন্যতম প্রধান কর্তব্য।

এত বাগবিতণ্ডার পরেও কিন্তু তিনি এই বিষয়ে কোন আইন পাস করাতে পারেন নি। এই অক্ষমতার কারণগুলো বিশ্লেষণ করলে ধরতে পারা যায় যে ফজলুল বাঙলার রাজনীতিতে নতুন শক্তি সূচিত করবার প্রধান সহায়ক হয়েও নিজে শক্তিধর হতে পারেন নি। এ বিষয়ে হিন্দু-বাঙালীর প্রতিরোধ তাকে অক্ষম করে নি। তাদের দেওয়া বাধা ছিল ডাইরেক্ট বা প্রত্যক্ষ এবং এ বাধার অতীত ইতিহাস ও রূপ এবং এর পেছনকার শ্রেণী-স্বার্থ ফজলুলের কাছে অজানা ছিল না। সেজন্যে এ বাধা অতিক্রম ও অগ্রাহ্য করতে যে অস্ত্রের ব্যবহার অপরিহার্য তা উপযুক্ত সময়ে তিনি সভাকক্ষে হিন্দু প্রতিপক্ষকে দেখাতে কুণ্ঠা বোধ করতেন না।

যেদিন বিধানসভার প্রথম অধিবেশন শুরু হল—সেদিনই ফজলুল হক মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সভ্যদের বিশেষ করে কংগ্রেস ও স্বতন্ত্র হিন্দু সদস্যদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিলেন তাঁর অনুকূলে পল্লী বাঙলার নবাগত প্রতিনিধিদের। এঁরা বিধানসভায় নবাগত কিন্তু এঁদের কথা ও ভাবনাই হবে এর পর সভার প্রধান বিবেচ্য বিষয়,—একথা তিনি সেদিনই বলেছিলেন। সেদিনও স্বতন্ত্র মুসলিম সদস্যরা সভাকক্ষে ছিলেন। কিন্তু হাউসের উপর দীর্ঘমাত্রা সেই দিন থেকেই পেয়ে এল তাঁরই সমর্থকেরা, স্বতন্ত্র মুসলিম—এমন কি মুসলিম লীগের সদস্যদের সেদিন কোন প্রাধান্যই ছিল না সেই সভাকক্ষে। হিন্দু বাঙালীর আসন্ন বিরোধ উপলক্ষ্য করে ফজলুল হক জানিয়েছিলেন মুসলমান বাঙালীর আগামী প্রতিবিরোধের কথা।

পক্ষান্তরে এ বাধাকে কলকাতা বনাম পল্লী বাঙলার দ্বন্দ্ব বলেও আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। কংগ্রেসের জন্ম থেকে অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যবর্তিকাল পর্যন্ত কলকাতাই ছিল কংগ্রেস এবং পরিণামে কংগ্রেস-বিরোধী মুসলিম লীগের রাজনৈতিক কর্মকেন্দ্র। এই প্রতিষ্ঠানের আওতায় গড়ে ওঠা কনফারেন্সের অধিবেশন সুদূর জেলা শহরে হোত, এবং সাময়িক চাঞ্চল্যের সৃষ্টিও করত, কিন্তু কলকাতাই ছিল কংগ্রেস ও লীগের প্রাণকেন্দ্র। প্রাদেশিক কনফারেন্সের ইতিহাস-বিশ্রুত বরিশাল-অধিবেশন অথবা প্রায় 'ভাঙ্গা হাটে কাড়া' দেওয়ার মতো নাটোরে মিঃ জিন্নার লীগ অধিবেশন ছিল সেই গতানুগতিক ধারার জের। ফজলুল হক মুখ্যমন্ত্রী থাকা কালে কলকাতা প্রথম শুনতে শুরু করেছিল—খাঁটি বাঙলা দেশের কথা। সে কথায় ভাষার ব্যঞ্জনা না থাকলেও, তাতে ছিল আন্তরিকতা ও দৃঢ়তা। সেই সময়কার বিধানসভার সভ্যদের নাম, ধাম এবং পেশার দিকে লক্ষ্য করলেই বোঝা যেত, কোন দল, কংগ্রেস, মুসলিম লীগ না ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি পল্লী-বাঙলার প্রতিনিধিত্ব দাবী করতে পারত!

হিন্দু বাঙালীর বাধা অগ্রাহ্য করতে পারলেও ফজলুল হক শিক্ষা-আইন প্রবর্তনে অসমর্থ হলেন। এর প্রধান কারণ হ'ল সেদিন তিনি আরও দুটো নতুন বাধার সামনে এসে পড়েছিলেন, যাদের সম্বন্ধে তাঁর কোন সুস্পষ্ট ধারণা বা জ্ঞান ছিল না। এবং যখন তাঁর জ্ঞান লাভ হল তখন সে বাধাগুলো আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের মত মুক্তিদাতাকেই গ্রাস করে ফেলেছে।

এর প্রথমটি এল খাজা স্যার নাজেমুদ্দিন সাহেবের তরফ থেকে। খাজা সাহেব ছিলেন নিতান্ত ভদ্রলোক তবে একেবারে অপরিচিত ও অজ্ঞাত। ঢাকার নবাব পরিবারের লোক হয়েও প্রাক্-ফজলুল হক যুগের নবাব আলি, গজনভীদের মতো কোন প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেন নি। সবে সে যুগ শেষ হয়েছে। কিন্তু নাজেমুদ্দিনদের

মত নবাগতদের রঙ্গমঞ্চে স্থান করে নেবার সময় আসে নি। ঢাকা জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক ও সাংবাদিক শ্রীনির্মল গুপ্তের রাজনৈতিক বোধ ছিল প্রখর। তাঁর মুখে শুনেছি যে তিনি সেই যুগসন্ধিক্ষণে ছিলেন অজ্ঞাত নাজেমুদ্দিনের উপদেষ্টা। তিনি নাজেমুদ্দিনকে পরামর্শ দিতেন কলকাতার সাহেবী মহলে যাতায়াত করতে। বেশ মনে পড়ে, সার্কুলার রোডে গলষ্টন পার্কের বাড়ীতে (আজকের নিজাম প্যালেস) "মাদার ইণ্ডিয়া" লেখক মিস্ মেয়োর প্রধান সহায়ক মিস্ কর্ণেলিয়া সোরাবজী বার-এট-ল, এক শিশু মেলার অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন এবং ছোটলাট জ্যাকসনের পত্নী সে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করলেন। খাজা নাজেমুদ্দিন সে সভায় বেশ আগ্রহভরে নিজ শিশু-কন্যাকে লাট-পত্নীর কাছে এগিয়ে দিচ্ছেন 'নিজ পরিচয়' লাভার্থে। কলকাতার সাহেবী ও শাসক মহলে তখন সবে তাঁর পরিচয় লাভের সুযোগ এসেছে।

নতুন আইন সভার সূচনা হতে চলেছে। পূর্ব যুগের বাঙালী মুসলমান নেতারা হয় পরলোকগত নয় অকর্মণ্য। নতুন ট্যালেণ্টের খোঁজাখুঁজি চলেছে। নাজেমুদ্দিন সাহেবের আবির্ভাব হল এমনই যুগ-সন্ধিকালে। জ্যাকসন রাজত্বেই মন্ত্রী পদপ্রাপ্তি তাঁর ভাগ্যে ঘটল। নতুন যুগে যে সব সমস্যা আসবে বা আনা হবে তার সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারে যে নতুন ট্যালেণ্ট তার শিক্ষা বা ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থাও করলেন শাসকশ্রেণী। খাজা নাজেমুদ্দিন অল্পদিনের মধ্যে তৎকালীন চটকলের অর্ধশিক্ষিত সাহেবদের এবং সরকারী জবরদস্ত ও জাঁদরেল সাহেব আই. সি. এস.দের 'ফেভারিট বয়' হয়ে পড়লেন। নাজেমুদ্দিনের প্রথম পদ-প্রাপ্তি হোল শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তর।

এখনও মনে আছে শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে ভবিষ্যতের মুসলিম লীগের কর্ণধার নাজেমুদ্দিনের প্রথম আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনা জুটেছিল ভাটপাড়ার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের কাছে। সে সংবর্ধনার সংবাদ সংবাদ-পত্রে প্রকাশ করবার কি আগ্রহই না নাজেমুদ্দিন প্রকাশ

করেছিলেন সেদিন। পরিণামে এই ধর্মভীরু বুরোক্রাট হলেন মুসলিম লীগের নায়ক। 'মুসলিম দাবী মানতে হবে' এই হল তাঁর প্রোগ্রামের প্রথম বুলি। সে দাবী কা'কে মানতে হবে তা ছিল সহজেই অনুমেয়।

নাজেমুদ্দিন-প্রোগ্রামটি যে আসলে কি বস্তু সে বিষয়ে সেদিন সঠিক ধারণা ছিল কেবল বিদেশী আই. সি. এস. শাসকদের এবং ঐ চটকলের সাহেব পরিচালকদের। একদা মিস মেয়োকে এঁরাই সাহায্য করেছিলেন গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ প্রভাবের মূল উৎপাটন করার উদ্দেশ্যে। যদিও ভারতবর্ষে মহিলার সে উদ্দেশ্য সফল হয়নি কিন্তু তাঁর বইখানি অবলম্বন করে যে বৃহত্তর ষড়যন্ত্র রূপ পেয়েছিল তা বিদেশে অনেকটা সার্থক হয়েছিল, বিশেষ করে মিস মেয়োর স্বদেশে। বিবেকানন্দ থেকে আরম্ভ করে লালা লাজপত রায় ও ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত পর্যন্ত তাদের স্বদেশ সম্পর্কে যতকিছু বুলি মার্কিনী তোতাপাখীকে শিখিয়ে আসছিলেন মিস মেয়ো-মার্জারের আবির্ভাবে সে সব শেখানো বুলি ভুলে বসল সে পাখী। ভারতীয় লেখকেরা ভাবলেন মিস মেয়োর যোগ্য প্রত্যুত্তর হল মার্কিনী নোংরামীর ইতিবৃত্ত উদ্‌ঘাটন করা। সুচতুর ইংরেজ খোশ মেজাজী হয়ে পড়ল তার প্রপাগাণ্ডার সার্থকতা দেখে, বোধহয় আমেরিকাও হেসেছিল ভারতীয়দের কাণ্ড-কারখানা দেখে। এমনি ধারায় দূর-নিকট সম্পর্কে হুসিয়ার হয়ে সাহেবরা দাবার বড়ে চালত, সে চালে প্রতিপক্ষের দিশেহারা না হয়ে উপায়ন্তর থাকত না। এবং সে অবস্থায় পড়ে প্রতিআক্রমণ এদিকে সেদিকে চলত এবং কদাচিৎ ইংরেজই যে আসল নষ্টের গোড়া সে ধারণা বদ্ধমূল হত।

মিঃ জিন্না তখন বিলেত থেকে ফিরেছেন। পাকিস্তান রব তাঁর কণ্ঠে তখনও ধ্বনিত হয়নি। সেদিনকার বিলিতি সাহেবদের কাগজখানার পাতা উল্টালে দেখতে পাওয়া যাবে কি চাতুর্যের সঙ্গেই না পাকিস্তান আওয়াজ বাঙলা দেশের কানে ফিস্ ফিস্ করে

শোনানো হচ্ছে। হাওড়ার মাঠে পাকিস্তান ধ্বনি প্রথম ওঠালে বিলিতি কাগজখানা—সে যুগের রীতিনীতি অনুসারে সে মিটিংএর যৎসামান্য রিপোর্ট দিয়েই কর্তব্য সম্পাদন করেছিল। ওপরতলায় যে পাকিস্তান কল্পনা নিয়ে বৃহৎ কর্মানুষ্ঠানের আয়োজন চলেছে নীচেরতলায় তখনও সে খবর পৌঁছেনি। দুদিন পরে দেখা গেল, ঐ একই মিটিং-এর বিবরণ বৃহত্তর আকারে আবার স্তম্ভে স্থান পেয়েছে। সম্পাদকীয় কলমে জানান হল—মিস মেয়ো সম্পর্কেও এই নীতি অনুসৃত হয়েছিল—যে এখন থেকে "পাকিস্তান" শব্দটি মাঠে-ঘাটে শোনা যাবে। যাদের জ্ঞানাঞ্জন শলাকা ভোঁতা হয়ে যায় নি, তারা কি অনুমান করতে পেরেছিলেন লোকচক্ষুর অন্তরালে এবং অতি সাবধানে নতুন কোন্ অস্ত্রে শান দেওয়া চলেছে?

প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯৪৬এর আগষ্টের কলকাতায় 'ডি-ডে' উৎসবানুষ্ঠানের কথা। সেদিন যে গৃহযুদ্ধ শুরু করানো হয়েছিল তারই পরিণতি হল দেশ-বিভাগ। এরও পরিকল্পনা অনেকদিন পূর্বেই এই চট-কলের সাহেবেরা, তাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠান ইয়োরোপিয়ান এসোসিয়েশন ও তাদের মুখপত্র জানত। গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হবার প্রায় মাসাধিক কাল পূর্বে কলকাতার জাতীয়তাবাদী ইংরিজী কাগজখানা ইয়োরোপিয়ান এসোসিয়েশন দ্বারা চটকলের সাহেবদের মধ্য প্রচারিত এক গোপন সার্কুলারের বক্তব্য ছেপে দেয়। সে সার্কুলারে ইয়োরোপিয়ান এসোসিয়েশন এই সব চটকলের সাহেব ম্যানেজারদের সাবধান করে জানায়, দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধলে তারা কি করবে এবং কি করে অস্ত্র ব্যবহারই বা করবে। সে সংবাদ প্রকাশে দেশী মহলে কোনই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেনি, কারণ কেউ তখন কল্পনাও করতে পারেননি যে আই. এন. এ আন্দোলন ও সে সময়ের পোলিটিক্যাল চিন্তাধারাকে ঘোলা করবার জন্য পাকিস্তান-দাবী দ্রুতলয়ে ধ্বনিত করবার আয়োজন সুসম্পন্ন হয়ে গেছে।

সংবাদে গোপন ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ হলে সাহেবরা কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকতে পারেনি। এসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা কাগজের সম্পাদকমণ্ডলীর সঙ্গে অবিলম্বে দেখা করে সে সার্কুলারের পশ্চাতে যে কোনই তাৎপর্য নেই সেই কথাই জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাৎপর্য যে ছিল তা' বুঝতে পারা গিয়েছিল সেই গৃহ-যুদ্ধের দিন। বারবার সাহেবদের পক্ষ থেকে দেশী কাগজগুলোর কাছে খোঁজ-খবর নেওয়া হয়েছিল যাতে সেই অরাজকতার ঘোর সন্ধ্যায় সবগুলো কাগজ একসঙ্গে বন্ধ করে রাখা হয়। উদ্দেশ্য সাধু। কাগজগুলো বন্ধ থাকলে গুজব-রাজ অপ্রতিহত গতিতে তার করণীয় কাজ করতে পারবে এবং গূঢ় মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। এ ষড়যন্ত্রের নাটের গুরু ডিটেল্ড প্লান করে সেই মুহূর্তে দিল্লীতে থাকলেন, যাতে তাঁকে ধরা-ছোঁওয়া না যায়।

সাঁইত্রিশের নির্বাচনে নাজেমুদ্দিন পরিচালিত মুসলিম লীগ পুরানো ধারায় আসরে নেমেছিল। ফজলুল হক তখন লীগ কাউন্সিল দ্বারা "একঘরে"। লীগ নেতৃত্ব পেয়েও মিঃ জিন্না সেদিন এমন কি নাজেমুদ্দিন সাহেবের কাছেও অল্প পরিচিতই ছিলেন। কলকাতায় সেকালে তিনি আদৃত হতেন ও আতিথ্যলাভ করতেন ইস্পাহানি, আদমজী হাজি দাউদ প্রভৃতি অ-বাঙালী মুসলিম ব্যবসায়ীদের কাছে। এঁরা তখন কলকাতার শিল্পাঞ্চলে ঢোকবার চেষ্টা করছেন ও খানিকটা সমর্থও হয়েছেন। তাঁদের প্রতিযোগী ছিল তাঁদেরই সম-গোত্রীয় মাড়োয়ারী বা ভাটীয়ারা। সাহেবরা পোলিটিক্যাল বাঙালাকে জব্দ করবার জন্য অনেক পূর্ব থেকেই, সেই স্বদেশী যুগ হতে, এদের সঙ্গে আঁতাত করে ফেলেছেন। এই নবাগত অ-বাঙালী ও সিন্ধুদেশীয় মুসলমান ব্যবসায়ীদের প্রতিষ্ঠা লাভের আশায় নির্ভর করতে হল বাঙালী মুসলমান সংখ্যাধিক্যের উপর। এতদিন ধরে বাঙালী মুসলমানের পোলিটিক্যাল আন্দোলন যে পথে ও যে উদ্দেশ্যে চলে আসছিল তাতে ছেদ পড়ল। নতুন ধারা শুরু হল। অ-বাঙালী

ব্যবসায়ীরা যে পোলিটিক্যাল ছড়ি ঘোরাবে বাঙলা দেশে, বিশেষ করে কলকাতায়, তার উদাহরণ মিলল প্রথম।

এই ব্যবসায়ীরা পল্লী অঞ্চলের বাঙালী মুসলমানের কি অভিযোগ,তাদের মান উন্নয়নের কি উপায় তা ঠিক ততখানিই জানত যতটা জানত মাড়োয়ারী বা ভাটীয়ারা। বাঙালী হিন্দুর, বাঙালী মুসলমানের রাজনীতি বাঙালী মুসলমানের হাতেই ছিল এতদিন। বরিশালের দাঙ্গা-হাঙ্গমায় লিপ্ত মুসলমানকে যখন ম্যাজিস্ট্রেট ব্লাণ্ডীর হুকুমে ও পুলিসের গুলিতে মরতে হল, তার প্রতিবাদ জানাতে স্যার আবদার রহিম লাহোর বা করাচীর সাহায্য নেন নি। বিধানসভার আসনে ইস্তফা দিয়ে তিনি আবার নির্বাচিত হলেন। নিজের অভিযোগ প্রতিকারার্থে বাঙালী মুসলমানদের কি করণীয় তা তাদের অজ্ঞাত ছিল না।

সাঁইত্রিশের সাধারণ নির্বাচন এসে পড়ল যখন তখন বাঙালী মুসলিম রাজনীতিতেও দেখা দিয়েছে বিরাট পরিবর্তনের সম্ভাবনা। এ সম্ভাবনার সমস্ত প্রেরণা এল বাইরে থেকে, এতে যথেষ্ট আবর্জনা নিক্ষেপে কোনই কার্পণ্য দেখায় নি সেদিনকার শাসক সম্প্রদায় ও চট-কলের সাহেবদের প্রতিনিধিরা। ঠিক সেই মুহূর্তে বাঙলার কংগ্রেসী রাজনীতিতে চলেছে ভাঁটা। যে চিত্তরঞ্জন দাশ স্যার আবদার রহিমের বাড়ীতে বসে রচনা করেছিলেন হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট যাতে বাঙালী মুসলমানের আর্থিক উন্নয়নের ইঙ্গিত স্পষ্ট করে ধরা আছে প্রতিটি ধারায়, তা রইল অনাদৃত এবং হয়ে পড়ল অগ্রাহ্য। একদিন সগর্বে চিত্তরঞ্জন দাশ সর্বসমক্ষে তাঁর অভিযোগকারীদের বলেছিলেন যে তিনি ঐ প্যাক্ট একমাত্র কলকাতার বড়বাজার এলাকা ছাড়া গ্রহণ করাতে পারেন বাঙলাদেশের যত্রতত্র।

সেই সাঁইত্রিশের নির্বাচনের প্রাক্‌কালে যখন বাঙলার মুসলিম রাজনীতি প্রায় হয়ে পড়েছে অ-বাঙালী মুসলমানের খেলার সামগ্রী, যখন বাঙলার হিন্দু রাজনীতি দ্বিধাগ্রস্ত, যন্ত্রবৎ এবং চরকায় বিশ্বাসী

ও অবিশ্বাসী, তখন সেই অমাবস্যা রাত্রির ঘোর অন্ধকার ভেদ করে পোলিটিক্যাল রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হলেন আবুল কাশেম ফজলুল হক। ঘটনাপরম্পরায় ফজলুল হক যুগান্তরকারী। ইতিহাসে বিশেষ করে বাঙলার ইতিহাসে—ভারতবর্ষের ইতিহাস বললেও ভুল হবে না—এই খাঁটি সেকেলে বরিশালের বাঙ্গালের অবদান যে কি তাৎপর্যময় তা বিচার করবার সময় এসেছে। অনেক ভুল তিনি করেছেন। সে ভুলের মাশুল দিচ্ছে ও দেবে যুগ-যুগান্তর ধরে আপামর বাঙালী মাত্রই। কিন্তু সেজন্য কেবল তাঁকেই দায়ী করলে ভুল করা হবে। জাতের যৌবন-জল-তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাত সকলকেই ছুঁয়ে যায়, কাউকে আঘাত ও আহত করে আবার কাউকে ডাঙ্গায় তুলে দেয়। কিন্তু সে জলের কি বৈশিষ্ট্য তা তরঙ্গের দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়। সাঁইত্রিশের বাঙলার বেনো জলের কি চেহারা ছিল, কি গুণই বা ছিল, সে জল লোনা না ঘোলা তা দেখবার ভার সেদিনকার ফজলুলী জলোচ্ছ্বাসের কাজ ছিল না। সে কাজ যেমন আজ তেমনি সেদিনও পড়েছিল বাঙালী সমাজের উপর, জাতির পোলিটিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গীর উপর ও তার কর্মকুশলতার উপর।

উনিশ শ সাঁইত্রিশের নির্বাচন হয়ে পড়েছিল বিশেষ তাৎপর্যময়। ভোটাধিকার যথেষ্ট সীমাবদ্ধ থাকলেও এই প্রথমবার স্বদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে আইনসভা গঠিত হবে এবং তাদেরই সংখ্যাধিক্যের মনোনয়নে মন্ত্রীরা রাজ্য ও শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করবেন, এ ধারণা জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। এ ভোটাধিকারে সাম্প্রদায়িক ভিত্তি ছিল। সাজ সাজ রব উঠেছে বাঙালী মুসলমান সমাজে। কারণ, সংখ্যাধিক্য হেতু বাঙলা দেশে যে মুসলমানেরাই কর্তৃত্ব করবেন এবং তাদেরই নির্বাচিত সদস্য মুখ্য-মন্ত্রী হয়ে রাজ্য পরিচালনার নেতৃত্ব করবেন এ তো অবধারিত। ঐ একই কারণে কংগ্রেস ও কংগ্রেস বহির্ভূত হিন্দুরা (জমিদার ও ব্যবসায়ীরা) নিরুৎসাহিত। বাঙলা দেশে এ নিরুৎসাহের

অপর প্রধান কারণটি হল কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্ব। "বিগ ফাইভ" তখন নিজেদের কোন্দল নিয়ে কংগ্রেসী বড় দরবারে (ওয়ার্কিং কমিটিতে) আবেদন-নিবেদনে ব্যস্ত। এ কোন্দল ছিল ব্যক্তিত্বের দাবী নিয়ে এবং সেজন্য এর নিরসন অসম্ভবই ছিল। পরিণামে শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় কেবল একলা এই নির্বাচন পরিচালনা করবার অধিকার পান। অবস্থা কেমন ছিল তার একটা উদাহরণ দিলেই বোধগম্য হবে। একদা নলিনীরঞ্জন সরকার 'বিগ ফাইভের' একজন ছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের মনোনয়ন পেলেন না, যদিও পরিণামে ভোট-যুদ্ধে তিনি জিতেছিলেন।

এক নতুন পরিবর্তনের আশায় বাঙলার, পাঞ্জাবের, সিন্ধুর ও আসামের মুসলমানদের মত ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের কংগ্রেসীরা সংখ্যা-গৌরবের সুনিশ্চয়তায় উৎফুল্ল। প্রদেশের সাম্প্রদায়িক সংখ্যাগরিষ্ঠ হেতু মন্ত্রিত্ব ও কর্তৃত্ব তাদের করায়ত্ত হতে চলেছে।

এমনি অবস্থা আসতে পারে অনুমান করেই কংগ্রেসের পূর্বগামীরা যুক্ত নির্বাচন দাবী করে এসেছেন। সে দাবীর পশ্চাতে কেবলমাত্র এই একটি উদ্দেশ্যই ছিল যে, সংখ্যাধিক্যে হিন্দু বা মুসলমান যেন নিরঙ্কুশ সাম্প্রদায়িক কর্তৃত্ব লাভ না করতে পারে। কূটনীতি ধুরন্ধর শাসক-শ্রেণী কংগ্রেসের এই দাবীর তাৎপর্য ঠিকই ধরেছিলেন এবং তাই নিজেরা ও মুসলমান প্রতিনিধিদের দ্বারা বার বার সে দাবী অগ্রাহ্য করে কেবল হিন্দু-মুসলমানের জন্য নয়, হিন্দু-হিন্দু, সাহেব ব্যবসায়ী ও ভারতীয় ব্যবসায়ী, হিন্দু ব্যবসায়ী ও মুসলমান ব্যবসায়ী, হিন্দু-শ্রমিক ও মুসলমান-শ্রমিক স্বার্থ পৃথকীকরণে সচেষ্ট ছিল। সব প্রদেশে একই নিশানা দেওয়া থাকলেও এই চেষ্টার উৎকট রূপায়ণ শুরু হল বাংলা দেশে—যে দেশে সর্ব-প্রথমে ইংরেজ ঘাঁটী করেছিল এবং যেখানে সর্বপ্রথম তাদের শাসনের প্রকাশ্য বিরোধিতা করবার আন্দোলন দানা বেঁধেছিল।

সাইত্রিশের নির্বাচনের সময় যুক্ত নির্বাচন বস্তুটি যে কি তা বাঙলা দেশের আধুনিকেরা, হিন্দু ও মুসলমান জানত। ডিস্ট্রীক্ট বোর্ডে যুক্ত নির্বাচন প্রথা চালু ছিল এবং সেজন্য পূর্ব, উত্তর ও মধ্য বাঙলার প্রায় সবগুলো বোর্ডে মুসলমান চেয়ারম্যান ছিলেন। এদের নির্বাচিত হতে হ'ত হিন্দু-মুসলমান যুক্ত ভোটে। এ অবস্থা সত্ত্বেও যে যুক্ত নির্বাচনে কংগ্রেসীরা বিশ্বাসবান ছিল তাতে তাদের দূরদর্শিতাই প্রমাণ হয়।

সাঁইত্রিশের সাধারণ ও সাম্প্রদায়িক নির্বাচন কংগ্রেসের পক্ষে মেনে না নিলে উপায়ন্তরও ছিল না। ভারতবর্ষের সমাজ, শিল্প ও শাসনক্ষেত্রে দীর্ঘকালীন সম্মার্জনার অভাবে এত জঞ্জাল ও পরগাছা সঞ্চিত হয়েছিল যে, কংগ্রেস অতীতের সেই ন্যায়সঙ্গত যুক্ত-নির্বাচন প্রথায় অবিচল থাকলে ভারতবর্ষের জীবনে আরও অরাজকতা ও অনৈক্যের বীজ ছড়াবার অবকাশ দিতে হত।

এই নতুন পরিপ্রেক্ষিতে পুরানো আদর্শ পরিত্যাগে কংগ্রেসের জীবনী-শক্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু পুরানো ছাড়লেও নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য নীতিতে যে অদল-বদল প্রয়োজন তা কংগ্রেসী নেতৃত্ব সেদিন দেখাতে পারেনি। হয়ত এ-ভার সম্পূর্ণভাবে ন্যস্ত ছিল প্রাদেশিক কংগ্রেসী নেতৃত্বের উপর। সে নেতৃত্ব ব্যক্তিত্বের মোহে বা দাম্ভিকতায় সমাজের "বহুজন হিতায়" দিকটার প্রতি একান্তভাবেই অন্ধ ছিল। কংগ্রেসী বড় দরবারে প্রকাশ্য নীতি ঘোষিত হ'ল যে, যে প্রদেশ কংগ্রেস নির্বাচনে সংখ্যা-গরিষ্ঠ না হবে সে প্রদেশে মন্ত্রিত্বে যোগদান করবে না। এ প্রকাশ্য ঘোষণা সত্ত্বেও পরিণামে বাঙলা দেশে যে অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল তা অনুধাবন করলে সহজেই বুঝতে পারা যায় যে, প্রাদেশিক নেতৃত্বকে অবস্থানুসারে ব্যবস্থা পরিবর্তনের আংশিক অধিকারও কংগ্রেসী ওপরওয়ালারা দিয়েছিলেন।

বাঙলা দেশের হিন্দু সাঁইত্রিশের নির্বাচনের প্রাক্‌কালে যেন

বুঝতে পারছিল—"নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে"। অন্তর্দ্বন্দ্বে কংগ্রেসী প্রোগ্রামে আস্থাহীন কিংবা উদাসীন এবং দুঃসাহসী নেতৃত্বের অভাবে সেদিন বাঙালী হিন্দুর দৃষ্টিকোণ যে কেবল অপ্রসারিত হয়ে পড়েছিল তা' নয়, সে নিজে কূপমণ্ডুকও হয়ে পড়েছিল। বাঙলার কংগ্রেস বিধান সভায় যে কখনও সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে না তা' জানা কথাই ছিল। কিন্তু অপরকে মন্ত্রিত্বে থাকতে সহায়তাও করতে পারবে না এটা হল বাঙলা কংগ্রেসী রাজনীতির পক্ষে মর্মঘাতী।

বাঙলা দেশের কংগ্রেসী নেতৃত্ব এ ভুল কেন করল? ইতিহাস সে প্রশ্নের সামনে মূক। পরে অবস্থা পরিবর্তনের অনেক চেষ্টা চলেছিল প্রাদেশিক নেতৃত্বের তরফ থেকে, এমন কি পরিণামে সর্ব-ভারতীয় কংগ্রেসী নেতৃত্ব অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করবার দুঃসাহসও দেখা দিয়েছিল। কিন্তু ভাগ্যবিধাতার রথচক্র তখন অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। অন্তরালে দেশ বিভাগের সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। কি হতে পারত বাঙলা-দেশে এবং ভারতবর্ষে যদি সেদিন বাঙালী নেতৃত্ব বাঙালী হিন্দুকে ও বাঙালী মুসলমানকে পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল করে রাখতে পারত!

সাঁইত্রিশের নির্বাচনে বাঙালী হিন্দুরা যতখানি উৎসাহহীন ও হতাশা-পীড়িত হয়ে পড়েছিল বাঙালী মুসলমানেরা হয়েছিল ততোধিক দুর্বার ও দুর্জয়। এ উৎসাহ আগে কোনদিন বাঙালী মুসলমান সমাজে আসেনি, অথবা বাঙালী মুসলমান অনুভব করেনি। স্বদেশী যুগে হয় বাঙালী হিন্দুর পাশে অথবা সাহেবী প্ররোচনায় তাদের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু আজ সে স্বয়ম্ভু এবং আত্মস্থ। তার প্রকাশ-ভঙ্গীতে অতীতের অনেক ছেঁদো কথা ছিল বটে, কিন্তু সে নিজেই আজ বক্তা ও স্রষ্টা। নাই বা থাকল অতীতের রাজনৈতিক ঐতিহ্য যার গর্ব বাঙালী হিন্দু করত; অনাগত ভবিষ্যৎ তার এবং সেই দিতে চলেছে এর রূপ। ডিস্ট্রিক্ট, লোক্যাল ও ইউনিয়ন বোর্ড পরিচালনা করে তার অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে

প্রচুর। বাঙলার পল্লী অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব দাবী কেবল সেই করতে পারে।

বাঙালী মুসলিম নেতৃত্ব বাঙালী হিন্দু নেতৃত্বের মতই সেদিন গতানুগতিকভাবে প্রাপ্ত পোলেটিক্যাল অনুশাসন সেলাম করতে রাজী ছিল না। এ নেতৃত্ব এসেছিল ত্রিধারা স্রোতে। প্রত্যক্ষভাবে এল দুটি, অপরটি থাকল ফল্গুর মত অন্তঃসলিলা। এর প্রধান ও প্রথম ধারা প্রবহমান করলেন নাজেমুদ্দিন। এ ধারা আদৌ অপরিচিত ছিল না সেদিন। এর গতি নিয়ন্ত্রণের গোপন ভার থাকল চটকলের সাহেব প্রতিনিধিদের এবং সরকারী দপ্তরের সাহেবী আমলাদের উপর। ঐ ধারাতেই যোগ দিলেন বাঙালী মুসলমান জমিদার, জোতদার ও বড় বড় অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরা।

দ্বিতীয় ধারার প্রবর্তক হলেন আবুল কাশেম ফজলুল হক। সে ধারায় যোগদান করল অনেক খ্যাত ও অখ্যাত পল্লী বাঙলার নবীন ও প্রবীণ মুসলমান উকিল মোক্তাররা, জেলা-বোর্ড, লোক্যাল-বোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যানেরা। তাদের হাতে তখন এসে গেছে বাঙলা দেশের জেলাগুলো। প্রজা স্বার্থ পেল দীর্ঘমাত্রা সে প্রোগ্রামে।

তৃতীয় ফল্গু ধারাটি থাকল একান্তভাবে অপরিচিত ও অবজ্ঞাত। এ ধারা নিয়ন্ত্রণের ভার পড়ল কলকাতার অ-বাঙালী মুসলমান ব্যবসায়ীদের হাতে।

প্রোগ্রামে দুটো বিশিষ্ট আওয়াজ শোনা গেল। একটি হল সেদিনকার মুসলিম লীগের প্রতিধ্বনি যাতে কণ্ঠ মেলালেন নাজেমুদ্দিন সাহেব। অপরটি হল আধা সনাতনী ও আধা আধুনিক। যার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকলেন হক সাহেব। বুঝতে এতটুকু দেরী হতে পারতনা যে, হয় নাজেমুদ্দিন নয় ফজলুল বাঙলা-দেশের ভাবী মুখ্যমন্ত্রী।

ভবিষ্যতের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাবার সঙ্গে সঙ্গে আসরে নেমে

পড়লেন ফজলুল। কোনপ্রকার জড়তা না রেখে তিনি ঘোষণা করলেন বাঙলাদেশের যে কোন নির্বাচনকেন্দ্রেই নাজেমুদ্দিন সাহেব নির্বাচনপ্রার্থী হোন না কেন, তিনি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হবেন।

বাঙলা দেশে নির্বাচনী যুদ্ধে অনেক অবাস্তব কল্পনা বাস্তবে পরিণত হয়েছে। অতীতে স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী হেরেছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে। কিন্তু সে দ্বন্দ্ব ফজলুল-নাজেমুদ্দিন দ্বন্দ্বের কাছে কিছুই নয়। কারণ সুরেন্দ্রনাথ প্রকৃতপক্ষে হেরেছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশের কাছে এবং সেদিনকার সত্যি-মিথ্যে প্রোপাগ্যাণ্ডার কাছে। তেমনি ওই একই কারণে এড্‌ভোকেট জেনারেল এস. আর. দাশ হারলেন বড়বাজারে সাতকড়িপতি রায়ের কাছে। অন্যদিকে আবার সুভাষ বসু জেল থেকে ও শরৎ বসু সুইজারল্যাণ্ড থেকে দাঁড়িয়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এর কারণ অন্য কিছু নয়; তাঁরা আপামরের প্রিয়-পাত্র ছিলেন বলেই। কিন্তু নাজেমুদ্দিন-ফজলুল দ্বন্দ্ব সেদিন গিয়ে পড়ল এক অভূতপূর্ব নির্বাচন দ্বন্দ্বের পর্যায়। এ হয়ে পড়েছিল বাঙালী মুসলমানের নিছক পোলিটিক্যাল দ্বন্দ্ব, দুটো বিপরীতমুখী শক্তির দ্বন্দ্ব, যার একটিতে রসদ জোগাচ্ছিল শাসক ও শোষকের দল, আর অপরটির পশ্চাতে ছিল কেবল বাঙালী মুসলমানের রাজনৈতিক চেতনা।

নির্বাচনের প্রাক্‌কালে যখন নাজেমুদ্দিন সাহেব রাইটার্স বিল্ডিং-এ শেষ সরকারী কাজগুলো শেষ করে বরিশাল যাত্রা করবার আয়োজন করছিলেন তখন জিজ্ঞেসা করেছিলাম নির্বাচনের দ্বন্দ্বের কথা। ফজলুল হকের ঘোষণা একটুও বিচলিত করতে পারেনি তাঁকে। কৃষক প্রজার স্বার্থের অনেক ওপরে থাকবে মুসলিম লীগের আহ্বান—বলেছিলেন তিনি।

নাজেমুদ্দিনের চরিত্রে বেশ একটু বৈশিষ্ট্য ছিল—আশা করি এখনও আছে—যা তাঁর বিরোধী সমালোচকেরাও দেখে আকৃষ্ট না হয়ে থাকতে পারতেন না। তাঁর এই বৈশিষ্ট্য কতটা তার

স্বোপার্জিত আর কতটা বিলিতী শাসকদের ট্রেনিং-এর ফল তা বিচার করা কঠিন। যেখান থেকেই এসে থাকুক, নাজেমুদ্দিনের চরিত্র সহজ, সরল ও ঋজু ছিল বলেই যে কেউ তাঁর সংস্পর্শে আসত তাঁকে তারিফ না করে থাকতে পারত না। তিনি নিজে জনসাধারণের সঙ্গে ফজলুল হকের মত মিশতে পারতেন না, এমন কি মুসলিম স্বার্থের জয়ধ্বনি দেবার জন্যও নয় এবং একথা তিনিও জানতেন। তাঁর বংশ-মর্যাদা, তাঁর বিলেতে অবস্থান, তাঁর সাহেবদের দেওয়া পোলিটিক্যাল ট্রেনিং এ সব কিছু ছিল—'ঐশ্লামিক ডিমোক্রেসী' সত্ত্বেও—প্রতিবন্ধক। কিন্তু এই ট্রেনিং পাবার দরুন তাঁর করণীয় কাজগুলো হ'ত অতি পরিষ্কার ও স্বচ্ছ।

উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করিঃ মুসলমান স্বার্থ পরিপূরণের উদ্দেশ্যে ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত করলেন যে, অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের হলেও সরকারী কলেজে মুসলিম অধ্যাপক নিযুক্ত করা হবে। হুগলী কলেজে অধ্যাপক নিয়োগ করতে হবে। প্রার্থীরা দরখাস্ত করল। প্রথম শ্রেণীর হিন্দু প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও সরকার তৃতীয় শ্রেণীর এক মুসলমান ভদ্রলোককে নিয়োগ করলেন। কাউন্সিলে প্রশ্নচ্ছলে ব্যাপারটি সকলের সামনে এলে নাজেমুদ্দিন সাহেব একটুও দ্বিধাগ্রস্ত না হয়ে জানালেন যে, তৃতীয় শ্রেণীর প্রার্থীকে, সর্বপ্রকার বিচার বিবেচনা করেই নিয়োগ করা হয়েছে। এ বিষয়ে ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মুসলমান প্রার্থী থাকলে ত কথাই নেই, এমন কি তৃতীয় শ্রেণীর থাকলেও তাঁকে নিয়োগ করা হবে। সাফ্ কথা।

নাজেমুদ্দিন কোন প্রকার ঢাক ঢাক গুড়গুড়ের প্রশ্রয় দিতেন না। যখন এই রকম আমলাতান্ত্রিক আদর্শবাদে নাজেমুদ্দিন চলতেন, তখন তাঁর অধীনে শাসন-ব্যবস্থা অনেকটা দৃঢ় থাকত। সবে মুসলিম লীগের চাপের রাজনীতি (Pressure politics) আরম্ভ হয়েছে। হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বেধে উঠছে দিকে দিকে ও

দেশে দেশে এবং নিত্য নতুন রূপে। এর পেছনের কারণগুলোর এক অতি ক্ষুদ্র অংশ থাকত অর্থনৈতিক, আর শতকরা নিরানব্বই ভাগ থাকত রাজনীতিক। নাজেমুদ্দিনের আমলাতান্ত্রিক আদর্শবাদ তখনও মুসলিম লীগ রাজনীতির চাপে ক্ষুণ্ন হয়ে পড়েনি।

সিরাজগঞ্জে দাঙ্গা বেধেছে, বেশ লুট-পাট, খুন-খারাবী হয়ে গেছে। নাজেমুদ্দিন সাহেব যে সে ঘটনায় বিশেষ অসুখী তা' তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে বুঝতে পারা গেল না। তিনি ছিলেন অবিচলিত। কেন? সে প্রশ্নের উত্তর এই কি যে সিরাজগঞ্জে মুসলমান-গুণ্ডারা হিন্দুদের ভাল পেটন দিতে পেরেছিল বলেই নাজেমুদ্দিন ছিলেন অবিচলিত? প্রশ্ন করলে নাজেমুদ্দিন যে উত্তর দিয়েছিলেন তাতে তাঁর আমলাতান্ত্রিক শিক্ষার বহর স্পষ্ট বোঝা যায়। তিনি বলেছিলেন যে শাসনের প্রধান ও প্রথম করণীয় কাজই হল দাঙ্গা যাতে না বাধে তার জন্য পূর্ব থেকেই সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। একবার কোনপ্রকারে সে দাঙ্গা যদি বেধে যায় তবে ক্ষয়-ক্ষতি যে করবেই তা' ত জানা কথা। তখন অনুশোচনা করলে বা বিধি-ব্যবস্থা নিলে শাসন-ব্যবস্থার বাহাদুরি প্রকাশ পায় না।

পূর্বে বলেছি, মুসলিম লীগের পাকিস্তান শ্লোগানের পশ্চাতে যে রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল সে বিষয়ে সঠিক ধারণা ছিল সাহেবী কাগজ-পরিচালকদের, কলকাতার ইয়োরোপিয়ান এসোসিয়েশনের মাতব্বরদের, বিলিতি আই. সি. এস. অফিসরদের এবং অ-বাঙালী মুসলমান ব্যবসায়ীদের মধ্যেকার দুই-একজনের। নাজেমুদ্দিন সাহেব, যদিও ঘটনাচক্রে হয়ে পড়েছিলেন এ বিষয়ে প্রধান সর্দার তবু তিনি বিশেষ কিছু জানতেন বা বুঝতেন তা' তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনায় ধরতে পারা যেত না। পরিণামে তাঁকে পাকিস্তান কায়েম করতে অনেক এগিয়ে যেতে হয়েছিল বটে, তাঁকে বুরোক্রাটিক আদর্শচ্যুতও হতে হয়েছিল মুসলিম লীগের মুখপাত্র হিসেবে। স্টার অফ ইণ্ডিয়া (মর্ণিংনিউজ) কাগজখানা লীগের আয়ত্তে

আনতে তিনিই সর্বাপেক্ষা বেশী সাহায্য করেছিলেন। রয়টারস ও এসোসিয়েটেড প্রেসের কলকাতার ম্যানেজার, ফ্রান্‌কৃসকে কর্ণধার করে কলেজ স্ট্রীটের পুস্তক-প্রকাশক, ভোলানাথ সেনের হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড থেকে বাঁচাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা পেছন থেকে তিনিই করেছিলেন। সরকারী প্রচার লীগের করায়ত্ত করতে বর্তমানে করাচীর "ডন" পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক আলতাফ হোসেনকে পূর্ববঙ্গ থেকে রাইটার্স বিল্ডিংএ এনে নতুন রীতিতে সরকারী প্রচারের তিনিই সূচনা করলেন।

এ সবের পশ্চাতে ছিল মুসলিম লীগের স্বার্থসিদ্ধির উগ্র আগ্রহ। কিন্তু পাকিস্তান হলে যে পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলা দুটো দেশ হবে, এমন কি যাওয়া-আসা বন্ধ হবে—নাজেমুদ্দিনই পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে (১৯৫২ সালের শেষ ভাগে) পাসপোর্ট প্রথা চালু করেছিলেন—সে ধারণা পাকিস্তান শ্লোগান ওঠবার আদি ও মধ্যযুগে তাঁর ছিল কি না সে বিষয়ে আমি সন্দিহান। পাকিস্তান হবার সিদ্ধান্ত যখন ঠিক হয়ে গেল, তখন নাজেমুদ্দিন সাহেব ব্যাকগ্রাউণ্ড থেকে রঙ্গমঞ্চে আবার ফিরে এলেন। সেদিনকার সর্দার সুরাবর্দী তখন কেবল ডুবতে শুরু করেছেন। তাঁর গান্ধী-শৈল আঁকড়ে থাকার কারণ থাকল যাতে ভরাডুবি না হয়।

রঙ্গমঞ্চে এসে নাজেমুদ্দিন সেদিন আশ্বাসই দিয়েছিলেন যে পূর্ব বাঙলা পশ্চিম বাঙলা থেকে বিভক্ত হলেও সাধারণ বাঙালীর কিছুই ক্ষতি হবে না, উভয় দেশের লোকই উভয় দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারবে এমন কি শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। তিনি কলকাতার বড় বড় দেশী শিল্পপতিদের অনুরোধ করতে শুরু করলেন, যাতে তাঁরা পূর্ব-বাঙলাকে শিল্প-সমৃদ্ধিতে উন্নত করতে সচেষ্ট হয়। উদাহরণ স্বরূপ তিনি প্রায়ই নলিনী সরকার মহাশয়ের নাম করতেন এই বলে যে, তিনি সর্ব-বাঙলায় তাঁর ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের সংযোগ বৃদ্ধি করতে স্বীকার করেছেন। এ সব থেকে নাজেমুদ্দিন যে আগামী

দিনের চিত্র সঠিকভাবে দেখতে পেরেছিলেন তা' মনে হয় না এবং পারলে তাঁর নিজেরই ভাগ্য বিপর্যয় ঘটত না।

এই ধর্মভীরু বুরোক্রাট এবং ভদ্রলোকের নিকট পেশাগত কারণে আমি কৃতজ্ঞ ছিলাম এবং এখনও আছি। একটা উদাহরণ দিলে সে কৃতজ্ঞতার স্বরূপ বুঝতে পারা যাবে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ইয়োরোপ থেকে পূর্ব-এশিয়ায় এসে পড়েছে এবং সংবাদের উপর সবে সেনসর বসেছে। নাজেমুদ্দিন হোম মিনিষ্টার। একটা সংবাদ-বহুল সরকারী কনফিডেনসিয়াল সার্কুলার হাতে এসে পড়ল একদিন, যাতে বিশেষ কোন পোলিটিক্যাল পার্টির প্রতি সরকারী লক্ষ্য কেমন হবে বা হওয়া উচিত তারই উপদেশাবলী লেখা ছিল। সংবাদটি এডিট করে দেখাতে নিয়ে গেলাম সেন্‌সর অফিসে। হোম সেক্রেটারী মিঃ পোর্টার হয়েছিলেন সেন্‌সর-অফিসর। টাইপ করা সংবাদটি তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিয়ে বসে আছি। ঘরে ডাক পড়ল। টেবিলের কাছে গিয়ে দেখলাম এক তাজ্জব ব্যাপার। পোর্টার আমার কাগজখানা কোন প্রকার কাটাকুটি না করে সটান আটা লাগিয়ে ফাইল-জাত করতে ব্যস্ত। একটু হেসে ও বসতে ইঙ্গিত করে ফাইলে আমার কাগজখানা রেখে বললেন—সেফ্‌ ডিপোজিটেই সংবাদটি থাকুক, এখন বলুন ত' কোথায় পেলেন ঐ কনফিডেনসিয়াল সার্কুলারখানা? নিশ্চয় দেখে থাকবেন আমার নামেই ও-সার্কুলারখানা প্রকাশ করা হয়েছে?

ব্যাপার বুঝতে একটুও দেরী হল না। ইতস্ততঃ করছি দেখে পোর্টার আর একটু মিষ্টি হেসে স্মরণ করিয়ে দিলেন—জানেন ত এখন সেন্‌সর বসেছে, সুতরাং নিস্তার নেই। মৌন ভঙ্গ করে উত্তর দিলাম—সেন্‌সর বসেছে বলেই ত খবরটি দেখাতে এনেছি। কোথায় পেয়েছি বা কে দিয়েছে তা'ত বলবার কথা নয়। পোর্টার প্রত্যুত্তরে জানালেন—দেখা যাক্‌ আপনার কাছ থেকে খবরের উৎস

বের হয় কিনা। তবে আপনার কপি আপনার নাম-ধাম সই নিয়ে ঐ ফাইলেই এখন থাকুক।

একটু অভিমানের ভান করেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। রাশভারী, জাঁদরেল প্রেনটিস, যিনি এমন কি চিত্তরঞ্জন দাশের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে সাহসী হতেন তাঁকে দূর থেকে দেখেছি, পরিচিত ছিলাম না; গো-বেচারী রিডের সঙ্গে ছোটখাট আলাপ আলোচনা করেছি; টুয়াইনামের সঙ্গে তর্কাতর্কি করেছি, আর সংস্কৃত সাহিত্যে ও ইতিহাসে সুপণ্ডিত গারনারকে প্রায় পকেটে রেখেছি। এঁরা সবাই ছিলেন প্রথম-শ্রেণীর কুলীন আই. সি. এস.। পোর্টারের পূর্বগামী ব্লেয়ার বা হোম ডিপার্টমেণ্টের সেদিনকার সবেধন নীলমণি কালা-সাহেব পুরনো এস. এন. রায়—ডেটিনিউদের জন্য বিধি-ব্যবস্থা করবার জন্যই তাঁর স্থান দেওয়া হয়েছিল হোম ডিপার্টমেণ্টে—প্রভৃতিকে পাত্তা দেবার প্রয়োজন বোধ করিনি যে আমি—তাকে বেঁটে পোর্টার ঘায়েল করবে!

সঙ্গে সঙ্গে মনে যে ভয়ের সঞ্চারও হয়নি তা অস্বীকার করলে মিথ্যাই বলা হবে। যুদ্ধকাল, কনফিডেনসিয়াল সার্কুলার, পোর্টার নিজে তা' জারী করেছে এবং কোথায় পাঠিয়েছে হয়ত তার লিষ্টও তার কাছে আছে, অতএব যে সূত্রে সে সার্কুলার জোগাড় করেছি হয়ত বের করে ফেলবে। তখন কি হবে? সে চিন্তা রাইটার্স্ বিল্ডিং ছেড়ে বেরোবার পূর্বেই মনে আতঙ্ক এনেছিল। সর্বোপরি সেই মুহূর্ত থেকে বাঙলা দেশের শাসন-ব্যবস্থা, মন্ত্রীরা থাকা সত্ত্বেও, যে গিয়ে পড়েছে তিন 'টা'র অফিসারের হাতে তাও জানতাম। এরা ছিলেন স্টুয়ার্ট, পোর্টার ও কার্টার। কার্টার ছিলেন ২৪ পরগণার ম্যাজিস্ট্রেট।

বেশ ঘাবড়ে গিয়ে সটান উপস্থিত হলাম স্যার নাজেমুদ্দিনের বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাসাতে। তিনি তখন বাইরে বেরোবার তোড়জোড় করছিলেন। তবুও সহজাত শিষ্টাচারের সঙ্গে আমার

বক্তব্য শুনলেন। পোর্টার যে দৃষ্টিভঙ্গীতে বিষয়টি দেখেছিলেন, নাজেমুদ্দিন তা দেখলেন না। তাঁর কাছে এটি হল সাংবাদিকের দৈনিক কর্তব্য কর্ম। এতে বাধা দেওয়া তার মতে, এমন কি যুদ্ধকালেও, উচিত হবে না।

পরের দিন রাইটার্স্ বিল্ডিংএ দেখা করতে উপদেশ দিয়ে বেরিয়ে গেলেন নাজেমুদ্দিন। দেখা করতে গেলাম। ঘরে লোক আছে বলে বাইরে অপেক্ষা করছি। কিছুকাল পরে দেখি বগলদাবায় ফাইল নিয়ে পোর্টার বেরিয়ে আসছে ও চাপরাসী আমাকে ঘরে ঢুকতে ইশারা করছে। ঘরে ঢুকে একটু আলাপের পরই বুঝতে পারলাম, পোর্টার নাজেমুদ্দিনকে বেশ ভাল ভাবেই বোঝাতে পেরেছে যে কন্‌ফিডেনসিয়াল সার্কুলার জারী হবার সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রে তা পৌঁছান সাধারণ ঘটনা নয়। শাসন-ব্যবস্থার ভিতই নাকি ধ্বসে যাবে যদি কন্‌ফিডেনসিয়াল পলিসি কনফিডেনসিয়াল না থাকে—বললেন নাজেমুদ্দিন। কিন্তু আমি সটান রাইটারস্ বিল্ডিং থেকে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে যে নালিশ পেশ করে এসেছি তাতে নাজেমুদ্দিন এইটুকু বুঝেছেন যে আমি পেশার খাতিরেই সে সংবাদ জোগাড় করেছি, আমার অন্য কোন মতলব থাকলে সেন্‌সর অফিসারকে তা দেখাতাম না। অতএব ব্যাপারটি ধামাচাপা দেবার জন্য পোর্টারকে তিনি হুকুম দিয়েছেন। আমাকে হুকুম করলেন যাতে সংবাদটি পরিবেশন না করি। আমি তখন কমলি ছাড়াতে ব্যস্ত, সংবাদ চুলোয় দিতেও রাজী। নিশ্চিন্ত মনে ফিরলাম এবং মনে মনে নাজেমুদ্দিনকে ধন্যবাদ দিলাম।

কমলি কিন্তু পরিণামে ছাড়াতে পারিনি। পোর্টারের ফাইলে সংবাদটি আমার নাম-ধাম সহ যত দিন যেতে লাগল ততই জ্বল জ্বল করে উজ্জ্বলতর আভায় দীপ্যমান হতে লাগল। স্বদেশী রাজত্ব এল। ইনটেলিজেনস্ ডিপার্টমেন্টের নবাগত কোন অফিসারের হাতে পুরানো সে ফাইল পড়লে এবং সেখানে আমার নাম ধাম দেখে সে

দেশ-প্রেমিক রেকমেণ্ডসন করলেন যে আমার এবং আজকের বাঙলা দেশের মেধাবী, পণ্ডিত এবং তরুণ এক সাংবাদিকের সরকারী কার্ড আর যেন ইস্যু না হয়।

আমাদের দুজনেরই কার্ড আটকা পড়ল। রাইটারস্ বিল্ডিংএ যাওয়া আসা বন্ধ হল। ব্যাপার কি খোঁজ করতে জীবনে দ্বিতীয়বার গেলাম লর্ড সিংহ রোডে। অফিসারের নাম নাই করলাম—ভদ্রলোক কথাবার্তা চালিয়ে উপদেশ দিলেন দরখাস্ত করতে।

জিজ্ঞেসা করলাম—কেন? কোন অপরাধে? উত্তর পেলাম না।

পরিণামে বন্ধুবর শ্রদ্ধেয় শ্রীঅমল হোম ও শ্রীসত্যেন রায়ের মাধ্যমে সে কার্ড পেলাম। বন্ধুটি সুদূর শিলংএ গিয়ে পরিত্রাণ পেলেন।

মনে পড়ে আর এক ঘটনার কথা। তখন অ্যান্ডারসনি রাজত্ব চলেছে। সন্ত্রাসবাদ ঠাণ্ডা করতে তাঁকে আমদানি করা হয়েছিল। আয়ারল্যাণ্ডে ব্লাক ও ট্যান পদ্ধতি তিনিই চালু করেছিলেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য অ্যানডারসনের নিয়োগ সংবাদ প্রকাশিত হলে কেন্দ্রীয় সংসদে আয়ারল্যাণ্ডের কথা বলে শাসক মহলকে নাস্তা-নাবুদ করেছিলেন।

অ্যান্ডারসন ছিলেন ধুরন্ধর লোক। তিনি দেখলেন পাবলিসিটির সহায়তা অতি প্রয়োজন তাঁর কাজের জন্য। এবং সে পাবলিসিটি করতে হবে দেশীয় কাগজে, সাহেবী কাগজ হলে চলবে না। সেদিনকার এসোসিয়েটেড প্রেস ছিল অনেকটা শাসককুল-সমর্থিত প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের রিপোর্টারদের সঙ্গে নিয়ে তিনি সফরে বেরুবার সিদ্ধান্ত করলেন। দু'জন রিপোর্টারের নাম সরকারে পাঠানো হল। একটি আমার, অপরটা হীরেন ঘোষ মহাশয়ের। নাম-দুটো সরকার থেকে অনুমোদিত হবার আগেই অ্যানডারসন চললেন কুমিল্লা সফরে, সঙ্গে গেলাম আমি। সফরের পাবলিসিটি ভালই হয়েছিল মনে হয়।

যখন নাম দুটো সরকার থেকে অনুমোদিত হয়ে আসবার সময় হ'ল তখন দেখলাম ঘোষ মহাশয়ের নাম বিনা বাধায় ফিরে এল, কিন্তু আমার এল না। ব্যাপার কি জিজ্ঞেসা করেছিলাম আর কাউকে নয়, স্বয়ং রায় বাহাদুর নলিনীনাথ মজুমদারকে। তখন চলেছে বোমার যুগ। রিপোর্টার হতে হলে বোমার খবর আনা চাই-ই চাই। পুলিসের সঙ্গে, বিশেষ করে ইনটেলিজেনস্ ব্রাঞ্চের এই রায় বাহাদুরের সঙ্গে খাতির জমানই ছিল প্রধান কাজ। বন্ধুবর হরিভূষণ চ্যাটার্জী ও আমার ঘাড়ে পড়েছিল সে কর্ত্তব্য ভার। তখন এসোসিয়েটেড প্রেসের কর্মকর্তা ছিলেন সুসাংবাদিক স্কোলফিল্ড। তিনি নিজে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন স্যার চার্লস টেগার্টের সঙ্গে।

রায় বাহাদুরের সঙ্গে বেশ খাতির। মনে মনে আশা থাকল, কিজন্য আমার নাম অনুমোদিত হ'ল না অন্ততঃ তার কারণটা শুনতে পাব। পরিণামে কিন্তু পাইনি। বুদ্ধিমান লোক ছিলেন রায় বাহাদুর, আমার প্রশ্নের উত্তরে কেবল পাল্টা প্রশ্ন করতেন—কি কাজ তোমার ঐ বেটাদের সঙ্গে ঘুরে ফিরে? সন্তুষ্ট হলাম না। অবশেষে জানতে পারলাম কোন এক যুগে আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত এক ভদ্রলোকের নাম লেখা একখানা গীতা হাত ঘুরে ঘুরে আমার হাতে পড়েছিল এবং বইখানা পুলিসী হেফাজতে দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। এই হ'ল আমার প্রধান অপরাধ যে জন্য অ্যান্ডারসনের সঙ্গে প্রথম সফর করেও দ্বিতীয়বার করবার অনুপযুক্ত বিবেচিত হয়েছিলাম সেই যুগে।

প্রাক্ অ্যান্ডারসনী যুগের গীতা, নন-কোঅপারেশন যুগের "গোলামখানা" পরিত্যাগ ও যুদ্ধকালীন পোর্টার রক্ষিত দলিল বিদেশী ও স্বদেশী রাজত্বে আমার পেশাগত অধিকারকে সমানভাবে ক্ষুণ্ণ করতে চেয়েছিল। এবং এই কারণেই পুলিসী অনুসন্ধান নির্ভেজাল হলেও যে সে তদন্ত বিষয়টি গ্রাহ্য তা অতীতের বা বর্তমানের

অভিজ্ঞতার উপর দৃষ্টি রেখে স্বীকার করতে আমি একান্ত অনিচ্ছুক।

ষড়যন্ত্র ত দূরের কথা এমন কি ভাঙ্গা পিস্তলও কি অতীতে কি বর্তমানে হাতে নাড়া-চাড়া করিনি কোনদিনই ; যদিও পেশাগত কারণে অনেক বড় বড় বিদ্রোহীদের বিচার রিপোর্ট করবার জন্য কোর্টে ও বাইরে উপস্থিত থাকতে হয়েছে অনেকবার। বোমা ফাটবার ও গুলি চলবার পর ঘটনাস্থলে যেতে হয়েছে অনেক ক্ষেত্রেই। বিচারের রায় দীনেশ মজুমদার কি প্রশান্ত অবস্থায় গ্রহণ করেছিলেন তা লক্ষ্য বোধহয় একা আমিই করেছিলাম। ডালহৌসী স্কোয়ারে টেগার্টের ওপর বোমা পড়বার পর স্কোলফিল্ডের সঙ্গে তাঁকে ইণ্টারভিউ করতে আমাকেই যেতে হয়েছিল। রাইটার্স বিল্ডিং-এ বিনয়-রা যখন কর্নেল সিমসন্‌কে গুলি মেরে পশ্চিম থেকে পূবে বারান্দা ধরে "বন্দে মাতরম্‌" ধ্বনি করে ও গুলি ছুঁড়ে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন সেই জনপ্রাণিহীন বারান্দার পশ্চিম প্রান্তে উঁকিঝুঁকি দিতে গিয়ে আমিই সার্জেণ্টদের হাতে আটক পড়েছিলাম। টেন্‌সনের মুখে পুলিস অফিসারদের অপ্রিয় হতেই হয়। সাংবাদিকদের পেশার তাড়নায় সে পুলিসী অপ্রিয়তার মুখোমুখীও হতে হয়। দ্বন্দ্ব অনিবার্য। এবং সে দ্বন্দ্বে, আমার মতে, সাংবাদিকের "পথ ছেড়ে দেওয়া" নীতিই একমাত্র কর্তব্য। কারণ পুলিস তখন নিছক সংবাদ পরিবেশন করবার দায়িত্বের ঢের ওপরকার কোন কিছুর সন্ধানে ব্যস্ত থাকেন, এবং তাতে প্রতিবন্ধক হবার অধিকার নেই কারুরই।

কিন্তু যেখানে অনুসন্ধান হয়ে থাকে নথিপত্রের সাহায্যে সেখানে আমার ধারণা, সাধারণ পুলিস অফিসারেরা হয়ে পড়েন সাংবাদিক অপেক্ষা বুদ্ধিতে একটু খাটো। অবশ্য অন্যান্য সরকারী অফিসারদের মধ্যে ইনটেলিজেনস্‌ ডিপার্টমেণ্টের অফিসারদের বুদ্ধিবৃত্তি ঢের সজাগ, ম্যানুভারিং তাঁরাই করে থাকেন কিন্তু তাঁদের ছকের মধ্যে। সে গণ্ডীর একটু বাইরে গেলেই তাঁরাও নিরুপায় হয়ে পড়েন ও

গোঁজামিল দিয়ে থাকেন। সেজন্য সাংবাদিক ক্ষমতা-শূন্য হলেও আলোচনার মাধ্যমে অতি সহজেই ধরে ফেলতে পারেন পুলিসী বুদ্ধির দৌড়।

যাই হোক, আমি ত নাজেমুদ্দিন সাহেবের অনুগ্রহে মুক্তিলাভ করলাম। কিন্তু পোর্টার রাজত্বে সবচেয়ে নাজেহাল হতে হয়েছিল বন্ধুবর হরিভূষণ চ্যাটার্জীকে।

হয় নাজেমুদ্দিন না হয় ফজলুল হক বাঙলার ভাবী উজিরে-আজম, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ সেদিন কেউ করেনি। বাঙলার মুসলমানের সঙ্গে নাড়ীর গভীর যোগসূত্র থাকাতে ফজলুল হকের বুঝতে একটুও দেরী হয়নি কোন্ তারে ঘা মারতে হবে। নাজেমুদ্দিন বাখরগঞ্জের পটুয়াখালি মহকুমার মুসলমান নির্বাচন কেন্দ্র থেকে নির্বাচন-প্রার্থী হবেন বলে যখনই ঘোষণা করলেন, তখুনি ফজলুল হক প্রতি-ঘোষণায় জানালেন যে পূর্ব নির্ধারিত কেন্দ্র ছাড়াও পটুয়াখালি থেকে তিনিও নির্বাচনপ্রার্থী হবেন। সে ঘোষণায় নাজেমুদ্দিন আতঙ্কিত হননি, কারণ তাঁর এই কেতাবী-ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে, উদীয়মান "মুসলিম লীগ" প্রার্থী যে কোন মুসলমান কেন্দ্র থেকে অতি সহজেই নির্বাচিত হবে। তাঁর বেলায় ত আরও অনেক সুবিধা সম্ভাবনা আছেই। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও বংশগতভাবে আবদুল গনি ও স্বনামখ্যাত আসানুল্লার পরিবারের সন্তানের কথা পূর্ব বাঙলার মুসলমানেরা কি এত শীঘ্রই ভুলে যাবে?

ফজলুল হকও যে সে-কথা না জানতেন তা নয়। বরিশাল মাতৃভূমি, পিতার জীবিতকাল থেকেই ফজলুল জেলায় সুপরিচিত। তবুও জমিদারেরা যে প্রজাকে প্রভাবান্বিত করতে পারে, বিশেষ করে সে জমিদার বংশে যদি আসানুল্লার মত পরহিতব্রতী সন্তান থাকেন তা তিনি ভালভাবেই বুঝতেন। তাই কৃষক-প্রজা সমিতির তরফ থেকে নির্বাচনী ক্যাম্পেন সফর তিনি শুরু করলেন একেবারে নবাব পরিবারের ঘরের দরজা থেকে। ঢাকায় বিরাট সভা।

প্রায় ১০,০০০ লোক সে সভায় উপস্থিত। ফজলুল সে সভায় প্রথম ঘোষণা করলেন তাঁর পার্টি প্রোগ্রাম।

কলকাতায় সে সভার বিবরণী আমরা পেলাম ইংরিজী ভাষার মাধ্যমে। তাও কত উদাত্ত! "From now onward begins the grim fight between Zemindars and Capitalists on one side and the poor people on the other. It is not at all a civil war in the Muslim community, but it is a fight in which the people of Bengal are divided on a purely economic issue. This issue must be decided first before we can take up any other matter for consideration. I am sure you realise that quite fully. You know much more than I do the apalling misery that prevails in villages and how thousands are dying every day in rural areas of Bengal in actual starvation and semi-starvation. The problem of *Dal* and *Bhat* and some kind of coarse cloth to cover our nudity is the problem of problems which stares us in the face and which must be solved immediately. This is the very problem which we will have to face as soon as we enter the Council. An obvious and immediate solution to the problem will be by effecting drastic economy in the cost of administration by reduction of taxation on the poor, by repeal of such taxation as tells heavily on the masses and by a thorough over-hauling of the Bengal Tenancy Act and other Acts in the interest of the raiyats. To all these measures Zemindars,

Capitalists and those holding vested interests will offer strenuous opposition. It is therefore, inevitable that there will be a division of the country into two main classes, those of the rich and the influential on the one side and the poor and the helpless on the other. We represent the latter ; we are sure you do the same".

সে যুগের ফজলুল হকের বক্তৃতা শুনবার সৌভাগ্য যাদের হয়েছিল তাঁরা অনায়াসেই কল্পনা করতে পারবেন কি সম্মোহনী ক্ষমতা ছিল তাঁর জিহ্বাগ্রে এবং সে শক্তি তিনি কিভাবেই নিয়োগ করতেন বাঙালী জনসভায় যখন পল্লী অঞ্চল থেকে আগত নিরক্ষরদের কাছে তাঁর কৃষক প্রজা পার্টির প্রোগ্রাম তুলে ধরতে হত।

এ প্রোগ্রামের বিরুদ্ধাচরণ করবার ক্ষমতা নাজেমুদ্দিনের ছিল না, মুসলিম লীগেরও ছিল না।

ঢাকা থেকে শুরু হল আন্দোলন। তরঙ্গাঘাতে পটুয়াখালি ডুবু ডুবু। নাজেমুদ্দিন পটুয়াখালিতে পৌঁছিলেন। ফজলুল হকও উপস্থিত হলেন। ছোট্ট পাড়াগেঁয়ে টাউন জলে ভাসছে। দুই পালোয়ানের মল্লভূমির ব্যবস্থা করা সেখানে অসম্ভব। মহকুমার হিন্দু সাবডিভিসনাল অফিসার নিজেই এগিয়ে এলেন এ সমস্যার নিরসন করতে। একই বিরাট নির্বাচনী সভা আহ্বান করলেন তিনি। উভয়ের বক্তব্য পেশ করবার অধিকার থাকল সমানভাবে। সাবডিভিসনাল অফিসারের এ বিষয়ে ব্যগ্রতা দেখানর বিশেষ কারণও ছিল। রাজায় রাজায় যুদ্ধে নল-খাগড়ার সমূহ ক্ষতি হবার যে সম্ভাবনা আছে সে আশঙ্কা তিনি করেছিলেন এই নির্বাচনী দ্বন্দ্বের মধ্যে। দাঙ্গা হাঙ্গামা যদি একান্তই শুরু হয় তবে নিরুপায়, কিন্তু তা যেন মুসলমানে মুসলমানে না ঘটে এইটাই ছিল সেদিনকার আমলাতান্ত্রিক সদিচ্ছা।

নাজেমুদ্দিন হয়ত সেই সভাতেই এবং তাঁর জীবনে সেই প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন মাতৃভাষার দাবীর কথা। ঢাকার নবাব-পরিবার তখনও উর্দ্দু বলনেওয়ালা—বোধহয় এখনও। ঢাকার কুট্টিদের সহজ ও সরল বাক-ভঙ্গীমা এবং খাঁটি উর্দ্দু বাত্‌কে কি অসাধারণ নিপুণতার সঙ্গে বাঙলায় ওতপ্রোতভাবে মেশাল দিতে তা'রা সক্ষম তাও তিনি লক্ষ্য বা গ্রাহ্য করেন নি। পরিণামে বিধানসভায় যখন বিশেষ কারণে তাপাধিক্য দেখা দিত তখন নাজেমুদ্দিন ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঙলা বলতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু পটুয়াখালির খালের ধারের সেই "পলাশী" প্রাঙ্গণে তাঁকে হতবাক্‌ই থাকতে হয়েছিল। আর ফজলুল! বক্তব্য ত সুর-সপ্তকে বাঁধা ছিলই, তার ওপরে চল্‌ল তাঁর খাঁটি "বাঙ্গাল" বাঙলা। শান্তিতে সভার কাজ শেষ হলে সাবডিভিসনাল অফিসারের উদ্বেগ গেল, তিনি উভয়কেই সমভাবে প্রশংসাবাদ করে কর্তব্য সমাধা করলেন।

তারপর আরম্ভ হল নির্বাচনী সভা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। সে সভায় নাজেমুদ্দিনের পক্ষ থেকে প্রশ্ন উঠত, কেন ফজলুল হক লীগের প্রার্থী হলেন না? ফজলুল উত্তর দিতে অনিচ্ছুকই ছিলেন। কারণ হ'ল, তিনি অ-বাঙালী অধ্যুষিত লীগের কাণ্ডকারখানা বাঙালী মুসলমানের কল্যাণে আসবে না বলে মনে করতেন। ফলে জিন্না-চালিত ও ইস্পাহানী-সুরাবর্দী অধিকৃত লীগের বাঙলা দেশের আঞ্চলিক লীগ-কাউনসিল ফজলুল হককে লীগ থেকে বর্জন করে এবং তার নাম লীগের নথিপত্র থেকে কাল কালি দিয়ে কেটে ফেলে দিয়েছে। পটুয়াখালির জনসভায় একাধিক বার সে প্রশ্ন তাঁর সামনে এসেছিল। ফজলুল আত্মসংবরণ করতে না পেরে পাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন—কা'রা লীগের জন্মদাতা? যা'রা আজ লীগ অধিকার করে বসে আছে তাদের কে ছিল সেদিন উপস্থিত ঢাকায় যখন আমরা মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেছিলাম—বলেছিলেন তিনি।

পটুয়াখালি নির্বাচনে তোলপাড় হল বরিশাল এবং সে ঢেউ পৌঁছল সমগ্র বাঙলার মুসলমান সমাজের ওপর। ক্লাইভ ও মীরজাফরের সঙ্গে তিনি কোনদিনই আঁতাত করেননি বা করবেন না—সেদিন বলেছিলেন তিনি। জোর করে বিনা বিচারে কাউকে অন্তরীণে রাখতে দেবেন না—তাও বলেছিলেন।

ভোটের দিন কাতারে কাতারে ছোট বড় নৌকায় ভোটারেরা উপস্থিত হয়েছিলেন ভোট দিতে। সে উৎসাহে ভাঁটা পড়েনি ভোটের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।

নির্বাচনের ফলাফল যখন প্রকাশিত হল তখন দেখা গেল, নাজেমুদ্দিনের মুসলিম লীগের "ইসলাম বিপন্ন" ডাক গ্রাম্য বাঙালী মুসলমানের কাছে অনাদৃত। ফজলুলের কৃষক প্রজা সমিতির সমর্থক হয়ে পড়েছে আপামর সাধারণ বাঙালী মুসলমান মাত্রেই।

এ নির্বাচনের ফলাফল অতি তাৎপর্যপূর্ণ। সে তাৎপর্য সেদিন বাঙলা দেশ ধরতে পেরেছিল কিনা সন্দেহ। ঢাকার নবাব পরিবারের সুনাম—বিশেষ করে নবাব আসানুল্লার জনহিতকর কাজগুলোর জন্য—ঢাকা ও বাখরগঞ্জ অঞ্চলে কথার কথা হয়ে পড়েছিল। স্বদেশী আমলে নবাব সলিমুল্লা সে সুনাম হিন্দুদের কাছে নষ্ট করে ফেলেছিলেন সত্য, কিন্তু মুসলমানদের কাছে তা' অক্ষুণ্ণই ছিল। সেই নবাবের নিজ জমিদারীতে নবাব পরিবারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান খাজা নাজেমুদ্দিনের পরাজয়! দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ পোলিটিক্যাল আলোকপ্রাপ্ত জেলা বর্ধমানের জমিদার বিজয়চাঁদ মহাতবের মনোনীতকে পরাজিত করতে পেরেছিলেন কি?

সমগ্র বাঙলার নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশের পর বাঙলার মুসলমান সমাজের রাজনৈতিক ভঙ্গীটা যে কি তা দৃষ্টিগোচর হল। সত্য বটে যে, সেদিন এক কংগ্রেস ভিন্ন—সাহেবদের কথা অবান্তর—অন্য কোন রাজনৈতিক দল দানা বাধতে পারেনি। তবুও মোটামুটি

নির্বাচিত মুসলমান সদস্যদের বড় একাংশ কৃষক-প্রজা-সমিতিতে যোগদান করেছিলেন।

বাঙলায় মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য, অতএব সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচন হলে যে বিধানসভায় তাদের সংখ্যাধিক্য হবে। সে সুযোগ কিন্তু দেওয়া হয় নি। সংখ্যা নিরূপণ এমনভাবে করা হয়েছিল যে মানদণ্ডের এদিক ওদিক করবার ক্ষমতা দেওয়া থাকল কেবল পেটো-সাহেবদের ২৩টি ভোটের ওপর।

এ ব্যবস্থার পশ্চাতে যে পোলিটিক্যাল ইঙ্গিত ছিল ফজলুল হক তা' বিলক্ষণ বুঝতেন এবং বুঝতেন বলেই সেই পটুয়াখালির নির্বাচনী সভায় নাজেমুদ্দিনের মুখের উপর কোনপ্রকার জড়তা না রেখে ঘোষণা করেছিলেন যে, কখনই তিনি ক্লাইভ ও মীরজাফরের বংশধরদের সঙ্গে আঁতাত করবেন না। কিন্তু পরিণামে বাধ্য হয়ে সে আঁতাত তাঁকে করতে হয়েছিল। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী সমালোচনার মাধ্যমে সুযোগ পেলেই ঐ ঘোষণার কথা উল্লেখ করতেন। ফজলুল বিব্রত বোধ করতেন সে সমালোচনায়। কিন্তু কেন যে তাঁকে সে আঁতাত করতে হল একান্ত নিরুপায় অবস্থা গতিকে, সে ইতিহাস তিনি নিজে কোনদিন ব্যক্ত না করলেও কলকাতার সাংবাদিক মহলে অজ্ঞাত ছিল না। বিরোধী পক্ষের স্বনামখ্যাত জালালুদ্দিন হাসেমী (সাতক্ষীরা, খুলনা) একদিন বিধানসভায় সে গোপন ইতিহাস প্রায় বলে ফেলেছিলেন। যদি শক্তিশালী ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টি-সম্পন্ন কংগ্রেসী নেতৃত্ব বাঙলা দেশে সে সময় থাকত তবে যে সামাজিক উৎপাতের সামনে বাঙলা দেশ চলেছে তা নিশ্চয়ই দেখা দিত না—একদা বলেছিলেন হাসেমী।

ইংরেজ সুকৌশলে যে ছক এঁকে দিয়েছিলেন বাঙলার বিধান-সভার জন্য, তা সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করা যেত যদি সেদিন কৃষক প্রজা পার্টির সঙ্গে কংগ্রেসী আঁতাত হত। ফজলুল হকের তরফ থেকে এ আঁতাত গড়ে তোলবার চেষ্টায় কোনই কার্পণ্য করা হয়নি।

সেদিনের উডবার্ণ পার্কে যাঁদেরই যাওয়া-আসা করতে হত তাঁরাই লক্ষ্য করতেন, কি আগ্রহভরেই না দিনের পর দিন ফজলুল হক শরৎ বসুর সঙ্গে মিলিত হতেন। মাঝে মাঝে সেখানে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং মৌলভী সামসুদ্দিন আহম্মদ (কুষ্টিয়া) ও অন্যান্যদের দেখা যেত।

আঁতাত কিন্তু হল না। এবিষয়ে চালু গল্প হল যে, কংগ্রেসের উঁচুতলার কর্তারা নাকি এ আঁতাতের বিরোধী ছিলেন। এ নিছক ভূয়ো কথা। আঁতাত গড়ে তোলা সম্ভবপর হয়নি কেবল ব্যক্তিগত কারণে। সে কারণ-গুলোও একদিনে দেখা যায়নি। আরম্ভ হয়েছিল সেই একত্রিশ সাল থেকে যখন শরৎচন্দ্রকে হঠাৎ ১৮১৮ রেগুলেশনে আটক করা হয়। "বিগ ফাইভ" ভাঙ্গনের মুখে এসেছে। শরৎচন্দ্র সুভাষচন্দ্রের প্রভাবে যেমন সেদিন দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পলিটিক্সে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, তেমনি অপরদিকে অন্যেরা আস্তে আস্তে সরে পড়েছেন অথবা ব্যবসা-বাণিজ্যে মনোনিবেশ করছেন। এই বিপরীতমুখী গতিবিধিতে এসেছিল মনোমালিন্য যার সবটাই ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক ঝগড়া, এবং যার আলোচনা এক্ষেত্রে হবে অপ্রাসঙ্গিক। ফজলুলের সঙ্গে কংগ্রেসের আঁতাত করতে কোনই আপত্তি হত না, যদি ফজলুল তাঁর একান্ত বশংবদ নলিনীরঞ্জন সরকারকে পরিত্যাগ করতে রাজী থাকতেন।

নির্বাচনে নাজেমুদ্দিনের পরাজয়ে মুসড়ে পড়লেন তদানীন্তন সরকারী সাহেব কর্মচারীরা এবং তাঁদের সম্প্রদায়ভুক্ত পাট-কলের সাহেবরা। এঁদের ছককাটা প্ল্যান বানচাল করে দিলেন ফজলুল হক। ঠিক এই সময়কার সাহেবী কাগজখানার পাতা উল্টালে ধরা পড়বে এরা এবং এদের ইয়োরোপিয়ান এসোসিয়েশন সেদিন বাঙলা দেশের পোলিটিক্যাল রঙ্গমঞ্চে ফজলুল হকের পুনরাগমনকে কি দৃষ্টি নিয়ে দেখেছিলেন। ফজলুল হকের প্রতি কুদৃষ্টি এঁদের অনেক আগেই পড়েছিল। নাজেমুদ্দিনকে গড়ে তোলার কাজ

ছিল ফজলুলকে গদি থেকে দূরে রাখার উদ্দেশ্যে। তাঁদের সেই আশায় বাদ সাধলেন ফজলুল; অতএব গাত্রদাহ না হয়ে পারে না। দ্বিতীয় কারণ হল, তাঁরা ভালভাবেই জানতেন যে, ফজলুল কখনই সাহেবদের বশংবদ হবেন না। অতীতে যখন ফজলুল বড় সরকারী চাকরীতে ইস্তাফা দিয়ে ওকালতি ব্যবসায়ে ফিরে এলেন তখনই শাসক-সম্প্রদায় বুঝতে পেরেছিলেন—বরিশালের এ কুমীরকে শানবাঁধানো দীঘিতে আটকে রাখা সম্ভব নয়। সে চলবে তার আপন দুর্বার গতিতে বাঙলার সীমাহীন নদী-নালাতে।

সাহেবদের মর্মাহত হবার আর একটি কারণ হল যে, এ যাবত তাঁদেরই স্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত জাঁদরেল শাসকসম্প্রদায় আসলে দেশশাসন করে আসছিল। সে ব্যবস্থায় যখন প্রথম ছেদ এসে পড়ল তখন সে ভার গিয়ে পড়ল এমন লোকের হাতে যার ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে কোনপ্রকার চাপ দেওয়া চলবে না। তবুও তাঁরা কিছুটা আশ্বস্ত হতে পারলেন ফজলুল-শরৎ আঁতাত গড়ে উঠলনা দেখে।

ফজলুল হকের মন্ত্রিত্বের আদি ও অন্তে সাহেবরা বরাবর সমর্থন জানিয়ে এলেও তাঁরা ছিলেন সন্দিগ্ধমনা। সমর্থন না দিয়ে উপায় নেই বলেই তাঁরা সমর্থন করতেন। হলওয়েল মনুমেণ্ট নিয়ে যখন সুভাষ বসু বাঙালী হিন্দু-মুসলমানদের সহযোগে আন্দোলন শুরু করলেন, ফজলুল হক সে প্রতিবাদের ভবিষ্যৎ ইঙ্গিত ধরতে পেরেই সে মনুমেণ্ট ডালহৌসি স্কোয়ার থেকে দূরীভূত করবার সিদ্ধান্ত করলেন। সাহেবদের নিয়ে কনফারেন্স বসল। টা-টু উচ্চবাচ্য না করেই হক-সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছিলেন সেদিন এই সাহেবরা। ইউনিভারসিটির পদ্ম-প্রতীক নিয়ে মুসলিম লীগ মহলে যে প্রতিবাদ ওঠে তাতেও সাহেবরা সমর্থন জানান এবং সে প্রতীক পরিবর্ত্তনে সহায়তা করেন। এসব না করে কোন উপায়ই ছিল না।

এ সমর্থনের জন্য পুরস্কার তাঁরা পেয়েছিলেন। ফজলুল মন্ত্রিত্ব-

কালেও ভূমি-রাজস্ব ছিল বাঙলার বাজেটের প্রধান অবলম্বন, সে খাতে জোর-জবরদস্তি দেখালে বাজেটে লণ্ডভণ্ড দেখা দিতে পারে তা ফজলুলের অজানা ছিল না। তথাপি সে-সব সমস্যা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেই ফজলুল ঋণভারগ্রস্ত বাঙালী কৃষক-সম্প্রদায়ের স্বার্থের প্রতি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিলেন। দাঁড়িয়েছিলেন সংকল্পে অটল হয়ে। কোন বাধা তাঁকে সে সংকল্পে বিচ্যুত করতে পারেনি। সমগ্র বাঙলার কৃষককুল ফজলুল হকের নাম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে চিরদিন।

তবুও তিনি সেই কৃষককুলকে তাদের প্রাপ্য অর্থ-সম্পদ দিতে পারেননি, যদিও তিনি বিলক্ষণ জানতেন কোন্ খাতে সে সম্পদ তাদের হাতে তুলে দেওয়া যায়। পাট চাষ তাঁর যুগ থেকে—প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকেই—হয়ে পড়েছিল বাঙালী কৃষকের একমাত্র অর্থের আকর। কেবল কলকাতার গুটিকতক চটকলের মালিক ও তাদের এজেন্ট, গোমস্তারা সে অর্থ কৃষককে বঞ্চিত করে নিজেদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিত—বোধহয় এখনও দুই বাঙলাতেই তা নিয়ে থাকে। ফজলুল জমিদার ও লগ্নী কারবারীদের হাত থেকে কৃষককে উদ্ধার করলেও, তাকে এই পাটের অর্থ প্রত্যর্পণ করে স্বপ্রতিষ্ঠ করতে পারলেন না। না পারার হেতু—সে কাজে অগ্রসর হলে সংঘর্ষ ছিল অনিবার্য। লোক দেখানো নীতি অনুসরণ করে ও সদস্যদের মুখ চেয়ে সরকার একটা জুট-অর্ডিনান্স জারী করেছিলেন। কিন্তু সে অর্ডিনান্স কার্যকরী হবার পূর্বেই (ছয় মাসের মধ্যেই) আবার প্রত্যাহার করতে হয়েছিল। আজকের মত সেদিনও বলা হত যে মিল-মালিকেরা যখন নিজের থেকে অর্ডিনান্সের ধারানুযায়ী চলতে রাজী হয়েছেন তখন এ অর্ডিনান্স বলবত্ রাখবার কোন প্রয়োজন নেই।

বিধানসভায় সেদিন ফজলুলকে এই সংঘর্ষে সাহায্য করতে পারত কেবল কংগ্রেস পার্টি। কিন্তু সে পার্টির সঙ্গে আপ্রাণ চেষ্টা করেও

ফজলুল কোন প্রকার আঁতাত করতে পারেননি। কংগ্রেসের পক্ষে জমিদারী বা লগ্নী কারবারে হস্তক্ষেপ করা যেমন কঠিনসাধ্য ছিল তেমনি পাট শিল্পের দ্বারা যে প্রভুত সম্পদ ও অর্থ বাঙলার বাইরে এবং বিশেষ করে বিলিতি সাহেবদের পকেটে চলে যাচ্ছে তাতে বাধা দেওয়ার কাজ ছিল সহজসাধ্য। সেই যুগসন্ধিকালে যদি ফজলুল হক বাঙলার কৃষককে তারই পরিশ্রমে অর্জিত অর্থ তাকে প্রত্যর্পণ করে সম্পদশালী করতেন এবং যদি সেদিন বাঙলার কংগ্রেস পার্টি ফজলুল হককে সে কাজে সহায়তা করতে পারত তবে বাঙলা দেশ অতীতের মতই আবার সম্ভবত সমগ্র ভারতবর্ষের পথপ্রদর্শক হতে পারত।

বাস্তবে তা হ'ল না, কারণ বিধানসভায় ফজলুল হককে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হয়েছিল এইসব সাহেবদের ভোটের ওপর। সাহেবদের অগ্রাহ্য করবার কোন উপায়ই তাঁর ছিল না। অপরপক্ষে যে কোয়ালিশন গভর্ণমেণ্ট তাঁকে গঠন করতে হল এবং যে কোয়ালিসনে মুসলিম লীগ হ'ল তার প্রধান সহায়—তার বড় বড় চাঁইয়েরা সকলেই অ-বাঙালী মুসলমান; যারা ব্যবসাসূত্রে এই সাহেবদের সঙ্গে জড়িত ছিল। সাহেবদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাওয়ার অর্থ হ'ল এইসব ইস্পাহানীদের, আদমজীদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা। ফজলুল সে কাজে অগ্রণী হতে পারেননি। সেদিনের কংগ্রেসী পলিটিকস সে কাজে তাঁকে কোন সাহায্যই করতে পারেনি।

নির্বাচন শেষ হবার সঙ্গে বাঙলা দেশের ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থা কি রূপ নেবে তা নিয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়েছে। ঘোলাটে জল অনেকটা পরিষ্কার হ'ল যখন হক-শরৎ বসুর মধ্যে আলাপ আলোচনা বন্ধ হয়ে গেল। কংগ্রেসী দেবতা বামমুখী হলেন, অন্তরালে এবং অতি সাবধানে ও সংগোপনে শুরু হল নতুন শলা-পরামর্শ। পলাসী যুদ্ধের প্রাক্‌কালে নিশ্চয়ই এমনি গোপন পরামর্শ চলেছিল।

সে শলা-পরামর্শে কে বা কারা যোগদান করেছিল তার কাহিনী যেমন সেদিন জন-সাধারণের অজ্ঞাত ছিল, আজও তেমনি। গুপ্ত পরামর্শ সংগুপ্তই রইল। এ শলা-পরামর্শের প্রধান লক্ষ্য হ'ল কেমন করে ডুবন্ত নাজেমুদ্দিনকে আবার রিহ্যাবিলিটেট করা যায়। কারণ নাজেমুদ্দিন ছাড়া অদূর ভবিষ্যতেও বাঙালী মুসলমানদের নেতৃত্বে বসাবার কোন যোগ্য প্রতিনিধি এঁদের আর ছিল না। সুরাবর্দীকে সাহেবরা জানতেন কিন্তু বিশ্বাস করতে পারতেন না অন্য কারণে। তাঁর ডেপুটী মেয়রগিরি সাহেবরা দেখেছেন। তাঁরা সঠিক অনুমান করেছিলেন যে, তার বাঙলা দেশের মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব করবার দাবী তখনও স্বীকৃত হয়নি। বগুড়ার মহম্মদ আলিরা ত' পুরোদস্তুর অপরিচিত। ফজলুল হক ঢেঁকি বটে কিন্তু সে ঢেঁকি গিলতেই হবে, তবে যত তাড়াতাড়ি হজম-কাজটা সম্পন্ন হয় তার জন্য এই প্লান এবং গোপন শলা-পরামর্শ।

এ শলা-পরামর্শের দূতরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন স্বনামখ্যাত নলিনীরঞ্জন সরকার। সরকার মহাশয় করিতকর্মা ব্যক্তি। অতীতে স্বরাজ পার্টিতে চিত্তরঞ্জন দাশ যখন দলপতি, তখন তিনি হয়েছিলেন পার্টি হুইপ এবং একদিকে ডায়ার্কী ভাঙবার পূর্বভূমিকার কাজগুলো যেমন সুচারুরূপে করতে পারতেন তিনি, তেমনি সেই অতীতকালেই জমিদারদের স্বার্থ রক্ষার্থে কংগ্রেসী স্ট্যাণ্ড বেশ ভাল রকমেই কমপ্রোমাইস করেও দিয়েছিলেন। কলকাতায় মোতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে যে কংগ্রেস অধিবেশন বঁসে (১৯২৮ সাল) তার সাবজেক্টস্ কমিটিতে মহারাষ্ট্র প্রেরিত যুবক নেতৃত্বের কাছে—তখনও তাঁরা কমিউনিস্ট বলে নিজেদের জাহির করেন নি—সুভাষ বসুকে নির্বাক হতে হয়েছিল, যখন সেই জমিদারী স্বার্থ-রক্ষায় কংগ্রেস পার্টির বাঙলার বিধানসভায় কৃত-কর্মের কাহিনী প্রকাশিত হল।

এ হেন কর্মকুশল ব্যক্তি আত্মরক্ষার জন্য এবং সেই গুপ্ত স্বার্থান্বেষী-দের দূত হয়ে এগিয়ে এলেন ফজলুল হক-নাজেমুদ্দিন মিলন ঘটাতে।

তদানীন্তন কংগ্রেসী মহলে সরকার মহাশয় হয়ে পড়েছিলেন একঘরে। নলিনীবাবু সে কাজে অগ্রণী না হলে যে হক-নাজেমুদ্দিন মিলন একেবারেই হ'ত না এ ধারণা করাও সমীচীন হবে না। এ মিলন হয়ে গিয়েছিল সেদিনই যেদিন ফজলুল হক আর শরৎ বসুর মধ্যে আলাপ-আলোচনায় ছেদ পড়েছিল।

নলিনীবাবু ছিলেন নিমিত্ত মাত্র। তাঁর হাতে পড়ে এ মিলন কিন্তু সার্থক হ'ল অবিলম্বে। পূর্বেই বলেছি ফজলুল হক সেকেলে হিন্দু-দত্ত বাধা কি হতে পারে সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। কিন্তু মুসলিম লীগ-ইউরোপিয়ান আঁতাত এবং তার ভবিষ্যৎ রূপ সম্পর্কে ছিলেন একেবারে অনভিজ্ঞ। নলিনী সরকার মহাশয় ছিলেন এ বিষয়ে ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। এবং সেই দৃষ্টিশক্তি ছিল বলেই হক-নাজেমুদ্দিন মিতালী করে দেবার পর নিজের পোলিটিক্যাল বন্ধু-বান্ধবদের কাছে খেদোক্তি করতেন এই বলে যে, উঁমিচাঁদের অভিনয়ের পুনরাবৃত্তিই তাঁকে করতে হল। কিন্তু নান্যঃপন্থা।

সার্কুলার রোডের রঞ্জনীতে বৈঠক বসল। এক তলায় বসে আছি আমি ও নৃপেন(পি. টি. আইয়ের কলকাতা অফিসের বর্তমান ম্যানেজার)। রাত্রি তখন বারটা। সহাস্যমুখে নেমে এলেন বৈঠকান্তে গৃহস্বামী নলিনীবাবু এবং তাঁর পশ্চাতে সুরাবর্দ্দী, নাজেমুদ্দিন এবং সর্বশেষে আবুল কাসেম ফজলুল হক। তাঁকে সেদিন অন্যান্যদের মত সপ্রতিভ দেখিনি। অনাগত ভবিষ্যতের কোন ইঙ্গিত সে বৈঠকে ধরতে তিনি পেরেছিলেন কি না তাও বলতে পারি না। নলিনীবাবুই উপস্থিত সকলের পক্ষ থেকে আমাদের দুজনকে জানালেন যে, বাঙলা দেশের আগামী মুখ্যমন্ত্রী হবেন হক সাহেব।

সংবাদটাই তখন বড় ছিল নিজের কাছে, সেই মুহূর্তে একটুও চিন্তা করিনি ইতিহাস কোন্ দিকে ধাবমান। সংবাদটি যথাস্থানে পৌঁছে দেবার জন্যই ব্যস্ত ছিলাম।

ফজলুলী আমলের বিধানসভা হয়ে পড়ল খাঁটি বাঙলা ছবি। পূর্ব আমলে যখন চিত্তরঞ্জন দাশ বা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত গোটা বিধানসভা ভাঙ্গা-গড়া করছিলেন তখন এবং তার পূর্বে সে সভা ছিল অনেকটা দরবারী গোছের। ভোটাধিকার ছিল আরও সংকুচিত, সুতরাং যে সব সদস্য নির্বাচিত হয়ে আসতেন তাঁরা সাধারণতঃ বড় বড় জমিদার, ব্যারিষ্টার, উকীল অথবা রায় বাহাদুর বা খান বাহাদুর। পোশাক পরিচ্ছদে, আদপ কায়দায় এঁরা ছিলেন ইংরেজদের ভারতীয় প্রতিচ্ছবি। এত বড় যে স্বদেশী যুগ বা ইংরেজ বিতাড়নের জন্য ষড়যন্ত্র চলেছিল দেশে তার বিশেষ কোন ছাপ বিধানসভায় প্রতিফলিত হয়নি। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী চোকা-চাপকান পরে একটু বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতেন। অপরেরা গোঁড়া বাঙালী-সাহেব। সামসুল হুদা উকীল ছিলেন। তিনি আমলা-সামলায় ও পালক-উড়ানো উষ্ণীষ পরে দরবারী হতেন। শুনা যায় ব্যারিষ্টার আব্দুল রসুল পোশাকে সাহেবই ছিলেন। পোশাকে একটু আধটু ভারতীয়ত্ব দেখালেও এঁরা সকলেই বক্তব্য পেশ করতেন ইংরেজীতে।

নন-কো-অপারেশন যুগে স্বরাজ্য পার্টি প্রথম বিধানসভায় এসে অতীতের এই ঐতিহ্যে দাঁড়ি টেনে দেন। খদ্দর এবং ধুতি চাদর স্থান পেল সেখানে। বাঙালী মুসলমান তখনও চোকা চাপকানে আবৃত। বক্তৃতার মাধ্যম কিন্তু সকলেরই ইংরেজীই থাকল। এর কারণও ছিল। বক্তব্যগুলো প্রধানত ইংরেজ শাসকদের উদ্দেশ্যেই দেওয়া হত। চিত্তরঞ্জন দাশ মেয়র হিসেবে কিংবা প্রাদেশিক কনফারেন্সে বক্তৃতা দিচ্ছেন। শ্রোতা প্রায় সকলেই বাঙালী অথচ মাধ্যম থাকল ইংরেজী। উদ্দেশ্য—যাতে লর্ড র্বাকেনহেড সে বক্তব্য সঠিক বুঝতে পারেন।

অর্ধেক একজিকিউটিব কাউন্সিলর অপর অর্ধেক মন্ত্রীদের নিয়ে ডায়ার্কিক্যাল শাসন ব্যবস্থা করা হয়েছিল। হোম মেম্বর তখনও জাঁদরেল সাহেব সিভিলিয়ন। স্যার হিউ স্টিফেনসন (পরে বেহারের

লাট হয়েছিলেন), মোরাবলি, স্যার উইলিয়ম প্রেনটিস (এর ছবিখানাই অ্যাসেমব্লী হাউসের দো-তলার সিঁড়ির পাশে সেদিনও ছিল) এবং সর্বশেষে রবার্ট রীড। সর্বপ্রথম দেশী হোম মেম্বর হলেন খাজা স্যার নাজেমুদ্দিন। তিনি হজ তীর্থযাত্রায় গেলে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা খাজা সাহবুদ্দিনও কিছুকালের জন্য হোম মেম্বর হয়েছিলেন।

টাউন হলের দোতলায় পূর্বে কাউন্সিল বসত। মণ্টেগু ব্যবস্থার গোড়ার দিকে প্রথম স্পিকার কটন সাহেব। কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট হয়েছিলেন এঁরই পিতা। হলের মধ্যস্থলে উত্তরমুখী হয়ে বসতেন, সামনে সাহেব ও দেশী শাসক-কাউন্সিলরা ও মিনিস্টাররা। একদা সেখানে স্থান পেয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথ, বিজয়চাঁদ মহতাব, প্রভাস মিত্র (রাউলট বিলে ইনিই স্বাক্ষর করেছিলেন বলে তাঁকে রাউলট মিত্র বলে ঠাট্টা করা হত), নদীয়ার মহারাজা, স্যার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র এবং পরে কুমার শিবশেখরেশ্বর রায়, (কিছুদিনের জন্য মন্ত্রী হয়েছিলেন পরে জমিদার ও হিন্দু স্বার্থের খাতিরে মন্ত্রীত্বে ইস্তাফা দেন), লেফটন্যাণ্ট (পরে স্যার) বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় প্রভৃতি। অপরদিকে ছিলেন নবাব আলি চৌধুরী (বগুড়ার মহম্মদ আলির পিতামহ), আব্দুল করিম গজনভী (এঁরই ছোট ভাই আব্দুল হালিম গজনভী, দেশ বিভাগের পরেও এখানে অনেক দিন ছিলেন এবং দুই ভাই স্বদেশী যুগ থেকে রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন), স্যার আবদার রহিম (মাদ্রাজের জজীয়তি শেষ হলে আবার বাঙলা রাজনীতিতে যোগদান করেছিলেন এবং হুসেন সৈয়দ সুরাবর্দী ছিলেন এরই জামাতা), আবুল কাসেম ফজলুল হক, খাজা নাজেমুদ্দিন এবং স্যার কাজী গোলাম মইনুদ্দীন ফারুকী (গজনভীর জামাতা)। এক সময়ে আজিজুল হকও সেখানে বসতে পেরেছিলেন।

কটন সাহেবের বাঁয়ে বসতেন স্বরাজ্য পার্টির মেম্বাররা এবং তার পুরভাগে থাকতেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, যতীন্দ্রমোহন

সেনগুপ্ত, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী (স্নেহাংশু আচার্যের মাতামহ) প্রভৃতি। চক্রবর্তী মহাশয়ও মন্ত্রী হয়েছিলেন।

সাঁইত্রিশের নির্বাচনে এ সব বিধি ব্যবস্থার ওলোট-পালট হ'ল। স্থান পরিবর্তন ত হ'লই কিন্তু তার চেয়েও যা দৃষ্টি-গ্রাহ্য তা হ'ল এই যে সাহেব শাসকদের কেউই আর সভা কক্ষে স্থান পেল না। তাঁদের থাকতে হ'ত হলের সরকারী সেক্রেটারীদের খোঁয়াড়ে। তখন সভা কক্ষের কেবল অর্ধেকটা অনাবৃত থাকত। নতুন অ্যাসেম্বলী হাউস যখন বানানো হয় তখন দেশ ভাগের প্রশ্ন আসেনি। অতএব এর বর্তমানের আয়তনের কথা স্মরণে রাখলে ইংরেজ আগামী "রিফরমে" বাঙলা-দেশে ভোটাধিকার কতটা বাড়াবার আশা করত তার একটা ধারণা করা যায়।

সাঁইত্রিশের ভোটাধিকার আজকের মত সুবিস্তৃত বা সুবিন্যস্ত না হলেও বিধানসভার এতদিনের বিধি-ব্যবস্থা যা' চলে আসছিল তা সম্পূর্ণভাবে বদলে গেল। এবং সেই পরিবর্তন বিশেষ করে ধরা পড়ল বাঙালী মুসলমান আসনগুলোতে। সাত বছর পরে বিধানসভায় এলেও কংগ্রেসী খদ্দরে তখন আর নতুনত্ব নেই। খদ্দর তখন "মিটিংকা কাপড়া" হয়ে পড়েছে। কিন্তু মুসলমানী দরবারী পোশাক কোথায় গেল? অতি সংগোপনে ঘরের কোণায় যেমন কোট প্যাণ্ট লুকিয়ে থাকত, তেমনি থাকত শেরওয়ানী চাপকানগুলো। জাতে উঠল লুঙ্গী, পায়জামা এবং ঢিলে পাঞ্জাবী। আজকের যে অংশকে পশ্চিম বাঙলা বলা হয় সেখান থেকে যে সব মুসলিম সদস্যরা সেদিন সে সভায় এসেছিলেন তাদের মধ্যে কেউ কেউ ত দস্তুর মত ধুতি পাঞ্জাবীই ব্যবহার করতেন।

যে বিরাট পরিবর্তন এই মুসলমান সদস্যেরা সে বিধান-সভায় আনলেন তার কাছে এই পোশাকের অদল-বদল অতি নগন্যই। এদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন পল্লীগ্রামের বাসিন্দা এবং এঁরা ভাবের আদান প্রদান করতেন মাতৃভাষার মাধ্যমে। "মিটিং কা

কাপড়ার" মত "দরবারী বুল ইংরেজীর" পরিবর্তে মাতৃভাষার দাবী স্থাপনা এঁরাই করলেন বিধান সভায়। সেদিন সে সভায় বাঙলা বক্তৃতার প্রতিলিপি গ্রহণ করবার ব্যবস্থা ছিল না। যাঁরা বাঙলায় বলতে শুরু করলেন তাদের বক্তৃতার সারাংশ ইংরেজীতে তর্জমা করে দিতে হ'ত। না দিলে এসেমব্লী প্রসিডিংসে কেবল লেখা থাকত মেম্বরের নাম। এ অসুবিধা সত্ত্বেও মাতৃভাষায় বক্তব্য পেশ করবার চেষ্টা তাঁরাই করেছিলেন।

এ ধারণা ঠিক নয় যে ইংরেজীতে বক্তৃতা দিতে তাঁরা অসমর্থ ছিলেন তাই বাঙলাতে বক্তৃতা দিতেন। খুলনার জালালুদ্দিন হাসেমী সেদিনকার কংগ্রেসী মহলে অত্যন্ত সুপরিচিত ছিলেন। যেমন বাঙলাতে তেমনি ইংরেজীতেও বক্তৃতা দিতে পারতেন তিনি। নতুন বিধানসভায় তিনি ইংরেজীতে বক্তব্য পেশ করতে শুরু করলেন। কিন্তু যেই বুঝতে পারলেন হাউসকে বিশেষ "ইম্‌প্রেস" করা যাচ্ছে না, তখন ফিরে গেলেন বাঙলার মাধ্যমে। সেদিনকার এ্যাসেমব্লীর আইনানুসারে স্পীকার আজিজুল হক তাঁকে সে অনুমতি দেননি এবং ঠাট্টা করে বলেছিলেন: আপনি ত ইংরেজীতে বেশ বলতে পারেন! ঐ মাধ্যমেই বক্তব্য পেশ করুন। হাসেমী প্রত্যুত্তরে জানিয়েছিলেন যে, বাঙলার মাধ্যমে বক্তব্য পেশ করা তাঁর পক্ষে আরও সহজতর। স্যার আজিজুল নিজে ঝড়ের বেগে ইংরেজীতে বক্তৃতা দিতে পারতেন, তিনি হাসেমীর সে অনুরোধ মেনে নেননি। ফলে যে ভুল গোড়ায় তিনি করেছিলেন তার মাশুল বরাবর হাসেমীকে দিতে হয়েছিল।

অন্যে পরে কা কথা! স্বয়ং ফজলুল নতুন বিধানসভার মতিগতি দেখে একবার স্পীকারের অনুমতি চাইলেন মাতৃভাষার মাধ্যমে বক্তৃতা দিতে। যে বিষয়ে সভায় তখন আলোচনা চলছিল তা হ'ল পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে। ফজলুল জানতেন এ বিষয়ে হাউসে কোন্ সেক্‌সনের স্বার্থ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এবং তাঁদের নিকট

বিষয়টি পরিষ্কার করতে হলে বাঙলা-মাধ্যম ছাড়া গত্যন্তর নেই। আজিজুল সম্মত হলেন না। ফজলুল হক প্রতি-মন্তব্য করলেন: I find along with the restriction of jute there is going to be restriction on freedom of speech. অবস্থার হেরফেরে এমনকি উর্দ্দু বলনেওয়ালাদেরও বাঙলা মাধ্যম গ্রহণ করতে হ'ত। হঠাৎ একদিন সভাকক্ষ, বিশেষ করে সরকারী কোয়ালিশন পক্ষ, আক্রোশে ফেটে পড়েছে। ফজলুল তখন হাউসে উপস্থিত ছিলেন না। বেগতিক দেখে খাজা স্যার নাজেমুদ্দিন উর্দ্দু ও ইংরেজি ছেড়ে দিয়ে উচ্চৈস্বরে সকলকে শান্ত হবার জন্য অনুরোধ করলেন: শুনুন, শুনুন —আমার কথা শুনুন। নাজেমুদ্দিনের মুখে ঢাকাই ঠাটের বাঙলা সেদিন ভালই শুনা গিয়েছিল।

বাঙ্গালদের বিশেষ করে মুসলমান বাঙ্গালদের বাঙলা ভাষা ও বাঙলা রীতি-নীতি সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবার কাহিনী অফুরন্ত। একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও আর একটি ঘটনার উল্লেখ এখানে করলে এ বিষয়ে মুসলমান-বাঙালীর দৃঢ় চিত্তের পরিচয় পাওয়া যাবে। কায়েদে আজম জনাব মহম্মদ আলি জিন্না বহরমপুরে মুসলিম কাউন্সিলের প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সে সভাপতিত্ব করছেন। যেমন পোশাক-পরিচ্ছদে তেমনি মেজাজে তিনি ঘোর ইউরোপিয়ান। মিটিং-এ হাজার হাজার পল্লীগ্রামস্থ বাঙালী মুসলমান উপস্থিত কায়েদে আজমকে দেখতে, তাঁর বক্তব্য শুনতে। কর্মকর্তারা বাঙলা দেশের রীতিনীতি অনুযায়ী যে প্রোগ্রাম করেছেন তাতে প্রথম স্থানই দেওয়া ছিল উদ্বোধন সংগীতের। গায়ক আর কেউ নয় স্বয়ং আব্বাস-উদ্দীন। কায়েদে আজম প্রোগ্রামখানা হাতে তুলেই হুকুম করলেন: no music. প্রতিক্রিয়া ঘটতে মিনিটখানেক সময় লাগল। নো মিউজিক তো নো সভা। আব্বাসউদ্দীনের কণ্ঠধ্বনি শুনব না!

কায়েদে আজম দৃঢ় তখনও; সমবেত জনতা উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সভা পণ্ড হতে চলেছে দেখে কায়েদে আজম "নরম

কাটলেন"। আব্বাস ভাটিয়ালী ধরলেন। মন্ত্রমুগ্ধের মত সে জনতা আবার আসন গ্রহণ করল। একটি নয়, তিন তিনটি গান শোনাবার পর আব্বাস ছুটি পেলেন। সভার কাজ শুরু হল। এই ছিল সেদিনকার বাঙালী ঐতিহ্য।

তিক্ততার মধ্য দিয়ে নতুন কোয়ালিশন সরকার গঠিত হলেও বিধানসভায় প্রথম দিকটার আবহাওয়া মন্দ ছিল না। সরকার ও বিরোধী পক্ষ উভয় উভয়কে বে-কায়দায় ফেলতে সর্বদা ব্যস্ত থাকত। ঠাট্টা বিদ্রূপের ছড়াছড়ি ছিল। কংগ্রেসী হুইপ নলিনাক্ষ পকেটে বিড়াল বাচ্চা এনে হাউসে ছেড়ে দিয়ে চীৎকার করে উঠলেন —"স্ট্রেনজার স্যার"। সরকারী পক্ষ থেকে রিজোলিউশন আনা হ'ল যা কংগ্রেসী পক্ষ মুখে বিরোধিতা করলেও ভোট ডিভিসনে দিতে নারাজ। সরকারী পক্ষের হুইপ প্রেরিত সদস্য বিরোধী পক্ষের আসনে বসে রিজোলিউশন ভোটে দেবার অনুরোধ জানালেন। মুখ নীচু করে কংগ্রেসীরা লবীতে ঢুকলেন।

দুই পক্ষের ঘাত-প্রতিঘাতে এবং বাদ-প্রতিবাদে বিধানসভা যেমন চিত্তরঞ্জন দাশের সময় হয়ে পড়েছিল কলকাতার মধ্যবিত্তদের পোলিটিক্যাল ফোরাম তেমনি ফজলুল হকের সময় হল সারা বাঙলার জন-গণ-মন অধিষ্ঠান স্থান। এ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ছিলেন ফজলুল। একদিন হাউস উত্তেজনায় ভরপূর, টেম্পার নামানো প্রয়োজন। ফজলুল উঠে দাঁড়ালেন। বরিশালের স্বকীয় ঠাটে উপমা দিলেন কেমন করে মাছিমারা কেরাণীর মত সরকারী হুকুম অফিসারেরা পালন করেন। সে গল্প হল স্টেশনে বাঘ এসেছে—কী তখন করণীয়?—তার জন্যে স্টেশন-মাস্টার উপদেশ চাচ্ছেন টেলিগ্রাফ মারফৎ কলকাতা থেকে। যেখানে মুহূর্ত পূর্বে ছিল সরব চীৎকার ও ভীতিব্যাঞ্জক অঙ্গ-সঞ্চালন সেখানে ফেটে পড়ল নিমেষের মধ্যে অট্টহাস্য। অথবা হাউসে সরকারী পক্ষ থেকে দেওয়া উত্তরগুলো বিরোধীপক্ষকে নীরব করতে অসমর্থ, অসহায় অবস্থায় একে অপরের

মুখ চাওয়াচায়ি শুরু করছে দেখলেন, ফজলুল হক। আবার দাঁড়ালেন। হাণ্টারের "ইণ্ডিয়ান মুসলমান" বই থেকে চোখা চোখা প্যারাগ্রাফগুলো মুখে মুখে "কোট" করে চলেছেন। চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছেন অতীতে মুসলমানকে কি খেসারত দিতে হয়েছে। সভা আবার গম গম করে উঠল! ফজলুলের বক্তৃতার পর বিরোধী পক্ষের তীক্ষ্ণ শাণিত অস্ত্রগুলো মাঠে প্রান্তরে পড়ে থাকল।

ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের ছেলেরা কি কারণে স্ট্রাইক করে সটান এসেমব্লী হাউসে এসে পড়েছে। সেদিন সেখানে যেতে কোন বাধাই ছিল না। যখন ছাত্রের দল সীমানা অতিক্রম করে ঢুকতে যাবে তখন পুলিস থেকে বাধা এল। ফজলুলের কাছে সে সংবাদ পৌঁছলে ফজলুল পুলিসকে বাধা দিতে বারণ করে ছাত্রদের লবীতে আসতে আদেশ দিলেন। এ নজীর ফজলুলের পূর্বে বা পরে আর কোন মুখ্যমন্ত্রীই রাখতে পারেন নি। লবীর দোতলায় ওঠবার সিঁড়িতে ফজলুল বসে। ছাত্র নেতারা তাদের বক্তব্য পেশ করলে ফজলুল উত্তরে তাঁর করণীয় কী এ সম্পর্কে তা অকপটে জানালেন। ছাত্রদের মুখে হাসি ফুটে উঠল। নীরবে, নিঃশব্দে তারা ফিরে গেল।

ছেচল্লিশের নির্বাচন। সুরাবর্দী গদি লাভের আশায় ঘোরতর নামাজে বিশ্বাসী মুসলমান হয়ে বাঙলার জেলায় জেলায় মুসলিম লীগের ঘোড়া ছুটিয়ে দিগ্‌বিজয়ে বেরিয়েছেন। "আজাদ" সে বিজয়বার্তা পৃষ্ঠাব্যাপী স্তম্ভে সাধারণকে পরিবেশন করছে। ফজলুল চলেছেন স্বধাম বরিশালে। মুসলিম লীগ পাণ্ডারা ফজলুলকে ধিক্কার দেবার জন্য কোন আয়োজনেই কার্পণ্য করেনি। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কায় পুলিস-বাহিনী মোতায়েন রেখেছেন স্টীমারঘাটে।

ঘাটে স্টীমার লাগলে পুলিসের বহর দেখে ফজলুল জিজ্ঞাসা করলেন—ব্যাপার কি ?

ব্যাপার শুনে বললেন পুলিস-বাহিনী অপসারিত না হলে তিনি

স্টীমার থেকে নামবেন না। বরিশালের মুসলমান যদি ফজলুলের মাথার ওপর লাঠি চালাতে চায় তবে চালাক।

পুলিস অপসারিত হল। বৃদ্ধ ফজলুল স্টীমার ছেড়ে বরিশালের মাটিতে পা' দিলেন। কালো পতাকা হাতে রেখেই বরিশালের লীগের ভলান্টিয়ার দল সচীৎকারে জয়ধ্বনি দিল—শেরে-ই-বঙ্গাল। ফজলুলের উঁচু মাথা সে আহ্বানে ঈষৎ অবনিত হয়েছিল বটে, কিন্তু মুখে হাসি ফোটেনি। বরিশাল আর ফজলুল—এত একই বস্তুবাচক নাম। সেখানে ফাট ধরেছে নাকি? তিনি সে চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয়েছিলেন।

কলকাতা ইউনিভারসিটির গ্রান্ট নিয়ে বিধানসভায় আলোচনা। এটাই ছিল সেদিনকার বাঙলা পলিটিকসের, এমন কি পুলিসী বরাদ্দের চেয়েও মারাত্মক ব্যাপার। স্বয়ং ফজলুল নিজে সে দাবী পেশ করলেন। মুসলমান সদস্যদের মধ্যে যাঁ'রা পলিটিকসের আসরে আসবার সুযোগ খুজতেন তাঁরা এই দাবী বিশেষ করে সমালোচনা করবার চেষ্টা করতেন।

সাহেবদের পক্ষ থেকে সবেধন নীলমণি, ওয়ার্ডসওয়ার্থ। (তখন ষ্টেটসম্যানের সহযোগী সম্পাদক) প্রতি বৎসর সেই দাবী সমর্থন করে বক্তৃতা দিতেন এবং বক্তৃতান্তে সভা থেকে পালাতেন। তাঁর পালাবার হেতুও ছিল। কারণ মন্ত্রীর পরই ওয়ার্ডসওয়ার্থের বক্তব্য ইউনিভারসিটির সদস্য শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর কাছে উত্তর দেবার বিষয় হ'ত। ওয়ার্ডসওয়ার্থ যখন প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রফেসর তখন শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন তাঁর ছাত্র। কিন্তু বিধানসভায় এই দাবী আলোচনা-সমালোচনায় ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'নিজের ব্যক্তিগত যে মতই থেকে থাকুক না কেন, তাঁকে সমর্থন করতে হত সরকারী নীতি। ছাত্র শ্যামাপ্রসাদ প্রাক্তন শিক্ষকের এই দুর্বলতা ক্ষমা করতেন না। শ্যামাপ্রসাদী বিদ্রূপ হয়ে পড়ত অসহনীয় ওয়ার্ডসওয়ার্থের পক্ষে। ভদ্রলোক সে জন্য বক্তৃতা দেবার পরই

সভা থেকে চলে যেতেন—এবং তাঁকে এই কাজ করতে হত প্রতি বৎসর।

ইউনিভারসিটির তরফ থেকে প্রথম বলতেন শ্রদ্ধেয় ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জী। ডাঃ মুখার্জীরও এটা ছিল বাৎসরিক কাজ। ভদ্র বাঙালী, ভদ্রতা রক্ষা করেই বক্তৃতা করতেন অনেকটা অনাসক্তভাবে। তাঁর বক্তৃতান্তেই উঠতেন শ্যামাপ্রসাদ। হাউসে তখুনি শোরগোল পড়ে যেত। উভয় পক্ষের সদস্যেরা ভীড় করে বসতেন তাঁর বক্তৃতা শুনতে।

সামনে প্রায় মুখোমুখি অবস্থায় ফজলুল হক গালে হাত রেখে শুনে চলেছেন একদিন সে বক্তৃতা। হঠাৎ উত্তেজনা-ভরা কণ্ঠে বলে উঠলেন—তা'হলে গ্র্যাণ্ট দেব না।

হাতে ধরা ক্লিপে আটা কাগজগুলো টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেলে শ্যামাপ্রসাদ দীর্ঘমাত্রা দিয়ে উত্তর করলেন—তবে তাই হোক। কখনো আপনার ধাত্রী-মা পাটের ছালা পরে, ভিক্ষুক বেশে এখানে উপস্থিত হবে না।

হাউসে বিদ্যুৎসঞ্চারণ হয়ে গেল। দমকা হাওয়ার ঝাপটায় সরকারী ও বিরোধী পক্ষ নিশ্চল এবং নীরব।

ফজলুল কিন্তু অবিচলিত। স্বগতোক্তি করলেন—বাঘের বাচ্চা বাঘ।

সে উক্তি শোনবার পর বিধানসভা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

সেকেণ্ডারী বোর্ড অফ এডুকেসনের খসড়া নিয়ে তুমুল বাদ-প্রতি-বাদের ঝড় উঠেছিল বাঙলা দেশে। আজকের পরিপ্রেক্ষিতে সে ঝগড়া কত অকিঞ্চিৎকর বলেই না মনে হয়! কিন্তু সেদিন এ ঝগড়ার পেছনে ছিল পোলিটিক্যাল অভিসন্ধি—যা' সাহেবী অফিসারেরা প্রধানতঃ ডাইরেক্টর অফ এডুকেশন, ডাঃ জেনকিনস্, মুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নতির ভান করে কাজ হাঁসিল করতে বদ্ধ-পরিকর হয়েছিলেন। সে ঝগড়ার নিষ্পত্তি সেদিন হতে পারেনি। যেমন আজ

সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশ-বিভাগ হয়েছে, সে খসড়া আইনে পরিণত হলে একই অবস্থা শিক্ষা বিভাগে আসত।

যখন সে ঝগড়া আইনসভায়, বাইরের সভা সমিতিতে এবং সংবাদপত্রে চলেছে তখন একদিন ফজলুল বিধানসভায় একটি লিখিত স্টেটমেণ্ট করেন। ফজলুল কখনো "ম্যানাসক্রিপ্ট এলোকোয়েন্স" এ বিশ্বাসী ছিলেন না এবং করতেনও না। এই নতুন রীতিতে বক্তব্য পেশ করবার পেছনে কোন গূঢ় কারণ যে তাঁর থাকতে পারে তা' সেদিনকার হিন্দু পোলিটিসিয়ান বা সাংবাদিক কেউ-ই অনুমান করতে পারেন নি।

চুল-চেরা সমালোচনা শুরু হল। ফজলুল হক দেশটাকে কোন্ জাহান্নামে নিয়ে চলেছেন—এই হ'ল সেই সমালোচনার মূল বক্তব্য। প্রায় সকল সমালোচকেরাই ফজলুলের স্টেটমেণ্টের একাংশ উদ্ধার করে তাঁকে তীব্র আক্রমণ করলেন। ফজলুল আক্রান্ত হ'লে প্রত্যুত্তর না দিয়ে থাকতেন না, এমন কি মহম্মদ আলি জিন্না সাহেবকেও তিনি খাতির করেননি সে যুগে। কিন্তু তাঁর স্টেটমেণ্টের এই একাংশ নিয়ে যে এত হৈ চৈ তবুও তিনি ছিলেন নিরুত্তর!

সমালোচকেরা যখন আক্রমণান্তে শ্রান্ত, তখন ফজলুল আবার এক লিখিত স্টেটমেণ্ট দিলেন, যাতে লেখা থাকল যে তাঁর পূর্ব স্টেট-মেণ্টের যে অংশ নিয়ে এত সমালোচনা হয়েছে তা হ'ল হুবহু স্যার আশুতোষ মুখার্জীর উক্তি। ফজলুল তাঁর স্টেটমেণ্টে সেই আশুতোষ-বক্তব্য কেবল উদ্ধার করেছেন; কিন্তু ইচ্ছা করেই কোটেসন মার্ক দেন নি।

অন্তর্দাহে জ্বলেও সমালোচকেরা নির্বাক। চাপা হাসি ও মস্করায় মুখর হয়ে উঠল জনসাধারণ।

প্র্যাকটিক্যাল "জোক্" তাঁকে অনেক সময় করতে দেখা গিয়েছে, এ "জোকে" খেসারৎও তাঁকে দিতে হয়েছে। মেজাজ ছিল মোড়লী।

সে মোড়লী স্বীকার করে নিলে ফজলুল হয়ে পড়তেন হাতের পুতুল, বাধা দিলে হতেন নর-শার্দ্দূল।

শেষ বিলিতি যে লাট সাহেবের সঙ্গে তাঁকে প্রকাশ্য ঝগড়া করতে হয় এবং পরিণামে বে-কায়দায় পড়ে পদত্যাগ করতে হয়, তারও পশ্চাতে—সে সময়ের অন্তরঙ্গদের মুখে শুনেছি—ছিল এই সব প্রাকটিক্যাল "জোক"। ক্যাবিনেটের মিটিং বসেছে রাইটার্স বিল্ডিংস্-এ, স্যার জন হারবার্ট নিজে মিটিং চালাচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল সে মিটিংএ কি হচ্ছে তাতে অনবহিত। কেবল মাঝে মাঝে কাগজের শ্লিপে বাংলায় কি যেন লিখে পাশে শ্যামাপ্রসাদের কাছে পাঠাচ্ছেন। সে শ্লিপ পড়ে শ্যামাপ্রসাদ টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলছেন। তাতে লেখা মন্তব্য পড়ে শ্যামাপ্রসাদ হাসতেন কিনা জানিনে। তবে হাসবারই কথা এবং সে হাসি যতই শালীনতা রক্ষা করে কেউ করুক না কেন সভাপতির দৃষ্টি এড়াতে পারে না।

—রয়টারের খবর এসেছে সিঙ্গাপুরে ইংরেজের যুদ্ধ জাহাজ জাপানিরা ডুবিয়েছে। ফজলুল শ্লিপে লিখলেন—ভরাডুবি হচ্ছে।

স্যার জন হারবার্ট সে মর্মার্থ ধরতে পারতেন কি না জানিনে, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর যুদ্ধ-প্রসঙ্গে অনাগ্রহ নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন। তিনি জানতেন যে ফজলুলকে নাড়ানো সোজা নয়। অথচ সেই মুহূর্তেই তাকে গ্রহণ করতে হবে"পোড়া-মাটি" নীতি, যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি গোটা বাঙলা দেশের দুর্ভিক্ষ। হারবার্ট অতি হীন কুটনীতির আশ্রয় নিয়ে সহজেই ফজলুল হককে গদীচ্যুত করলেন। ফজলুল ও বাঙলা দেশ সে ঘটনাকে গ্রহণ করল হারবার্টের ব্যক্তিগত আক্রোশ মনে করে। হারবার্ট ফজলুল হককে ডিপ্লোম্যাটিক চিঠি লিখতেন। ফজলুল সে গুলোর মধ্যে ভবিষ্যতের কোন ইঙ্গিত দেখেন নি, ধরতেও পারেন নি যে যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা বাঙলাদেশের উপর চালু করবার সময় এসে গেছে এবং সে ব্যবস্থায় শ্যামাপ্রসাদ বা তাঁকে মন্ত্রিত্বের গদিতে থাকতে দেওয়া যায় না।

এরা উভয়ই কিন্তু দেখলেন যে হারবার্ট যেন তাদের প্রতিই অখুশী।

যদি সেদিন হারবার্টের খপ্পরে এঁরা স্বেচ্ছায় পা বাড়িয়ে না দিতেন তবে হয়ত অন্য কোন উপায়ে তাদের অপসারিত করা হত।

কিন্তু তার প্রয়োজন হল না। সহজেই বশংবদদের এবং পোর্টারের ষড়যন্ত্রে ফজলুলের অপসারণ ও কনিস্টিটিউসনাল ধারা চালু রাখা সম্ভবপর হ'ল সার জন হারবার্টের পক্ষে।

পূর্বেই বলেছি, হাউসের বাইরে এবং ঝাউতলার বাড়ীতে ফজলুল ছিলেন সেকেলে মোড়ল। দ্বার ছিল অবারিত এবং তাঁর কাছে গিয়ে নালিশ করতে, সাহায্য পেতে, উপদেশ নিতে প্রতিটি বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের ছিল সম-অধিকার। সেই মানুষ-ফজলুলের বাঙালীপনা ছিল দেখবার বিষয়।

একদিন এক বাঙালী হিন্দু-জমিদারের সান্ধ্য-পার্টিতে গিয়েছিলাম। সেখানে হক সাহেবের পাশে বসে আছি। এমন সময় হক সাহেবের পরিচিত এক গ্রাম্য হিন্দু ডাক্তার তাঁকে নমস্কার করে কাছে এসে দাঁড়ালেন। তাঁকে চিনতে ফজলুলের এতটুকু দেরী হল না। পাশে উপবিষ্ট রাজা মহারাজাদের সঙ্গে যে আলাপ আলোচনা চলছিল তা সহসা বন্ধ হয়ে গেল। জমিদারদের যে সংকটের মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে সে বিষয়-বস্তু শিকেয় উঠল। ডাক্তারের গ্রামের সংবাদ, পরিবারের ছেলে-মেয়ের কথা ও তাদের কুশল বার্তা উচ্চস্থান পেল। ডাক্তারের মেয়ের বিয়ের সমস্যা এসে পড়েছে, ফজলুলের উপদেশ চাইলেন। মনের মত ছেলে পাচ্ছি না, পেলেও পণ দেবার ক্ষমতা নেই, প্রভৃতি কথা পাড়লেন ডাক্তার। একটু শুনেই ফজলুল বললেন—ভাল ছেলের খোঁজ কর। টাকা পয়সার অভাব হবেনা। আমার সাব-রেজিস্টার করে দেবার ক্ষমতা আছে, উপযুক্ত ছেলে দেখ। কোন্ মধ্যবিত্ত ঘরের কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা এ অভয়ের তাৎপর্য বুঝতে অক্ষম ?

আর এক শ্রেণীর অভাজন বাঙালী তাঁর কাছে জুটত। এরা ছিলেন নিজেদের সন্তান-সন্ততির শিক্ষাভার বহনে অসমর্থ। এদের প্রতি ছিল তাঁর প্রগাঢ় দরদ। ফজলুল হক বুঝতে পেরেছিলেন কেন বাঙালী মুসলমান অনগ্রসর এবং কেমন করে সে সম্প্রদায়কে হিন্দু-বাঙালীর সমকক্ষ করে তুলতে হবে। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি বাঙালীর অতীত ঐতিহ্য—স্কুল প্রতিষ্ঠা—মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। ফজলুলের সেই যুগের শিক্ষা-প্রীতির পরিচয় অনায়াসেই মিলতে পারে যদি কলকাতার আঢ্যিদের আদি-কালের বইএর দোকানের পুরানো কর্মচারীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা বা দোকানের পুরানো কাগজপত্র কেউ নাড়াচাড়া করেন। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ফজলুল প্রদত্ত রিকুইজিসন স্লিপ আসত সে দোকানের মালিকের কাছে, পত্র-বাহককে নতুন বই দেবার জন্য।

ফজলুলের শেষ মন্ত্রিত্ব কাল। কেবল রাজসাহী নয়, সমগ্র বাঙলার শ্রেষ্ঠ জমিদার নাটোর, সরকারী এলাউন্স বৃদ্ধি করবার জন্য আবেদন করেছেন। তাঁর স্টেট তখন কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের দ্বারা পরিচালিত। যে অর্থ জমিদার সংসার প্রতিপালন হেতু পেতেন, তা ছিল অকিঞ্চিৎকর। ভূমি-রাজস্ব বিভাগ তখন সেই জমিদারেরই স্ব-শ্রেণী ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর হাতে। জমিদার আবেদন করেছেন যে, তাঁকে বাৎসরিক ৬০০০ টাকা করে এলাউন্স দেওয়া হোক। মন্ত্রী সে আবেদন অগ্রাহ্য করে ৩০০০ টাকা দিতে হুকুম দিলেন। মহারাজা নিরুপায়। ফজলুল জানতে পারলেন মহারাজার দূরবস্থার কথা, নিজে রাজস্ব-মন্ত্রীর কাছে গিয়ে তাঁর আবেদন পুনর্বিবেচনা করবার জন্য অনুরোধ করলেন। আলাপ আলোচনা কালে ফজলুল এইসব পুরানো জমিদারদের জীবনধারা, অতীত ঐতিহ্য, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, প্রভৃতির কথা জানালেন: এরা তোমার আমার মত হাইকোর্টে ব্যবসা করে অর্থ উপার্জনে অসমর্থ। বাঙলাদেশের ব্যারণ ইনি, তাঁরই অর্থ তাঁকে দিতে কি আপত্তি থাকতে পারে?

রাজস্ব-মন্ত্রী তবুও অটল। পরিণামে ফজলুল তাঁর প্রধানমন্ত্রীর অধিকার প্রয়োগ করে মহারাজের অনুরোধ রক্ষা করলেন। রাজনীতির আবর্তে পড়েও ফজলুলের এই সহজাত বাঙালীপনা একটুও মলিন হয়নি। ফজলুলী রাজনীতি নিশ্চয়ই সমালোচনার বস্তু এবং সে সমালোচনা চলবে বহু বছর ধরে। কিন্তু মানুষ ফজলুল, বাঙালী ফজলুল তাঁর যুগের পুরোধা, তার কীর্তি অবিস্মরণীয়। সে বিষয়ে সমালোচনা করা জাতিগত অকৃতজ্ঞতার শামিলই হবে।

প্রথম যুগে যখন ফজলুল হকের মন্ত্রিত্ব (১৯২৪ সাল) অবসান করবার জন্য চিত্তরঞ্জন দাশ সারা বাঙলা দেশ তোলপাড় করে ফেলছিলেন তখন তাঁর প্রধান হাতিয়ার হয়ে পড়েছিল একখানা চিঠি যা ফজলুল লিখেছিলেন ঢাকার রায়বাহাদুর পিয়ারীলাল দাশকে। ফজলুলের সেই চিঠিখানা—এস. আর. দাশও একখানা চিঠি লিখেছিলেন—দেশবন্ধুর "ফরওয়ার্ডে" বের হ'ল অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করবার দিনে। সেই চিঠিখানার প্রতিলিপির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য "ফরওয়ার্ড" যে শিরোনামা সেদিন দিয়েছিল তা হয়ে পড়েছিল বাঙলা দেশের প্রপাগাণ্ডা সাংবাদিকতার প্রথম নমুনা—Bait, Bluff, Bribery—which ?

ফজলুল এমনি ধারায় চিঠিপত্র বরাবর লিখতেন। চব্বিশের সেই চিত্তরঞ্জন দাশ প্রদত্ত শিক্ষা পেয়েও তিনি সাঁইত্রিশের আমলে মুখ্যমন্ত্রী হবার পর ঐ একই ধারায় পত্র ব্যবহার করতেন। কংগ্রেসী মহলে সে-সব চিঠিপত্রের প্রতিলিপি গিয়ে আবার পৌঁছেছিল খোদ পুলিস কমিশনারের মারফত। কিন্তু সেগুলো সংবাদপত্র-স্তম্ভে স্থান পেলনা। যদি স্থান পেত—পুলিস কমিশনার (ফেয়ারওয়েদার) যে উদ্দেশ্য সাধনে সে চিঠিপত্রগুলো বিরোধী কংগ্রেসী পক্ষকে যোগান দিয়েছিলেন তা কেবল ব্যর্থ হ'ত না তাতে মানুষ ফজলুল যে কত বড় ছিলেন তা আরও ভালো করে ধরা পড়ত, সাধারণ বাঙালীর কাছে।

পুলিস কমিশনারের অভিযোগ হ'ল—গোপন উদ্দেশ্য তাঁর যাই থাক না কেন—তিনি ডিপার্টমেন্টের কাজে ইণ্টারফিয়ার করছেন। অনুচিতভাবে নিজের লোককে পুলিস-ডিপার্টমেণ্টে নিযুক্ত করবার সুপারিশ করছেন—পুলিসে তার নিজের লোক নিযুক্ত করবার তদ্বির করে, এবং তা প্রমাণিত হচ্ছে পুলিস কমিশনারের কাছে লেখা চিঠিপত্র থেকে।

নমুনা স্বরূপ দু'খানা ফজলুলী পত্রের মর্মার্থ দিলে সে নাক-গলানোর স্বরূপ ধরা যাবে। প্রথম পত্র-বাহক হলেন তাঁরই স্ব-গ্রামবাসী একটি মুসলমান যুবক, সামান্য লেখাপড়া শিখেছেন, স্বাস্থ্যবান এবং সেজন্য ফজলুল তাঁকে পাঠিয়েছেন কমিশনারের কাছে কনেস্টবল পদপ্রার্থী করে। পরিচয়ে লিখেছেন—৪০ বৎসর পূর্বে আমি যখন সাবডিভিসনাল অফিসার ছিলাম তখন এরই পিতা আমার পাচক ছিল। তারই নাম করে সে এসেছে আমার সঙ্গে দেখা করতে। আমি তার পিতার কথা এখনও ভুলতে পারিনি। তুমি যদি দয়া করে এর একটি গতি করে দাও তবে আমি বাধিত হব।

দ্বিতীয় পত্রে ফজলুল লিখছেন—এরই পিতা—দাশগুপ্ত আমাকে শৈশবে হাতে খড়ি দিয়েছিলেন। তাঁরই অনুগ্রহে আমি জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করেছি এবং তাঁর ঋণ বিস্মৃত হতে পারি না বলেই এ ছেলেটিকে তোমার কাছে পাঠাচ্ছি। একে সাহায্য করা আর আমাকে সাহায্য করা অভিন্ন হবে।

ফজলুল হকের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল এই মমতা বোধের মধ্যে। সরকারী উচ্চ কর্মচারীদের কাছে তদ্বির করে পত্র দেওয়ার রেওয়াজ অতীতে যেমন ছিল তেমনি বর্তমানেও আছে ও ভবিষ্যতেও থাকবে। যেমন সে ব্যবস্থা আছে এদেশে তেমনি আছে বিদেশে। ফেয়ারওয়েদার সাহেব যে কুমারী সুলভ ব্রীড়াগ্রস্ত হয়ে বিরোধী পক্ষের কাছে ফজলুলী পত্রগুলো গোপনে যোগান দিয়েছিলেন

তার পশ্চাতে ছিল অন্য কারণ। সে কারণেই সেকালের সবগুলো সরকারী সাহেব কর্মচারীরাই ফজলুল হককে লোকের চোখে হেয় করতে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন।

কিন্তু এমন কয়জন দিকপাল আছেন যাঁরা সুদূর অতীত জীবনের সঙ্গী, সাথী ও পোষ্যদের কথা ফজলুলের মত স্মরণে রাখেন? নলিনাক্ষ সান্যালের মুখে শুনেছিলাম ফজলুলের বহরমপুর পরিদর্শনের কথা। মন্ত্রী এসেছেন বহরমপুরে, ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিস সুপার প্রভৃতি স্টেশনে মোতায়েন। তাঁর অভ্যর্থনার জন্য, শোভাযাত্রা সহকারে তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য আয়োজনের কোন ত্রুটি রাখা হয়নি।

ফজলুল গাড়ী থেকে নেমে দৃষ্টি ফেরাতেই দেখতে পেলেন জনতার এককোণে গেঞ্জী গায়ে, লুঙ্গী পরা এক বৃদ্ধ মুসলমান লাঠির উপর দেহভার রেখে তাকিয়ে আছেন। ফজলুলের যৌবনের সহচর ছিলেন তিনি। ফজলুলের মুখে হাসি ফুটে উঠল; সটান চলে গেলেন তার কাছে এবং প্রশ্নচ্ছলে বললেন—কিরে তুইও এসেছিস? বৃদ্ধকে নিয়ে উঠলেন মোটরে। সরকারী কর্মচারীরা অবাক! অভ্যর্থনার আয়োজন প্রায় পণ্ড।

নলিনীবাবু সহসা বাঙালী-সুলভ সেন্টিমেন্টের প্রশ্রয় দিতেন না। ফজলুলী ক্যাবিনেট একদা তাঁকে ছাড়তে হয়েছিল যখন "চাপ" হয়ে পড়েছিল অসহনীয়। তবুও যখন মানুষ ফজলুলের কথা বলতেন তখন তাঁরও কণ্ঠস্বরে আবেগ এসে পড়ত। ফজলুলের অর্থের প্রয়োজন থাকত নিয়ত। নলিনীবাবুর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হ'ত সময়ে অসময়ে ঐ টাকা পয়সা নিয়ে। টাকার প্রয়োজন এই কথাটাই শুধু বলতেন, কিন্তু কেন—সে উদ্দেশ্য থাকত উহ্য। একদিন নলিনীবাবু বলেছিলেন—সঙ্গে লোক দেব? ফজলুল উত্তরে বলেন—কেন, বাঙ্গালকে হাইকোর্ট দেখাতে চাও নাকি?

—না, তবে কি না—করে নলিনীবাবু নিরস্ত থাকলেন। যা

আশঙ্কা করেছিলেন তাই কিন্তু হ'ল সেদিন। ৫০০ টাকার মধ্যে এক টাকাও বাড়ীতে ফিরিয়ে নিতে পারেননি ফজলুল।

শ্যামাপ্রসাদ একদিন ফজলুল সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন— lovable but unpredictable. প্রথম বিশেষণ নিয়ে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন, দ্বিতীয়টা সমালোচনা সাপেক্ষ। কে আবুল কাশেম ফজলুল হককে unpredictable করেছিল?

নতুন বিধান সভার দ্বিতীয় বৎসরের বাজেট অধিবেশনে ফজলুল-ক্যাবিনেটের বিরুদ্ধে প্রথম অনাস্থা প্রস্তাব বিরোধী পক্ষ এনেছিল। সকলের বিরুদ্ধেই প্রস্তাব আনা হল। কিন্তু অনাস্থা প্রস্তাবের প্রথম শিকার হয়েছিলেন প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দীর পুত্র শ্রীশচন্দ্র নন্দী। মহারাজা শ্রীশচন্দ্রের বিরুদ্ধে আনীত সে প্রস্তাবের প্রথম অভিযোগ ছিল যে তিনি "অকেজো" লোক এবং তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর "দেউলিয়া" জমিদারী ব্যবস্থা থেকে।

শ্রীশ নন্দী যতটা ভদ্র বাঙালী ছিলেন ততটা বক্তা ছিলেন না। তবুও সেদিন সেই অভিযোগের সামনে দাঁড়িয়ে শ্রীশ নন্দী যে উত্তর দিয়েছিলেন আজ মানুষ ফজলুল হক চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সেই কথাটাই বার বার মনে পড়ছে। শ্রীশ নন্দী বলেছিলেন—আমি দেউলে, আমার জমিদারী বন্দকী অবস্থায় পড়ে আছে তা অকপটে স্বীকার করছি—কিন্তু কেন, সে কথার উত্তর কি দেবে কেউ এখানে তার বুকের উপর হাত রেখে?

ভদ্রতায় বেধেছিল, তাই তাঁকে সে উত্তর নিজের মুখে আর দিতে হয়নি। স্বদেশী যুগ থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত একা মণীন্দ্র নন্দী বাঙালীর জন্য যা করেছিলেন নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উজাড় করে দিয়ে, তার দ্বিতীয় উদাহরণ কোথায়?

ফজলুল হক সম্পর্কেও সে কথা সমান জোর দিয়ে বলা যেতে পারে। একথা অস্বীকার করা আর বাঙালীর মানবিকতাবোধ অথবা মর্ম-বেদনা নেই বলা একই কথা।

জিন্না, জয়াকর, তেজবাহাদুর এবং তুলসী গোস্বামীর পরিণত বয়েসের বিলিতি ধরণের বক্তৃতা শুনেছি, যেমন শুনেছি বিপিন পাল, সত্যমুর্ত্তি. জে. এল. ব্যানার্জীর বিগলিত ধারার প্রস্রবন। কিন্তু ফজলুলের বক্তৃতার ধরণ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। সে বক্তৃতায় আকৃষ্ট হবার প্রধান কারণ বোধ হয় ছিল তাঁর আল্‌গা ভঙ্গীতে। লোক-সঙ্গীতের মত তাঁর বক্তব্যগুলো হত সুরেলা। অতি সহজ ও সাবলীল অবস্থায় যেন বাগ্‌দেবী স্বয়ং যোগাতেন বক্তব্য তাঁর কণ্ঠে। ত্রিশের শেষ কোঠায় ফজলুল প্রায় দন্তবিহীন। উচ্চারণ কিন্তু অশুদ্ধ হয়নি, যেমন হয়নি কণ্ঠস্বর ক্ষীণ। বক্তব্য বলতে একটুও প্রয়াস করতে হতনা তাঁর। একটানা সুরে ও প্রতি-প্রশ্ন গ্রহণ করবার বিরাম দিয়ে কথাগুলো আসত। কদাচিৎ দ্রুততাল বা মাত্রায় বৈচিত্র্য দেখা যেত। স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর, রসবোধ ছিল প্রচুর এবং সর্বোপরি পলিটিকসের ওপর দিয়ে চলত সামাজিক মানুষ হয়ে থাকবার ঐকান্তিক আগ্রহ।

ফজলুল যখন দ্বিতীয় বার পুত্র সন্তানের পিতা তখন বাঙালী জীবনের গড়পড়তায় তাঁকে বৃদ্ধ বলা যেত। কানাঘুষায় পুত্র-লাভের সংবাদ হাউসে প্রায় সকলেই শুনেছেন। কিন্তু সে শুভ-সংবাদ নিয়ে বৃদ্ধের সঙ্গে চাপল্য-রসিকতা করে অকালপক্ক ধৃষ্টতা দেখাবার যেমন কেউ ছিলেন না তাঁর নিজের দলে, তেমনি ছিলেন না বিরোধী পক্ষে। অবশেষে প্রশ্ন করবার অবকাশে অকৃতদার ও অ-বাঙালী আবদার রহমান সিদ্দিকী সে চাপলা দেখাতে সাহসী হলেন। তিনি সভার অধিবেশন, নবজাতকের আগমন হেতু, স্থগিত রাখতে অনুরোধ জানালেন। বৃদ্ধ ফজলুল সহাস্যে সে সংবাদ সমর্থন করেছিলেন।

বলা বাহুল্য, পরে সিদ্দিকীর সঙ্গে অনেকেরই সন্দেশ-ভোগ জুটেছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মহাকারণের নতুন পটভূমিকা

ফজলুলী আমলের নতুন বিধান সভার প্রথম বাজেট অধিবেশন বেশ দাপটের সঙ্গেই কাটল। সে অধিবেশন শুরু হয়েছিল ১৯৩৭ সালের ২৯শে জুলাই এবং দেড় মাস ধরে চলেছিল। দাবার চালের মত একে অন্যকে বানচাল করতে ব্যস্ত। বাইরে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিত তা অনেকটা গড়ের মাঠের ফুটবল খেলার মত, অকারণে হৈ হৈ, রৈ রৈ। নলিনী সরকারের বাজেট বক্তৃতা কেন লিখিত অবস্থায় দেওয়া হবে শরৎ বসু নিজে তাই নিয়ে প্রশ্ন করলেন। আজিজুল সরাসরি সে প্রশ্ন অগ্রাহ্য করে জানালেন যে বাজেট স্টেটমেণ্ট লিখিত না হয়ে পারে না।

এ আপত্তির মূলেও ছিল ব্যক্তিগত আক্রোশ।

নলিনীবাবু আপার হাউসে গিয়ে ঝাল ঝাড়লেন—মা কালীকে পূজো করতে পারি। কিন্তু কালীঘাটের হালদারদের পূজো করব কেন ?—বলে ইঙ্গিত করলেন।

নীচের হাউসে প্রতি-উত্তর দেবার জন্য শরৎ বাবু তুলসী গোস্বামীকে অনুরোধ করলেন। তুলসীবাবু ভদ্রলোক। এ বিষয়ে অগ্রসর হতে নারাজ হয়ে দেখিয়ে দিলেন, "মাই ব্রাদার বারেন্দ্র" নলিনাক্ষ সান্ন্যালকে।

গোটা ফজলুলী আমল থেকে দেশ বিভাগ কাল পর্যন্ত বিধানসভায় বন্ধুবরের মত "ফাইটিং বুল" দ্বিতীয়টি দেখিনি। যেমন "পয়েণ্ট অফ অর্ডার" নিয়ে স্পাকার আজিজুল হতেন নলিনাক্ষ সম্পর্কে সন্ত্রস্ত—আধুনিক কালে সুবোধ ব্যানার্জী খানিকটা নলিনাক্ষ-ধারা জীবন্ত রাখতে পেরেছিলেন—তেমনি হাউস হত উৎসুক নলিনাক্ষ দাঁড়ালেই। কোন্ গোপন তথ্য ফাঁস করে দেয় বা নতুন তথ্য

পরিবেশন করে তা শোনবার আশায়; আর তেমনি থাকত প্রেস গ্যালারী উৎকণ্ঠিত হয়ে নতুন ধরণের বিশেষণ প্রয়োগ শোনবার জন্য। নলিনাক্ষ কাউকেই নিরাশ করতেন না।

নলিনীবাবু সেদিন নলিনাক্ষের কাছে হলেন সিন্দুর মার্কা-মারা "হিগোট"। আর যা বললেন তা বাঙলায় অনুবাদ সাপেক্ষ মোটেই নয়। একদিন যোগেন্দ্র মণ্ডল একটা পয়েণ্ট অফ অর্ডার নিয়ে আইনের দোহাই দিলেন; নলিনাক্ষ মন্তব্য করলেন: Ang goes, Bang goes Khalsey says he also goes. সে তুবড়ীর মুখে যোগেন মণ্ডল আর অগ্রসর হতে পারলেন না। পরিণামে নলিনাক্ষের হাতে পড়ে অনেককে ঘায়েল হতে হয়েছে।

এই সবই ছিল "এহ বাহ্য"। ভেতরে ভেতরে প্ল্যান মাফিক বাঙলা দেশের পলিটিকস নতুন পথে ফজলুলকে সামনে রেখে এগুতে শুরু হল সেই ১৯৩৭ সালের বাজেট অধিবেশনের পর থেকেই। পশ্চাতে থাকল মুসলিম লীগ কর্মকর্তারা সাহবুদ্দীন-ইস্পাহানী-সুরাবর্দী। কলকাঠি নাড়াতে আরম্ভ করলেন সাহেব কর্মচারীরা এবং দণ্ড হাতে বিধানসভার গেটে দাঁড়িয়ে থাকল পেটো সাহেবদের ইউরোপীয়ান প্রতিনিধিরা যাদের ভোটের ওপর সম্পূর্ণভাবে ফজলুল হককে নির্ভর করতে হ'ত শাসন ব্যবস্থা চালু রাখবার জন্য।

পাকিস্তানী ডাক তখনও সরব হয়নি। সার্ভিস কোটা, কম্যুনাল এওয়ার্ড, পৃথক নির্বাচন প্রথা নিয়ে বাদানুবাদ এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের অন্যান্য মুসলিম-লঘিষ্ঠ প্রদেশে মুসলমানদের প্রতি "অত্যাচারের" কাহিনী নিয়ে যে আন্দোলন সৃষ্টি করলেন নবাব লিয়াকত আলি খাঁ, তার ঢেউ এসে পৌছল কলকাতায়। সরাসরি সরকারী দান সাহায্যে পুরানো "মোহম্মদী" নাম ভোল বদলে হল "আজাদ" সে ঢেউ আরও জোরদার করবার উদ্দেশ্যে।

যে পরিমাণে বিধানসভার কোয়ালিশন দলত্যাগ করে চলে গেলেন বাঙালী মুসলমান সদস্যেরা বিরোধী পক্ষে, তার দ্বিগুণ

সংখ্যায় আমদানী করা হতে লাগল অ-বাঙালী মুসলমান কর্মচারীদের খাস যুক্ত প্রদেশে ও পাঞ্জাব থেকে। তাদের উর্দু-বুলি, সাহেবী আদব-কায়দা, আর মুসলমানী বনেদিত্ব' হকচকিয়ে দিতে শুরু করল কোয়ালিসন পার্টির সব পল্লীগ্রামস্থ মুসলমান সদস্যদের। বাঙালী মুসলমান আদৌ মুসলমান কি না সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগল এইসব উর্দু বলনেওয়ালা অ-বাঙালীরা।

রাইটার্স বিল্ডিংস্-এ পাঞ্জাবী মুসলমান সিভিলিয়ানদের শুভাগমনে অন্যে পরে কা কথা বাঙালী মুসলমান সিভিলিয়ান টি. আই. এম্ নরুন্নবি চৌধুরী সাহেবও কোথায় কোন্ ঘরে মুখ বুজে বসে আছেন তার পাত্তা পাওয়া কঠিন হ'ত। কলকাতা কর্পোরেশনের হেল্থ অফিসার ডাঃ এম. ইউ. আহমদ হলেন বাঙালী এবং সেই অপরাধেই তিনি অপাংক্তেও হলেন সেদিনকার বাঙলা সরকারের ইউ. পি. থেকে আমদানি মুসলমান ডাইরেক্টর অফ হেল্থের কাছে। নৌসের আলির মন্ত্রিত্বের গদী ছাড়বার একটি কারণ হ'ল যে তিনি মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপালের পদে বাঙালী ডাঃ দবিরুদ্দীন আহমদকে নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন। সাহেবরা ও এইসব অ-বাঙালীরা রুখে দাঁড়াল, দবিরুদ্দীন ভেতো বাঙ্গালী, আনো গয়েলকে। হোক না অ-মুসলমান, তবুও উর্দু বলনেওয়ালা পাঞ্জাবী তো!

কর্পোরেশনের বাঙালা মুসলমান হেল্থ অফিসারের সঙ্গে ঝগড়া বাধল সরকারের অ-বাঙালী মুসলমান ডাইরেক্টরের সঙ্গে বসন্তের টীকা দেওয়া নিয়ে। হিন্দুস্থানী ডাইরেক্টর হেসেই উড়িয়ে দিলেন বাঙালী হেল্থ অফিসারের বক্তব্য এবং পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিলেন তারই হুকুম তামিল করতে হবে। বেগতিক দেখে বেচারী হেল্থ অফিসার ছুটলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মতামত নেবার জন্য। তাঁরই স্বপক্ষে রায় দিলেন ডাঃ রায়। অ-বাঙালী ডাইরেক্টর সে মতামতও অগ্রাহ্য করলেন এবং স্বমত সমর্থনে আমদানি করলেন ফোর্ট উইলিয়ম থেকে তাঁর স্ব-গোত্র পাঞ্জাবী ও হিন্দুস্তানী আর্মি

ডাক্তারদের—যাদের সঙ্গে কি সেদিন কি আজ শহরের জীবন-যাত্রার কোন পরিচয়ই নেই।

এ সব কাণ্ডকারখানার একমাত্র উদ্দেশ্য থাকল কেমন করে বাঙলা দেশের এডমিনিস্ট্রেসনের ঘাঁটি রাইটাস বিল্ডিংস্‌টা অবাঙালী কর্তৃত্বে আনা যায়, বাঙালী মুসলমানের সেদিনকার পোলিটিক্যাল আত্ম-মর্যাদা ভেঙ্গে ফেলে পাঞ্জাবী ঠাটে নতুন করে গড়া যায় এবং বাঙালী হিন্দুকে সে এডমিনিস্ট্রেসনে কোণ-ঠাসা করে রাখা যায়।

রাইটার্স বিল্ডিংস্‌-এ সেদিন হিন্দু-বাঙালী সিভিলিয়ানদের বড় একটা দেখা পাওয়া যেত না। তাদের রাখা হ'ত মফঃস্বলে। লালবাজারেরও প্রায় একই অবস্থা। এর ওপর এল যুদ্ধকালীন দাবী ; যখন সাহেব সিভিলিয়ান বা পুলিস অফিসারেরা সামনে এবং পশ্চাতে থাকল পাঞ্জাবী-করণের জন্য অ-বাঙালী মুসলমান। নীচে থাকল হিন্দু কেরাণীর দল ! তবে তাদের উপস্থিতি দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়।

এই নয়া মুসলিম-পলিটিকসের মধ্যমণি হয়ে পড়ল ১৯৩৮ সালে সৃষ্ট পাবলিসিটি ডিপার্টমেণ্ট। যার হর্তা-কর্তা-বিধাতা হলেন বন্ধুবর আলতাফ হোসেন।

আলতাফ সু-শিক্ষিত, প্রখর-বুদ্ধি-সম্পন্ন এবং করিতকর্মা। পাবলিসিটির গুণাগুণ বিচারে কি সেদিন, কি আজ, তাঁর জুড়ি বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে আর দেখিনি। বাঙালী হয়ে জন্মেও আলতাফ বাঙালী মুসলমানের যে ভারতীয় বা পাঞ্জাবী মুসলমান থেকে কোন পৃথক সত্ত্বা আছে বা থাকতে পারে তা বিশ্বাস করতেন না। তিনি ছিলেন—এবং বোধহয় এখনও আছেন—ঘোর প্যান-ইসলামী এবং পরিণামে মুসলিম লীগ যে দ্বি-জাতি থিয়োরী সৃষ্টি করলেন হিন্দু ও মুসলমান নিয়ে তা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস ও সমর্থন করতেন।

খাঁটি বাঙালী হয়েও কেন আলতাফ ঘোরতর বাঙালী হিন্দু-বিদ্বেষী এবং বাঙালী মুসলমানের পলিটিকসের নব জাগরণকে

তাচ্ছিল্যের চোখে দেখতেন তা আজও বুঝিনা। আলতাফের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে কেউ যদি তাঁর এই দৃষ্টিকোণ অলক্ষ্যে রাখতে পারতেন তবে তাঁর সঙ্গে আলতাফের হৃদ্যতা কোন প্রকারেই ক্ষুণ্ন হ'ত না। সে আলোচনা দূরে রাখতে পারলে আলতাফ হতেন মিষ্টভাষী, বন্ধুবৎসল এবং খাঁটি বাঙালী। খাজা স্যার নাজেমুদ্দিনের একান্ত আপনার লোক ছিলেন আলতাফ এবং তাঁরই ভাগ্যের সঙ্গে নিজের ভাগ্য জড়িত করে ফেলেছিলেন।

পাবলিসিটি ফজলুলের নিজের ডিপার্টমেণ্ট হলেও, আলতাফ তাঁকে একটু নীচ-নজরেই দেখতেন, যদিও প্রকাশ্যে সে বিষয় নিয়ে কঠোর মন্তব্য তাকে করতে শুনিনি। হেনরী টুয়াইনাম যখন চীফ সেক্রেটারী (১৯৩৮ সাল) তখন বর্তমান পাবলিসিটি ডিপার্টমেণ্ট সৃষ্ট হয়। প্রপাগাণ্ডা ও পাবলিসিটি যে আর হোম ডিপার্টমেণ্টেরই একটা শাখায় আবদ্ধ রাখা যায় না তা'সাহেব কর্মচারীরা বেশ বুঝতে পেরেছিলেন সেদিন থেকেই। আইনের শাসনভার হোম ডিপার্ট-মেণ্টের হাতেই থাকল—সেদিন ডেটিনিউ দিবস পালনের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা সেই ডিপার্টমেণ্ট থেকেই এসেছিল—কিন্তু পাবলিসিটির যে আর একটা দিক আছে তা সাহেবরা বুঝেই নাজেমুদ্দিনের দ্বারা বিধান সভা থেকে বাজেট পাশ করে নিয়ে ডিপার্টমেণ্ট গঠন করে রাখলেন। আলতাফ হোসেন প্রথম ডাইরেক্টর হলেন।

আলতাফের হাতে পড়ে নতুন পাবলিসিটি ডিপার্টমেণ্ট অচিরাৎ বিরাট কর্মশালায় পরিণত হ'ল, রিসার্চ ল্যাবোরেটরী এবং পোলিটিসিয়ানদের ট্রেণিং স্কুলের মত। পুরানো প্রেস ডিপার্টমেণ্টের সঙ্গে এর কোনই তুলনা চলে না। মামুলি ধরণের প্রকাশিত সংবাদের ভুল ভ্রান্তি দেখানর কাজ হ'ল গৌণ এবং দীর্ঘমাত্রা পেল নতুন কোয়ালিসন গভর্ণমেণ্ট কি করছে, কি করবে, কেন করছে বা কেন করতে পারছে না তা জানবার হেড-কোয়ার্টার্স। নিজে ফজলুলকে দিয়ে রাইটার্স বিল্ডিংস্‌এ খুললেন প্রেস রুম। সেখানে ফোন, টাইপ-রাইটারের

বন্দোবস্ত থাকল। উদ্দেশ্য যাতে কলকাতার সাংবাদিকেরা আসে সব কিছু বুঝতে ও জানতে। তার উদ্দেশ্য সফলও হয়েছিল। এ ছাড়াও আলতাফের কাজ ছিল সপ্তাহে অন্ততঃ একবার কলকাতার বিভিন্ন সংবাদপত্র অফিসে গিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করা। সেদিনকার সরকারী বক্তব্য মানেই ছিল মুসলিম-লীগ নিয়ন্ত্রিত দৃষ্টিকোণ—অতএব আলতাফের দ্বারা সে কাজ অতি সুষ্ঠুভাবেই সম্পাদিত হতে থাকল। অধিকন্তু আলতাফের পোলিটিক্যাল কাজ কর্মও ছিল, যা গোপনে সম্পাদিত হলেও বাইরে থেকে আভাস পাওয়া যেত। কেবল বাঙলা দেশের সংবাদপত্র নয়, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের সংবাদপত্রে কি প্রকাশিত হচ্ছে তার "রেফারেন্স" প্রায়ই বাঙলা বিধান সভায় এমন সব সদস্যদের মুখ থেকে আসতে লাগল যা' শুনে অবাক লাগত। এ ধারণা করা একটুও ভুল হবে না যে এ সবের উৎস ছিল আলতাফ আর তাঁর ডিপার্টমেণ্ট। ফজলুল মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে মুসলমানেরা কিরূপে "বিধ্বস্ত" হচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার হিন্দুরা কত "নিরুপদ্রবে" বসবাস করছে তার এক ফিরিস্তী দিলেন। আলতাফ তাঁর "গড়ে তোলা" ব্যবস্থায় সে ফিরিস্তীর সর্বভারতীয়—বিশেষ করে নাগপুরের একখানা সংবাদপত্রে—পাবলিসিটি দিলেন। সেদিন আলতাফের আড্ডায় যাদের দেখছি তাদের মধ্যে একজনের কথা আজ বিশেষ করে মনে পড়ে। তিনি হলেন নোয়াখালির স্বনামধন্য পীর সাহেব, গোলাম সারওয়ার—যিনি সুরাবর্দী-আমলে নোয়াখালি দাঙ্গা শুরু করেছিলেন এবং যা' শান্ত করতে গান্ধীজীকে সেখানে যেতে হয়েছিল। এই পীর সাহেবও প্রথম প্রথম বাঙালী-সুলভ পোশাক পরিচ্ছদে বিধান সভায় আসতেন, রেস্টোরেন্টের স্বদেশী সেকসনে—সন্দেশ, রসগোল্লা, সিঙ্গাড়া যেখানে পাওয়া যেত—সেখানে আহার করতেন। নতুন রেওয়াজে লুঙ্গী পাঞ্জাবী স্থানচ্যুত হ'ল। তার বদলে

পরিধেয় হ'ল শেরওয়ানী। তারপর পীর সাহেবের রেস্টোরেণ্টের সন্দেশ, রসগোল্লায় অরুচি হওয়াতে কেক্, বিস্কুটের প্রতি দৃষ্টি হানলেন। বুলি বদলাতে পারলেন না কিন্তু।

ফজলুলী আমল শেষ হলে নাজেমুদ্দিন যখন মুখ্যমন্ত্রী তখন পাবলিসিটি ডিপার্টমেণ্ট (১৯৪৪) আরও সম্প্রসারিত হল। তখন হিন্দু-মৌলভী মহাশয় হয়ে পড়লেন আলতাফের হিন্দু এক্সপার্ট। ডিপার্টমেণ্ট বড় করা হবে কিন্তু আলতাফ এটুকু খুব ভাল করেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই স্ট্রাটেজিক ডিপার্টমেণ্টে হিন্দু বাঙালী স্থান পেলে সর্বনাশ। লীগ পলিটিকস জমাট বেধে আসছে (৪৪-৪৫ সাল) এ সময়ে ঘরের শত্রু বিভীষণ হয়ে পড়বেই। অথচ ডিপার্টমেণ্টে কাষ্ঠ হিন্দু ডাইরেক্টর একটাও না রাখলে অত্যন্ত দৃষ্টিকটু হয়ে পড়ে এবং সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। তাই বাঙালী হিন্দুকে দূরে রেখে আলতাফ সুকৌশলে নিযুক্ত করলেন অন্য প্রদেশের হিন্দুকে, নাম করা বাঙালী হিন্দু ও অভিজ্ঞ সাংবাদিকের দাবী অগ্রাহ্য করে। ইনিই হলেন বর্তমানের ডাইরেক্টর, প্রকাশ স্বরূপ মাথুর। আলতাফের মূল উদ্দেশ্য থাকল এমন হিন্দুকে আমদানী করা হবে যার সঙ্গে কোনদিনই বাঙলার হিন্দু সাংবাদিকদের কোন প্রকারে কি রাজনীতির ধ্যানধারণায়, কি ভাষায়, মিলন ঘটে। তাঁর উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছিল বোধ হয়। এ নিয়োগে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রয়োজন হল না, লাট সাহেব কেসীর সঙ্গে দু'চারটে কথাবার্তায় মাথুর নিযুক্ত হলেন।

আলতাফ যখন "ডন" পত্রিকার সম্পাদক হয়ে দিল্লী চলে গেলেন তখনও তাঁর সে নীতি বলবৎ থাকল। পরপর যে দুজন ডাইরেক্টর হলেন তাঁরাও অ-বাঙালী পাঞ্জাবী। এদের একজন হলেন সু-সাংবাদিক প্রেম ভাটিয়া, অপরজন মুস্তাক। বাঙলা দেশের সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য তা বলতে পারি না, তবে সেই আলতাফ যুগ থেকে আজ পর্যন্ত পাবলিসিটি ডাইরেক্টর (কেবল কয়েকদিনের জন্য

অমল হোম ভিন্ন) বরাবর এমন অফিসারদের দ্বারা চালিত হয়ে আসছে স্থানীয় ভাষা সম্বন্ধে যাঁদের জ্ঞান একেবারেই নেই। বাঙলা দেশের চীফ সেক্রেটারী যদি অন্য কোন প্রদেশের ভাষাভাষী হন তাতেও তত আশ্চর্য হবার কিছু থাকে না, কিন্তু পাবলিসিটি ডাইরেক্টর যে এভাবে চলতে পারে এটা একটা বিস্ময়কর বিষয়। আলতাফই লীগ-কোয়ালিসন সরকারের বাৎসরিক বিবরণী আপন তদারকে বার করতেন, যে ধারা তারপর থেকে পাবলিসিটি ডিপার্টমেণ্টের পক্ষে চালু রাখা অসম্ভবই হয়েছে। অথচ সেদিন এই ডিপার্টমেণ্টের জন্য যে বাজেট ধরা হ'ত তা ছিল অতি সামান্য। ১৯৩৮ সালে নাজেমুদ্দিন এক টাকা নিয়ে পাবলিসিটি শুরু করেন এবং ডাঃ রায়ের আমলে সে বরাদ্দ ৩৬।৩৭ লাখে দাঁড়ায়।

পাবলিসিটির উদ্দেশ্য ও সার্থকতা-অর্জন আলতাফ ও কোয়ালিসন সরকার বুঝেছিলেন এবং করেছিলেন। আলতাফই "বেঙ্গল উইক্লি" "বাঙলার কথা" চালু করেছিলেন। একটা ইংরেজীতে অপরটি বাঙলায়, কারণ তিনি উভয় ভাষাতেই পণ্ডিত ছিলেন—কাগজ দুইখানির দেখাশুনা তিনি নিজেই করতেন। তিনিই মোবাইল এক্সজিবিসন (এমনকি নৌকাযোগেও) শুরু করেছিলেন, তিনিই ডকুমেণ্টারী ফিল্ম নেবার ব্যবস্থা চালু করেছিলেন।

আলতাফ যুগ থেকে বর্ত্তমান যুগের পাবলিসিটিতে যেটুকু পার্থক্য চোখে পড়ে তা ঐ বিরাট অর্থব্যয়ের মধ্যে এবং বিশেষ করে ডাইরেক্টর ও সংবাদপত্রগুলোর ক্ষীণতর যোগাযোগের মধ্যেই। আলতাফের পোলিটিক্যাল মতবাদ যে কি তা সকল সাংবাদিকই জানতেন তবুও দু-পক্ষকেই মেলামেশা করতে হ'ত দৈনন্দিন কর্ত্তব্য ও পেশার খাতিরে। বর্তমানের পাবলিসিটির কর্মকর্তাদের মত কণ্ট্রাক্টরদের সঙ্গে ওঠা বসা, তাঁবু ফেলা, গেট-বানানো, হোটেলে ব্যাগ-ব্যাগেজের তদারক করবার কাজে নিযুক্ত থাকাকে আলতাফ ঘৃণার চোখেই দেখতেন। তিনি নিজে ছিলেন ইণ্টেলেকচুয়াল

ও পোলিটিক্যাল বাঙালী এবং ইণ্টেলেকচুয়ালদের সঙ্গ ভালবাসতেন; যে কারণে আক্রমণাত্মক পলিটিকসের যুগেও তাঁর ডির্পাটমেণ্টটি হয়ে পড়েছিল রাইটার্স বিল্ডিংস্-এর মধ্যমণি।

এই পাবলিসিটি ডিপার্টমেণ্ট মুসলিম লীগ সরকারের যে কত সাহায্যে এসেছে তার প্রকাণ্ড ইতিহাস আছে। আলতাফ চলে যাবার পর এলেন প্রেম ভাটিয়া। দেশীয় ভাষা সম্পর্কে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তবুও নামজাদা সাংবাদিক এবং যুদ্ধকালে সামরিক পাবলিক রিলেসন্স অফিসার রূপে কলকাতাতে অনেকদিন থাকার জন্য তাঁর পাবলিসিটি জ্ঞান ছিল প্রখর। সুরাবর্দী "খেল" দেখাতে শুরু করবেন তারই প্রাক্‌কালে পাবলিসিটি ডিপার্টমেণ্টের ডাইরেক্টর হলেন প্রেম ভাটিয়া। সুরাবর্দী বিশেষ সন্দেহের চোখে দেখতেন এই সাংবাদিককে। লীগের গোপন কাজকর্ম—কলকাতার রাস্তায় সিভিল ওয়ার, তখন প্রায় শুরু হয় হয়—প্রেম ভাটিয়া এ খবর জানতে পারলে সুরাবর্দীর কাজের অনেক অসুবিধা ঘটবে। তাই প্রেম ভাটিয়াকে সরাসরি পদত্যাগ করতে সুরাবর্দী বাধ্য করলেন। কিন্তু কাকে সে পদ দেবেন? লাহোরে উপযুক্ত মুসলমান ডাইরেক্টরের খোঁজখবর সংগ্রহ করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে কিন্তু প্রেম ভাটিয়ার উপর হুকুম করলেন ডিপার্টমেণ্টের ভার বিশ্বস্ত প্রকাশ-স্বরূপ মাথুরকে বুঝিয়ে দিতে। দুজনই হিন্দু, দুজনই অবাঙালী তবুও যে মাথুর প্রেম ভাটিয়া অপেক্ষা সুরাবর্দীর কাছে বিশ্বস্ত ছিলেন তার কারণ হ'ল মাথুর সাংবাদিক ছিলেন না, প্রেম ভাটিয়ার সমকক্ষ তো নয়ই—তারপর নাজেমুদ্দিনের আমলে অনুমোদিত হয়ে এসেছিলেন মাথুর। অতএব তাকে বিশ্বাস করা সুরাবর্দীর পক্ষে সহজতর ছিল। কানা-ঘুষায় সে যুগে শুনেছিলাম যে ডাঃ আম্বেদকর মাথুরের এই পদ প্রাপ্তির জন্য নাজেমুদ্দিনকে অনুরোধ করে পত্র দিয়েছিলেন। তখন লীগ ও সিডিউল্ড কাষ্ট নেতাদের মধ্যে সম্প্রীতি ছিল প্রগাঢ়। নাজেমুদ্দিনের অনুরোধেই

মহম্মদ আলি জিন্না যোগেন্দ্র মণ্ডলকে কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী করেছিলেন।

দেশ-বিভাগের সময় মুস্তাক ছিলেন ডাইরেক্টর। তিনিও সাংবাদিক ছিলেন বলে—গোঁড়া লীগাইট হলেও সেই ডামাডোলের মুহূর্তে ডিপার্টমেণ্ট চালু রাখতে পেরেছিলেন এবং নোয়াখালিতে গান্ধী-প্রতিক্রিয়া যাতে লীগ-সরকারকে একেবারে হেয় প্রতিপন্ন না করে সে বিষয়ে সচেষ্ট ছিলেন।

দেশ বিভাগের পর অমল হোম যখন ডাইরেক্টর হন তখন অন্য পরিবেশ। অমলবাবু আলতাফের মত ডিপার্টমেণ্টকে আবার "ইণ্টেলেকচুয়াল হাব" করতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর সময়ে যেসব পত্রিকা ও পুস্তিকা ডিপার্টমেণ্ট থেকে প্রকাশিত হ'ত তদ্দ্বারাই তাঁর কি উদ্দেশ্য ছিল তা প্রমাণ করে।

আলতাফের সৃষ্টির সঙ্গে বর্তমানের কোনই মিল নেই, যদিও গতানুগতিক ধারায় এ ডিপার্টমেণ্ট যা আজও করে থাকে তার প্রতিটি ব্যবস্থা আলতাফই ঠিক করে দিয়েছিলেন। আলতাফের চাইতে নতুন কিছু এরা করতে পারেনি, বরং তাঁর গড়া গণ-সংযোগ ব্যবস্থা ক্ষুণ্ণই হয়েছে এবং তাই করতে টাকার অঙ্ক বেড়েই চলেছে।

আলতাফের কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করতে গিয়ে অনেক দূর চলে এসেছি। যদি আলতাফ সেই ১৯৩৮ সালের বাঙলা দেশের নবসৃষ্ট পাবলিসিটি ডিপার্টমেণ্টের কর্মকর্তা না হতেন তবে কি হ'ত, তা অনুমান সাপেক্ষ। এখানে কেবল এটুকু বলতে পারি যে আলতাফের অবর্তমানে, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের বড় বড় কাগজগুলোয় কি বেরোত বা না বেরোত তার "রেফারেন্স" বিধান সভায় যে কোন গ্রাম্য সদস্যের মুখে শুনা যেত না এবং কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যেত না। নোয়াখালির গোলাম সারোয়ার সন্দেশ রসগোল্লাতেই মজে থাকতেন, হিন্দু-মৌলভী দেখবারও সুযোগ আসত না। অথবা কোয়ালিসন সরকার পাবলিসিটির দৌলতে

নিজেকে জাহির করতেও পারতেন না। সর্বোপরি অ-বাঙালী প্রভুত্ব ও উর্দ্দু বলনে-ওয়ালাদের প্রতিপত্তি লাভ ঘটত না।

এ যুগ থেকে আমদানী হতে লাগল পাঞ্জাবী মুসলমান সিভিলিয়ান, পাঞ্জাবী বা হিন্দুস্তানী মুসলমান ডাক্তার আর পুলিস কনেস্টেবল, যাদের হাতে পড়ে বাঙালী মুসলমানের বাঙালীত্ব টুকরো টুকরো হয়ে যেতে লাগল ফজলুল হকেরই চোখের সামনে।

সাঁইত্রিশ-আটত্রিশের বাঙলা দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে একটু ধারণা না থাকলে আবুল কাশেম ফজলুল হক শাসন ব্যবস্থায় কি নতুনত্ব আনতে চেষ্টা করেছিলেন তার মর্মার্থ অনুধাবন করা কঠিন।

নানা কারণে, বিশেষভাবে রাজনৈতিক কারণে, সেদিন বাঙালী মধ্যবিত্ত হিন্দুর সামাজিক মন ইংরেজ সম্পর্কে দৃঢ় হয়ে পড়েছে এবং সুযোগ পেলে "এসপার ওসপার" করতেও যেন প্রস্তুত। এর পশ্চাতে কতখানি অর্থ-নীতির চাপ, কতখানি পরাধীনতার আত্ম-অবমাননা বোধ এবং ঘৃণা অথবা পুলিসী অত্যাচার ও প্রভোকেশন কার্যকরী ছিল তা নিয়ে চুল-চেরা আলোচনা চলতে পারে। মোটের ওপর মধ্যবিত্ত হিন্দু বাঙালীর এই মনোভাব সম্পর্কে ইংরেজ শাসকদের মনে কোন প্রকার আবছায়া ছিল না।

এ মনোভাব বদলান যে অসম্ভব তা ভারতবর্ষের ও বাঙলা দেশের ইংরেজ শাসকেরা বিলক্ষণ বুঝতেন। তাঁদের লক্ষ্য রইল কেবল এর প্রতিষেধক আবিষ্কারে। নানা প্রকার কেমিক্যাল মিশ্রণ শুরু হ'ল।

যে ডায়ার্কিক্যাল শাসন ব্যবস্থা ইংরেজ চালু করেছিল ষোল বছর পূর্বে তাও বানচাল করে দিয়েছিল এই বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্তের নেতৃত্ব! নতুন শাসন ব্যবস্থায় তাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য থাকল বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্তদের বিরোধ অপসারণ করা। এ কাজ হাসিল করতে ইংরেজ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করল নতুন "পরিসংখ্যান" শাস্ত্রের উপর। এই শাস্ত্রজ্ঞেরা অঙ্ক কষে বার

করলেন "কম্যুনাল এওয়ার্ড"! যার পশ্চাতে পড়ে আছে এক বিরাট ইতিহাস। বাঙলা দেশে মুসলমানেরা ৫১ এবং হিন্দু ৪৮ পারসেণ্ট, কিন্তু শাসনের কাঠামো হ'ল এমনি যাতে সেই সংখ্যানুপাতে বাঙালী হিন্দু মুসলমানের দাবী বিধান সভায় অস্বীকৃত থাকল।

তবু ভারতীয় মুসলমানেরা সে এওয়ার্ড নিয়ে প্রতিবাদ করলেন না, কারণ বাঙলা দেশের লোক অনুপাতে বাঙালী মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব দাবী যেটুকু খর্ব করা হ'ল তা অপেক্ষা অনেক বেশী মুসলিম প্রতিনিধিত্ব ফাঁপানো থাকল ভারতের অন্য প্রদেশগুলোতে।

সর্বভারতীয় দৃষ্টিতে স্বতঃই মনে হবে ইংরেজ মুসলমানদের প্রতি কত দরদী! কিন্তু যারা ইংরেজের ভারতীয় শাসন ব্যবস্থার পশ্চাতে কেবল ইংরেজেরই ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গল আশঙ্কা বা আশার রূপদান প্রচেষ্টা দেখে থাকেন তাদের বুঝতে এতটুকু দেরী হ'ত না যে, বাঙলা দেশের নতুন বিধানসভায় বাঙালী মুসলমানদের একক সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে ইংরেজ দেয়নি তার একমাত্র কারণ বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্তদের সম্পর্কে ইংরেজ যে গভীর সন্দেহ পোষণ করত তা বাঙালী মুসলমানদের সম্পর্কেও কম ছিল না। অতীতে অনেক "সুয়োরাণী" "দুয়োরাণী"র গল্প ইংরেজ সৃষ্টি করেছিল, সে সব কেবল নিছক রাজনৈতিক চাপ এবং সে সবের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বাঙালী মধ্যবিত্ত হিন্দু ও বাঙালী মুসলমানের মধ্যে যাতে কোন আঁতাত গড়ে না ওঠে। চোর তাড়িয়ে ডাকাত পত্তন যে বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয় তা ইংরেজ ভারতবর্ষ দেড়শ বছর শাসন করে ভালভাবেই বুঝেছিল।

বাঙালী মুসলমানদের দাবীর সমস্যা ত কোনমতে মিটল। কিন্তু বাঙালী হিন্দুদেরও লোকসংখ্যানুসারে প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার ত আছে! তাদের সম্পর্কে কোন্ নীতি গ্রহণ করা হবে? এদের মধ্যবিত্তেরা ত সব নষ্টের গোড়া। ইংরেজ কোন নীতিরই বালাই রাখল না এদের বেলায়। বাঙালী হিন্দু সংখ্যালঘু—তাতে কি

এসে যায়? তাদেরও প্রতিনিধিত্বের দাবী ক্ষুণ্ণ করা হ'ল এবং বাঙালী মুসলমানের অনুপাতে বেশী করে। কেন? উত্তর নেই। এ বিষয়টি নিয়ে সেদিনকার রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সে খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার ও ল-মেম্বর স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার ভারত সচিব স্যার সামুয়েল হোরকে নাস্তানাবুদ করে নিজের ও বাঙালী উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের মনোরঞ্জন নিশ্চয়ই করেছিলেন। কিন্তু কোনো ন্যায় শাস্ত্র বা লজিক যে আত্ম-রক্ষার ওপর স্থান পায় না, সেটুকু তিনি কি ধরতে পেরেছিলেন সেদিন? তার বক্তব্য থেকে তা বুঝতে পারা যেত না।

বাঙলা দেশের জন্য যে নতুন বিধানসভা গঠিত হল তার মোট সদস্য সংখ্যা থাকল ২৫০। মুসলমান সদস্য সংখ্যা ১১৭, ইংরেজ বাসিন্দা (ইউরোপীয়ান অ্যাসোসিয়েশন) পেল ১১, ব্যবসায়ীরা পেল ১৯ (এ উনিশটির তিনটি বাদে সবগুলিই থাকল ইংরেজ) অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান তিনটি, ভারতীয় খ্রীস্টান দুটি, জমিদারেরা পাঁচটি, শ্রমিক আটটি, বিশ্ববিদ্যালয় দুটি, মেয়েরা পাঁচটি এবং সাধারণেরা (general)—এঁদের মধ্যে পড়ল হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, পারসী ও ইহুদী)—৮২টি। "সাধারণ" আসন থেকে আবার প্রায় ৩০টি আসন রিজার্ভ থাকল নবসৃষ্ট হিন্দু সিডিউল্ড কাষ্টদের জন্য। এ সুযোগ ছাড়াও এই সিডিউল্ড কাষ্ট হিন্দুদের "সাধারণ" আসন থেকে নির্বাচন প্রার্থী হবার অধিকারও দেওয়া থাকল। মোটের ওপর বাঙালী হিন্দুদের অধিকার সীমায়িত থাকল ঐ ৫২টি আসনের মধ্যে। বাঙালী মধ্যবিত্তেরা যাতে কোন প্রকার টুঁ-টা বিধানসভায় না করতে পারে তার সমস্ত ব্যবস্থাই করে রাখা হ'ল।

সে সময় এই কম্যুনাল এওয়ার্ড নিয়ে যে সব পরিসংখ্যান দেওয়া হ'ত তাতে দেখান হ'ত যে এ দলিল অনুসারে বাঙলায় ইংরেজ পেল তাদের সংখ্যার উপর ২৫,০০০, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানেরা ৩০০ এবং ভারতীয় খ্রীস্টানেরা ৩০০ পারসেন্ট বেশী আসন। এবং ঐ একই গণনায় ভারতীয় মুসলমানেরা বোম্বাই প্রদেশে পেল ১১৭, বিহারে

১৩০ এবং মধ্যপ্রদেশে ২০০ পারসেণ্ট বেশী আসন। বাঙালী হিন্দুদের সংখ্যানুসারে যে মোট আসন পাবার কথা (পুনা প্যাক্ট ব্যতীত) তা থেকে আট-দশ পারসেণ্ট কম আসন দেওয়া হ'ল। বাঙালী হিন্দু প্রতিনিধিত্বের দাবী এমনি করে পঙ্গু করে দেবার বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই বাঙলা দেশে সেদিন প্রতিবাদ উঠেছিল। কিন্তু তাতে যেমন কোন সাড়া দেয়নি বাঙালী মুসলমান তেমনি অ-বাঙালী হিন্দু রাজনীতিজ্ঞেরা। বাঙালী মধ্যবিত্ত হিন্দুরা হয়ে পড়ল "একঘরে"।

এ হেন সিমেণ্ট কংক্রীট ভিতের উপর দাঁড়িয়ে অতি নিশ্চিন্ত মনে স্যার সামুয়েল হোর বাঙলা দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ঘোষণা করেছিলেন :—

I do not wish to make prophecies about the future, least of all the Indian future. But I would ask the Hon. Members to look very carefully at the proposals which we have made in the White Paper for the constitution of the Federal Legislature that will be almost impossible, short of a landslide, for the extremists to get control of the Federal Centre. I believe that to put it at the lowest it will be extremely difficult for them to get a majority in a province like Bengal.

বাঙলা দেশের পঁয়ত্রিশের নতুন শাসন ব্যবস্থায় এই বৈশিষ্ট্য সেদিনকার রাষ্ট্রনায়কেরা সামুয়েলের পরিষ্কার বক্তব্য শুনবার পরও ধরতে পেরেছিলেন কি না সন্দেহ। এ ব্যবস্থা সম্পর্কে সর্বভারতীয় কংগ্রেসী নীতি হ'ল—না বর্জন না গ্রহণ। এরই ওপর পরিণামে প্রতিষ্ঠিত হ'ল হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোতে কংগ্রেসী মন্ত্রিত্ব গ্রহণ নীতি। বাঙলা, পাঞ্জাব, আসাম ও সিন্ধু নিয়ে কোন দুর্ভাবনাই কংগ্রেসে দেখা দেয়নি সেদিন।

সাম্প্রদায়িক ভিত্তির ওপর দেওয়া হল এওয়ার্ড, সুতরাং সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধি যে বাড়বে তা'ত জানা কথা। সে দ্বন্দ্ব দেখা দিল হিন্দু-মুসলমানে, হিন্দুতে-হিন্দুতে এবং ক্রমেই ইঙ্গিত ফুটে উঠল যে নিকট ভবিষ্যতে ভেদ-বুদ্ধি বিষিয়ে দেবে এমন কি মুসলমান-মুসলমান সম্পর্ক। যখন কম্যুনাল এওয়ার্ড ঘোষণা করা হয়নি তখন থেকেই এর উত্তাপ এদেশে পৌঁছেছিল। যে জট পাকানো হ'ল সম্প্রদায়-সম্প্রদায় নিয়ে তা ছাড়ানোর দায়িত্ব পড়ল কেবল মাত্র কংগ্রেসী নেতৃত্বের উপর। যতই সেদিকে সে নেতৃত্ব এগুতে চাইল ততই জট জম-জমাট হতে থাকল। মনে পড়ে পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য এই জট খোলবার উদ্দেশ্যে প্রদেশ থেকে প্রদেশে ঘুরে উপস্থিত হয়েছিলেন সেদিন কলকাতায়। ফজলুল হক, আবদুল মোমিন প্রভৃতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যেই তিনি তাঁর রেশিও (ratio)র আভাস দিলেন আর সে সংবাদ বিলেতে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে সামুয়েল পাল্টা রেশিও ঘোষণা করলেন, যাতে আরও মুসলমান সংখ্যাধিক্য থাকল। ঠিক নিলামের ডাকের মত সংখ্যা-নিরূপণ ধাপে ধাপে উঠেছিল।

কম্যুনাল এওয়ার্ডের বিরুদ্ধে অকাট্য যুক্তি দেখানো অর্থহীন হল। ক্ষমতা যখন ইংরেজের হাতে তখন আপন স্বার্থে সে এওয়ার্ড চালু রাখবে এত জানা কথা। টাউন হলে বিরাট প্রতিবাদ সভা বসল, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত। মানবধর্মী কবি অনশনে খিন্ন গান্ধীজীকে রক্ষা করতে আকুল হয়ে পুনা-প্যাক্ট সমর্থন করেছিলেন। সে প্যাক্টের দরুণ বাঙলার হিন্দু প্রতিনিধিত্ব দাবী যে আরও ক্ষুণ্ণ করে ইংরেজের উদ্দেশ্যই সার্থক হ'ল তা' তখন মনে হয় ধরতে পারেন নি। তাই এলেন টাউন হলে তাঁর বক্তব্য, "Insult of insignificance" জানাতে। ভাষণে জানালেন এই কম্যুনাল এওয়ার্ডের স্বরূপ :—
Hindus have been singled out for reduction in their representation even below their normal population strength by weightage being cast against them.

এ প্রতিবাদ সভার পশ্চাতেও একটু ইতিহাস ছিল। ১৯৩৫ সালে ভারতসচিব হয়েছিলেন লর্ড জেটল্যাণ্ড যিনি লর্ড রোনাল্ডসে নামে বাঙলার ছোট-লাট ছিলেন এবং পাণ্ডিত্যে তখনকার কলকাতার বিদগ্ধ সমাজে নাম রেখে যেতে পেরেছিলেন। কোন কোন মহল থেকে গুজব ছড়ানো হয়েছিল যে, ভালভাবে ধরাধরি করলে বাঙলাদেশের হিন্দু সম্পর্কে যে অবিচার সে রোয়েদাদে করা হয়েছে তার রদবদল হতে পারে। তখনও মোহের ঘোর কাটেনি। সামুয়েল হোরের পরিষ্কার বক্তব্য—I believe, to put it at the lowest, it will be extremely difficult for them (the extremists) to get a majority in a province like Bengal—মরমে পশেনি। বাঙলার হিন্দুদের প্রতিবাদ চলল। এ প্রতিবাদ থাকল ইংরেজের বিরুদ্ধে, ফাঁপানো ইংরেজ প্রতিনিধিত্বের বিরুদ্ধে। ইংরেজ শাসকেরা সে প্রতিবাদ গ্রাহ্য না করলেও এর বিরুদ্ধে কোনই পাল্টা বক্তব্য নেই বলে চুপ করেই থাকলেন। কিন্তু বেশীদিন তাঁদের সেই অপ্রীতিকর অবস্থায় পড়ে থাকতে হ'ল না। কায়েদে আজম মহম্মদ আলি জিন্না যখন তাঁর চোদ্দ দফা দাবী সমগ্র হিন্দু ভারতকে মেনে নিতে হুকুম পেশ করলেন তার প্রথমেই স্থান পেল এই কম্যুনাল এওয়ার্ড। যা ইংরেজরাও বলতে ইতস্তত করছিল তা' জিন্না কোন প্রকার হেঁয়ালী না করে জানিয়ে দিলেন :—হিন্দুকে এ এওয়ার্ড যেমনটি দেওয়া হয়েছে তা মেনে নিতে হবে, প্রতিবাদ বন্ধ করতে হবে।

কেন জিন্না হিন্দুদের প্রতি এ হুকুম করলেন? হিন্দু প্রতিবাদ—সে প্রতিবাদ বিশেষ করে জমে উঠেছিল কেবল বাঙলা দেশেই, মুসলমানের বিরুদ্ধে ত' সে প্রতিবাদ ছিল না! সে প্রতিবাদ উঠেছিল, কোন্ ন্যায়সম্মত নীতিতে সংখ্যালঘু হিন্দুদের প্রতিনিধিত্বের দাবী অগ্রাহ্য করে বাঙলা দেশের বিধানসভায় ইংরেজ ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি পাঠাবার অধিকার ফাঁপিয়ে তোলা হ'ল

সমপর্যায়ের দ্বিতীয় রাজনৈতিক কারণ যা বাঙলা দেশের সমাজে তখন দেখা দেয়েছিল তা হ'ল যাকে বলা হয় সন্ত্রাসবাদ বা টেরোরিজম্। বিলেতের পার্লামেণ্টে যখন নতুন ভারতশাসন আইনের খসড়া নিয়ে আলোচনা চলছিল তার পূর্ব থেকেই বাঙলা দেশের ২০০০ মধ্যবিত্ত হিন্দু বাঙালী যুবক নানা ধরণের বিধিনিষেধের জালে আটকে অন্তরীণে বা দ্বীপান্তরে দিন গুজরান করছিলেন। সেই যুগটার সঠিক চিত্র আজ তুলে ধরা কঠিনই। একটার ওপর আর একটা ঘটনাবহুল মুহূর্ত এসেছিল তখন। আদিতে সন্ত্রাসবাদের যে রোমানটিক ধ্যানধারণাই থেকে থাকুক না কেন ত্রিশে হয়ে পড়েছিল যৌবন-জনোচিত একমাত্র আদর্শ বাঙালী মধ্যবিত্ত হিন্দুর কাছে। কেন?—তার কারণ থাকতে পারে একাধিক, কিন্তু কাজে হয়ে পড়েছিল এপিডেমিকের মত। সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স স্তিমিত, কিন্তু জেলগুলো তখনও ভর্তি। কংগ্রেস আইন অমান্য পরিহার করেছে, জেলগুলো খালি করতে হবে কিন্তু হোম মেম্বর, সার উইলিয়ম প্রেনটিস সিভিল ডিসওবিডিয়েন্সের জন্য যে সিকিউরিটি অর্ডিনান্সগুলো রচিত হয়েছিল সর্বভারতের পক্ষে সেগুলো একত্রিত করে বত্রিশ সালে পাবলিক সিকুউরিটি এ্যাক্ট করে রাখলেন ভবিষ্যতে বাঙলা দেশে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে।

সিভিল ডিসওবিডিয়েন্সের ধারা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে লাগল। সন্ত্রাসবাদ কিন্তু প্রবল হয়ে প্রচণ্ডতর আকার নিতে লাগল। অ্যান্ডারসনকে তখন আনা হয়েছে। অভিজ্ঞতা প্রচুর। আয়ারল্যাণ্ডেও একই অবস্থা দেখেছিলেন এবং প্রতিরোধের জন্য অন্যান্য বিধিনিষেধের মধ্যে আবিষ্কার করেছিলেন "ব্ল্যাক ও ট্যান" ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় হতভাগ্য বন্দীর শরীরে চিটেগুড় বা আলকাতরা লেপে এবং তার ওপর তুলো লাগিয়ে গ্রামের মধ্যে সর্বসমক্ষে প্যারেড করানো হ'ত—হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্য। যে পুলিস সুপারটি —বোধহয় আইরিশম্যানই ছিল—এ বিষয়ে সবচেয়ে উৎসাহী

হয়েছিল, তার দেহাবশেষ নিশ্চয়ই মিশিয়ে আছে ঢাকার মাটির বুকে।

অ্যান্‌ডারসনের চোখে বাঙলা দেশের এই উত্থান হিন্দু উত্থান বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। বাস্তবে তার অনুমান সত্য। হিন্দু উত্থান, তবে মধ্যবিত্ত হিন্দু বা "ভদ্রলোক" হিন্দু উত্থান। কেন বাঙালী হিন্দু *মধ্যবিত্তেরা এমনিভাবে খেপে উঠল সে কারণটি কিন্তু অ্যান্‌ডারসন* দেখেননি। অবশেষে সতীশচন্দ্র মিত্রের ডেটিনিউ রিহ্যাবিলিটেসন স্কিম যা' এস, এন, রায়ের মাথা থেকে বেরিয়েছিল তা' নিয়ে অনেক মাতামাতি করেছিলেন অ্যান্‌ডারসন।

গোটা অ্যান্‌ডারসন যুগটা—নতুন শাসন আইন প্রবর্তন (উনিশশো-সাঁইত্রিশ) কাল ধরে চলেছিল। সে যুগের ধরণ-ধারণ মনে করলে গা শিউরে ওঠে। এক দিকে চলেছে বাঙালী মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিচালিত টেররিষ্ট আন্দোলন, অপরদিকে চলেছে অকথ্য সরকারী অত্যাচার। আর সে চণ্ড শাসনে অত্যাচারিত হতে লাগল প্রধানতঃ বাঙলা দেশের পল্লী অঞ্চলের মধ্যবিত্ত বাঙালী হিন্দু। সেকালের সাহেবী কাগজগুলো, ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশন এবং গণ্যমান্যেরা কে কি করেছিলেন তা আজ অনুসন্ধানের বিষয়। কলকাতা কর্পোরেশন অতীতে দীনেশ গুপ্ত সম্পর্কে অনুমোদিত রিজোলিউসন প্রত্যাহার করল সেদিন, যে দিন দীনেশকে আলিপুর জেলে ফাঁসি দেওয়া হল, তার সংবাদ ফরওয়ার্ড পরিবেশন করেছিল এমন এক শিরোনামা দিয়ে যা সাংবাদিক জগতে অমর হয়ে আছে। ফরওয়ার্ড লিখেছিল, Dauntless Dinesh Dies with Dawn.

প্রতিশোধ নেবার প্রবৃত্তি উভয় পক্ষেই তখন উগ্র আকারে দেখা দিয়েছে। বড়লাট ওয়েলিংডন ও ছোটলাট অ্যান্‌ডারসন একসঙ্গে গ্র্যাণ্ড হোটেলে ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশনের ভোজ সভায় সাহেবদের আশ্বাস দিলেন এই বলে: দাঁড়াও সন্ত্রাসবাদ ঠাণ্ডা করছি। সাহেবরা আবদার করে বলছে—আর যাই কিছু করোনা কেন, ল'

এবং অর্ডার নতুন ব্যবস্থায় মন্ত্রীদের হাতে দিও না, এবং পুলিসের ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চটি খোদ গভর্ণর জেনারেলের হাতে রাখো।

অ্যান্‌ডারসন ব্যবস্থা করলেন বাঙলা দেশের পল্লী অঞ্চলে গোরা ও গাড়োয়ালী সৈন্যদের "রুট মার্চ।" এ "রুট মার্চ" যেমন চল্‌ল পূর্ব বাঙলার ঢাকা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরার পথে পথে তেমনি চল্‌ল উত্তর বাঙলায় এবং পশ্চিম বাঙলার মেদিনীপুরে। কবে, কোথায় কাদের কেমন করে লোক চোখে হেয় করতে হবে তার ডিটেল্‌ড দৈনিক তালিকা দিত এই সৈন্যদের সহযাত্রী ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের অফিসারেরা। সঙ্গে সঙ্গে চলল ধর পাকড় ও খানাতল্লাসী। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটরা হুকুম করলেন প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্ক হিন্দুকে (২৫ বছর পর্যন্ত) রাখতে হবে আইডেনটি কার্ড, প্রতিটি হিন্দু পরিবারকে (চট্টগ্রামে) থাকতে হবে এক মাস ধরে স্বগৃহে অন্তরীণ, কোন পড়ুয়া স্কুলে অনুপস্থিত থাকলে তার কারণ জানাতে হবে প্রধান শিক্ষককে এবং সে কারণ জানাতে হবে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে। ঢাকা শহরের পার্কে বা খেলার মাঠে আসতে নিষেধ করা হ'ল বাঙালী হিন্দু যুবকদের, সন্ধ্যায় তাদের ঘরে থাকতে হবে এবং যে কোন সময় পুলিস তাদের খোঁজখবর বা খানাতল্লাসী করবে। সংবাদপত্রের ওপরে আসল নিষেধাজ্ঞা।

যেখানে যে অঞ্চল ধরে সৈন্যেরা রুট মার্চ করবে তা দেখবার জন্যে উপস্থিত হতেই হবে গ্রামের সবাইকে। ইউনিয়ন জ্যাককে অভিবাদন করতে হবে। হুকুম অমান্য করলে প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত। বাঙলার পল্লী অঞ্চল ধরে চলল অবাধে পুলিসী শাসন ও অত্যাচার। যে পরিবারের সন্তান রাজবন্দী বা রাজনৈতিক কারণে নির্যাতিত হয়েছে সে পরিবারের হতভাগ্য পিতা, মাতা, ভায়েরা হয়ে পড়ল জঘন্য পুলিসী প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার শিকার। রায় বাহাদুর ও খান বাহাদুরের কৌলিন্য বেড়ে

চললো, পুলিসী কুদৃষ্টি থেকে মুক্তি পেতে এরাই একটু সাহায্য করতে পারতেন।

সে তাণ্ডব-লীলার খবর কলকাতাতে কদাচিৎ এসে পৌঁছত। সেই অশুভ মুহূর্তে বাঙলা দেশের পল্লীঅঞ্চলে—বিশেষতঃ সেই সব অঞ্চলে যেখানে সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছিল অথবা পুলিসী অভিযান চলেছিল সে সব স্থানের বাসিন্দা এবং সেখানে যে সব সাংবাদিকদের যেতে হ'ত শুধু মাত্র তাঁরাই স্মরণ করতে পারবেন সেই কণ্ঠরোধের পৈশাচিক কাহিনী, সেই অমানুষিক বীভৎসতা।

পশ্চাতের দিকে দৃষ্টি ফেরালে আজ কত কথাই না মনে পড়ে! ষ্টেটসম্যানের সম্পাদক ওয়াটসনের ওপর যখন গুলি চলেছিল তখন গান্ধীজীর "হরিজন" টুরে সহযাত্রী সাংবাদিক হয়ে আসাম-বিহার-উড়িষ্যা ঘুরে পুরীতে এসেছি। মহাত্মাজীকে সে সংবাদ দিলাম। স্তব্ধ হয়ে রইলেন তিনি। পরে বললেন—প্রতিটি মুহূর্তে আমার প্রত্যয় দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছে এই ভেবে যে অহিংস-প্রতিরোধই একমাত্র পথ।

সেদিনকার বাঙলা দেশের লেজেসলেটিভ কাউনসিলে সময় সময়ে পল্লী বাঙলার আর্তনাদের প্রতিধ্বনি শোনা যে একেবারেই যেত না তা নয়, কিন্তু তা ছিল একান্তভাবে ক্ষীণ। কাউনসিলের বাইরে সে কণ্ঠরোধের প্রতিবাদ কোথাও যে বিশেষ গুঞ্জরণ তুলেছিল এমন মনে হয় না। কিন্তু উদ্বেগ দেখেছিলাম কেবল ঐ মহাপ্রাণ মহামানবের চোখে মুখে আর তারই প্রতিক্রিয়া রূপায়িত হয়ে বিরাট ইতিহাসও রচনা করেছিল বাঙালী যুবশক্তির কল্যাণে।

সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স মুভমেণ্ট প্রত্যাহারের সঙ্গে সঙ্গে কেন বাঙলা দেশে সন্ত্রাসবাদ মাথা নাড়া দিয়ে দাঁড়াল এ একটা বড় ধরণের ঐতিহাসিক প্রশ্ন যার সন্তোষজনক কোন উত্তর খুঁজে বার করা যায়নি অদ্যাবধি। এর পেছনে সেই মুভমেণ্ট প্রত্যাহার জনিত হতাশা মধ্যবিত্ত বাঙালী হিন্দুমনে কি সন্ত্রাসবাদ-ইন্ধন

যুগিয়েছিল? না এ ছিল পুলিসী অত্যাচারের প্রতিহিংসা। অথবা আগামী শাসন-সংস্কার-কাজ কলুষিত করবার মানসে বাঙলার ইংরেজ ব্যবসায়ী ও সরকারী অফিসারদের যুক্ত-ষড়যন্ত্র? সত্য বটে সিকিউরিটি আইন প্রত্যাহার করবার পরই চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হয়েছিল (এপ্রিল ১৯৩০)। কিন্তু সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স যে প্রকারের ব্যাপক আন্দোলনে গোটা বাঙলা দেশকে আলোড়িত করে তুলেছিল, তেমনিভাবে সে লুণ্ঠন সন্ত্রাসবাদকে ব্যাপক করতে পারেনি। অপর পক্ষে সার উইলিয়ম প্রেনটিস যেদিন সে আইন বিধিবদ্ধ করে পুলিসী অত্যাচার আবার চালু করলেন সেদিন থেকে সন্ত্রাসবাদ এমন রূপ নিতে লাগল যেমনটি অতীতে আর কোনদিনই দেখা যায় নি।

সন্ত্রাসবাদ ও সিভিল ডিসওবিডিয়েন্সের সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী গতি থাকলেও বাঙলা দেশের শাসনকর্তারা এ দুটোর মধ্যে যোগসূত্রের সন্ধান বের করতে সক্ষম হয়েছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বন্দবিলার আন্দোলনের নাম করা যেতে পারে। এ আন্দোলনের সর্বভারতীয় খ্যাতি সুভাষচন্দ্র প্রচার করলেন বোম্বাইতে। স্যার সুরেন্দ্রনাথের আমলে স্বনামধন্য বীরেন্দ্রনাথ শাসমল যে প্রবল আন্দোলন গোটা মেদিনীপুর জেলায় চালু করেছিলেন এ আন্দোলনও সেই প্রকারের। সংবাদ সংগ্রহের জন্য গেলাম সেই যশোর জেলার গণ্ডগ্রামে, যেখানে একা বিজয় রায় মহাশয় ইংরেজের বিরুদ্ধে শক্তি-শেল হানতে বদ্ধ-পরিকর হয়েছিলেন। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন লারকিন; আইরিশম্যান ও ভদ্রলোক। তাঁরই গাড়ীতে পৌঁছলাম সেই গণ্ডগ্রামে। দেখলাম এ যেন শত্রু অধিকৃত পুরী। আরমড্ পুলিসের ছড়াছড়ি, গোয়েন্দাদের তৎপরতা, প্রতিটি চোখ যেন সন্দেহ ভরা। গ্রামের গৃহস্থরা হয় ঘরের দরজা বন্ধ করে, নয় সংসারের তুচ্ছতম দৈনন্দিন কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছেন। যে পল্লী অঞ্চলের বাঙালী গ্রামে অপরিচিত কেউ এলে আলাপ পরিচয়

করতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করে, তারাই সেখানে নিজের বাড়ির চৌহদ্দী পার হতেও দ্বিধাগ্রস্ত।

কোন সন্ত্রাসবাদের তো লক্ষণ বন্দবিলায় (১৯৩০-৩১) দেখলাম না; তবুও কেন এত পুলিসী সমাবেশ? ফিরে এলাম ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোতে, আলাপ আলোচনায় বুঝলাম লারকিন নিজে বন্দবিলার ঘটনায় সুখী নন। তাঁর অভিযোগ সীমাবদ্ধ ছিল সংবাদপত্রের "অ-সত্য" পাবলিসিটির ওপর।

যখন আলোচনা চলছে, তখন এল পুলিস সুপারিটেণ্ডেণ্ট—এলিসন। মুখ খুলতেই বুঝলাম "বন্দবিলার" ভেতরকার অবস্থা। যে উৎসাহ নিয়ে এলিসন সুভাষচন্দ্রের নতুন জুতো চুরি যাবার গল্প করলেন, তাতে যে অত্যন্ত নিম্নস্তরের মনোবৃত্তিই প্রকট হয়ে উঠেছিল তা লক্ষ্য না করে পারিনি। তাঁর মতে সত্যাগ্রহ সম্পর্কে বদ্ধ ঘরে সুভাষের আলোচনার সময় ঐ জুতো ভলাণ্টিয়াররাই চুরি করেছিল।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম: পুলিসী অনুসন্ধান করে চোর ধরলেন না কেন?

—কি দায় পড়েছে আমার?—উত্তর করল এলিসন।

দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তরে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করল এই পুলিস সুপার যার তাণ্ডবে জেলার পল্লী অঞ্চল কেঁপে উঠেছিল।

এত ছোট একটা গ্রামের মধ্যে এত পুলিস ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘাঁটি করবার কোনো সার্থকতা আছে কি?—জিজ্ঞাসা করলাম।

—এরা প্রত্যেকটি ডাকাত। বোমা, রিভলভার মজুত রেখেছে। কেবল সুভাষের হুকুমের অপেক্ষা করছে।—এলিসন উত্তরে বলল।

এলিসনের ভাবভঙ্গী এবং কথা-বার্তাতে এতটুকু সন্দেহের অবকাশ ছিল না যে একটা বিরাট ষড়যন্ত্রের জাল শাসককুল বাঙলা দেশে ফেলতে শুরু করেছেন। নতুন প্রতিহিংসার আগুনে বাঙলার মধ্যবিত্ত হিন্দুকে পোড়াতে হবে—এই হ'ল সরকারী নীতি। এ

আগুনে পাঁচ দশটা ইংরেজ কর্মচারীকে প্রাণ নিশ্চয়ই দিতে হয়েছিল—এলিসনও ছিল তার মধ্যে একজন—কিন্তু তার বিনিময়ে বাঙলার মধ্যবিত্তকে যে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল তার তুলনা কোথায় ?

লবণ সত্যাগ্রহ শুরু হল। গেলাম মেদিনীপুরের তমলুক আর কাঁথিতে। শৈবাল গুপ্ত কি এস. ডি. ও ? মনে হল না। সব কিছুই পুলিস সুপার দোহা সাহেব। নিরীহ গ্রামবাসীর উপর যে অকথ্য অত্যাচার চলেছিল তাতে মেদিনীপুর যে পরিণামে বিদ্রোহী হয়ে পড়বে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না।

শাসনসংযত কণ্ঠ, সভা সমিতি প্রায় নিষিদ্ধ, সংবাদপত্র পীড়িত। সঙ্গে সঙ্গে সাহেবী দাপট, ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশনের দৌরাত্ম্য ইত্যাদি যখন চরমে তখন অ্যানডারসন ছেড়ে দিলেন বাঙলার দিকে দিকে ও দলে দলে গাড়োয়ালী ও গোরা সৈন্য। এভারেষ্ট বিজয়ী ব্রিটিশ দলপতি হাণ্টার ছিলেন এমনি একদলের দলপতি পূর্ববঙ্গে। তাঁর কৃত কর্মের কাহিনী এখনও মনে আছে।

যখন বাইরে সব কিছু নিশ্চল ও নীরব তখন মেদিনীপুরের ত্রাহি ত্রাহি ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন গুটি কয়েক বাঙালী। তার মধ্যে অন্যতম ছিলেন আবুল কাশেম ফজলুল হক। সেই পুরানো আলবার্ট হলের সভামঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে সভাপতি ফজলুল সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে মেদিনীপুর কাঁথি চট্টগ্রাম ও ঢাকা অঞ্চলে যে অবাধ অত্যাচার নীরবে আপামর হিন্দ বাঙালীকে করতে হচ্ছিল তাকে ভাষা দিয়েছিলেন। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু এই ফজলুল সভাপতিত্বে আহুত সভায় বক্তৃতা দেবার জন্য সিডিসন চার্জে পড়ে কলকাতার তদানীন্তন চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট সুশীল সিংহ কর্তৃক দু'বছর জেলভোগের সাজা পান। (১৯৩৪ সাল)।

যখন চৌত্রিশের আইন সভায় রীড সাহেব সন্ত্রাসবাদ দমন বিল আনলেন তখন কাউন্সিলে ফজলুল ছাড়াও অনেক মুসলমান সদস্য ছিলেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজন পরবর্তী ফজলুল হকের ক্যাবিনেটের মন্ত্রীও হয়েছিলেন; যথাঃ নৌসের আলি (যশোর) হাসেম হালি (বাখরগঞ্জ) তমিজুদ্দীন খাঁ (ফরিদপুর, শেষে পাকিস্তান আইন সভায় স্পীকার) এবং হুসেন শহিদ সুরাবর্দী (কলকাতা)। কিন্তু সেদিন সেই সন্ত্রাসবাদ দমন বিলের বিরোধিতা করেছিলেন কেবল ফজলুলই আইন সভায় দাঁড়িয়ে। রীড সাহেবকে ঠাট্টা করে বলেছিলেন—অতীতে বাঙলা দেশের "প্রাইম মিনিস্টার সার উইলিয়ম প্রেনটিসকে" ত অবাধ ক্ষমতা এই কাউন্সিল দিয়েছিল। তাতে কি ফল লাভ হয়েছিল? ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটগুলো যারা কার্যতঃ সরকারী গাধা স্বরূপ, তাদের নিয়ে স্পেশাল বেঞ্চ বানানো হয়েছিল; তারা কি করতে পেরেছিল? তাদের বদলে এই সভার রায় বাহাদুর, খান বাহাদুরদের নিয়ে এই বিলের সিলেক্ট কমিটি করলে অতীতের ধারা বজায় রাখা যেত। হয়ত একটা বিলের প্রয়োজন আছে, কিন্তু তা কি এই বিল যার কোন কিছুই সমর্থনযোগ্য নয়! অনুগ্রহ করে বিলটি জনমতাপেক্ষ ক'রো, তোমাদেরি ভাল হবে।—বলেছিলেন ফজলুল হক।

সে আলোচনার দিনটি (ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৪) বেশ স্মরণে আছে। এই একটি দিন যখন প্রফেসর জীতেন্দ্রলাল ব্যানার্জীকে হাউসে বেশ ভাল রকমে নাস্তানাবুদ হতে দেখেছি।

ফজলুল ঠিক সে মুহূর্তে হাউসে অনুপস্থিত। প্রফেসর ব্যানার্জী বক্তৃতা সুরু করলেন ফজলুলকে আক্রমণ করে।—তিনি যে বিলটি এখন জনমতাপেক্ষ করতে এত আগ্রহী, নিজে যখন মন্ত্রিত্বের গদি হারিয়েছিলেন তখন কি করেছিলেন?—

ফজলুলকে আক্রমণ করবার পর জীতেন বাবুর বক্তৃতার স্রোতে ভাটা পড়ল। ঠাট্টা বিদ্রূপ করবার যেন আর কিছুই নেই।

শান্তি শেখরেশ্বর রায় জীতেন বাবুর থেমে থেমে কথা বলার ভঙ্গী দেখে জিজ্ঞাসা করলেন : why this pause ?

ব্যানার্জী উত্তরে জানালেন : because of the interruptions.

শান্তি শেখর প্রশ্ন করলেন : or the past memory haunts you ?

জীতেন বাবু বিলটি সরাসরি সিলেক্ট কমিটিতে যায়—সেইটি ছিল সরকারী মহলের ইচ্ছা—তা' সমর্থন করতে ইতস্তত করাতেই শান্তি শেখর খোঁচা দিয়েছিলেন। পাছে সব কিছুই প্রকাশ হয়ে যায় এই দুর্ভাবনায় জীতেন বাবু ঘাবড়ে গিয়ে জানালেন, তিনি হাউসের অন্যান্য সকলের মতামতেরই প্রতিধ্বনি করছেন, বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর প্রস্তাব সমর্থন করে। উদাহরণ স্বরূপ নাম করলেন সরকারের পেনসনপ্রাপ্ত জে. এন. গুপ্তের (Retd.I. C. S.)। গুপ্ত মহাশয় তখন হাউসে উপস্থিত, তিনি তখুনি জীতেনবাবুর মন্তব্যের প্রতিবাদ করলেন। জীতেনবাবু নিজেকে আরও অসহায় বোধ করলেন এবং জানালেন : তবে অন্যান্য পেনসন ভোগীদের পক্ষ থেকে আমার মন্তব্য রাখছি।

সে কথার প্রত্যুত্তরে নরেন্দ্রকুমার বসু প্রফেসর ব্যানার্জীকে এমন এক কঠোর খোঁচা মারলেন যাতে তিনি আহত হয়ে রি রি শুরু করলেন। প্রেসিডেন্ট নরেন্দ্র বাবুকে মন্তব্য প্রত্যাহার (withdraw) করতে হুকুম করলেন। বসু মহাশয় সে আজ্ঞা পালন করতে যেটুকু বলা হয়নি তাও বিশেষভাবে ও পরিষ্কার ভাষায় জানালেন।

প্রফেসর ব্যানার্জী মুষড়ে পড়লেন। সেদিন তাঁকে যে অসহায় অবস্থায় পড়তে দেখেছিলাম এমনটি আর কখনও দেখিনি।

পূর্বে উল্লেখ করেছি ফজলুল হকের সভাপতিত্বে এলবার্ট হলে যে সভা আহূত হয়েছিল সে সভায় যারা উপস্থিত ছিলেন পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, রামানন্দ চ্যাটার্জী,

ডাঃ প্রমথনাথ ব্যানার্জী, যোগেশ গুপ্ত, মৌলভী সামসুদ্দীন আহমদ প্রভৃতি নেতারা।

সস্ত্রীক পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু কলকাতায় এসেছিলেন তাঁর অসুস্থা পত্নী কমলা নেহরুর চিকিৎসার উদ্দেশ্যে। মিণ্টো পার্কে নাড়াজোলের কুমার দেবেন খাঁর বাড়িতে উঠেছেন। মোতিলাল নেহরুও কলকাতায় এলে ঐ বাড়িতে উঠতেন। তিনটি দিন কলকাতায় থাকবেন নেহরু। এই তিন দিনের পর একবার ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত বিহারের অবস্থাটা দেখতে যাবেন। ইচ্ছা একবার শান্তিনিকেতনে যাবার। অবশ্য সময় হ'লে।

পর পর এলবার্ট হলে ছদিন এবং মহেশ্বরী ভবনে ও ওয়েলিংডন স্কোয়ারেও বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতার বিষয়গুলো কি ছিল তা কোর্টে সরকারী সাক্ষ্যে ভালভাবেই জানা গিয়েছিল। পাবলিক প্রসিকিউটর প্রশ্ন করলেন রাজসাক্ষীকে ঃ এ সভাগুলো কে আহ্বান করেছিল, কি জন্য এবং কতলোক উপস্থিত ছিল ?

উত্তর হল ঃ ছাত্রেরা ডেকেছিল, প্রায় ১২০০ যুবক ছাত্র উপস্থিত ছিল এবং বিষয়বস্তু "alleged excesses committed by troops on route march in Midnapur." এবং "Present political situation in India and duties of Indian people."

আদালতে নেহরু আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নি, তবে একটি স্টেটমেণ্ট পেশ করেছিলেন এবং তার খানিকটা পড়তেও পেরেছিলেন। সে স্টেটমেণ্টে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু বাঙালীর প্রতি যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন তা স্মরণীয় ঃ—I should like to express my gratitude to the Government of Bengal for the opportunity they have accorded me by taking these proceedings against me to associate in a small measure with the past and present lot

of the people of Bengal. That is a privilege I shall long treasure.

আর বেশী তাঁকে বলতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট দণ্ড দিতে গিয়ে নেহরুর বক্তৃতার যে অংশ বিশেষ উদ্ধার করেছিলেন তাতে ধরা পড়ে আছে কোন দৃষ্টিকোণ দিয়ে নেহরু এইসব ঘৃণ্য অমানুষী অত্যাচার দেখতেন : In the first speech reference has been made to recent arrests in the district of Midnapur. The speaker sees in the measures taken by the Government to restore law and order nothing but the attempt of an arrogant Imperialist Power to humiliate not Midnapur, not the few people of the district, but the whole of India because it is a humiliation to every Indian from the Khyber Pass to Cape Comorin..... He goes on to speak of the innate and inherent vulgarity of Imprialism, its utter cruelty and its vandalism. its shamelessness, its callousness....

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জবাহরলাল নেহরুর ওপর দণ্ডাজ্ঞা শুনে বলেছিলেন : আজ একা নেহরু বিহার ভূমিকম্পে আর্তদের মনে আশার সঞ্চার করেছেন। তাঁকে এমনিভাবে সরান হ'ল!

এ্যান্টি-টেররিষ্ট বিলের আলোচনার উত্তরে রীড একটা কথা বলেছিলেন যার আভিধানিক অর্থে তৎকালীন মধ্যবিত্ত বাঙালী যুবকদের চরিত্রের ব্যাখ্যা পরিস্ফুট হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন : আপনারা হয়ত জানেন না যে, এদের মধ্যে আছে অনেক—যদিও তাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়—যারা এক হাতে পিস্তল ও অন্য হাতে বিষের মোড়ক নিয়ে স্বকার্য সাধনে অগ্রসর হয়ে থাকে।

বিশের কোঠায় বাঙলায় বা কলকাতায় একই সঙ্গে আবির্ভূত

হয়েছিলেন দুটি ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন পুরুষ—লর্ড লিটন ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। একজনের কর্তব্য কর্ম হ'ল মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন ব্যবস্থা চালু রাখা, অপরের একমাত্র করণীয় কাজ হ'ল তা সম্পূর্ণরূপে বিফল করা। একজনের পশ্চাতে থাকল সেকেলে ব্যুরোক্রাটিক গোষ্ঠী, যারা পদে পদে অনুপ্রেরণা দিতে লাগল তাঁকে —এবং অপরকে ঘিরে দাঁড়াল জনপ্লাবন; যার তুলনায় অতীতের স্বদেশী যুগের কর্মকাণ্ডও অকিঞ্চিৎকর। নানা ভাবের মিশ্রণে, নানা দ্বন্দ্ব ও ঘাত-প্রতিঘাতে চিত্তরঞ্জন দাশের যুগের এই প্লাবনের গতিমুখ হ'ল বিভিন্ন, যদিও এর প্রতিটি ধারা সেই স্বদেশী যুগের একই মিলন-মোহনায় উপনীত হবার জন্য উন্মুখ ছিল।

লিটন এ প্লাবনের মুখে পড়ে দিশেহারা। যতটুকু আত্মস্থ হবার ক্ষমতা তাঁর ছিল তাও নষ্ট করে দিতে লাগল ইংরেজ শাসকেরা। ভদ্রলোক প্রায়ই বলতেন যে, এ দেশেই তাঁর জন্ম এবং তিনি চেয়েছিলেন নতুন কিছু করতে। কিন্তু কি বাস্তবের সামনেই না তাঁকে পড়তে হল! মণ্টেগু-চেমসফোর্ড আইন চালু হয়েছে, সুরেন্দ্রনাথ ও নবাব সৈয়দ নবাব আলি মন্ত্রী এবং হিউ স্টিফেনসন, বর্ধমানের বিজয়চাঁদ ও আবদার রহিম একজিকিউটিভ কাউনসিলর। বাইরে চলেছে নন-কোঅপারেসন আন্দোলন। জেলগুলো ভর্তি। হঠাৎ একদিন বাইরের পৃথিবী জানতে পারল যে, বরিশালের জেলে রাজবন্দীদের প্রতি বেত্রাঘাত ব্যবস্থা করা হয়েছে। (সেপ্টেম্বর ১৯২২)।

সেদিনের বিধানসভায় অনেক নাম করা বাঙালী হিন্দু ছিলেন—শিব শেখরেশ্বর রায়, রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, যতীন্দ্রনাথ বসু, আর সেই সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ তো ছিলেনই। বিষয়টি উত্থাপন করে প্রতিবাদ করলেন কেবল কুমিল্লার ইন্দুভূষণ দত্ত মহাশয়।

মুসলমান সদস্যদের মধ্যে সে প্রতিবাদে সমর্থন জানিয়েছিলেন একমাত্র ফজলুল হক। এরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত যুবকের দল,

এদের ওপরে এমনিধারা ঘৃণ্য ব্যবহার করলে সে কথা এরা ভুলবে না। পরিণামে দেখা যাবে যে তাদের মনের মধ্যে যে সুকুমার বৃত্তি জাগ্রত আছে তার মৃত্যু ঘটেছে—বলেছিলেন ফজলুল হক। বেসামাল হয়ে হিউ স্টিফেনসন বেত্রদণ্ডের বিলিতি ইতিহাস জানিয়ে কেবল ফজলুলের তাৎপর্যময় উক্তির জবাব দিয়েছিলেন।

পরের দিন অমৃত বাজার পত্রিকা বিষয়টি নিয়ে যে ধরণের মন্তব্য করেছিলেন তাও ছিল অনন্যসাধারণ। টেলিপ্যাথিতে প্রাপ্ত লিটন-স্টিফেনসন কথোপকথনের রূপক ব্যাখ্যা ছাপলেন সম্পাদক। লিটন হলেন Lord Biscuit ও স্টিফেনসন হলেন Sir Red Rag Bull. সে সম্পাদকীয় মন্তব্য একটু উদ্ধার করলেই তার মর্মার্থ ধরা পড়বে।

লর্ড বিস্কুট : এই নন্-কোঅপারেটররা অত্যন্ত স্পর্শকাতর, না?

স্যার রেড র‍্যাগ বুল : ঠিক বলেছেন হুজুর।

লর্ড বিস্কুট : যদি তাঁরা বেত খেয়েও জেলারকে সেলাম না করে তবে কি করবে?

স্যার রেড র‍্যাগ বুল : তাদের দণ্ড বাড়িয়ে দেওয়া হবে।

লর্ড বিস্কুট : যদি দণ্ড বাড়িয়ে দিতে চাও, তবে মারছ কেন?

স্যার রেড র‍্যাগ বুল : বেত মেরে যদি কাজ হাসিল হয় তবে দণ্ড বাড়াতে চাইনে।

লর্ড বিস্কুট : মোদ্দা কথা হ'ল আগে বেত মেরে লোকগুলোকে খেপিয়ে তুলবে তারপর তাদের দণ্ড বাড়াবে?

স্যার রেড র‍্যাগ বুল : জেলের কর্মচারীদের জেলের আইন যাতে বলবৎ থাকে তার জন্য সব কিছু করতে হবে।

লর্ড বিস্কুট : আমি তোমার কথা বুঝেছি।

স্যার রেড র‍্যাগ বুল : হুজুরের কিছু বলবার আছে?

লর্ড বিস্কুট : না তেমন কিছুই নেই। আমি কেবল ভাবছি

নন-কোঅপারেটরদের বেত-খাওয়া মডারেটদের ভবিষ্যৎকে কতটা গুঁড়িয়ে দেবে।

পুলিসী অত্যাচার জেলের সীমানা পার হয়ে বাইরে এসে পড়ল। ফরিদপুরে চরমানার ঘটনা (ভাঙ্গা থানা, ১৯২৩ সাল) সারা বাঙলায় ছড়িয়ে পড়ল। লিটন আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। রংপুরে এক সংবর্ধনায় করে ফেললেন সেই ইতিহাস বিশ্রুত উক্তি: Indian men induce Indian women to create offences against their honour merely to bring discredit to the police. উঠল প্রতিবাদের প্রচণ্ড ঝড়। টাউন হলের সভায় লোক আর ধরে না, সামনের সিঁড়ি ও বিস্তৃত প্রাঙ্গণে (তখনও এসমব্লী হাউস হয়নি) পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু সভাপতি। চিত্তরঞ্জন দাশ, সরোজিনী নাইডু ও সভাপতি নিজে লিটনের উক্তির তীব্র সমালোচনা করলেন। উদ্বেলিত হ'ল জনতা। আর সে জনমত জোর করে দাবিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হল টেগার্ট চালিত আই. বি ও গোরা-পুলিস। প্রতিক্রিয়া আসতে দেরী হল না। গোপীনাথ সাহা টেগার্ট ভ্রমে ডে সাহেবকে গুলি করে মারলেন তৎকালীন ইউনাইটেড সার্ভিস ক্লাবের (বর্তমানের জিয়োলোজিক্যাল সার্ভের অফিস) সামনে (১৯২৪ সাল)।

সন্ত্রাসবাদীর হাতে শাসক কুলের প্রতিনিধির হত্যা বাঙলা দেশে নতুন নয়। তবুও এতে নতুনত্ব ছিল এবং তা' ধরা পড়েছিল গোপীনাথের উক্তির মধ্যে, যখন তিনি আদালতে অকপটে ও প্রকাশ্যে বললেন: আমি হত্যা করতে চেয়েছিলাম টেগার্টকে, সে কাজ অসমাপ্ত রেখেই আমার যেতে হল। "Every drop of my blood will sow the seeds of freedom in every Indian home." আজ সব রাজবন্দীই এই টেগার্টের অত্যাচারে জর্জরিত।

গোপীনাথকে নিয়ে রিজোলিউসন পাস হ'ল সিরাজগঞ্জের

প্রাদেশিক কনফারেন্সে (১লা জুন ১৯২৪)। বিশ্বাস করা যায় কি যে আজকের "আজাদ" সম্পাদক মৌলনা আক্রাম খাঁন ছিলেন সে সভার সভাপতি? রিজোলিউসনের যে সরকারী ড্রাফট কিরণশঙ্কর রায় দিলেন আর যা সেদিনের "ইংলিসম্যানের" রিপোর্টার চারী গোপনে যোগাড় করে ছাপালেন—চারীই হয়েছিলেন এ কাজের জন্য কলকাতার রিপোর্টারদের মধ্যে সর্বপ্রথম রাও বাহাদুর, পরে হীরেন ঘোষ মহাশয় হয়েছিলেন O. B. E.—তার মধ্যে ছিল বিরাট পার্থক্য। এবার শুরু হল ইউরোপীয়ান প্রতিক্রিয়া, আই. সি. এস. দের মহলে উঠল ঝড়, সে ঝড়ে যোগদান করল ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশন এবং সাহেবী কাগজগুলো। ল' এবং অর্ডার জোরাল কর'—শ্লোগান উঠল।

পুলিসী খানাতল্লাসী শুরু হ'ল ব্যাপকভাবে, প্রাদেশিক কংগ্রেস অফিস তছনছ হ'ল পুলিসী দাপটে। সন্ত্রাসবাদ ত ছিলই এর ওপরে চাপল বলসেভিক আতঙ্ক। শুরু হল ধর পাকড়। যাতে ধরা পড়লেন অনিলবরণ রায় (বর্তমানে পণ্ডিচারী আশ্রমে), সত্যেন্দ্র মিত্র, সুভাষ বসু, উপেন ব্যানার্জ্জী, কিশোরীলাল ঘোষ প্রভৃতি—যারা ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশের দক্ষিণ-হস্ত স্বরূপ (অক্টোবর, ১৯২৪)।

ডে-হত্যার ১০ দিনের মধ্যে শুরু হ'ল মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন ব্যবস্থায় গঠিত বাঙলা কাউনসেলের দ্বিতীয় অধিবেশন। যাতে ৪৫ জন স্বরাজী (২৫ জন হিন্দু ও ২০ জন মুসলমান) যোগদান করে ছিলেন। মডারেট দল হ'ল লুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ, এস. আর. দাশ ("হক কথা" চালু হয়েছিল এরই অনুপ্রেরণায়) গেলেন হেরে।

এই সন্ত্রাসবাদ প্রশ্ন আসল বিধান সভার সামনে। খোলাখুলি ভাবে চিত্তরঞ্জন দাশ বললেন: যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে (deportees) তাদের অনেকেই আমার সহকর্মী, আমি তাঁদের জানি এবং হলফ করে বলতে পারি তারা অহিংসক। সরকার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, সরকার স্বরাজী ভ্রূকুটিতে ভীত হবে না। উত্তরে

আমিও জানাচ্ছি যে সরকারী ভয়ে দেশের লোককেও ঠাণ্ডা করা যাবে না। অনেক দিন ধরে আমি নিজে এদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে বুঝিয়েছি যে স্বাধীনতা সন্ত্রাসবাদের দ্বারা আসতে পারেনা। আমি সফলকামও হয়েছিলাম। কিন্তু আমি আতঙ্কিত হলাম সরকারী কাণ্ড কারখানা দেখে। কয়েকদিনের মধ্যেই এদের গ্রেপ্তার করে জেলে পুরে রাখা হল! কি অপরাধে? তা আমরা জানিনা। আমাদের বলা হ'ল যে, ১৮১৮ সালের তিন নম্বর রেগুলেসনে তাদের আটক করা হ'ল। তাদের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ?—না, তুমি বলসেভিক এজেন্ট! এই হল প্রথম অভিযোগ। কোন সঠিক প্রমাণ আছে কি? আমি জিজ্ঞাসা করি কাউকে এমনিভাবে অভিযুক্ত করলে সে কি প্রমাণ করতে পারে যে সে অভিযোগ অ-সত্য? অন্যান্য অভিযোগগুলো হ'ল, তুমি পুলিসকে হত্যা করেছ, তুমি এর সঙ্গে বা ওর সঙ্গে ওঠাবসা কর, কিংবা তুমি রাজদ্রোহী।

আমি জিজ্ঞাসা করি, কোথায় কোন্‌দেশের ইতিহাসে নজীর পাওয়া যায় যে, বিদ্রোহাত্মক মনোভাব পুলিসী অত্যাচারে দূর করা যায়? এ মনোভাব অন্তরালে থেকে যায়, অন্তর্হিত হয় না। যে বোমা ছোঁড়ে বা গুলি মারে সে নিশ্চয়ই সন্ত্রাসবাদী, কিন্তু সেই কেবল একমাত্র সন্ত্রাসবাদী নয়। এ গোষ্ঠীর মধ্যে তারাও পড়ে যারা জনসাধারণকে ভীত সন্ত্রস্ত করে বেপরোয়া করে ফেলে।

জনগণের সন্তুষ্টি সাধনের মধ্য দিয়ে কেবল এই অবস্থার নিরসন হতে পারে। এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, এই বিদ্রোহীরা দেশ প্রেমিক। লাট সাহেবকে তা স্বীকার করতে হয়েছে। এরা দেশের স্বাধীনতা চায়। সেই আকাঙ্ক্ষা মেটানোর চেষ্টা কৈ?

শেষে মন্তব্য করলেন Just one word. His Excellency—I beg your pardon—I mean Maharajadhiraj Bahadur of Burdwan used language sounding intimidation. We were asked that we should

not pass it (Opposition sponsored resolution demanding the release of the deportees). Let me assure the Hon. member that this House will not be intimidated either and inspite of what he has said this House will pass the resolution.

সেদিনকার স্বরাজ্য পার্টি-সদস্য কাউনসিলে লঘুসংখ্যক হলেও এক চিত্তরঞ্জন নিজে বিধান সভায় লিটনের দৌত্যকাজ সব ভেস্তে দিয়ে সে রিজোলিউসন সেই গরম আবহাওয়ার মধ্যেই গ্রহণ করাতে সক্ষম হয়েছিলেন। ৪৫ জন সদস্য এর বিরুদ্ধে ও ৭৫ জন পক্ষে ভোট দিয়েছিল। মন্ত্রীদের মধ্যে সুরেন মল্লিক মহাশয় সেদিন উপস্থিত ছিলেন না, ফজলুল হক ও আবদুল করিম গজনভী মুখ খোলেন নি, কাউনসিলর বিজয় চাঁদ মহাতব ও আবদার রহিম বিরুদ্ধে বক্তব্য পেশ করেছিলেন।

পেনসন-প্রাপ্ত জজ আবদার রহিম ১৮১৮ সালের তিন নম্বর রেগুলেসন আর গুণ্ডা আইনের মধ্যে কেবল একটুকু পার্থক্য দেখলেন যে, একটি ভদ্রলোকদের বেলায় ব্যবহৃত হয় অপরটি গুণ্ডাদের বেলায়। ব্যোমকেশ চক্রবর্তী ছিলেন বড় ব্যারিষ্টার তিনি আবদার রহিমের টিকা টিপ্পনীর বহর দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: আমরা তবে কি গুণ্ডার দলের সদস্য?

গোপীনাথ সাহাকৃত ডে-সাহেব হত্যা নিয়ে, যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হ'ল সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক কনফারেন্সে তাই হয়ে পড়ল বিচারবস্তু স্বদেশে ও বিদেশে। কেমন করে চিত্তরঞ্জন দাশকে ঘায়েল করা যায় এই থাকল উদ্দেশ্য। পরের বছর (১৯২৫ সাল) আরও ঘটনা-বহুল। স্টিফেনসন গোপীনাথ প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে নতুন আইনের খসড়া আনলেন বিধান সভায়। লিটন সভা উদ্বোধন কালে মুসলমানপাড়া বোমার আসল আসামী, নগেন্দ্রনাথ সেন কেমন করে খালাস পেল এবং তার পরিবর্তে নিরপরাধরা দণ্ড

পেল সে কথা বলেও সেই আইন পাস করার জন্য অনুরোধ ও কাজ করলেন। বিধানসভা কিন্তু স্টিফেন্‌সন দ্বারা আনিত আইনের খসড়া বিল বাতিল করে দিল। লিটন সার্টিফিকেট দ্বারা তা' চালু রাখলেন। যেদিন সভায় সে বিল গ্রহণ করবার কথা সেদিন পাটনা থেকে অসুস্থ অবস্থায় চিত্তরঞ্জন কলকাতার টাউন হলের সামনে উপস্থিত হলে এবং স্টেচারে দোতলায় তাঁকে নিয়ে যাবার সময় জনতার মুখে ও চোখে যে দৃশ্য দেখেছিলাম তার পুনরাবৃত্তি দেখবার অবকাশ হল কই ?

এই বছরই (২রা মে, ১৯২৫ সাল) বিখ্যাত ফরিদপুর প্রাদেশিক কনফারেন্স। চিত্তরঞ্জন দাশ সভাপতি। নিজে অসুস্থ, পাটনায় ভাই. পি. আর দাশের বাসায় অবস্থান করে তাঁর সেই ভাষণ লিখলেন—যার একমাত্র উদ্দেশ্য থাকল যাতে ইংরেজ নিজেকে সংযত করে। সন্ত্রাসবাদের অন্ধ্ররন্ধ্র বাঙালীর মধ্যে যদি কেউ ধরতে পেরে থাকেন, তবে তিনি ছিলেন একমাত্র চিত্তরঞ্জন দাশ। আজ সন্ত্রাসবাদের ইতিহাস লিখবার সময় এসেছে। এর কাটামোখানা প্রস্তুত করে রেখে গেছেন চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর সেই ফরিদপুরের অভিভাষণে। একদা চিত্তরঞ্জন দাশকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, কেন স্বরাজীরা মন্ত্রিত্ব গ্রহণে অস্বীকৃত? উত্তরে বলেছিলেনঃ নিশ্চয়ই আমরা মন্ত্রিত্ব নিতে রাজী আছি, কিন্তু দায়িত্ব দেবার ইচ্ছাও থাকা চাই। কই সে ইচ্ছে? পরিবর্তে দণ্ড দেবার প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি রয়েছে উন্মুখ।

চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর আবার বিধানসভায় সিকিউরিটি বিল আনা হল (মে, ১৯২৬)। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের নেতৃত্বে স্বরাজ্য-পার্টি সে বিল নাকচ করবার যথেষ্ট চেষ্টা করেও কৃতকার্য হননি। স্বপক্ষে ৬১টি ও বিপক্ষে ৪৬টি ভোটে সে বিল গৃহীত হল। বিশের কোঠায় চিত্তরঞ্জন দাশ যে প্রবল সরকার-বিরোধী জনমত সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন তা সেই দশকের শেষেই নীরব.

হ'ল। স্বরাজীরা ৭ বছরের জন্য বিধান সভা বর্জন করল, সরকার পক্ষ ফিরে পেল আত্ম-বিশ্বাস। লিটন পরিণামে হলেন জয়ী। পুলিসী তাণ্ডব শুরু হ'ল। সে প্ররোচনায় যুক্ত হল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা; যাতে ইন্ধন জোগালেন হুসেন শহীদ সুরাবর্দী। সাহেবরাও চুপ করে থাকেন নি। লালবাজারের আঙ্গিনা মাড়িয়ে পালালো—বড় কর্তাদের সহায়তায়—সে দাঙ্গা-হাঙ্গামার নায়ক ও সুরাবর্দীর বন্ধু, মীনা পেশোয়ারী।

অতীতে, বিশেষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে কলকাতায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা অ-বাঙালী হিন্দু এবং অ-বাঙালী মুসলমান নিয়ে, নিছক সামাজিক কারণে অথবা গোড়ামীর ওপর ভিত্তি করে, বাধত। পাটের কল এলেকায় এ হাঙ্গামা প্রায়ই দেখা যেত। এতে কলকাতার বাঙালী হিন্দু ও বাঙালী মুসলমানদের যোগদান করতে কদাচিৎ দেখা যেত।

বিশ দশকের শেষ কোঠায় যখন রাজনীতির নতুন চাপ এল এবং তখন যে ধরণের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হ'ল, তা অনেকটা সেমি-পোলিটিক্যাল। সুরাবর্দীকে এ বিষয়ে পাইওনিয়ার কর্মকর্তা বলা যেতে পারে। সে সময় থেকে ছেচল্লিশের "সিভিল ওয়ার" নিয়ে, কলকাতায় যতগুলো দাঙ্গাই বেধে থাকুক না কেন তার প্রতিটির পেছনে সুরাবর্দী ছিলেন। এবং এর কারণগুলো ক্রমেই নতুন ধরণের হতে লাগল। বাঙালী হিন্দু-মুসলমানেরা আস্তে আস্তে এ হাঙ্গামায় এসে পড়তে বাধ্য হলেন। ক্রমে এ নতুন ধরণের দাঙ্গা—পোলিটিক্যাল মতলব সিদ্ধি করবার উদ্দেশ্যে—কলকাতা থেকে মফঃস্বলে ঢুকতে লাগল। বাঙলার গ্রাম-দেশে এ যাবৎ নিছক অর্থনীতির কারণে, জমি-জমার স্বত্বের দাবীতে বা অতিরিক্ত সুদ আদায়এর প্রতিবাদে দাঙ্গা বাধত, বিশেষতঃ মুসলমান ও নমঃশূদ্র চাষীদের মধ্যে। তবে তারও ধরণ ছিল আলাদা।

পরিণামে সাহেবরা রাজনীতির চাপ থেকে মুক্তি পাবার আশায়

এই নতুন ধরণের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পূর্ণ সুযোগ নিতে শুরু করল সেই ত্রিশের কোঠা থেকে। সুরাবর্দীকে পছন্দ না করলেও অতি সহজেই তিনি হয়ে পড়লেন প্রধান সহায়ক সে কর্মে।

আবুল কাশেম ফজলুল হক যখন প্রধানমন্ত্রী হলেন (১৯৩৭ সাল)। তখন সর্বসাকুল্যে ২৭০০ বাঙালী মধ্যবিত্ত হিন্দু কারা প্রাচীরের অন্দরে নানা বাধাগ্রস্ত অবস্থায় দিন গুজরান করছেন। কংগ্রেসের সঙ্গে যখন ফজলুল আঁতাত করতে ব্যাগ্র, তখন কিরণশঙ্কর রায় বলেছিলেন যে, সে আঁতাত অতি সহজেই সম্ভব হতে পারে যদি এই রাজবন্দীদের মুক্তিতে ফজলুল রাজী হন। এ আলোচনাও বেশী দূর চলল না। শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত কারণেই সে আঁতাত সম্ভবপর হয় না।

আন্দামানের বন্দীরা বিধানসভা বসতে না বসতে সেই ইস্যুটি নিয়ে এলেন সকলের সামনে। আমাদের স্বদেশে নিয়ে যাওয়া হোক—এই হ'ল তাদের দাবী। সকলেই অনশনে।

প্রতিক্রিয়া শুরু হ'ল। মিনিস্ট্রিতে বাধল অন্তর্দ্বন্দ্ব। নাজেমুদ্দিন হোম মিনিস্টার। অতীতের অভিজ্ঞতায় জানতেন এ দাবীর ব্যাপকতা এবং সাহেবদের প্রতিক্রিয়া। ঠিক আবদার রহিম গুণ্ডা আইন ও তিন নম্বর রেগুলেসনের ক্ষমতা নিয়ে যে ব্যাখ্যা করেছিলেন নাজেমুদ্দিন তারই প্রতিধ্বনি করে বললেন: এদের নিয়ে এত মাথা ব্যথা করলে মসজিদের সামনে বাজনা বাজানো আর গো-হত্যার দরুণ যেসব দাঙ্গা-হাঙ্গামা অথবা ধর্ম নিয়ে অথবা প্রফেট নিয়ে লেখালেখি—ভোলানাথ সেনের হত্যাকারী সম্পর্কে সেই ইঙ্গিত ছিল—যেসব লোক দণ্ড পায় তাদের দাবীও মানতে হয়।

মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল অপর পক্ষে জানতেন এ দাবীর আন্তরিকতা এবং জানালেন: আমরা শীঘ্রই এদের দেশে আনবার জন্য সকল পার্টি নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করব। Anything that retards individual freedom deserves condemnation. Do not

for a moment believe that because we are sitting here opposite to those benches we have changed our nationality. It is not at once possible to change an administration 100 years old. I have put orders of release issued on my own responsibility in the case of many persons. Please do not throw obstacles in our way.

I do sincerely hope that the time is fast coming when instead of looking upon our action with suspicion as you have done, you will be induced to look on our action as those of your friends, your own countrymen and your own brethren, and I believe that although at the moment we may be considered separated, one having the men on the Government benches and the other on the Opposition, we and the members on the other side all belong to the great Bengali community, and we have got affection for each other and for the detenues as well. I may assure you that the detenues belonging to the Hindu community have always been as dear and affectionate to me as the youths of my own community. I may tell you of hundreds of instances to prove it. It does not matter to me whether a detenue is a Hindu or a Muslim, I look upon him as a youth belonging to the Bengali community. Please do not add to our difficulties.

বাইরে চল্‌ল আন্দোলন। 'ডেটিনিউ দিবস' যাতে সংবাদপত্রের

স্তম্ভে স্থান না পায় তার জন্য প্রেস অফিসার হুকুম নির্দেশ করলেন। টাউন হলে মিটিং ব্যর্থ করে দিল পুলিস, কংগ্রেস ফ্লাগ কেড়ে নেওয়া হ'ল। (নাজেমুদ্দিন হাউসে জানালেন, এটি কংগ্রেসী ফ্লাগ, জাতীয় ফ্লাগ নয়, মুসলমানেরা এ পতাকা স্বীকার করে না—ভবিষ্যতের ইঙ্গিত প্রকাশিত হল সে সময় থেকে) মার খেল কংগ্রেসী ভলান্টিয়েররা। নাজেমুদ্দিন লিটনের কথার প্রতিধ্বনি করে বললেন মেয়েদের শোভাযাত্রার সামনে রাখা "সিভালরি" নয়। হাউসের সেদিনকার আলোচনায় ফজলুল বলেছিলেনঃ My colleagues and I extremely regret the deploarble incident and we do so without accepting their arguments. We do not stand on the uncertain support of commercial men. We stand on our programme. সঙ্গে সঙ্গে সেদিন টাউন হলের মিটিংএ যেসব ইস্তাহার বিলি করা হয়েছিল তার একখানি উল্লেখ করে বললেন Colson and Huq should be whipped. এই তো হ'ল নমুনা!—মন্তব্য করলেন ফজলুল।

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উপস্থিত হলেন টাউন হলের এক মিটিংএ এই আন্দামানের রাজবন্দীদের মুক্তিদাবী সমর্থনের উদ্দেশ্যে। এর পূর্বে গিয়েছিলেন একদা অক্টোরলনি মনুমেণ্টের পাদদেশে, জীবনে বোধ হয় একবারই গিয়েছিলেন সেখানে, যখন কলকাতা স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল হিজলী জেলের রাজবন্দীদের গুলি দিয়ে হত্যা করবার খবর শুনে (১৯৩১)। অবশেষে তিনি আহ্বান করলেন মহাত্মা গান্ধীকে। মহাত্মা গান্ধী সে অনুরোধে সাড়া দিলেন সেই মুহূর্তেই। সিমলা নড়ল গান্ধীর উদ্বেগ প্রকাশে। গান্ধী-আশ্বাসে আন্দামান রাজবন্দীরা অনশন পরিত্যাগ করল। গান্ধীজী এলেন বাঙলায় (১৯৩৭-৩৮)।

সেদিনকার কথা আজও বিস্মরণ হইনি যখন গান্ধীজীকে অনুসরণ করে উপস্থিত হয়েছিলাম কারাগারে ও রাজদ্বারে। মহাদেব

দেশায়ের সঙ্গে গান্ধীজী চলেছেন বারাকপুরে, অ্যানডারসন আসছেন দার্জিলিঙ থেকে সেখানে এই রাজবন্দীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে, পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলেছি আমরা। গান্ধীজী চলেছেন দমদমে ও আলিপুর জেলে, দ্বারে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। নাজেমুদ্দিনের বাড়িতে চলেছেন গান্ধীজী, সে গৃহে তার সংবর্ধনা দেখেছি আমরা। ফজলুল হক, নাজেমুদ্দিন, নলিনী সরকার ও সুরাবর্দীর সঙ্গে বন্ধ দুয়ারে আলাপ আলোচনায় ব্যাপৃত গান্ধীজী, সাক্ষী আমরা।

সবচেয়ে স্মরণযোগ্য যে ঘটনা তা ঘটেছিল খড়গপুরের হিজলী জেলে। সেখানে আটক ছিলেন অনেকগুলি রাজবন্দী। এমন কি গান্ধীজীরও দেখাশোনার ব্যাপারে অত্যন্ত কড়াকড়ি ব্যবস্থা। সেখানেই অতীতে চলেছিল পুলিসীগুলি, যাতে প্রাণ হারিয়েছিলেন সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেন এবং আহত হয়েছিলেন আরও কুড়িজন। সে সিংহ-বিবরে রাত্রে প্রবেশ করতে নারাজ হ'ত যে কোন রাজ-কর্মচারী। হ্যারিকেন লণ্ঠনের আলোয় অল্প আলোকিত দ্বারপথ দিয়ে ভীম আগারে প্রবেশ করলেন গান্ধীজী ও তাঁর পশ্চাতে মহাদেব দেশাই। আমরা অপেক্ষা করছি বাইরে। চারিদিকে সব নীরব, নিস্তব্ধ ও নিশ্চল। কেবল মাঝে মাঝে প্রহরীর সে দুর্গ-প্রাচীরের এদিকে ও দিকে গমনাগমনে সে গুমোটের সাময়িক বিরতি ঘটেছে। মিনিট-মুহূর্ত ঘণ্টায় এসে পড়ল তবুও গান্ধীজীর ফেরবার কোনই লক্ষণ নেই। বাইরে অপেক্ষমান যেমন আমরা তেমনি শরৎ বসু, সুপারিডেন্ট ও অপর রাজ-কর্মচারীরা।

হঠাৎ জেলের দ্বারদেশ সরব হয়ে উঠল। জয়ধ্বনি শোনা গেল, আমরা উৎকর্ণ হলাম। সশস্ত্র প্রহরীরা আবার বন্দুকের ওপর হাত রেখে সুপারিডেন্টের দিকে তাকিয়ে আছে। একাধিক প্রবেশ দ্বার, একটির পর একটি অর্গলমুক্ত হচ্ছে আর গান্ধীজী অগ্রসর হচ্ছেন। বাইরে তিনি এসে পড়েছেন, কিন্তু মহাদেব সাথে নেই।

প্রথম দ্বার তাঁর বের হবার আগেই আবার বন্ধ করাতে মহাদেব বের হতে পারেননি। জেল সুপারিন্টেণ্ডেন্টের মুখ আরক্ত হল—তাকে কি আটকে রাখল বন্দীরা? সঙ্গীন-লাগানো বন্দুক উঁচিয়ে প্রহরী সমন্বিত হয়ে সুপার আবার জেল গেট খুলতে আদেশ দিলেন। দেখা গেল তার-কাঁটা দিয়ে বানানো দ্বিতীয় গেটের ওপারে দাড়িয়ে রয়েছেন মহাদেব এবং তার চারিপাশে সেই সব "ডাকাতেরা" যাদের আটকে রাখবার জন্য এত কড়াকড়ি ব্যবস্থা। মহাদেবের সেই দশা দেখে আমরা হেসে উঠেছিলাম, সাহেব-সুপারের মুখও আরক্তিম হয়ে উঠেছিল।

গান্ধীজী বাঙলা দেশ ছাড়বার প্রাক্‌কালে ইঙ্গিত করে গেলেন যে রাজবন্দীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করবার সুযোগ পেয়েছেন। তারা সকলেই—সন্ত্রাসবাদ যে কোন প্রকারেই কার্যকরী নয় তা তাঁকে জানিয়েছেন।

গান্ধীজী আশা করেছিলেন যে ফজলুল হক-মন্ত্রীসভা রাজবন্দীদের মুক্ত করবেন। এই আশা-পোষণ তাঁর পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। কারণ তিনি নিজে বন্দীদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে এ ধারণা সহজেই করতে পেরেছিলেন যে সন্ত্রাসবাদ রোমানটিসিজিমে তাঁদের আর আস্থা ছিল না। তাঁর আশা অপূর্ণই থাকল। তবে একসঙ্গে ১২০০ রাজবন্দী সেদিন মুক্তি পেয়েছিল কেবল এই পুণ্যশ্লোক মহাপুরুষের অক্লান্ত প্রচেষ্টায়।

সেদিন কেন "আস্তাবল" পরিষ্কার হ'ল না তার কারণগুলো সেদিনের এবং পরের দিনের ফজলুলের, নাজেমুদ্দিনের, সাহেব সিভিলিয়ানদের ও পুলিস কর্মচারীদের বক্তব্য ও কর্মকাণ্ড থেকে ধরতে পারা যেত। ফজলুল যে রাজবন্দীদের মুক্তি দিতে ইচ্ছুক ছিলেন তা অকপটে বিধানসভায় একাধিকবার প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন। নাজেমুদ্দিন পোলিটিক্যাল রাজবন্দীদের যে অন্য কোন বন্দীদের থেকে বৈশিষ্ট্য আছে—এখনও তিনি সেই মত

পোষণ করেন কিনা তা' জানতে ইচ্ছে হয়– তা স্বীকার করতেন না। আর সাহেব সিভিলিয়ান ও পুলিস কর্মচারীরা যেমন সেদিন তেমনি পরে যুদ্ধ শুরু হলে আরও দৃঢ়তার সঙ্গে রাজবন্দী মুক্তির বিরোধিতা করে আসছিলেন।

নাজেমুদ্দিন-সুরাবর্দী ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও একচল্লিশে ফজলুল হককে মুখ্যমন্ত্রীর গদীতে রাখতে হয়েছিল স্যার জন হারবার্টকে। তখন পোর্টার, পিনেল, কার্টার, স্টুয়ার্টের রাজত্ব প্রায় এসে পড়েছে।

বিয়াল্লিসের কংগ্রেসী "কুইট ইণ্ডিয়া" আন্দোলন শুরু হলে বাঙলা দেশের জেলগুলো আবার ভর্তি হতে লাগল। রাজবন্দীদের সংখ্যা হয়ে পড়ল প্রায় তিন হাজার। ফজলুল তখন কেবল মুখ্যমন্ত্রী নন, তিনি হোম মিনিস্টারও। আন্দোলনে ভাঁটা পড়াতে এইসব সিকিউরিটি বন্দীদের মুক্তি দেবার জন্য বিধান সভায় প্রায়ই দাবী উঠত। ফজলুলের বাকরোধ হয়ে পড়েছে তখন। নোয়াখালিতে সৈন্যরা মেয়েদের ওপর অত্যাচার করেছে অভিযোগ এসেছে ফজলুলের কাছে। ফজলুল সেখানে যাবেন ঠিক করেছেন। লাট সাহেব হারবার্ট থেকে চট্টগ্রামের কমিশনার, নোয়াখালির ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত সকলেই তার প্রতিবন্ধক। যে বাঙালী মুসলমান ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট সে অভিযোগ এনেছিল তাকে সরাসরি বদলি করা হ'ল। ফজলুল তবুও উপস্থিত হলেন নোয়াখালিতে, স্টেশনে মোতায়েন দেখলেন সব রকম ছোট বড় অফিসারদের। তাদের প্রত্যেকের মুখে একই কথা : আপনার যাওয়া হবে না।

এ ভদ্রভাবে বিরোধিতা করা অগ্রাহ্য করলে মুখ্যমন্ত্রীকে জোর করেই ট্রেনে পুরে কলকাতায় ফেরৎ পাঠাতো কিনা কে জানে!

আর মেদিনীপুর! সেখানে যা ঘটেছিল তার আভাস দিয়েছিলেন সেদিন ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। হায় নিয়ামত খাঁ (N. M. Khan) আজ তুমি এত নিশ্চেষ্ট কেন? ল ও অর্ডার

মান্য করাতে তোমার ছড়ি ও হুকুম কি পশ্চিম, কি পূবের পাকিস্তানে কেন জোরদার আজ হয় না!

ফজলুল মেদিনীপুরেও ছুটেছিলেন কিন্তু একই বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁকে। পয়তাল্লিশে যখন গান্ধীজীর সঙ্গে মেদিনীপুরের পল্লী অঞ্চলে গিয়েছিলাম তখনও সেখানে সেই প্রকৃতি-প্রদত্ত ও মনুষ্য-সৃষ্ট হাহাকার নীরব হয়নি।

বিয়াল্লিশের বিধান সভায় রাজবন্দীদের মুক্তির প্রশ্নে শেরে-ই-বঙ্গাল-এর ভাষার দৃঢ়তা আর ছিল না। ফজলুলের মুখে হঠাৎ নতুন কথা শোনা গেল: I am advised that the disclosure of information will be against public interest. I have nothing further to say. কংগ্রেসী পক্ষ থেকে ব্যঙ্গ করে মন্তব্য করা হ'ল: ফজলুল হকের মুখে লাগাম পড়েছে!

লাগামই বটে! যে ফজলুল ত্রিশের কোঠায় কংগ্রেসী বিদ্রূপের সামনে দাঁড়িয়ে বলতেন: Bengal Ministers are not puppets সেই ফজলুলকে I am advised বলতে হ'ল বিয়াল্লিশে!

বেশীদিন সে অবস্থা থাকল না। জাপানীরা বার্মা দখল করে ভারতবর্ষের দিকে ধাবমান। কে জানে মালয়, সিঙ্গাপুরে বার্মায় যা ঘটেছে, বাঙলায় তা ঘটবে না? দাও বাঙালীকে দিশেহারা করে। সে কাজ ফজলুলের দ্বারা করান অসম্ভব। অতএব সরাও ফজলুলকে, আনো নাজেমুদ্দিন-সুরাবর্দী-সাহবুদ্দীনকে। ষড়যন্ত্র শুরু হ'ল। পূর্বেকার ষড়যন্ত্র সার্থক হয়নি বাঙালী হিন্দুর অনিচ্ছাহেতু। এবার সে অনিচ্ছা আর নেই। তুলসী গোস্বামী, বরদা পাইন, তারক মুখার্জী এবং নরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্তী পশ্চাতে থাকলেন। স্যার বিজয়প্রসাদ তো ঝোলে ঝালে অম্বলে বরাবরই থাকতেন। তিনিও এলেন। ইউরোপীয় সমর্থন তো নাজেমুদ্দিন পাবেনই, পেলেনও।

নাজেমুদ্দিন মুখ্যমন্ত্রী ও হোম-মিনিস্টার। নতুন মন্ত্রীসভা। সভা ঠিক করলে রাজবন্দীদের "আস্তাবল" পুরোপুরি পরিষ্কার করা হবে। তখনও জেলে প্রায় ২৫০০ সিকিউরিটি বন্দী।

"জেল ডেলিভারী" যা ফজলুল করতে পারেননি তা' নাজেমুদ্দিন করবেন। এ অঘটন-ঘটন অপ্রত্যাশিত। কিন্তু নাজেমুদ্দিন করবেনই। দিন ক্ষণ কাগজ-পত্র সব ঠিক-ঠাক করা হয়েছে। নাজেমুদ্দিন কয়েকদিনের জন্য ছুটিতে গেছেন। বিজয়প্রসাদ হোম-মিনিস্টারগিরি করছেন। মহাসাগরের ওপার থেকে সুভাষ বসুর গলার আওয়াজ বাতাসে ভেসে আসছে। পোর্টার বিজয়প্রসাদের সুখ-নিদ্রায় ব্যাঘাত না ঘটিয়ে সরাসরি হারবার্টের কাছে কাগজ-পত্র পেশ করে সে মুক্তি-দান স্থগিত রাখতে উপদেশ দিলেন। পোর্টারের কথামত কাজ হ'ল। বন্দী-মুক্তি হ'ল না। সেদিন বিধানসভায় নলিনাক্ষ সান্যাল এ রহস্য ফাঁস করে দিয়েছিলেন। কেবল অফিসারটির নাম করেন নি। সে অফিসারটি ছিলেন পোর্টার।

সেই তেতাল্লিশের বন্দীমুক্তি বহুলাংশে ঘটল ছেচল্লিশে যখন সুরাবর্দী মুখ্যমন্ত্রী। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের জন্য দণ্ড-প্রাপ্ত রাজবন্দীরা মুক্তি পেল। তবুও যেন রেশ থেকে গেল।

দেশ স্বাধীন হ'ল কিন্তু রাজবন্দীদের "জেল ডেলিভারী" হ'ল না। ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ বা ডাঃ বিধান রায়ের আমলে বরং উত্তরোত্তর বেড়েই চলল।

সাম্প্রতিক কালে প্রফুল্ল সেনের আমলেই সত্যি-সত্যি সে "ডেলিভারী" সাময়িক ভাবে ঘটেছিল।

তবু "কিন্তু" থেকে গিয়েছিল। আজ পূবের বুড়ী-গঙ্গার পারে বসে এক বাঙালী ভাগীরথী-গঙ্গার তীরবর্তী অপর বাঙালীর উদ্দেশে গান ধরেছে—

তোমার হ'ল সারা,
আমার হ'ল শুরু।

সেই একই মর্মবেদনা, সেই একই কাহিনী, সেই একই ধরণে রক্তক্ষরণ এবং সেই একই দুঃস্বপ্নে দিশেহারা বাঙালী।

স্বদেশী যুগের আরম্ভ হতে যখন অরবিন্দ ঘোষ, সত্যেন বসু, কানাইলাল, অশ্বিনী দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতিরা দেশের ও দশের ডাকে সাড়া দিতে রাজবন্দী হয়েছিলেন তখন থেকে এই দীর্ঘ অর্ধ-শতাব্দ ধরে যেমন হিন্দু-বাঙালীকে রাজরোষানলে পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে, বুড়ী-গঙ্গার তীরবর্তী মুসলমান-বাঙালী তা' থেকে কি করে পরিত্রাণ চাইতে পারে? এ বিধাতৃনির্দিষ্ট পথ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিধানসভার বিবর্তন

স্যার জন অ্যানডারসন পুরানো বিধানসভার শেষ অধিবেশন বর্তমান এসেমব্লী হাউসে বসলে, এক অভিভাষণ দেন। স্যার সামুয়েল হোর যে উদ্দেশ্য নিয়ে কম্যুনাল এওয়ার্ড প্রস্তুত করেছিলেন, অ্যানডারসনের বক্তব্য সেই একই উদ্দেশ্যে দেওয়া হলেও উভয়ের বক্তৃতার ধরণ ছিল ভিন্ন। অ্যানডারসন স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন ১৯২০-২৪ সালের কথা—যখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব নিয়ে বাঙলার রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। ১৯২০ সাল থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত, অ্যানডারসন বলেছিলেন, বাঙলার ও ভারতবর্ষের শাসন-ব্যবস্থায় যে সব বিধি-ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছে তার সমস্তটাই সেই একটি লোকের দৃষ্টিভঙ্গী ও কার্যকলাপের প্রতিক্রিয়া। পরিশেষে চিত্তরঞ্জন দাশের কাছ থেকে—অ্যানডারসন অনুমান করেছিলেন—নতুন ইঙ্গিত দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তখন তিনি পরলোকে। যে নতুন শাসন ব্যবস্থা চালু হল ১৯৩৭ সালে তাতে অ্যানডারসন আশা করেছিলেন, চিত্তরঞ্জন দাশের সেই নতুন ইঙ্গিত রূপায়িত হবে।

এ ছিল সরকারী ভাষ্য সরকারী ভাবেই দেওয়া। নতুন শাসন ব্যবস্থা নতুন ধ্যান-ধারণা নিয়েই রচিত হয়েছিল। কম্যুনাল এওয়ার্ড যে ডামাডোল নিনাদে ঘোষিত হ'ল সামুয়েল হোরের ভাষ্য সহ তা কে না লক্ষ্য করেছিল সেদিন! কিন্তু চিত্তরঞ্জন দাশ যে পরিপ্রেক্ষিতে এবং যে রাজকীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ডায়ার্কি ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছিলেন তার পুনরাবৃত্তি যে '৩৭ সালে সম্পূর্ণভাবে অবাস্তব স্বপ্নে পরিণত হবে, তা' সেদিনের বাঙলা দেশের মধ্যবিত্ত হিন্দু নেতারা বুঝতে পারেননি। যে বাধা সেদিন

ইংরেজ শাসকেরা বাঙলা দেশের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে গড়ে তুললেন তার প্রতি-বাধা না গড়ে যাতে সে বাধা আরও দৃঢ় হয় তার জন্য সব কিছু জ্ঞাতে ও অজ্ঞাতে করে ফেললেন।

অপর পক্ষে মুসলিম লীগ বিজয়ী আবুল কাশেম ফজলুল হকের দৃষ্টি সেদিন ছিল অভ্রান্ত। ইতিহাস নতুন পথে পা বাড়িয়েছে তা তিনি ধরতে পেরেছিলেন। বাঙলার লেজিসলেটিভ কাউনসিলে (১৯৩৩ সালে) বেঙ্গল লোকাল সেল্‌ফ্‌-গভর্ণমেণ্ট সংশোধনী বিলএ মিউনিসিপ্যালিটিগুলোতে যুক্ত নির্বাচন (joint electorate with reservation of seats for minorities) ব্যবস্থা করা হ'ল যখন তখন সবে সামুয়েল হোরের কম্যুনাল এওয়ার্ডের সহায়তায় নতুন সাম্প্রদায়িক ভিত্তি রচিত হতে চলেছে। ফজলুল হক এই যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা কাউনসিলের বক্তৃতায় শুধু সাগ্রহে সমর্থন জানিয়েই ক্ষান্ত হননি সঙ্গে সঙ্গে এও জানিয়েছিলেন যেখানে বাঙালী-হিন্দু সংখ্যালঘু সেখানে বাঙালী-মুসলমান তাকে দেবে সম্যক প্রতিনিধি পাঠাবার সুযোগ। অবশ্য এ ব্যবস্থায় নতুনত্ব কিছুই ছিল না। চিত্তরঞ্জন দাশ স্যার আবদার রহিমের বাড়িতে বসে জনাব আবদুল করিম (স্বনামখ্যাত অবসরপ্রাপ্ত ইনস্পেক্টর অফ স্কুল্‌স্) রচিত ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদের আশিস প্রাপ্ত যে "বেঙ্গল প্যাক্ট" গ্রহণ করেছিলেন তাতেও এ ব্যবস্থা ছিল। ইংরেজ ভারতীয় রাজনীতি নিয়ে ভবিষ্যতে যে নতুন করে জল-ঘোলা করবে সে আশঙ্কা করেই তা নিরসনের আশায় সেই প্যাক্টের প্রয়োজন চিত্তরঞ্জন বুঝতে পেরেছিলেন।

লোকাল বোর্ড প্রভৃতিতে এ প্রকারের যুক্ত নির্বাচন দাবী সেদিন পৃথক-নির্বাচনে বিশ্বাসী সাধারণ বাঙালী-মুসলমানের কাছে আপত্তিকরই ছিল। মনে হয় ফজলুল কেবল বাঙলা দেশের ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে সে নীতি সমর্থন করেছিলেন। এ বিষয়ে সেদিন তাঁকে আর একজন বাঙালী মুসলমান সমর্থন করেছিলেন। তিনি

হলেন সৈয়দ নৌসের আলি। নৌসের কেবল একটি প্রতিশ্রুতি চেয়েছিলেন যে কোথায়ও কোন প্রকারেই সংখ্যাগরিষ্ঠকে সংখ্যা-লঘুতে পরিণত করা হবে না। যখন নতুন শাসন ব্যবস্থার জন্য নতুন আসন (Constituency) সীমায়িত করবার প্রশ্ন কাউনসিলে উঠল তখন নৌসের আরও পরিষ্কার ভাষায় বলেছিলেন যে, মুসলমান সংখ্যা-গরিষ্ঠদের পৃথক নির্বাচন দাবীটাই সমর্থনযোগ্য নয়, এতে তাদের দুর্বলতাই ধরা পড়ে।

অপর পক্ষে কলকাতার বাসিন্দা ও পশ্চিমা অ-বাঙালীদের সুহৃদ সুরাবর্দী সেদিন ফজলুলের সেই যুক্ত নির্বাচন সমর্থন দাবী সমালোচনা করাতে প্রফেসর জিতেন্দ্রলাল ব্যানার্জী চুটকী কেটে বলেছিলেনঃ ভাগ্যিস ফজলুল হাউসে নেই, তাই এ আলোচনা করতে সাহসী হলে!

অতীতের বেঙ্গল প্যাক্ট ও ফজলুলের মিউনিসিপ্যাল প্রতিষ্ঠানে যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থায় সমর্থন থাকলেও সে সবই চাপা পড়ে রইল। সামুয়েল হোরের নতুন বিধান, কম্যুনাল এওয়ার্ড, সুকৌশলে লোক-চক্ষুর সামনে আনা হ'ল। ভারতবর্ষের সংখ্যালঘু মুসলমান প্রদেশগুলো থেকে খাল কেটে বেনো জলে বাঙলার মাটি সিঞ্চিত করা হতে থাকল।

হিন্দুর বিশেষ করে বাঙালী-হিন্দুর সামুয়েল ঘোষিত এওয়ার্ডের বিরুদ্ধাচরণ লোপ করবার জন্য জিন্না সাহেব চোদ্দ দফা দাবী পেশ করলেন। সেগুলো আজ বিশেষ অধ্যয়নের বিষয়; কারণ সেগুলোই হ'ল পাকিস্তানের গোড়ার কথা। এওয়ার্ডের বিরুদ্ধাচরণ করা চলবে না, বন্দেমাতরমের লেজ কাটলেও চলবে না, একে একদম বিসর্জন দিতে হবে, গোহত্যা বন্ধ করা চলবে না, মসজিদের সামনে বাজনা বাজানো চলবে না, কংগ্রেসী ফ্লাগ উঠিয়ে দিতে হবে ইত্যাদি, ইত্যাদি। শেষ পর্যন্ত এইগুলোই হ'ল দেশ বিভাগের বড় বড় যুক্তি।

সামুয়েল হোরের দেওয়া সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের ওপর ভিত্তি করে নির্বাচনেও যখন ফজলুল একাধিক মুসলমান আসন থেকে নির্বাচিত হলেন তখন সাধারণ বাঙালী মুসলমানেরা বেশ খুশী, বাঙালী হিন্দু সে জয়ে অংশীদার হতে পারল না। চব্বিশের নির্বাচন হতে সাঁইত্রিশের নির্বাচনের পার্থক্য থাকল ঐখানে। চিত্তরঞ্জন দাশ যখন কাউনসিলে এলেন তখন তাঁর পশ্চাতে ছিল ২৫ জন বাঙালী হিন্দু ও ২০ জন বাঙালী মুসলমান স্বরাজিষ্ট। সাঁইত্রিশের নির্বাচনের ধারা সম্পূর্ণ অন্য রকমের হয়ে পড়ল। ইংরেজী ডিপ্লোমাসীর নতুন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবার জন্য প্রয়োজন ছিল অন্য স্ট্রাটেজীর, যে স্ট্রাটেজী সেদিন বাঙলার নেতৃত্ব দেখাতে পারেননি।

জলঘোলা ত করবেই ইংরেজ। এত অতি স্বাভাবিক। চব্বিশে কি সে চেষ্টা হয়নি? সেদিন একাজ কলকাতাতেই হয়েছিল। ইউরোপীয়ানদের নেতা হিসেবে লর্ড লিটন নিজে এ কাজ করেছিলেন। গোপিনাথ সাহার টেগার্ট ভ্রমে ডে-সাহেবকে গুলি-মারায় সেদিন, সেই অস্বাভাবিক পরিপ্রেক্ষিতেও, চিত্তরঞ্জন দাশ কাউন্সিলে বাঘা বাঘা সরকারী সদস্যদের যেমন করে নিরস্ত করে আপন কাজ হাসিল করেছিলেন সাঁইত্রিশের কাউন্সিলে সে চেষ্টা আদৌ সম্ভবপর হ'ল না। ইংরেজ যে নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করল তাতে চব্বিশের ট্যাকটিক্স ব্যবহার করে কেবল আগুনে ঘি ঢালার মত কাজ করাই হল।

নতুন ভবিষ্যৎ কি রূপ নেবে ফজলুল তা ধরতে পেরেছিলেন গোড়া থেকেই। সেজন্য সচেষ্টও হয়েছিলেন নতুন ভিত্তি-স্থাপনা করতে। পারেননি। একজন উৎসাহী বাঙালী মুসলমান সেদিন ফজলুলকে প্রশ্ন করেছিলেন: মুসলমান-গরিষ্ঠ বাঙলা দেশে আবার "মুসলিম রাজত্ব" এসে পড়লে তার কেমন রূপ হবে? ফজলুলের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়নি, তিনি সে প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন: বাঙলায় মুসলিম

রাজত্ব হবে না, হিন্দু রাজত্বও হবে না। যেমন বর্তমানে তেমনি নতুন শাসন ব্যবস্থাতেও সেই ইংরেজ রাজত্বই কায়েম থাকবে।

নতুন বিধান সভার সদস্যদের নির্বাচনে হরেক রকমের শ্রেণী বিন্যাস করা হয়েছিল যার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যাতে কোন প্রকারেই বাঙলা দেশে চব্বিশের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না হয়।

ফজলুলের কৃষক-প্রজা পাটি জয়ী হ'ল ৪৪টি আসনে, মুসলিম লীগও পেল প্রায় সমান সংখ্যক আসন। বাকী মুসলমানেরা হয় ইণ্ডেপেণ্ডেণ্ট অথবা উপদলে যুক্ত। কংগ্রেস ৪৮টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৪৩টি সাধারণ আসন, তেরটি তপশীলি আসনের মধ্যে সাতটি এবং পাঁচটি শ্রমিক আসন—মোট ৫৪টি আসন পেল।

কোয়ালিসন (ফজলুলের কৃষক-প্রজা ও মুসলিম লীগ নিয়ে গঠিত), কংগ্রেস ও ইউরোপীয়ান দলের নায়ক হলেন যথাক্রমে ফজলুল হক, শরৎ বসু ও সার জর্জ ক্যাম্বেল। স্বতন্ত্র কৃষক-প্রজার নেতৃত্ব করতেন সামসুদ্দিন আহমদ (কুষ্ঠিয়ার) ও আবু হোসেন সরকার, হুইপ ছিলেন নবাবজাদা হাসান আলি (ময়মনসিং)। স্বতন্ত্র প্রজা দলের নেতা ছিলেন তমিজুদ্দীন খান (ফরিদপুর)। কৃষক-মজদুর দল বলে একটি উপদল কিছুদিন অস্তিত্ব রেখেছিল যার নেতৃত্ব করতেন নীহারেন্দু দত্তমজুমদার। উলেমা দল বলে একটি দল ছিল যার বক্তব্য পেশ করতেন ডাঃ সানাউল্লা (চট্টগ্রাম)। স্বতন্ত্র ন্যাশান্যালিস্টদলের নায়ক ছিলেন যতীন্দ্রনাথ বসু (ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এই দলে বসতেন)। এ ছাড়াও "জমিদার বেঞ্চ"। "লেবর বেঞ্চ" প্রভৃতি ছিল।

স্পীকার নির্বাচনে কংগ্রেসী নেতৃত্ব করলেন দ্বিতীয় "হিমালয়ান" ভুল। তিনজন প্রার্থী দাড়ালেন। প্রথম কোয়ালিসন ও ইউ-রোপীয়ানদের সমর্থিত খান বাহাদুর (পরে স্যার) আজিজুল হক। দ্বিতীয় প্রার্থী হলেন কুমার শিবশেখশ্বরের রায়, যিনি মণ্টেগু চেমসফোর্ড শাসন-ব্যবস্থায় প্রথম প্রেসিডেণ্ট মনোনীত হয়েছিলেন

এবং হাউস থেকে স্বরাজীদের একবার তাড়িয়ে দিয়ে লর্ড লিটনের প্রশংসাও অর্জন করেছিলেন। একে সমর্থন করতে রাজী হলেন শরৎ বসুর কংগ্রেস এবং তৃতীয় প্রার্থী হলেন তমিজুদ্দীন খাঁ, যিনি অতীতে ননকোঅপারেসন আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন ও জেলেও গেয়েছিলেন। তাকে সমর্থন করতে রাজী হ'ল স্বতন্ত্র কৃষক প্রজা পার্টির সদস্যেরা।

তমিজুদ্দীনকে সমর্থন করবার জন্য শরৎ বসুকে কংগ্রেসী সদস্যদের অনেকেই এবং স্বতন্ত্র কৃষক প্রজাদের আবু হোসেন প্রভৃতি অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু সে অনুরোধ শরৎ বাবু রাখেননি। কংগ্রেসী স্ট্রাটেজী ঐ পথে যেতে দেখে সবচেয়ে খুশী হয়েছিলেন সেদিন নলিনী বাবু।

হাউসে তিনটি প্রার্থী নিয়েই ভোটাভুটি হ'ল। আজিজুল পেলেন ১১৬, শিবশেখর ৮৩ এবং তমিজুদ্দীন পেলেন ৪২টি ভোট। আজিজুলের সমর্থক কোয়ালিসন পার্টি ও সাহেবরা, শিবশেখরের সমর্থক কংগ্রেসী ও ন্যাশান্যালিস্টরা এবং তমিজুদ্দীনের সমর্থক কৃষক প্রজাপার্টি! তমিজুদ্দীনের নাম বাতিল হয়ে যাবার পর আবার ভোট গ্রহণ করলে দেখা গেল শিবশেখর পূর্বাপেক্ষা একটি কম ভোট পেয়েছেন আর আজিজুল পেয়েছেন পূর্বের সবগুলো আর স্বতন্ত্র কৃষক প্রজার ৪২টি ভোট।

যদি কংগ্রেসীরা তমিজুদ্দীনকে সমর্থন করতেন সেদিন তা হলে আজিজুল পেতেন ১১৬টি আর তমিজুদ্দীন পেতেন ১২৫টি ভোট। কোয়ালিসন পার্টিসহ ইউরোপীয়ানদের হার মেনে নিতে হ'ত প্রথমেই এবং তার প্রতিক্রিয়াও হ'ত প্রচণ্ড। কংগ্রেসীরা—চিত্তরঞ্জন দাশ যে সব নজীর রেখে গিয়েছিলেন তা বাতিল করে এবং কোয়ালিসন দল যাতে সংঘবদ্ধ হতে পারেন তার জন্য যা করণীয় সবই করেছিলেন।

অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে উল্লেখযোগ্য যে পরিণামে যখন

প্রথম মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আসে (আটত্রিশের বাজেট অধিবেশনান্তে), তখন হাউসে যে ভোটাভুটি হয়েছিল তাতে কোয়ালিসন পেয়েছিলেন ১৩৮টি আর বিরোধী পক্ষ ৯৩টি ভোট। সরকারী পক্ষে তখন ছিলেন ৮২জন সদস্য, ইউরোপীয়ানরা ২৩জন সিডিউলড ন'জন, মন্ত্রীরা ১০, হিন্দু স্বতন্ত্র বারজন এবং দুজন এ্যাংলোইণ্ডিয়ান। বিরোধী পক্ষে ছিল কংগ্রেসী ৫৩ (সিডিউলডের হেম নস্কর তখন বিরোধী দলে এসে পড়েছেন) কৃষক-প্রজাদের ১৪, তমিজুদ্দীনের প্রজাপার্টি ১৫, (নৌসের আলি তখন সেদিকে এসে গেছেন)। ন্যাশন্যালিস্ট হিন্দুদের ৫জন, ভারতীয় খ্রীস্টান দুজন, লেবর দুজন, চা বাগান শ্রমিক একজন ও এ্যাংলোইণ্ডিয়ান একজন। তিনজন মুসলমান সদস্য হাউসে থাকলেও কোন দলেই ভোট দেননি।

সেই অনাস্থা প্রস্তাব হাউসে আসবার পরই এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে ইউরোপীয় দলের ভোটের উপর কোয়ালিসন দলের মন্ত্রিত্বের ভবিষ্যৎ বিশেষভাবে নির্ভর করছে। স্যার স্যামুয়েল হোর হয়ত এই আশা করেই বলেছিলেন : it will be extremely difficult for them, (the Congress) to get a majority in a province like Bengal. ইউরোপীয়ানরাও বুঝতে পারল কেমন করে পিঠে ভাগ করতে হবে। পাটমূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে যে অর্ডিন্যান্স ফজলুল সরকার জারী করবার ছ'মাসের মধ্যেই প্রত্যাহার করলেন তারও গোপন ইতিহাস এই সমর্থনের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে। বাঙলা দেশের শাসনের পেছনে বে-সরকারী ইংরেজের আবির্ভাব শুরু হ'ল সেদিন থেকেই।

স্পীকার হয়ে আজিজুল হাউসে কোন্ দল কোথায় বসবে তার নির্দেশ দেন। স্পীকারের আসনের ডাইনের তিনটা ব্লকে মন্ত্রীরা ও কোয়ালিসন পার্টি-মেম্বারেরা বসলেন। তার পরের ব্লকে স্থান করে দিলেন ন্যাশন্যালিস্ট এবং সিডিউলডদের। পরের ব্লকে ইউরোপীয়ানরা

বসত। পরের ব্লকে স্বতন্ত্রকৃষক-প্রজা এবং প্রজা পার্টি এবং তার পরের দুটো ব্লক কংগ্রেসীদের জন্য থাকল। স্পীকারের আসনের ডাইনের ব্লকের সম্মুখের প্রথম দুটি আসনে বসতেন ফজলুল হক ও নলিনী সরকার। বামের দ্বিতীয় ব্লকের প্রথম তিনটি আসনে বসতেন শরৎ বসু, কিরণশঙ্কর রায় ও সন্তোষ বসু। এর পরের ব্লকের সামনে বসতেন তমিজুদ্দীন, সামসুদ্দীন, আবু হোসেন এবং জালালুদ্দীন হাসেমী। সাহেবদের বাঁয়ের ব্লকের সামনে বসতেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। কোয়ালিসন ব্লক তিনটির সামনে যা'রা বসতেন তাদের মধ্যে ছিলেন আবুল হোসেন (বর্ধমান) ও আবদুল বারি (বহরমপুর), ফজলুর রহমন (ঢাকা)।

আজও এই দীর্ঘকাল অন্তে সেই অবিভক্ত বাঙলার বিধান সভার দৃশ্য মানসপটে গাঁথা রয়েছে। কা'কে বাদ দিয়ে কা'র নাম করব! বহরমপুরের আবদুল বারি আজ পরলোকে। উদীয়মান উকিল কোয়ালিসনের প্রধান স্পোকসম্যান। অমায়িক বাঙালী। কোয়ালিসন নিয়ে বাঙালী মুসলমান সদস্যদের মনান্তর ও মতান্তর হয়ে গেছে। প্রতিক্রিয়া পড়েছে এবং পড়ছে বাঙালী মুসলমান সমাজের স্তরে স্তরে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে যেখানে মুসলমান সংখ্যালঘু তাদের পক্ষে নতুন ব্যবস্থার সঙ্গে সাম্যরক্ষা কঠিন হয়ে পড়াতে তারও প্রতিক্রিয়া এসে পড়েছে বাঙলা দেশে।

টেন্‌সন চূড়ান্ত, জিন্নার দাবী উঠন্ত, মুসলমান বিভ্রান্ত, হিন্দু দিগ্‌ভ্রান্ত এবং ইংরেজ নিশ্চিন্ত। কেবল সাধারণ হিন্দু-মুসলমান নয়, সাধারণ মুসলমান-মুসলমানেও বাদ-প্রতিবাদ। লক্ষ্ণৌতে সিয়া-সুন্নি দ্বন্দ্ব হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্ব অপেক্ষা এতটুকুও কম ছিল না। সেখানকার স্যার ওয়াজির হোসেন জিন্নার মতলব দেখে ভেগে পড়লেন। আসলেন কলকাতায় ডাঃ রফিউদ্দীন আহমদ ও স্যার কাজী মইনুদ্দীন ফারুকীর আহ্বানে বাঙলা দেশের প্রাদেশিক লীগ কাউনসিলের বাৎসরিক অধিবেশনের সভাপতিত্ব করতে।

তাঁর সভা পণ্ড করে দিলেন সেদিনকার কর্পোরেশন মার্কেট-সুপারিটেন্ডেন্ট ও আজকের মুসলিম নেতা সৈয়দ বদরুদ্দুজা। তাঁর সাথী হলেন আবদার রহমান সিদ্দিকী ও এম এ ইস্পাহানী। বিধান সভায় অভিযোগ এল। উত্তরে সিদ্দিকী যে ভঙ্গীতে বাঙালী-মুসলমানের ইংরেজি কথাবার্তা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করলেন হাউসে—তা যদি সেই সাম্প্রদায়িক অশুভ মুহূর্তে না ঘটত তবে তার যে কি পরিণাম হ'ত আজ ধারণা করাও অসম্ভব।

বারি সেই প্রসঙ্গে বলেছিলেন: আমরা বাঙালী, কোনদিন আমরা কাউকে নেতা বানিয়ে বাইরে থেকে আমদানি করিনি। মুসলমানদের ও বাঙলা দেশের অবিসম্বাদী নেতা আবুল কাশেম ফজলুল হক। বারি তখনও বুঝতে পারেননি পায়ের তলার বাঙলা দেশের মাটি ধ্বসে যাচ্ছে।

ওয়াজির হোসেন কলকাতায় পাত্তা পেলেন না বটে কিন্তু ইস্পাহানী সিদ্দিকীরা মুসলমানের বাঙালীত্ব ধুয়ে মুছে পশ্চিমা করে ফেলতে প্রস্তুত হয়ে পড়েছে তখন।

বর্ধমানের আবুল হাসেম লীগের পার্লামেন্টারী দলের সেক্রেটারী। নির্ভেজাল যুক্তিবাদী বাঙালী। পোশাক ও পরিচ্ছদ বা ভাষার ব্যবহারে অথবা ভাবের প্রকাশে বাঙালী হিন্দু ও বাঙালী মুসলমানের মধ্যে সাধারণ অবস্থায় যে বিভেদটুকু দেখতে পাওয়া যায় তাও রক্ষা করতেন না। দুই পুরুষ ধরে বাঙলা রাজনীতির সঙ্গে তার পরিবার যুক্ত এবং সে ঐতিহ্যের দাবী সেদিনকার বিধানসভায় তিনি ভিন্ন আর কে করতে পারতেন! মুসলিম লীগের প্রাদেশিক সেক্রেটারী, স্বয়ং জিন্না সাহেব পর্যন্ত অস্থির হয়ে উঠতেন তাঁর সমালোচনায় ও প্রশ্নে। সে সময় সারা হিন্দুস্তানের মুসলমান সমাজে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন না যে কায়েদে আজমের বক্তব্য তাঁরই উপস্থিতিতে প্রতিবাদ করবার হিম্মত রাখতেন।

পাকিস্তান কায়েম হবার পর হাসেম শেষবারের মত এসেমব্লী

হাউসে বেড়াতে এসেছিলেন। স্বাস্থ্যহীন, দৃষ্টি-শক্তি ক্ষীণ কিন্তু মানসিক বল অটুট। পুরানো যায়গা, তীর্থও বলা চলে; কারণ পাকিস্তান দাবীর বিধিসম্মত সমর্থন ত এই বাড়িতেই করা হয়েছিল, তাই অনুরাগ ভরে এসেছেন পুরানো মুখগুলো আর একবার দেখে যেতে। সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে বল্‌লেন : ঢাকায় যাচ্ছি; মনের অবস্থা কেমন জানেন ? শকুন্তলা পড়েছেন ? পতি-গৃহে চলেছেন শকুন্তলা আশ্রম থেকে, মনে হ'ল কে যেন তাঁর শাড়ী পেছন থেকে টানছে। মুখ ফেরাতে দেখলেন—হরিণ-শাবক। আমারও সেই অবস্থা। প্রতিটি স্মৃতিকণা আজ পশ্চাৎ থেকে আকর্ষণ করছে।

সে বক্তব্যে অনাগত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন অজানা সন্দেহ হাসেম স্থান দেননি। কেবল প্রাণভরে শ্রদ্ধা নৈবেদ্য নিবেদন করেছিলেন অতীতের প্রতি। বাঙালী ভিন্ন সেদিনকার বিধান সভায় আর কেউ কি ছিল যে হাসেমের সেই দরদী মন নিয়ে করতে পারত তেমন শ্রদ্ধা তর্পণ ? মুসলমান অ-বাঙালীদের চোখের ওপর তখন জ্বল জ্বল করে ভেসে উঠেছে পাটশিল্প, পাটকল ও পাট ব্যবসার ভবিষ্যৎ। পশ্চিম-বাঙলার বাউল আর পূব-বাঙলার ভাটিয়ালীর সুর সে পাট-কলের লৌহকপাট ভেদ করতে পারে নি কোনদিন।

ময়মনসিং-এর নবাবজাদা হাসান আলি বগুড়ার মহম্মদ আলির নিকট আত্মীয়। জমিদার মহম্মদ আলি মুসলিম লীগ সদস্য। হাসান আলিও জমিদার, কিন্তু বিরোধীপক্ষের কৃষক প্রজা পার্টির হুইপ। মহম্মদ আলি ইংরেজী অথবা উর্দুতে বাতচিত করতে উৎসুক। হাসান আলি বাঙলায়। হাসান আলি সুপুরুষ ও ভদ্র যুবক এবং মনে প্রাণে প্রজা-স্বার্থ সংরক্ষণে ব্যস্ত। সেদিনকার মানদণ্ডেও তাঁকে বামপন্থী বলা যেত।

আমাদের আলাপ পরিচয় হয় একটি বৃদ্ধ-শিশুর মাধ্যমে। তিনি হলেন শ্রদ্ধেয় হরেন্দ্রকুমার মুখার্জী। ডাঃ মুখার্জী এক ভোটাভুটী বা

বক্তৃতা দেবার দরকার না হলে এসেমব্লী লাইব্রেরীতে বসে পড়াশুনা করতেন। আলাপ পরিচয় প্রথমে সেখানেই শুরু হ'ল। ডাঃ মুখার্জীর সঙ্গে একবার পরিচয় হলে তার লোভনীয় সঙ্গ ছাড়া দুষ্কর ছিল।

সঙ্গ-পাবার লোভ ক্রমে দুর্বার হ'য়ে পড়ল। সে লোভে যখনই যেতাম লাইব্রেরীতে দেখা পেতাম তাঁর। এ আড্ডায় প্রায় অজ্ঞাতসারে এসে পড়লেন হাসান আলি।

ডাঃ মুখার্জী ডাক দিলেন ঃ আসুন নবাবজাদা, গল্প করি।

চেয়ারে নবাবজাদা এসে বসতেই বললেন ঃ দেখি, দুটো সিগারেট দিন ত?

হাসান আলি হেসে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ দুটো দিয়ে কি করবেন?

আমাকে দেখিয়ে বললেন ঃ একটা ওর জন্য।

হাসতেও পারি না, প্রতিবাদও করতে পারি না সেই "শিশুর" মন্তব্যে। খেতে হ'ল সিগারেট সেইদিন তাঁর সামনে। হাসান আলি হয়ে পড়লেন সে আড্ডার তৃতীয় মেম্বর। আর সংখ্যা বাড়েনি, বাড়তে দেননি। লাট সাহেব হয়েও সেদিনকার সে আড্ডার কথা ভোলেন নি, ডাঃ মুখার্জী। আর ভোলেন নি সেই টাঙ্গাইলের হাসান আলিকে।

একদিন হঠাৎ দমদমের এয়ার পোর্টে দেখা হ'ল নবাবজাদার সঙ্গে। আমি প্লেনে উঠতে যাচ্ছি—তিনি তাঁর প্লেনের জন্য অপেক্ষা করছেন। দেখলাম বাইরে একরকমই আছেন। সহাস্যে পরস্পরের মৌন সম্ভাষণ হ'ল মুহূর্তকালের জন্য।

আর দেখিনি তাঁকে।

নোয়াখালির হবিবুল্লা বাহার হলেন কবি ও সাহিত্যিক। সাধারণ বাঙালী অপেক্ষা দীর্ঘাঙ্গ, বলিষ্ঠ দেহ, বিরলকেশ ও আয়তচোখ। মন্ত্রীও হয়েছিলেন পূর্ববঙ্গে। কিরণশঙ্কর রায় যে পূর্বপাকিস্তানে যেতে রাজী হয়েছিলেন তার পশ্চাতের অন্যতম কারণ

ছিল বাহার এবং বাহারের মত আরও যুবক বাঙালী মুসলমানের জমাট অনুরোধ ও উপরোধ। ইউরোপীয়ান এসাইলাম লেনে কিরণ বাবুর ঢাকা যাত্রার পূর্ব মুহূর্তক্ষণ স্মরণ করলে এই বাহারের কথাই বারবার মনে পড়ে।—চলুন—আমরা ত আছি—বলেছিলেন বাহার। সে একান্ত নির্ভরযোগ্য আশ্বাস, এখনও মনে হয়, একমাত্র বাঙালী হিন্দু মুসলমান একে অপরকে দিতে সক্ষম ছিল সেদিন গোটা ভারতবর্ষে। সে স্বপ্ন ধুলিসাৎ হয়ে গেল। মর্ম্মবেদনায় বাহার দুরারোগ্য রোগে শয্যা গ্রহণ করলেন।

পূবের বাঙালদের শেষ ভোটাভুটি হাউসে হয়ে গেল, পশ্চিমের 'ঘটী'দের সে কর্তব্য সমাধা করতে হ'ল দোতলার লবীতে। ঘরপোড়া ও ঘরভাঙ্গা হ'ল বাঙালী। বুড়ো-খোকারা কেউ খুশী, কেউ বা অখুশী। বাহারকে পেলাম একান্তে। প্রশ্ন করলাম তাঁর ভবিষ্যৎ কবিতা সম্পর্কে। উদাসীন চিত্ত, জড়তা আবিষ্ট শুকনো মুখ ও উদ্দেশ্যহীন চাহনি। পাড়লাম ভাটিয়ালীর কথা। হদিস যেন ফিরে এল। সে ভাটিয়ালী গানের কলিগুলি পেয়েছিলাম প্রিয় বন্ধু ও শ্রদ্ধাস্পদ অমূল্য সেনগুপ্তের কাছে থেকে। বাহার অনুরোধ করলেন গানের কলিগুলো লিখে দিতে। স্বীকার করেছিলাম কিন্তু দিইনি, দিতে পারিনি, সে অবকাশ আর আসেনি। আজ দিচ্ছি—কার উদ্দেশ্যে তা জানিনে। কোন্ নাম-না-জানা বাঙালীর অমিয় হিয়া মন্থন করে সে কলিগুলো কায়া পেয়েছিল তাও জানি না। তবে তা শাশ্বত ও জাগ্রত, যাবৎ চন্দ্রদিবাকরৌ-র মত বাঙালী মনের স্বাক্ষর।

সেলাম চাচা
সেলাম তোমার পায়
বড় নৌকার মাঝি মোরে
বানাইছে আল্লায়।
কৈয়ো আমার চাচীর কাছে
দুঃখ আমার ঘুইচে গেছে,

গুণটানা মোর শেষ হইয়াছে
আমি বইসেছি পাছায় ॥

আবু হোসেন সরকার, ধীর, শান্ত ও রাজনীতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত। অনায়াসেই সেদিন "কেরিয়ার" বানাতে পারতেন যদি একটু রফা করতে রাজী হতেন। তা করেন নি, কারণ অতীতের ঐতিহ্য ছিল। নন্-কোঅপারেসন ও খেলাফৎ যুগে জেলের ভেতরটা দেখেছিলেন। হাউসে জেলের দফা আলোচনায় একবার বলেছিলেনঃ এমন একত্রীকরণের প্রতিষ্ঠান আর নেই!—এর স্বাদ বুঝল না জমিদার-বহুল ক্যাবিনেট! গোটা কোয়ালিসনে কেবল দুজন সদস্য, মৌলভী তমিজুদ্দীন খাঁ ও মৌলভী আহমদ হোসেন সে বিদ্যালয়ে ছাত্র হবার সৌভাগ্য পেয়েছিলেন। অপর পক্ষে কংগ্রেসী ও কৃষক প্রজা সদস্যের শতকরা ৯০ থেকে ৯৫ ভাগ জেল যে কি বস্তু তা ভাল ভাবেই জানেন বলেই এ আস্তাকুঁড় পরিষ্কার করতে ব্যগ্র।—দোহাই আপনাদের আর কিছু করুন বা না করুন জেলের হিন্দুস্তানী দারোয়ানগুলোকে সরিয়ে বাঙালী পত্তন করুন।

একবার হাউসে তামাকের উপর ধার্য ট্যাক্সের সার্থকতা নিয়ে বিতর্ক শুরু হলে আবু হোসেন বিশেষভাবে চঞ্চল ও বিরক্ত হয়ে পড়েছিলেন। মোদ্দা তিন লাখ টাকার মামলা এই নিয়ে কেন যে সরকারী মাথা ব্যথা এত তা তিনি বুঝতে পারলেন না।—বাঙালী কৃষকের কাছে হুঁকো যে কি প্রিয় বস্তু তা কি মুখ্যমন্ত্রী হক সাহেব জানেন না?—প্রশ্ন করেছিলেন আবু হোসেন। "পটুয়াখালির" রণপ্রাঙ্গণে কোন হাতিয়ার তাঁকে জয়ী করেছিল? নিজেই উত্তর দিলেন—ঐ নারকেলের খোলের হুঁকো।

সভায় প্রলয় হাস্যরোল উঠলে আবু হোসেন মন্তব্য শেষ করলেন এই অভিযোগ করে যে, মাসাধিককাল হাউসে উপস্থিত থেকে তাঁর ধারণা দিন দিন দৃঢ়ই হচ্ছে—এই নতুন শাসন ব্যবস্থার

মাধ্যমে একটা "নিখিলবঙ্গ লুটপাট সমিতি" কায়েম হতে চলেছে।

ফজলুল নিরুত্তর। আবু হোসেন এমন যায়গায় আঘাত করেছেন যেখানে ফজলুল সহজেই কাতর হয়ে পড়লেন এবং তাঁর পক্ষে দিলদরিয়া মেজাজ রক্ষা করা অসম্ভব হ'ল।

অথচ উত্তর দিতেই হবে। জবাবে স্বীকার করলেন পটুয়াখালিতে তাঁর নির্বাচনী চিহ্ন ছিল হুঁকো। তিনি চেয়েছিলেন লাঙ্গল—লাঙ্গলই অপর নির্বাচন ক্ষেত্রে তাঁর চিহ্ন ছিল—কিন্তু লটারীতে তার ভাগ্যে হুঁকো উঠল। এটাও সত্য, তিনি তামাকের ওপর কোন ট্যাক্স বসে তা পছন্দ করতেন না।

কিন্তু কি করব এ যে বদলতি দুনিয়া! যে কংগ্রেস পার্টির সঙ্গে আবু আঁতাত করেছেন তারা নির্বাচন ইস্তাহারে জানাল যে, শাসন ব্যবস্থা ধূলিসাৎ করবে। হাউসে ঢোকবার পর তাঁদের পক্ষ থেকে মহাত্মা গান্ধী জানালেন যে, এ ব্যবস্থা একেবারে পরিত্যাজ্য নয় এবং বর্তমানে তাঁরা মন্ত্রীত্ব নিয়ে বসেছেন অনেক স্থানে এবং অন্যান্য স্থানেও নেবার জন্য অস্থির। এ ক্ষেত্রে কোয়ালিসন পার্টির কেউ যদি নির্বাচনের সময় যা বলেছে তা হাউসে এসে রক্ষা করতে না পারে তবে কি খুব দোষের হয়?

ফজলুলের জবাব রাজনৈতিক গোছের হয়েছিল। আবু হোসেনের "চাপান" পাষাণ হয়েই থাকল। উঠলেন ফজলুল-সুহৃদ মোজাম্মেল হক। কবি ও অবসরপ্রাপ্ত স্কুল-ইন্সপেক্টর। বাঙলায় বক্তৃতা করতেন, সেজন্য সে বক্তৃতা কাউন্সিল দপ্তরে লিপিবদ্ধ থাকত না। থাকলে আঞ্চলিক বাঙলা ভাষার চৌহদ্দি দেখে আজকের আধুনিকেরা নিশ্চয়ই চমকাতেন। রংপুরের তামাক (আবু হোসেনের প্রতি ইঙ্গিত), বরিশালের নারকেলী খোল, সুন্দরবনের কাঠের নলচে, আর বাঙলার মাটির কল্কের উদ্দেশ্যে সে কবিতা ছিল উৎসর্গীকৃত। কবিতা পাঠান্তে সভাগৃহ হয়ে উঠল

মুখর। তামাকের ও হুঁকোর বন্দনা করতে সকলেই যেন ব্যস্ত।

হাস্য পরিহাসের মধ্যে চাপা পড়ল আবু হোসেনের আক্রমণ, ফজলুল হকের পাল্টা জবাব। কবির লড়াই শুরু হতে চলেছে যখন তখন স্পীকার আজিজুল ছেদ টেনে দিলেন।

নামাজের সময় উপস্থিত। হুঁকা বন্দনা আপাতত স্থগিত থাকল।

আর মনে পড়ে ত্রিপুরার অসিমুদ্দীন আহমদ সাহেবকে। কি কারণে বলতে পারি না সেদিনকার বাঙলার এই অঞ্চলটা হয়ে পড়েছিল বিশুদ্ধ প্রজা ও স্বদেশী আন্দোলনের ক্ষেত্র বিশেষ। উগ্র সাম্প্রদায়িকতার ঢেউও সেই আঞ্চলিক সামাজিক মনকে বিষিয়ে দিতে পারত না। এই প্রৌঢ় ভদ্রলোক কোনপ্রকার হীন ইঙ্গিত না করে আপন বক্তব্য সহজ ও সরল বাঙলায় ব্যক্ত করে অনেকেরই শ্রদ্ধা অর্জন করতেন। অবিভক্ত বাঙলার বিধানসভার কথা ভাবতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে এই বাঙালী ভদ্রলোকটির কথা। এমনটি হয়ত আর দেখা যাবে না!

রথীদের সংখ্যা ছিল অগুণতি। এদের প্রত্যেকেরই বৈশিষ্ট্য ছিল যা আক্রমণে ও প্রতি-আক্রমণে ফুটে উঠত। কেউ কেউ বা সম্পূর্ণরূপে ব্যাকগ্রাউণ্ড থেকে অস্ত্র চালনা পছন্দ করতেন। মুখর ছিলেন বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে ফজলুল রহমান (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত সদস্য এবং নিজেকে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করতেন), আব্দুল লতিফ বিশ্বাস (মানিকগঞ্জ), আব্দুল-আল মামুদ (সিরাজগঞ্জ), খান বাহাদুর আবদার রহমান (২৪ পরগণা), জসিমুদ্দীন আহম্মদ (ডায়মণ্ডহারবার), আফতাব আলি (লেবর ইউনিয়ন), ইদ্রিস আহমদ (মালদহ), ইউসুফ আলি চৌধুরী (মোহন মিয়া, ফরিদপুর), নদীয়ার ডাঃ মালেক।

প্রতি পক্ষের মধ্যে ছিলেন নলিনাক্ষ ও শশাঙ্ক সান্যাল,

হরিপদ চ্যাটার্জী, সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস (ফরিদপুর), ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (কুমিল্লা), সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র (রাজসাহী), চারুচন্দ্র রায় (মৈমনসিং), মন্মথ রায় (হাওড়া), কমলকৃষ্ণ রায় (বাকুড়া), নরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্তী (পাবনা), শ্যামাপ্রসাদ বর্মা (দিনাজপুর), রসিক বিশ্বাস (যশোর) ও বিরাট মণ্ডল (ফরিদপুর)।

এই উভয় গোষ্ঠী নিয়ে বিধানসভার নতুন বাঙালী-সমাজ পত্তন হতে চলেছিল। এতে সাহিত্যিক, কবি, সমালোচক, ভাবুক যেমন ছিলেন তেমনি ছিলেন অর্থনীতিজ্ঞ এবং সমাজতাত্ত্বিক। রাজনীতির আবর্তে পড়ে কেউ কেউ এদিক ওদিক ছিটকে পড়েছিলেন। নরেন চক্রবর্তী "বোস-আইট" থেকে হয়েছিলেন ঘোর "লীগ-আইট"। অতুল কুমারেরও অবস্থা তথৈবচ।

সেদিনকার বিধান সভা সময় সময়ে অত্যন্ত "মুডি" হয়ে পড়ত এবং আত্ম-সমালোচনায় প্রবৃত্ত হ'ত। শরৎ বসু হাউসের ক্রমবর্ধমান "টেনসন" লক্ষ্য করে আশঙ্কা প্রকাশ করায়, ফজলুলও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে বললেন: শরৎ বাবু এ অবস্থা নিরসনে যা' বলবেন তাই তিনি করবেন।

রাজসাহীতে ছেলেরা বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। ফজলুল শরৎ বসুকে সেখানে যেতে অনুরোধ করলেন একটা মিটমাট করে দেবার জন্য। শরৎবাবু সে অনুরোধ রক্ষা করলেন।

নলিনাক্ষের "পয়েন্ট অফ অর্ডারে" আজিজুল অস্থির। সে আত্ম-সমালোচনা কালে নলিনাক্ষ স্পীকার আজিজুলকে বললেন: আপনি যদি বিরক্ত বোধ করেন তবে আর কোন পয়েন্টই ওঠাব না।

উত্তরে আজিজুল জানালেন যে নলিনাক্ষের পয়েন্টে তিনি উপকৃতই হন, তবে তার পশ্চাতের মনোভাব যদি সেই মুহূর্তের মত দেখা যায় তবে তা কত সুখের হয়? প্রেসবক্স এ আত্মসমালোচনা-পর্বের মধ্যে খুঁজে পেত অনেক "কপি"।

আজকের বদরুদ্দুজার মাথাকাঁপানো, প্রতিশব্দবহুল ফাঁকা

আওয়াজ শুনে যদি কেউ মনে করেন সেদিনকার পল্লীবাঙলার মুসলমান সদস্যেরা ঐরূপ বক্তৃতাই দিতেন তবে ভুলই করবেন। তাঁদের বক্তৃতায় নিশ্চয়ই উত্তাপ থাকত, ঝাঁঝালো ও তীক্ষ্ণ নিশ্চয়ই হ'ত বক্তব্যগুলো কিন্তু তার পশ্চাতে থাকত তথ্য, ইতিহাস এবং সেজন্য সরাসরি সেগুলো অগ্রাহ্য বা অস্বীকার করা হ'ত কঠিন।

কেবল একটি নাম ইচ্ছে করেই এই লিস্টে এতক্ষণ যোগ করিনি। তিনি হলেন জালালুদ্দীন হাসেমী। সাতক্ষিরার বিখ্যাত সৈয়দ বংশজাত সন্তান ও মনে প্রাণে খাঁটী বাঙালী ছিলেন তিনি। সুন্দরবনের বাসিন্দা। বাঘের সঙ্গে লড়াই করে একটি পা হারিয়েছিলেন। অঙ্গহানি হলেও শারীরিক ও মানসিক বল তাঁর ছিল অটুট। কাঠের পা বগল দাবা করে তিনি উপস্থিত হতেন যেমন রাজদ্বারে তেমনি শ্মশানেও। পুঁথিগত বিদ্যার্জন বিশেষ করেন নি। নিজেই একবার স্বীকার করেছিলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা তিনি মাড়াননি, কিন্তু তৎসত্ত্বেও যেমন বাঙলায়, তেমনি ইংরেজীতে বক্তৃতা করতে পারতেন। অবিভক্ত বাঙলার বিধানসভার বিবরণীতে হাসেমীর বাক্য ও কার্য নিশ্চয়ই জুড়ে আছে প্রতিটি পৃষ্ঠাতে।

একটি ছোট গল্প বললেই হাসেমীর পরিচয় দেওয়া হবে। রেওয়াজ অনুযায়ী লাট সাহেব বা সাহেবা আজকের মতই সেদিনও বিধানসভা উদ্বোধন করতেন। দুই হাউসের সদস্যেরা আসন গ্রহণ করেছেন, স-পার্ষদ লাট সাহেব (বোধহয় ব্রাবোর্ন) শোভাযাত্রা করে সভাস্থলে প্রবেশ করে স্পাকারের মঞ্চ থেকে লিখিত ভাষণ সবে পড়তে যাবেন এমন সময় হাসেমী কাঠের পা'য়ের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে বললেন—on a point, Sir. কেই বা সে প্রশ্ন শুনবে কেই বা উত্তর দেবে? লাট সাহেব হতভম্ব, স্পীকার হা হতোস্মি গোছের, মন্ত্রীরা অস্থির, বিরোধী পক্ষের জাঁদরেলরা অবাক, আর সাংবাদিকেরা ভাল "কপির" আশায় উন্মুখ। হাসেমী তখনও অনুমতি অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে।

কয়েক সেকেণ্ড সে পরিস্থিতি চলবার পর স্পীকার বলে উঠলেন—after the address. পশ্চাতে ডেস্ক থেকে ইতিমধ্যে কোন সদস্য হাসেমীর খদ্দরের পাঞ্জাবী ও চাদর ধরে টান দেওয়ায় তাঁকে বসে পড়তে হ'ল। লাট সাহেব স্পীকারের টেবলে রাখা জলের গ্লাস থেকে এক ঢোক জল খেয়ে বক্তৃতা শুরু করলেন। সভার জ্বর ছাড়ল।

পরিণামে হাসেমী ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হন এবং কিছুদিন—যখন আজিজুল বিলেতে হাই কমিশনার হলেন এবং নৌসের তখনও স্পীকার নির্বাচিত হননি—একলাই সভার কার্য-পরিচালনা করেছিলেন। তখন "শ্যামা-হক" ক্যাবিনেট শেষ হয়ে নাজেমুদ্দিন-তারক মুখার্জী "নাজিপ্রতারক" ক্যাবিনেট এসে গেছে। সভার আবহাওয়া স্বভাবতই উত্তপ্ত। হাসেমী কিন্তু বেশ সুচারুরূপেই সভার কাজ পরিচালনা করতেন। তাপমাত্রা চরমে উঠতে আরম্ভ করেছে তখন। ফলে হাসেমীকে প্রায়ই রুলিং দিতে হ'ত শব্দ বিশেষ পার্লামেণ্টারী বা অ-পার্লামেণ্টারী ব্যাখ্যা করে।

হাসেমী ডেপুটি স্পীকার থাকা-কালেই সদস্যদের স্পীকারের আসনের দিকে "চড়োয়া" হতে প্রথম দেখা যায়। বেশ মনে আছে ৪২এর সেই দৃশ্য, হাসেমী ডেপুটি স্পীকার। ডান দিক থেকে ছুটে এসেছেন মোহন মিয়া (ফরিদপুর) এবং মহম্মদ আলি (বগুড়া) আর বা'দিক থেকে নলিনাক্ষ ও হরিপদ চ্যাটার্জী কি হয় কি হয়? রিপোর্টারেরা তাদের খোয়াড়ে বসে প্রমাদ গুনছেন। হাসেমী কিন্তু সে দৃশ্যে একটুও ঘাবড়ান নি। বেশ তিরস্কার করলেন উভয় পক্ষকে এবং হাউস "এডজোরন" করে কাঠের পা ঠক ঠক করে ফেলে বাইরে চলে গেলেন।

বাঙলার বিধানসভার যে আবহাওয়া এমন কি শ্যামা-হক মিনিস্ট্রির প্রথম দিকটা পর্যন্ত বজায় ছিল তা' আর টিকতে পারল না আভ্যন্তরীণ কারণগুলোর জন্যই। কি কংগ্রেস, কি মুসলিম লীগ, কি কৃষক প্রজা সকলেই সেই '৪২ সাল থেকে এমন এক সমস্যার

সামনে এসে দাঁড়িয়েছে যাতে বাঙলার রাজনীতি ঘোলাটে না হয়ে থাকতেই পারে না। বিধানসভায় সেই আভ্যন্তরীণ অবস্থার প্রতিফলন পরিস্ফুট। '৪৪ সালে যখন নৌসের আলি স্পীকার তখন আবার সদস্যেরা স্পীকারের আসনের দিকে ধাববান হন। এই দিনই হরিপদ চ্যাটার্জী "মেস" (গদা) কাঁধে করে ভেগে পড়েন। নলিনাক্ষ আসনের সামনের টেবলের উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুরু করেন।

বাঙলা-বিধান-সভায় যে মেস-গদা এখনও অতি সমারোহের সঙ্গে স্পীকারের সভাকক্ষে প্রবেশ কালে দেখান হয় তার পশ্চাতে কিন্তু কোন আইন-সঙ্গত কারণ নেই। এটি নিছক লোকাচার মাত্র; এবং এর পত্তন করেন ১৯৩৪ সালে সন্তোষের রাজা মন্মথ যখন তিনি স্পীকার হলেন। রাজা সাহেব ছিলেন সেকেলে লিবারেল এবং স্যার সুরেন্দ্রনাথের সাকরেদ। বিলিতি আদপকায়দায় বিশ্বাসী। স্পীকার হয়ে তিনি ঠিক করলেন বিলেতের হাউস অফ কমনসে স্পীকারকে সভাকক্ষে যেমন "মেস" নিয়ে শোভাযাত্রা করে আনা হয়, কলকাতাতেও তাই করা হবে—তাতে কোন বিধিসম্মত কারণ থাকুক আর নাই থাকুক। তিনি তাঁর মনোবাসনা ব্যক্ত করলেন সদস্যদের কাছে। সদস্যরাও চাঁদা করে টাকা তুলে রাজা সাহেবের মনবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। পূর্বে এ "মেসে" ব্রিটিশ সিংহের মুখ ছিল এখন অশোক-সিংহের। অন্যান্য লোকাচারের মত এটিও বর্তমানের বিধানসভার রেওয়াজে দাঁড়িয়েছে। বিলেতের স্পীকারের আগমন বার্তা কনেস্টবল উচ্চৈস্বরে হাঁক দিয়ে জানান দেয়, আর এখানে বাঙালীর হাতে পড়ে সে অনুষ্ঠান হাউসের সেক্রেটারীর অতি ক্ষীণ কণ্ঠে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

বাঙলার বিধানসভার আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে যা লক্ষ্য এড়ায় না। অন্যান্য অনেক প্রদেশের মত, বিশেষ করে লোক-সভার মত বা বিলেতের পার্লামেন্টের মত এখানে কোনদিন

"মার্শাল" নিযুক্ত করতে হয়নি। কিন্তু তাই বলে কেউ যেন মনে না করেন যে বাঙলা দেশের বিধানসভার সদস্যেরা অতীতে কেবল সুবোধ গোপালের দল ছিলেন। প্রথম স্পীকার (তখন প্রেসিডেণ্ট বলা হ'ত) স্যার সৈয়দ সামসুল হুদার কথা বলতে পারব না (তবে বেশ আন্দাজ করতে পারি), কিন্তু দ্বিতীয় স্পীকার স্যার ইভান কটন যখন মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন ব্যবস্থাধীনে বিধানসভার স্পীকার (প্রেসিডেণ্ট) নিযুক্ত হলেন তাঁকেও বেশ অস্বস্তি ভোগ করতে হয়েছিল।

স্বরাজিস্ট যুগ। চিত্তরঞ্জন দাশ দলপতি। দুই স্বরাজী সদস্য, নুরুল হক চৌধুরী (উকীল, চট্টগ্রাম) ও এ. সি ব্যানার্জী (ব্যারিস্টার, মধ্য কলকাতা) কথায় কথায় কটন সাহেবের মেজাজ রুষ্ট করতে বদ্ধপরিকর থাকতেন। কটন তেড়ে উঠতেন, বসতে বলতেন, সভাগৃহ ছেড়ে যেতে বলতেন তাঁদের। একদা চিত্তরঞ্জন দাশকেও কটনের আচরণের প্রতিবাদ করতে হয়েছিল। এই কটন সাহেব প্রেসিডেণ্ট থাকাকালেই চিত্তরঞ্জন দাশ এবং সুরেন্দ্রনাথ গত হন। উভয়ের প্রতিই কটন শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। উভয়ই তাঁর সভাপতিত্ব কালে বাঙলার বিধানসভার সদস্য ছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাশকে কটন রোমান-সেনেটর বলে অভিহিত করেছিলেন।

বাঙলা দেশের বিধানসভার প্রথম মনোনীত স্বদেশী প্রেসিডেণ্ট হলেন কুমার শিবশেখরেশ্বর রায়। তখন স্বরাজীদের দাপট চলেছে হাউসে। দলপতি যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত (১৯২৬ সাল)।

সম্প্রদায়ের লোক সংখ্যানুপাতে বিধান সভায় প্রতিনিধিত্ব দাবী স্বীকৃত হোক, এই বিষয় নিয়ে হাউসে একদিন প্রস্তাব এল। স্যার আবদার রহিম, এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের মেম্বার, সংশোধনী প্রস্তাব দিলেন যে, এই সংখ্যা নিরূপণ ব্যাপারে সংখ্যাগরিস্টদের ও স্বার্থবান্ ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিত্বের দাবী যথাযথ ভাবে বিবেচনা করা হবে। মনে রাখতে হবে, সেই ছাব্বিশ সাল থেকেই বাঙলার সরকারী মহল

পঁয়ত্রিশের শাসন ব্যবস্থায় সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ কি ছকে ফেলা হবে তার তোড়জোড় করেছিলেন। আবদার রহিম সেই সংশোধনী প্রস্তাবের নোটিশ লেজিসলেটিভ ডিপার্টমেণ্টেকে দিতে একটু দেরী করলেও স্পীকার (প্রেসিডেণ্ট) শিবশেখর নিয়ম অমান্য করেই তাঁকে অনুমতি দিয়েছিলেন।

—কেন অন্যায়ভাবে এই অনুমতি দিলেন?—প্রশ্ন করলেন নুরুল হক ও ব্যানার্জী।

শিবশেখরের মুখে উত্তর নেই। সুযোগ পেয়ে উভয়ই তাঁকে শুনিয়ে দিলেন যে প্রেসিডেণ্ট সরকারী চাকর নন।

শিবশেখর চটে আগুন হয়ে তাদের মন্তব্যগুলো প্রত্যাহার করতে আদেশ দিলেন। কিন্তু উভয়েই সে হুকুম মানতে গররাজী। উভয়কেই হাউস পরিত্যাগ করতে হুকুম করলেন শিবশেখর। গোটা সভায় হৈ হৈ, রৈ রৈ শুরু হল। যতীন্দ্রমোহন প্রতিবাদ করতে উঠলেন। শিবশেখর তাঁকেও সভাগৃহ থেকে চলে যেতে আদেশ করলেন। সব স্বরাজী ও ন্যাশানালিস্টরা একসঙ্গে "ওয়াক আউট" করলেন।

শিবশেখরের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা ঠিক হল। একটার পর একটা ধাক্কা খেয়ে ও চিত্তরঞ্জন দাশ পরলোক-গত হবার পর লর্ড লিটন দেখলেন স্বরাজীদের ভাল ভাবে শিক্ষা দেবার সুযোগ এসেছে এবার। তিনি গোপনে শিবশেখরকে নরম হ'তে নিষেধ করে বিধানসভার প্রতিটি সদস্যের কাছে স্পীকারকে সমর্থন করবার জন্য নিজে তদ্বির করতে লাগলেন। সে যুগে, বিশেষ করে লর্ড লিটন একাজ প্রায় প্রকাশ্যভাবেই করতেন—না করে উপায়ও ছিল না, কারণ বাঙলাদেশেই কেবল স্বরাজীরা ডায়ার্কী ভাঙতে সক্ষম হয়েছিলেন। লিটনের মুখ-রক্ষা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে তখন।

অবস্থা বেগতিক এবং লাট সাহেবকে তদ্বির করতে দেখে গোপনে গোপনে স্বরাজীরা একটা আপসের চেষ্টাও করেছিলেন। শিবশেখর সে আপস রক্ষা করতে তখন অসমর্থ।

অনাস্থা প্রস্তাব অবশেষে হাউসে এল কিন্তু তা পাস হ'ল না। লর্ড লিটনের তদ্বিরে স্বরাজীরা শিক্ষা পেল। বিধান সভায় মার্শাল নিযুক্ত না থাকলেও মার্শালের করণীয় কাজ আপনা থেকেই সদস্যেরা মেনে চলত। শিবশেখর সে নজীর সৃষ্টি করলেন, যে নজীর আজিজুল তাঁর আমলে কেবল একবারই মাত্র ব্যবহার করেছিলেন।

স্বরাজীদের সঙ্গে ঝগড়া করতে রাজী হওয়াতে লর্ড লিটনের আদরের পাত্র হয়ে পড়লেন শিবশেখর। তাঁকে মন্ত্রী করলেন। সন্তোষের রাজা তখন তাঁর পদে প্রেসিডেন্ট হলেন। আজকের মত সেদিনও, আজ যিনি স্পীকার কাল তিনি মন্ত্রী হবেন এ নজীর ছিল।

স্পীকার হিসেবে যদিও নৌসের আলির রুলিং-এর ঐতিহাসিকত্ব বিরাট তবুও হাউসে আজিজুলকে প্রতি নিয়ত যে ঝক্কী সহ্য করতে হ'ত এমনটি আর কাউকে করতে হয়নি। একমাত্র আজিজুলই স্পীকারের দপ্তর গড়ে তোলেন। আজিজুলের রুচি ছিল উন্নত, দৃষ্টি ছিল সুদূর প্রসারী। এবং সর্বরকমে লেজিসলেটিভ বিভাগটিকে কার্যকারী করে তুলতে আগ্রহী ছিলেন। মুসলিম লীগের প্রতিনিধি হয়ে হাউসে আসেননি তিনি এবং সে জন্যেই তাঁর স্থান ফজলুলী ক্যাবিনেটে হয়নি। কিন্তু এটি শাপে বর হ'ল ডিপার্টমেন্টের কাছে। দপ্তর গড়ে পিটে তুলেছিলেন তিনিই।

শিবশেখর ছিলেন সরকারী মনোনীতদের সমর্থিত প্রার্থী, সন্তোষের রাজাও তাই। আজিজুলই হলেন হাউসের প্রথম নির্বাচিত স্পীকার। সেদিনকার সাংবাদিকেরা জানতেন আজিজুল হাউসের নিয়ম-রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর। একবার হোম ডিপার্টমেণ্ট থেকে নাজেমুদ্দিন একটি বিল পাঠালেন তাঁর কাছে। তখন ২০ দিন সময় দিতে হ'ত ডিপার্টমেন্টকে বিলটি বিবেচনা করে দেখবার জন্য—আজ সে কাজ রাতারাতি হলেও চলে—আজিজুল দেখলেন বিল আনবার ১৮ দিন ব্যবধান আছে—too short a notice মন্তব্য করে আজিজুল সে সরকারী বিল ফেরৎ দিয়েছিলেন।

সেদিনের হাউসের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যা ভোলবার নয়। সাম্প্রদায়িকতার তীব্রতা বাইরে বেশ প্রকট। হাউসেও বিশেষ বিষয় নিয়ে আলোচনায় সময় সময়ে যে তীব্রতা বোধ হ'ত না এমন নয়। কিন্তু এ নিয়ে ব্যক্তিগত আক্রমণের রেশ হাউসের বা বাইরের লবীতে টানতে কেউ চাইতেন না। ব্যক্তিগত সম্পর্ক অনেকটা কোর্টের বাদী ও প্রতিবাদী পক্ষের উকীলদের মত ছিল। অপর পক্ষে যে ব্যক্তিগত আক্রমণের নমুনা মাঝে মাঝে মিলত তা দেখা যেত হিন্দু-হিন্দুকে নিয়ে, মুসলমান-মুসলমানকে নিয়ে। কদাচিৎ এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটত।

নোয়াখালির এক কৃষক-সদস্য একদিন নবাব পরিবারের সেলিমকে লাথি মারতে উদ্যত হয়েছিলেন। পরিবারের প্রায় আধ ডজন মেম্বার বিধানসভায় ছিলেন। এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ও সুচতুর ছিলেন নাজেমুদ্দিনের "ভাইজান" সাহবুদ্দিন। নাজেমুদ্দিন যখন প্রধানমন্ত্রীর পদ পেলেন তখন সাহবুদ্দিনই হয়ে পড়লেন সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। তার পরই ছিলেন এই সেলিম। ইনি ঢাকা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। এর নামে অনেক কুৎসা শোনা যেত সেদিন। সে কুৎসা সে অঞ্চলের হিন্দুরা ত বটেই, এমনকি অনেক মুসলমান সদস্যরাও করতেন। ঢাকার প্রতিটি হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার নাকি কলকাঠি ছিলেন এই সেলিম।

নবাব হবিবুল্লা বাহাদুর ছিলেন যেমন দীর্ঘকায় সুপুরুষ, তেমনি ভদ্র। মন্ত্রী পদ গ্রহণ করলেও তাঁর স্বকীয় ঐতিহ্য হেতু তিনি সাহবুদ্দিনের সমপর্যায়ে কোনদিনই নামেন নি। আদিতে ও মাতৃভাষার দিক থেকে অ-বাঙালী হলেও বাঙলা দেশ সম্পর্কে তাঁর উচ্চ ধারণা ছিল বলেই ইস্পাহানীরা তাঁর কাছে ঘেঁসতে পারতেন না।

অন্যদিকে এক বারেন্দ্র-হিন্দু সভায় অপর এক বারেন্দ্র-হিন্দুকে

এমনি ইতর ভাষায় কুৎসিত ইঙ্গিত করেছিলেন একদিন যার তুলনা শিক্ষিত মহল ত দূরের কথা, বাজারেও শোনা যায় না।

এইসব রথী-মহারথী এবং মনসব্‌দারদের অধিনায়কত্বের ভার থাকত আবুল কাশেম ফজলুল হক ও শরৎচন্দ্র বসুর ওপর। বিধান সভার বাইরে ও ভেতরে বসুদের অবদান বিরাট। একদম নিখাদ সোনা বললেও হয়। বাঙলার আত্ম-সম্মান বা ইংরেজী দুষমনত্ব নিয়ে যেখানে যে প্রশ্ন এসেছে সেখানে বসু ভ্রাতারা হিমালয় সদৃশ প্রহরী ছিলেন। কিন্তু স্বর্ণ ধাতু নিখাদ হলেও তা যেমন ব্যবহারোপযোগী হয় না বসুদের কর্মধারাও হয়ে পড়েছিল তেমনি। ত্রিশের-বাঙলা যে বিশের-বাঙলা ছিল না, এটুকু তাঁরা সঠিক ধরতে পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ।

চিত্তরঞ্জন দাশের ঐতিহ্যের একমাত্র ধারক ও বাহক তাঁরাই ছিলেন। কিন্তু চিত্তরঞ্জন দাশের স্ট্র্যাটেজি যে বসু-রা আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন তা মনে হয় না।

সুভাষ বসুর দৃষ্টি সেদিন বিধান সভায় পড়ে থাকত কেবল রাজবন্দীদের মুক্তি সমস্যার ওপর। হোম মেম্বর ছিলেন মোবারলি, অপেক্ষাকৃত ভদ্রলোক। মোবারলি স্টিফেনসনের মত জাঁদরেল বা প্রেন্টিসের মত সুচতুর সিভিলিয়ান ছিলেন না। সুভাষের প্রশ্নে কোণঠেসা হলে প্রেন্টিস যেমন ঠাট্টা বিদ্রূপের প্রশ্রয় দিয়ে আত্মরক্ষা করতেন, মোবারলি তা' করতেন না। উত্তর দিতে অসমর্থ হলে বা ইচ্ছে না থাকলে প্রায়ই বলতেন: এসব ভাষ্যের ইঙ্গিত ধরতে পারছি না।

সাঁইত্রিশের বিধান সভায় শরৎ বসু হলেন পার্টি নায়ক। ধীর, গম্ভীর ও শান্ত অবস্থাতেই তিনি বিতর্কে যোগদান করতেন। এমনকি হাউস যখন জমাট ভাবে আত্মসংযম হারিয়েছে, ফজলুল হকও উঁচু পর্দায় গলার স্বর উঠিয়েছেন তখনও শরৎ বসুকে আত্মস্থ থাকতে দেখেছি। ঝড়ের পর অনেকবার দেখেছি ফজলুলকে শরৎবাবুর বেঞ্চে বসে আলাপ আলোচনা করতে। হাউসের এই সব

টুকরো টুকরো "ডকুমেণ্টারী ফিল্ম"-গুলো রক্ষিত হয়নি। হ'লে আজ যখন দুজনেই পরলোকে তখন তাদের ব্যক্তিগত সম্বন্ধ ঝড় ঝাপটার মধ্যে বা পরে কি ছিল তা ধরা যেত।

বসু-রা মনে করতেন অ-বাঙালী মুসলমানদের সঙ্গে আঁতাত সম্ভব। সেইজন্যেই কর্পোরেশনে ইস্পাহানীর দৌত্যে সুভাষ বসু সাড়া দিয়েছিলেন এবং সিদ্দিকী মেয়র হলেন। সিদ্দিকী একদা ডাঃ আন্সারীর শিষ্য ছিলেন ও তাঁরই প্রেরণায় কামাল আতাতুর্কের সাহায্যার্থে প্রেরিত ভারতীয় ডেলিগেসনের সদস্য হয়েছিলেন। ছত্রিশে তিনি লীগ-পন্থী হয়ে পড়েন।

একদা বিধান সভায় ভোট সঠিকভাবে নেবার জন্য স্পীকার আজিজুল হক নির্দেশ দেন যে, প্রতিটি মেম্বারকে আসন থেকে দাঁড়িয়ে "মোশন" সম্পর্কে সম্মতি বা অসম্মতি জানাতে হবে। বিধান সভার সদস্যদের প্রতি এরূপ আদেশ অপমানকর বলে প্রতিবাদ করলেন সিদ্দিকী। আজিজুল তাঁকে বিধানসভা থেকে চলে যেতে হুকুম করলেন। ভোট নেবার পর শরৎ বাবুই স্পীকারকে অনুরোধ করলেন সিদ্দিকীর প্রতি তাঁর নির্দেশ পুনর্বিবেচনা করবার জন্য। আজিজুল শরৎ বসুর অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন। শরৎবাবুর বিরোধী-পক্ষের নেতৃত্বে একদেশদর্শী দৃষ্টি ছিল না।

নাটকীয় ঘটনার প্রাচুর্য্যের দিক থেকে বিচার করলে ফজলুলী যুগের বিধান সভা অতীতের চিত্তরঞ্জনের যুগের বা বর্তমানের বিধান সভা অপেক্ষা ঢের বেশি চিত্তাকর্ষক ও দৃশ্য-বহুল ছিল। অবস্থাটা অনেকটা গোয়ালের মত দেখাত। একই বাথানে ২৫০ এঁড়ে বাছুর ও ষাঁড় রাখলে যে দৃশ্য দেখা যায়, প্রেস-গ্যালারী থেকে বিধানসভা প্রায় তদ্রূপ হয়ে পড়েছিল। সিম্বোলিকভাবে বলছি যে, গুঁতোগুতি ও তর্কাতর্কি লেগেই থাকত, কিন্তু মজার কথা—ইস্পাহানীদের দ্বারা সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেওয়া সত্ত্বেও সে ঝগড়া-ঝাঁটির রেশ দিনান্তে কেউ টানতেন না।

সে ঝগড়া-ঝাঁটির রূপও ছিল "ফিউডাল"-যুগের "ডুয়েলের" মত, তাতে শক্তি পরীক্ষা হ'ত ; ক্যাপিট্যালিষ্টিক যুগের নোংরামী কদাচিৎ দেখা যেত। আজকাল যেখানে জুতো ছোঁড়াছুঁড়ি বা মাইকের মুখ ভেঙ্গে প্রতিপক্ষকে লক্ষ্য করে আঘাত করতে দেখা যায়, অতীতে সে অবস্থায় প্রতিপক্ষের সদস্যকেই ছলে-বলে-কৌশলে চুরি করা হ'ত।

এ সদস্য-চুরি সেদিনকার নৈমিত্তিক রেওয়াজ ছিল। এ রেওয়াজ আমদানি করেছিলেন চিত্তরঞ্জন-যুগে নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় এবং ফলে ফুলে বিকশিত হয়ে পড়ল ফজলুলী যুগে। ভোট দেওয়া যে পোলিটিক্যাল অধিকার, সে ধারণা প্রাক্-চিত্তরঞ্জন-যুগে প্রকটভাবে দেখা দেয়নি। কারণ তখন বেশ এক ভাগ মনোনীত সদস্য নিয়ে বিধানসভা গঠিত হত। ভোটের সাহায্যে যে সব কিছু অনায়াসেই বানচাল করে দেওয়া সম্ভবপর সে ধারণা বদ্ধমূল হল চিত্তরঞ্জন-যুগে।

ফলে যেমন নিজ পক্ষের সব সদস্যকে হাজির করা কর্তব্য কর্ম, তেমনি প্রতিপক্ষের সদস্যের হাউসে গর-হাজির করানোও জরুরি করণীয় হয়ে পড়ল। সত্যাগ্রহ, ঘুষ প্রভৃতি পোলিটিক্যাল "ডাক্তারী" দাওয়াই-যোগে এ গর-হাজির সম্ভবপর না হলে সরাসরি চুরি করবার ব্যবস্থা অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়াল।

চিত্তরঞ্জন যুগের এই ধারা ফজলুলী-যুগে বেগবতী হবার কারণ ছিল দুটি। একটি হ'ল পোলিটিক্যাল পার্টি-ফরমেশন তখনও সমাপ্ত হয় নি, অনেক স্বতন্ত্র বা উপদলে বিভক্ত সদস্যেরা হাউসে আসতেন এবং প্রধানতঃ এদের নিয়েই বড় দুটি দলের মান-অভিমানের পালা অভিনীত হ'ত। দ্বিতীয় কারণ হ'ল কংগ্রেসী হুইপরূপে নলিনীবাবু যে ব্যবস্থা চালু করেছিলেন পূর্বে, ফজলুলী যুগে মন্ত্রী হয়ে তা অব্যাহত রাখতে হ'ল কোয়ালিসনের তরফ থেকে।

দু' দলেই সমানভাবে সদস্য চুরি করতে আগ্রহী ছিলেন। বড় বড় ভোটাভুটির সময় অথবা অনাস্থা প্রকাশের সময় এ চুরি প্রায়

পুকুর চুরির মত হয়ে দাঁড়াত। প্রায় সকলেই জানতেন—অন্ততঃ প্রেস গ্যালারীর সকলেই—কা'কে কা'কে নিয়ে লীলা খেলা শুরু হয়েছে। এদের যে জামাই আদরে রাখা হ'ত তার সবিস্তার বর্ণনা দেওয়া আজ সম্ভবপর নয়; কারণ এপারে ওপারে এদেরই কেউ কেউ পলিটিক্স এখনও করছেন। সে যুগে ভোটাধিকার যে কি অমূল্য সামগ্রী হয়ে দাঁড়িয়েছিল বিধান সভার এইসব সদস্যদের কাছে তার সম্যক ধারণা এখনও করা যায়! চর্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় ত' ছিলই, রজত-কাঞ্চনও দেওয়া হ'ত, তা' ছাড়া অনেক কিছু ভোগ্য দ্রব্য জুটত।

আটত্রিশ সালে বাজেট আলোচনান্তে প্রথম অনাস্থা প্রস্তাব বিরোধী পক্ষ থেকে আনা হ'ল। স্পীকার আজিজুল দিন ঠিক কর্‌লেন আর তোড়জোড় শুরু হ'ল সেই থেকে। উভয় দলের লক্ষ্য পড়ে রইলো ঐ স্বতন্ত্র ও উপদলের সদস্যদের ওপর। দু দলেরই ঘটকেরা আনাগোনা শুরু করেছে, দর উঠ্‌ছে।

নলিনীবাবু এক্সপার্ট। কাগজ-কলম এবং মনে মনে সংখ্যা গুণে তিনি বলে দিলেন কংগ্রেসীরা ১৬ বা ১৭ ভোটে হারবে। তাঁর কথা সত্যে পরিণত হ'ল। কিন্তু ইতিমধ্যে দু পক্ষ থেকে ২০,০০০ টাকা এসপার-ওসপার হয়ে গেছে।

শ্রেণীবিন্যাসে এ ভাগ্যবানদের মধ্যে কাষ্ট হিন্দু, সিডিউলড হিন্দু, মুসলমান জোতদার, ট্রেড ইউনিয়ন লিডার, মৌলবী সাহেব প্রভৃতি হরেক রকমের জীব দেখতে পাওয়া যেত। এঁদের দিবা-রাত্র পাহারায় রাখতে হ'ত এবং সময় সময় দেখা যেত একই সদস্য উভয় পক্ষের দান গ্রহণ করে ফেলেছেন। তাঁর গৃহ-দ্বারে দু-পক্ষেরই গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে।

অনাস্থা প্রস্তাব এল (দোসরা আগস্ট তারিখে)। প্রথমেই আফতাব আলি (লেবর লিডার) সুরাবর্দীর বিরুদ্ধে আনীত মোশন পড়লেন। ৮২ জন সদস্য দাঁড়িয়ে সে মোশন সমর্থন করতে তা হাউসে আলোচনার জন্য গৃহীত হল। একই কায়দায় আবু হোসেন

আনলেন অনাস্থা প্রস্তাব ঢাকার নবাব হবিবুল্লা বাহাদুরের বিরুদ্ধে; ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জ্জী আনলেন স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহরায়ের বিরুদ্ধে। জে, এন, গুপ্ত (লেবর প্রতিনিধি) আনলেন নলিনীরঞ্জন সরকারের বিরুদ্ধে। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল আনলেন প্রসন্ন দেব রায়কতের বিরুদ্ধে। তমিজুদ্দীন খাঁ আনলেন নবাব মুসারফ হোসেনের বিরুদ্ধে, সামসুদ্দীন আহমদ আনলেন খাজা স্যার নাজেমুদ্দিনের বিরুদ্ধে। প্রমথরঞ্জন ঠাকুর (বর্ত্তমানে পি, আর ঠাকুর) আনলেন মুকুন্দবিহারী মল্লিকের বিরুদ্ধে এবং খুলনার আব্দুল হাকিম আনলেন স্বয়ং আবুল কাসেম ফজলুল হকের বিরুদ্ধে, সর্বশেষে মৈমনসিংএর ধনঞ্জয় রায় আনলেন মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দীর বিরুদ্ধে।

শেষের দুটো নাম প্রথমেই আমরা আশা করেছিলাম। তা' না আসাতে মনে হয়েছিল যে বিরোধী পক্ষ মন্ত্রীদের "বাছাই" করে, গোবেচারী ভদ্রলোক শ্রীশ নন্দীকে এবং খাতির করে ফজলুলকে রেহাই দিয়েছেন। হয়ত ফজলুলের মনেও সেই রকম একটা ধারণা এসে যাচ্ছিল। হাকিম যখন তাঁর নামে অনাস্থা প্রস্তাব পড়তে শুরু করেছেন তখন ফজলুল অবাক হয়ে বলে উঠলেন: হাকিম— তুমি!—যে স্বরে ও সুরে ফজলুল তাঁর মনোভাব প্রকাশ করলেন তাতে অভিনয়সুলভ ভাণ থাকা বিচিত্র ছিল না, তবে প্রকাশ-ভঙ্গীতে গোটা হাউসের অবরুদ্ধ আবহাওয়া হাল্কা পরিহাসে পরিবর্তিত হয়েছিল।

প্রায় সপ্তাহকাল পরে (৮ই আগষ্ট) অনাস্থা প্রস্তাবগুলো আলোচনার দিন ধার্য্য করলেন আজিজুল হক। তখন লবীতে গিয়ে ভোট রেকর্ড করা হ'ত। অতএব সময় যেত অনেকখানি। এ সময় অযথা অতিবাহিত হ'ত না, এমনকি হাউসের মধ্যেও এ পক্ষের ও পক্ষের ছোটবড় দূতেরা, স্বতন্ত্রেরা যেখানে যেখানে বসতেন সেদিকে ভিড় করে থাকতেন, একটু-আধটু টানা-হেঁচড়া যে না হ'ত এমন নয়। বুদ্ধিমান আজিজুল অন্যদিকে তাকিয়ে থাকতেন এবং কেউ দৃষ্টি

আকর্ষণ করলে হাওয়ার উপর তর্জন-গর্জন করে মেম্বরদের লবীতে যেতে আদেশ দিতেন। অনাস্থা প্রস্তাবের দিন যে ভিজিটরের ভীড় হবে সে আশঙ্কা করে নির্দেশ দিলেন যে প্রতিটি সদস্যের একটি করে ভিজিটরকে প্রবেশপত্র দেওয়ার অধিকার দেওয়া হবে।

কিন্তু ভিজিটরদের নিয়ে যে তাঁর বিশেষ চিন্তা তা নয়, তিনি চিন্তান্বিত হয়েছিলেন সদস্যদের নিয়ে। দু' দলই স্ট্রাটেজী গ্রহণ করতে সমান দক্ষ। হাউসে কেউ কিছু বেখাপ্পা না করে বসে। তাই তিনি নির্দেশ দিলেন কোয়ালিশন ডাইনের দরজা দিয়ে লবীতে ঢুকবে আর বিরোধী পক্ষ বাঁয়ের দরজা দিয়ে। লবীতে কোন দুর্ঘটনা না ঘটে তার জন্য গোরা সার্জেন্ট মোতায়েন রাখলেন।

এত তোড়জোড় বিধানসভার ইতিহাসে পূর্বে কোনদিনই হয়নি। চিত্তরঞ্জন যুগে এক তরফা ব্যবস্থা ছিল। অন্য তরফ কেবল পরিদর্শক ছিল, এবার সে তরফে স্বয়ং নলিনীরঞ্জন সরকারই কর্মকর্তা। অতএব ব্যবস্থায় কোন ত্রুটিই থাকবার কথা নয়। সে অনুমান প্রেস গ্যালারীতে বসে সকলেই করেছিলেন। বিরোধী পক্ষ একটু "নতুনত্ব" আমদানী অবশ্য করেছিল, কিন্তু তাতে কিছু হ'ল না। অনাস্থা প্রস্তাব আসবার আগের দিনে সে প্রস্তাবের বিরোধিতা করে কলকাতার রাস্তায়, বিশেষ করে পার্ক-সার্কাস এলাকায়, জনতার প্রসেসন্ বেরুল—একাজ এতকাল কেবল বিরোধী পক্ষেরই একচেটিয়া ছিল—তাতে বিরোধী পক্ষ শেষকালে হাউসে তাদের সদস্য নিয়ে উপস্থিত হতে পারবে কি না আশঙ্কা করলেন। অতএব স্পীকারের অনুমতি নিয়ে তাদের অনেকেই সন্ধ্যার দিকে হাউসে রাত্রিবাস করবার ব্যবস্থা করলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন জে. সি. গুপ্ত, তুলসী গোস্বামী, সামসুদ্দীন আহমদ প্রভৃতি। প্রভাতী সংবাদপত্রে সে সংবাদ পাঠকেরা গরম চা'এর সঙ্গে পড়ে যতটা আরাম পেলেন ততটা প্রতিক্রিয়া দেখা দিল না তাঁদের মধ্যে।

বিকেলে হাউস যথারীতি বসলে, সত্যি সত্যি দেখা গেল নলিনী-বাবুর স্ট্রাটেজী জয়যুক্ত হয়েছে, গণ্ডা-খানেক কংগ্রেসী সদস্য চুরি হয়ে গেছে রাতের অন্ধকারে। দুই তরফেরই দৈত্য উপদৈত্যেরা হাউসের গেটের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন যাতে "লেট লতিফের" দল আসা মাত্র চিলের মত ছোঁ মেরে সটান নিজেদের ব্লকে নিয়ে যেতে পারেন। উভয় পক্ষেরই সমান উৎকণ্ঠা।

এ যেন "পলাশী" যুদ্ধের মহড়া। হাউসে আসতে দেখা গেল একজন স্বতন্ত্র মুসলমান সদস্যকে। দু' দলকেই তাঁর দিকে ছুটতে দেখে গোরা সার্জেন্ট মাঝখানে পড়ে তাঁকে আগলে চেমবারের মধ্যে যখন ঢোকাবে তখন মহম্মদ আলি (বগুড়ার) সার্জেন্টকে বললেন: ওঁকে জিজ্ঞাসা কর কোনদিকে বসবেন? সদস্য হাতের ইঙ্গিতে বিরোধী পক্ষের ব্লক দেখালেন। সার্জেন্ট যখন সেদিকে তাঁকে নিয়ে যাবে তখন মহম্মদ আলি বাধা দিয়ে বললেন: ও আমাদের লোক, আমাদের ব্লকে বসবে।

সার্জেন্ট সেকথা শুনতে না চাওয়ায় দুজনের মধ্যে ঘুষোঘুষি বাধল। লবীতে হৈ হৈ। ওদিকে হাউস বসে গেছে। স্পীকার লোক পাঠিয়ে কোনোরকমে সাময়িক শান্তি আনলেন।

কংগ্রেসীরা যেমন হাউসে রাত্রিবাস করে একটু নতুনত্ব দেখালেন, নলিনীবাবু আরও একটু নতুনত্ব দেখালেন যা পূর্বে বা আজ পর্যন্ত আর কেউ দেখাতে পারেন নি। আবদার রহমান সিদ্দিকী মাতব্বর গোছের সদস্য ছিলেন এবং ভাল ইংরেজী বক্তৃতাও দিতে পারতেন। তাঁর হাতে প্রায় আড়াই হাজার টাকার নোটের তাড়া গুঁজে দিয়ে বলা হ'ল যে, এগুলো বিরোধী পক্ষ থেকে কোয়ালিসন দলের জনৈক সদস্যকে দেওয়া হয়েছে, বিরোধী পক্ষে ভোট দেবার জন্য। নোটের কাগজগুলো ছিল কাটা। শর্ত ছিল যে ভোট দেবার পর অপরার্ধ দেওয়া হবে।

সিদ্দিকী ডান হাতে নোটের তাড়া নাচিয়ে বক্তৃতা শুরু

করলেন। উর্দু বয়েৎ সংযোগে তাঁর সেদিনের বক্তৃতা বেশ সুশ্রাব্য হয়েছিল। বক্তৃতায় বললেন, নোটের সঙ্গে বিরোধীপক্ষের জনৈক সদস্যের চিঠিও তাঁর কাছে আছে। I am prepared, Sir, to give you the name of the member. They (Opposition) talk of nationalism as if we, on this side, are bereft of all national feelings. We too entertain national feelings just as any other Indian, but we play the game better.

রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী Downright lie বলে প্রতিবাদ করলে বরিশালের আফজাল দ্বিগুণ চড়ন্ত সুরে হাঁকলেন: আলবৎ সত্যি। স্পীকার দুইজনকেই ধমক দিয়ে সমস্ত কাগজপত্র তলব করলেন।

শরৎ বসু জানতে চাইলেন: সিদ্দিকী কি কোনো কংগ্রেসী সদস্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন?

স্পীকার উত্তরে 'না' বলায় শরৎবাবু বিরোধী পক্ষের তরফ থেকে কোয়ালিসন সদস্যদের বিরুদ্ধে অনুরূপ অভিযোগ আনবার অনুমতি চাইলেন: I appeal to my honourable friend, Mr. Curtis Miller, to state whether or not it is a fact that he saw a big bundle of notes in the hands of a member of the Coalition group?

সিদ্দিকী উত্তরে শরৎবাবুকে জানালেন: he will not find me cowardly, running away or doing underhand and dirty tricks.

সিদ্দিকীর কাগজ পত্র আজিজুলের কাছে থাকল এবং পরের দিন কমিটী অফ প্রিভিলেজ বিচারে যে সিদ্ধান্তে এলেন তা আজিজুলের ভাষায় হল: The Committee of privileges have found on investigation that the document put in by Mr. Siddiqi contains a statement namely, "if you

sign this paper you will get the other halves plus Rs 1,000/- in full notes". But the signature of any Member or of anybody else did not and does not exist. Mr. Siddiqi had placed the unsigned writing with certain allegations before Mr. Speaker which was placed before the Committee. It is as follows: To the Secretary, Independent Krishak Praja Party, Dear Sir, I want to be a member of the Independent Krishak Praja Party. Kindly enrol me as your member. I shall adide by the majority decision, yours faithfully. টাকা চালান সম্পর্কে কমিটি তখন বা পরে কোন সিদ্ধান্তেই আর আসেন নি।

চিঠি জাল প্রমাণ হলে শরৎবাবু তখুনি সিদ্দিকীকে হাউস থেকে অপসারিত করে (suspension) দেবার প্রস্তাব করলেন। তার পূর্বে অবশ্য শরৎবাবু সিদ্দিকীকে তাঁর বক্তব্য প্রত্যাহার করতে বলেছিলেন। সিদ্দিকী সে প্রস্তাবে ঘাবড়ান নি, তবে পরিণামে পলিটিক্সে তিনি যে অভিনয় করেছিলেন তারই মহড়া সেদিন দেখালেন। Mr. Speaker, Sir, I think I owe an apology to the House for the language in which the speech was made, but I stand by the charge, the document and the notes. I expect that when the Committee of Privileges have come to the conclusion on the charges I made, and if my allegations are found to be incorrect I shall stand condemned before the House.

এর পরেই শরৎবাবু সিদ্দিকীকে হাউস থেকে বিতাড়িত করবার প্রস্তাব পেশ করেন। স্পীকার বেগতিক দেখে নির্দেশ দিলেন

অনাস্থা প্রস্তাব আলোচনা শেষ হলে, এ অভিযোগ শোনা হবে। শরৎবাবু নাছোড়বান্দা। পার্লামেণ্টারী নজীর দেখিয়ে দাবী করলেন এ ধরণের অভিযোগ শুনতে কালক্ষয় করা যায় না। অনেকেই পয়েণ্ট অফ অর্ডার এর সাহায্যে শরৎবাবুকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সক্ষম হন নি। শেষ পর্যন্ত সিদ্দিকীকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়েছিল: I accept the decisions of the Privileges Committee and I offer an apology to the House.

সিদ্দিকীর পালা পরে আরও জমকালো হয়ে পড়েছিল। ভদ্রলোক অ-বাঙালী হলেও পলিটিকসে একটু পরিষ্কার থাকতে ভালবাসতেন কিন্তু ইস্পাহানী তাঁকে থাকতে দেয়নি। কলকাতা কর্পোরেসনে ফরওয়ার্ড ব্লকের সহায়তায় মেয়রও হয়েছিলেন এবং শা'নগরের দেশবন্ধু স্মৃতিমন্দিরে দেশবন্ধুর মর্মর প্রস্তর নির্মিত বাস্ট আপন উদ্যোগে স্থাপন করে গেছেন।

যখন যুদ্ধকালে ভারতবর্ষের প্রদেশ সমূহে কংগ্রেসীরা গভর্ণমেণ্ট চালাতে অনিচ্ছুক হয়ে গদী ছেড়ে দেয়, তখন জিন্নাসাহেব পরম সন্তোষে ভারতীয় মুসলমানের কল্যাণার্থে মুক্তি-দিবস (Deliverence Day) ঘোষণা করলেন। সিদ্দিকী তখন মুসলীম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির মেম্বার। জিন্নার কাণ্ড কারখানা সিদ্দিকীর চোখে অভদ্র বলে মনে হয়েছিল এবং তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন। মজার কথা অ-বাঙালী সিদ্দিকী প্রতিবাদ করলেন, আর বাঙালী বদরুদ্দুজা —পাকিস্থান কায়েম করতে তখন ব্যস্ত—সেই মুক্তি দিবস অতি সমারোহের সঙ্গে কলকাতায় সুসম্পন্ন করেছিলেন।

কায়েদে আজম সিদ্দিকীর এ প্রতিবাদ হজম করেন নি। সিদ্দিকীকে তলব করলেন, ফলে সিদ্দিকী তাঁর এ প্রতিবাদ প্রকাশ্যে প্রত্যাহার করলেন। একই ধরণে কায়েদে আজম যখন ফজলুল হককে তাঁর প্রতিবাদ উঠিয়ে নিতে আদেশ দিয়েছিলেন —ফজলুল তা না করাতেই, মুসলিম লীগ থেকে আবার বিতাড়িত

হন—তখন সিদ্দিকী তাঁর নিজের পূর্ব-দশা স্মরণ করে আপনা থেকে এক স্টেটমেণ্টে কায়েদে আজম কৃত ফজলুল হক-বিতাড়ন ব্যাপার সমর্থন করেছিলেন।

সিদ্দিকী-অভিনয় ছাড়াও অনাস্থা প্রস্তাব আলোচনা কালে বিধান সভায় কতকগুলো শোনবার মতো বক্তৃতা সেদিন শোনা গিয়েছিল। আবদুল হাকিম ও আবদুল বারি ফজলুল হক সংহার এবং রক্ষা করতে ব্যস্ত হয়েছিলেন। তমিজুদ্দীন খাঁ ও রাজসাহীর খানবাহাদুর আবদুল রহমান পোলিটিক্যাল ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন; সার জর্জ ক্যাম্বেল যথারীতি দুপক্ষকে নীতি উপদেশ দিয়ে সরকারকে সমর্থন করলেন। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ও শরৎ বসু ফজলুল হকের ব্যক্তিত্ব ও পলিসি আলোচনা করলেন এবং ফজলুল হক উত্তরে "সময় দাও" আবেদন জানালেন।

প্রথম দুটো বক্তৃতার আজ কোন সার্থকতাই বোধ হয় নাই। কিন্তু পরের গুলোর কিছু মূল্য থাকলেও থাকতে পারে ইতিহাসের নজীর হিসাবে। তমিজুদ্দীন খাঁ "কুকুরের দৌড়ের" রেসখেলা (তখন এটি প্রবর্তন হয়েছিল, টাকা ওঠাবার উদ্দেশ্যে) শয়তানী কাজ (satanic) বলে আখ্যা দিয়ে বলেছিলেন :

Again far from raising their little finger to solve the difficult unemployment problem of the Province the Ministry have been deliberately pursuing a policy that has already made the communal tension far worse than what it was when they assumed office. A false insidious cry of "religion in danger" has been raised and this has poisoned the very atmosphere of the country.

আবদুল রহমান অনাস্থা প্রস্তাবের আলোচনা সম্বন্ধে বললেন : সংবিধানেই ইয়োরোপীয়দের হাতে ভার-সাম্য (balance of

power) দেওয়া হয়েছে। অতএব তা'রা নিজেদের স্বার্থের খাতিরে সে ক্ষমতা ত ব্যবহার করবেই, এতে আশ্চর্য হবার কি আছে ?

And taking all things into account is it not a blessing in disguise that their (European) sober, steadying influence is there to control the fury of passions let loose on both sides at the slightest provocation ?

স্যার জর্জ ক্যাম্বেল বললেন : ১৭ মাস ধরে মিনিস্ট্রি যে কাজ করেছে তাতে তা'দের ক্ষমতার পরিচয়ই পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয়, সাম্প্রদায়িকতার চাপ সময় সময় এসে যাচ্ছে—উদ্দেশ্যমূলকভাবে সে কথার উল্লেখ করছি না—কিন্তু বলতে চাই সে দোষ না এলেই ভালো হ'ত।

কায়েদে আজম জিন্না ও আমেরীর মুখের কথা উদ্ধার করে কংগ্রেসকে "great Hindu party" আখ্যা দিয়ে ক্যাম্বেল সাহেব আশা পোষণ করলেন যে, একদিন এ পার্টিরও সহযোগিতা বাঙলার প্রাদেশিক শাসনে তাঁরা দেখতে পাবেন।

শ্যামাপ্রসাদ ফজলুল হক সম্পর্কে যা বলেছিলেন সেদিন তা' ক্লাসিক হয়ে পড়েছিল : Bengal expected better of him. I shall leave him with the remark that lovable he certainly is, but undependable entirely also ! I shall leave him with this remark that unfortunately he is at once an asset and a liability of the first magnitude to any Gavernment to which he may belong

অনাস্থা প্রস্তাব আসবার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার লীগ দলের বা "আজাদ" ও "স্টার অফ ইণ্ডিয়া"তে যে সব লেখা বেরুল

(ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জী, আবুল মনসুর আহমদের ওপর আক্রমণ চলেছিল সে সময়) তার উল্লেখ করে এবং ক্যাম্বেল সাহেবকে সম্বোধন করে শ্যামাপ্রসাদ বলেছিলেন: Sir George Cambell in his wisdom has seen it right to lend support to the Ministry now in power and has turned the scale. From him and from none others, Bengal expects an answer as to whether Government are to be permitted to fan the flame of of communal passions directly or indirectly and resort to means which virtually mean the surrender of an ordered Government to the mercy of goondas and hooligans.

শরৎ বসুও কলকাতার তৎকালীন অবস্থা জানালেন। জানালেন স্টার অফ্ ইণ্ডিয়ার কথা, আলতাফ হোসেনের কথা। জানালেন গাজী আবদার রহমান সিদ্দিকীর নেতৃত্বে হরতাল-শোভাযাত্রা প্রভৃতির কথা।

ফজলুল হক্‌কে কী নজরে শরৎবাবু দেখতেন এবং তাঁদের উভয়ের মনের মিল কতটা ছিল তা তাঁর এই বক্তব্যের উদ্ধৃতি থেকেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে:

Now, Sir, may I appeal from Philip drunk to Philip sober, may I appeal from Mr. Fazlul Huq, the Chief Minister, to Mr. Fazlul Huq, the man? Sir, I stood by the Hon'ble Mr. Fazlul Huq in his days of troubles, in his days of distress, in his days of sorrow. I have not had the good fortune of standing by him in his days of glory as the Chief Minister of Bengal! But I may assure him personally of the same feelings as I did in the past.

এবং ফজলুল হককে ছেড়ে শেষ মন্তব্যে শরৎ বাবু জানালেন: And it is only because of the "achievements' of his Ministry, it is because of the want of any policy during the last 16 months, it is because of the atmosphere of violence they have created, it is because of instances of nepotism brought to my notice—possibly cannot be challenged as far as my information goes—it is because of all these that, today, with the little strength that I possess, I support this motion of no-confidence.

শ্যামাপ্রসাদ ও শরৎ বসুর বক্তৃতার দীর্ঘমাত্রা যে কোথায় পড়েছিল ফজলুল তা নিশ্চয়ই ধরতে পেরেছিলেন। তাই উঠেই শ্যামাপ্রসাদকে বললেন: তোমার মর্মবেদনা আমি বুঝি, এত বড় সম্মানের আসনচ্যুত হওয়া কি সহজে ভুলতে পারা যায়? (শ্যামাপ্রসাদের প্রতি এই ইঙ্গিত হ'ল কারণ তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলারী তখন শেষ হয়েছে)।

শরৎ বসু সে ইঙ্গিতে আপত্তি তোলার সঙ্গে সঙ্গে ওস্তাদ বক্তৃতার মোড় ফিরিয়ে বললেন: Sir, if it is taken like that I will withdraw the expression and I express my regret.

আবার বাধা দিয়ে শরৎ বাবু কড়া মন্তব্য ফজলুলের প্রতি নিক্ষেপ করলেন: most shameful on your part.

ফজলুল থমকে গিয়েছিলেন সে অপ্রত্যাশিত মন্তব্য শুনে।

হাউসে ফজলুলের ধৈর্যচ্যুতি মাঝে মাঝেই ঘটত, এমন সব বেফাঁস মন্তব্য পেশ করতেন যার প্রতিবাদ প্রতিপক্ষ না করে থাকতে পারত না। প্রতিবাদ আসলেই ফজলুল সে কথা প্রত্যাহার করতেন ও ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। এর পশ্চাতের কারণ কতটা

স্বভাবজ এবং কতটা আইন-ব্যবসায়ীর মনোভাব দ্বারা পুষ্ট তা বলতে পারি না। তবে শরৎ বাবুকে কোনদিন ধৈর্য্যচ্যুত হতে দেখি নি—এমন কি যখন গোটা হাউসে হৈ হৈ চলেছে তখনও যে স্বল্প সংখ্যক সদস্য অধৈর্য্য হতেন না, তাঁদের মধ্যে প্রধানতম ছিলেন শরৎচন্দ্র বসু। কেবল ঐ অনাস্থা প্রস্তাব যে কয়দিন হাউসে আলোচিত হয় শরৎ বাবু বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন।

শরৎ বাবুর সেদিনের সেই কড়াপাকের সন্দেশ খেয়েও ফজলুল অনায়াসেই হজম করে ফেললেন! কেন—তা বুঝতে পারা গেল অনাস্থা প্রস্তাবগুলির শেষ পরিণাম দেখবার পর। ভোটে সবগুলো বাতিল হ'ল। কিন্তু এত সব ইঁট-পাটকেল যে বিরোধীপক্ষ থেকে ফজলুলের উদ্দেশ্যে ছোঁড়া হ'ল তার একটাও তাঁকে স্পর্শ করল না।

পাকা খেলোয়াড়, বল গোলের কাছে এনে জালে না ঢুকিয়ে প্রতি-আক্রমণ যে বোকামী তা ফজলুল বিলক্ষণ বুঝতেন এবং সেজন্য শরৎ বসুর মন্তব্য অগ্রাহ্য করেই আপন বক্তব্য বলে গিয়েছিলেন।

উত্তরে বাঙলার মিনিস্ট্রি এবং তার সঙ্গে বিহার ও উত্তর প্রদেশের মিনিস্ট্রি ভূমি সংস্কারে কি করেছে তাঁর তুলনা করলেন। (ফজলুলের এইটাই ছিল ব্রহ্মাস্ত্র) We are indeed a reactionary Province and they are progrssive!

শেষ মন্তব্য যা করলেন তা হ'ল: Sir, I have said these things, because I feel that justice is not being done to me. I would appeal to my friend, Mr. Bose, to come and tell me what is it that he wants me to do? He says he is not going to accept office. I should be very glad to sit with him and the European group round the table and see what is the programme he wants us to follow. If I fail in my duty then will be the time for them to condemn us. But please

give us respite at least for another year and give us an opportunity to do what we are able to do.

অনাস্থা প্রস্তাব ভোটে দেওয়া হলে ১১১-১৩০ ভোটে বাতিল হ'ল। নলিনী বাবুর গণনাই ঠিক প্রমাণিত হল।

সিদ্দিকী অভিনয় হাউসে আর হয়নি। ২৫০০ টাকার কাটা-নোটগুলো নাকি লেজিসলেটিভ ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারী আফজলের সিন্ধুকে অনেকদিন পড়েছিল, তারপর আর কোন হদিস পাওয়া যায়নি। সে অনাস্থা প্রস্তাবের যে রেশটুকু মনে গাথা থাকল তা' হ'ল ক্যাম্বেল সাহেবের হাকিমী সুলভ উপদেশ এবং শরৎ বসু ও ফজলুল হক উভয়েরই তাঁর উদ্দেশে কাকুতি-মিনতি প্রার্থনা।

আর একবার বিধানসভা হঠাৎ অশান্ত হয়ে পড়বার কথা বেশ স্মরণে আছে। জেনারেল এডমিনিস্ট্রেশনের উপর বিতর্ক চলেছে। আজকের মন্ত্রী খগেন দাশগুপ্ত বিরোধীপক্ষ থেকে নথীপত্র দেখিয়ে বলতে চাইছিলেন যে জলপাইগুড়ির খাস-মহলের প্রজাদের ওপর অত্যাচার করা হচ্ছে। হোম মিনিস্টার স্যার নাজেমুদ্দিন খগেন বাবুর বক্তৃতা শুনছেন। খগেন বাবু সে কালে—অন্তত সেদিন—আপন বক্তব্য গুছিয়ে বলতে পারতেন না। নলিনাক্ষ খগেনবাবুর টেবলের ওপর রাখা কাগজপত্রগুলো এক টান দিয়ে নিয়ে নাজেমুদ্দিনের টেবলের ওপর রেখে দিলেন। নাজেমুদ্দিন বৃথা বাক্য ব্যয় না করে সে সবগুলো কাগজই ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। সামসুদ্দীন আহমদ হাউসের চাপরাসীকে সেগুলো গুছিয়ে আনবার জন্য নির্দেশ দিলেন। বেচারী যখন কাগজপত্রগুলো গোছাতে যাবে তখন নাজেমুদ্দিন তাকে এমন এক বিশ্রী ধরণের ধমক দিলেন যাতে সে বেচারী গেল যেমন ঘাবড়ে, তেমনি অবাক হলেন হাউসের সদস্যেরা।

উঠল প্রতিবাদ, বাধল শোরগোল, চিৎকার, বিদ্রূপ, শুরু হ'ল কথা-কাটাকাটি।

'এটা ঢাকার আসান মনজিল' নয় বলে মন্তব্য শোনা গেল।

নলিনাক্ষ সান্যাল কাগজগুলোতে কি লেখা ছিল পড়তে আরম্ভ করলেন।

কোয়ালিসন দল থেকে 'বসে পড় বসে পড়' চিৎকার উঠল। স্পীকার আজিজুল, সেক্রেটারী আফজলকে কাগজপত্রগুলো গোছাতে নির্দেশ দিয়ে হাউস এডজোরন করলেন কয়েক মিনিটের জন্য।

হাউস আবার বসলে সন্তোষ বসু (ডেপুটী লিডার, কংগ্রেস পার্টির) জানালেন ঃ হোম মিনিস্টার ক্ষমা না চাইলে তাঁরা হাউসে থাকবেন না। স্যার নাজেমুদ্দিন ক্ষমা চাইতে নারাজ, পরন্তু জানালেন—হাউসে কোন সদস্যেরই অপর সদস্যের বক্তৃতা শুনতে বাধা দেবার অধিকার নেই। ডাঃ সান্যাল যা করেছেন তা কেবল অন্যায় নয়, গর্হিত।

সে অভিযোগ স্বীকার করলেন আজিজুল।

শরৎ বাবু আজিজুলকে জানালেন ঃ আপনার মন্তব্য নিয়ে আমি আপত্তি করছি না, তবে আমরা হাউসে থাকব না। কংগ্রেস ও কৃষক প্রজা পাটি হাউস থেকে চলে যাবার পরেই আজিজুল সেদিনের মত সভার কাজ স্থগিত রাখলেন।

পরের দিন আবার সেই প্রশ্ন উঠল ঃ হোম মিনিস্টারকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। ফজলুল উঠে বললেন ঃ নলিনাক্ষই ত যত নষ্টের গোড়া। সেই আগে ক্ষমা চ'াকনা কেন ? স্যার নাজেম তারপর যথাবিহিত করণীয় কাজ নিশ্চয়ই করবেন।

তর্কাতর্কি চলতেই থাকল। এর মধ্যে স্যার নাজেমুদ্দিন আলোচনার উত্তর দিতে উঠলেন। আবার সমস্বরে দাবী উঠল ঃ ক্ষমা চাইতে হবে।

আজিজুল বললেন ঃ নলিনাক্ষ সান্যাল অন্যায় করেছেন, বেয়ারার এক সেক্রেটারীর কথা শোনা ভিন্ন অন্য কিছু কাজ হাউসে নেই। তবে নাজেমুদ্দিনের উচিত হয়নি এমনভাবে তাকে অপর সদস্যের অনুরোধ অগ্রাহ্য করতে আদেশ দেওয়া, প্রভৃতি।

কিন্তু হাউসের উত্তাপ তখনও পড়ে নি। গোলমাল থামেই না যখন, তখন আজিজুল একে একে কিরণশঙ্কর রায়, সুরেন মৈত্র (রাজসাহী), হরিপদ চ্যাটার্জ্জী, খগেন দাশগুপ্ত, নিহারেন্দু দত্ত মজুমদার, শশাঙ্ক সান্যাল প্রভৃতিকে হাউস থেকে চলে যেতে আদেশ দিলেন। তাঁরাও সে আদেশ মেনে নিয়েছিলেন।

স্পীকারের আদেশ বরাবরই বাঙলার বিধানসভা সেকালে মেনে এসেছিল বলেই এখনও মার্শাল নিযুক্ত করবার প্রয়োজন বিধানসভায় হয়নি। এও হ'ল বাঙলার বৈশিষ্ট্য।

স্পীকার হিসাবে আজিজুল বর্ত্তমানের বিধানসভার গোড়া পত্তন করে গেছেন। আরও ভালভাবে বিধানসভা সুগঠিত করবার ইচ্ছা তাঁর ছিল। নিজে ছিলেন পণ্ডিত এবং ভদ্র। ইংরেজী ভাষায় সুবক্তা হলেও মনে প্রাণে ছিলেন বাঙালী—একদম কৃষ্ণনগরের "ঘটি" বাঙালী। মুসলীম লীগে অ-বাঙালী প্রাধান্য ছিল বলেই তাঁর স্থান সেখানে হয়নি, তবুও স্ব-চেষ্টায় তিনি তাঁর নাম বাঙালার ইতিহাসে রেখে গেছেন ক্ষেত্র বিশেষে।

ডেপুটী স্পীকার জালালুদ্দীন হাসেমীর সময় বিধানসভায় কথা কাটাকাটি ও তর্কাতর্কি ছিল দৈনন্দিন কাজ। ফলে তাঁকে দিতে হ'ত রুলিং কথায় কথায়। কোন্ কথাটা পার্লামেণ্টারী কোনটাই বা তা নয় সে সম্পর্কে হাসেমী যত রুলিং দিয়েছেন এত রুলিং আর কেউ দেননি।

কিন্তু যাকে বলা হয় "ঐতিহাসিক" রুলিং তা দিয়েছিলেন সৈয়দ নৌসের আলি। এই রুলিং-এর জোরে বিধানসভার—তখন নাজেমুদ্দিন ক্যাবিনেট হারবার্ট সাহেব কায়েম করে দিয়েছেন—পাকাপাকি অবসান হল।

সে অবস্থা এসেছিল যখন বাজেটের এক দফায় হেরে গেলেন নাজেমুদ্দিন—অথচ তাঁর খেয়াল হয়নি যে বাজেটের কোন দফা পাশ না করান আর অনাস্থা প্রস্তাব পাশ একই। নৌসের

সেদিনকার মত হাউস বন্ধ করে পরের দিন রুলিং দেন। কি যে রুলিং দেবেন তা নাজেমুদ্দিনের দল বোধ হয় আঁচ করতে পেরেছিলেন।

রুলিং দিতে উঠলে মহম্মদ আলি (বগুড়া) জিজ্ঞাসা করলেন : আপনি কি কোন নথী পত্র থেকে পড়ছেন ?

নৌসের উত্তরে জানালেন : আমি নোট থেকে বক্তব্য বলছি।

ফজলুর রহমান (ঢাকা) স্বগতভাবে বললেন : না, আমরা ঐটাই জানতে চাচ্ছিলাম।

নৌসের প্রত্যুত্তরে জানালেন : এতে জানবার কি আছে ? সকলেই জানেন।

সুরাবর্দী নৌসেরের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ইঙ্গিত করলেন : আজ্ঞে হাঁ, সকলেই জানেন !

ফজলুর আবার উঠতে চেষ্টা করলে সন্তোষ বসু বললেন : ঘা' খাবে, তার জন্য এত ছটফট করছ কেন ?

নৌসের বললেন : The most important question is the question as to what is the effect of the decision of the House refusing the demand for grant on Agriculture. In ordinary case I could have delayed but I am compelled to give decision here and now.

সুরাবর্দী : That is not your function.

নৌসের : It is certainly my function—who says it is not my function ?

The Ministry is the creature of this House ; the House can make and unmake the Ministry and the Governor is but the registering authority of the declaration of the House.

Besides direct no-confidence, there are other

recognised methods. Sir Nazimuddin may claim that the decision of the House does not really reflect the opinion of the majority of the House but I doubt if it is permissible to be dragged into the realm of speculation after the verdict of the House against the Ministry to function as a Ministry in this House.

In these circumstances I think the House cannot function any longer unless a new Ministry is formed.

রুলিং দিয়ে এবং হাউস বন্ধ করবার হুকুম দিয়ে নৌসের হরিষে বিষাদের মধ্যে ১৯৩৫-৪৫ সালের ফজলুলী যুগের শেষকথা বলে গেলেন।

যে ঘটনা পরম্পরায় নৌসের আলিকে সেই ঐতিহাসিক রুলিং দিতে হয়েছিল তা ঘটেছিল ১৯৪৫ সালের ১৮শে মার্চ তারিখের বিধান সভার মিটিং-এ। বাজেট অধিবেশন, কৃষিমন্ত্রী মোয়াজুদ্দীন খাঁ দাবী পেশ করলে বিরোধী পক্ষ থেকে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (কুমিল্লা) বিনাবাক্যব্যয়ে তাঁর "কাট মোসন" পড়ে বিরোধ জানিয়ে বসে পড়লেন।

সবে হাউস বসেছে, এত তাড়াতাড়ি ভোটাভুটি হবে সে আশা পেটো-সাহেবরা করেন নি। যথারীতি অফিসের কাজ সেরে তাঁরা বাঙলা দেশের রাজনীতি ও বাঙালীর উন্নতি সাধন করতেন। ৬ টার আগে কদাচিৎ তাঁদের হাউসে দেখা যেত। এই সাহেবদের ও হাইকোর্টের ব্যারিস্টার-উকীল বাবুদের সুবিধার জন্যই বাঙলা-দেশের বিধান সভা বিকেলে বসবার রেওয়াজ চলে আসছিল।

সেদিন ভোটাভুটি এত শীঘ্র যে আসবে সরকার পক্ষ (নাজেমুদ্দিন সরকার) কল্পনাও করতে পারেননি। হাউসের অন্তিমকাল তখন এসে গেছে, আজ যে সরকারী পক্ষে কাল সে কোন্ পক্ষে যে থাকবে তার

কোনই নিশ্চয়তা নেই। অপর দিকে বিরোধীপক্ষ থেকে এ খবর বেশ ভাল ভাবে চালু করা হয়েছে যে, সরকারী পক্ষ থেকে প্রায় দু'ডজন দেশী সদস্য বে-দলে যেতে প্রস্তুত হয়ে পড়েছে।

তার ওপর এল এই ভোটাভুটি পরিস্থিতি। নাজেমুদ্দিন শঙ্কিত। নলিনাক্ষ লাফাতে সুরু করেছেন—'ঘুঘু ফাঁদে পড়েছে' বলে চিৎকার। চেঁচিয়ে দাবী করলেন "কাট মোশন" ভোটে দেওয়া হোক, একটা এসপার ওসপার হোক।

সুরাবর্দী আঁতকে উঠে বললেন, এ বড় অন্যায়। আলোচনা ব্যতীত মোশন কি করে ভোটে দেওয়া যায়!

পেটো-সাহেবদের নীলমনি, (whip) স্টর্ক সাহেবও সুরাবর্দীর কথায় সায় দিলেন।

ফজলুল ব্যঙ্গ করে বললেন: তা ত ঠিক কথাই। ওদের কেবল দুজন হাউসে আছে, এ অবস্থায় মোসন ভোটে কেমন করে দেওয়া যায়! এসব আলোচনা করে কি ফয়দা? বরং যেতক সাহেবরা অনুগ্রহ করে হাউসে না আসছেন, ততক্ষণ অধিবেশন বন্ধ থাকুক।

স্টর্ক সাহেবের মুখখানা লাল হয়ে উঠল।

স্পীকার নৌসের আলি বললেন: এটা ঠিক যে সরকারী পক্ষ থেকে কোন সংশোধনী প্রস্তাব আসবে না।

সুরাবর্দী প্রশ্নোত্তরে বললেন: কেন?

নৌসের উত্তর দিলেন: এ হাউসে তেমন কোন নজীর নেই।

তর্কাতর্কির ফাঁকে নৌসের জানালেন যে কৃষিমন্ত্রী যদি দফার ওপর কোন বক্তৃতা দিতে চান তবে তিনি দশ মিনিটের জন্য তাঁকে বলতে দেবেন। খাঁ সাহেব আবোল তাবোল করে ১০ মিনিট কাটালেন বটে, কিন্তু ক্লাইভ স্ট্রীটের ব্লুসারদের এসে পড়বার কোনই ইঙ্গিত দেখা গেল না সে ওয়টারলুতে। এরাও ষড়যন্ত্র করেছে নাকি? স্টর্ক ঘর্মাক্ত, মহম্মদ আলি ছুটন্ত, সাহবুদ্দিন টেরাচোখে বিরোধী সংখ্যা বারবার গুনছেন।

৪-৩০ মিনিটে নৌসের মোশন ভোটে দিতে যাবেন। সুরাবর্দী হুমড়ে পড়ে স্পীকারের টেবলস্থিত মাইকটা কেড়ে নিয়ে বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন। কিন্তু সে নামেই বক্তৃতা। একটু পরেই ক্লান্ত হয়ে সুরাবর্দী বসে পড়লেন।

বিরোধী পক্ষ থেকে মাইক স্পীকারের সামনে আবার রাখলে নৌসের মোশন ভোটে দিলেন। "কাট মোশন" সমর্থন করলেন ১০৬ জন সদস্য ও বিরোধিতা করলেন ৯৭ জন।

টেবল চাপড়ে ফজলুল বলে উঠলেন : ভাগো। (resign).

নাজেমুদ্দিন চুপ করেই ছিলেন এতক্ষণ। ফজলুলের কথা শুনে বক্তব্য পাশ করতে যখন দাঁড়াবেন তখন ক্লাইভ স্ট্রীটের পেটোরা—১৬ জন একে একে ত্রস্ত ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন। খেল তখন শেষ হয়ে গেছে।

পরের দিন নৌসের দিলেন তাঁর রুলিং যার ফলে ১৯৩৫ সালে যে অভিনয় শুরু হয়েছিল তা' ১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ শেষ হ'ল। কোথায় সেই পটুয়াখালিতে এর আরম্ভ আর কোথায়—দেশ বিভাগ ইস্যু মুখে করে—তার পরিণতি।

নৌসেরের রুলিং, ঠিক বিটল-ভাই পাটেলের রুলিংএর পাশে স্থান পায়।

নৌসেরের রুলিং নিয়ে সেদিন বেশ আলোচনা-সমালোচনা হয়েছিল। মূলতঃ কিন্তু এতে ঢাক-ঢাক কিছুই ছিল না। মোদ্দা কথা হ'ল যে কম্যুনাল এওয়ার্ডের দৌলতে বিধানসভার ভারকেন্দ্র থাকত পেটো সাহেবদের ওপর। তারা যাদের দিকে ভর করে থাকত তারাই গদীতে আসীন থাকতে পারত। কেবল একবারই শ্যামা-হক ক্যাবিনেট সাহেবরা ওজনে ভারী না করলেও নড়বড় করতে পারেনি। এবং তা পারেনি বলেই লাট সাহেব হারবার্টকে চক্ষু-লজ্জার কোন বালাই না রেখে রাজভবনের দরজা বন্ধ করে এবং ভয় ও লোভ দেখিয়ে ফজলুলের পদত্যাগ পত্র আদায় করতে হয়েছিল।

নাজেমুদ্দিনের হাউসে ভোটে হেরে যাওয়ার ঘটনাটি ছিল অপ্রত্যাশিত। পেটো সাহেবরা তাদের অফিসের কাজ শেষ করে ত' পলিটিক্স করবে। সেদিন বিরোধী পক্ষ গোপন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে বাজেটের কৃষি দফা নিয়ে আলোচনা নমো নমো করে সেরে ভোটে দেওয়া হবে।

দফা ভোটে গেল। সাহবুদ্দিন তখন নৌকা বানানো কণ্ট্র্যাক্টে ও কাপড় চালান দেওয়ার ব্যবসাতে ব্যস্ত ছিলেন বলেই বোধহয় বিরোধী পক্ষের এই গোপন সিদ্ধান্তের খোঁজ খবর নিতে পারেন নি, ফলে নাজেমুদ্দিন হেরে গেলেন। এতে বিরোধীপক্ষের কর্মকুশলতা যে খুব একটা ছিল তা নয়। এতে যেটুকু কৃতিত্ব ছিল তার সবটাই নৌসের আলির প্রাপ্য।

কেসী সাহেব তখন লাট সাহেব। সে ঘটনা-মুহূর্তে তিনি মফস্বলে। অন্য কোন স্পীকার গদীতে থাকলে হয়ত লাট সাহেবের কলকাতা ফেরবার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন—নৌসের তা' ত করলেনই না, বরং পরিষ্কার ভাষায় ভবিষ্যতের জন্য নজীর রেখে বলে গেলেন : the Governor is but the registering authority of the decision of the House.

কেসী সাহেব কলকাতায় এসে নৌসেরকে তলব করেছিলেন। নৌসেরও সাফ জবাব দিয়েছিলেন। কেসী বিলেতের হাউস অফ কমনসে খোঁজ খবর নিয়ে বুঝতে পারলেন, নাজেমুদ্দিনকে গদীতে রাখা অসম্ভব। শেষ পর্যন্ত হাউস বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত তাঁকে নিতে হয়েছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইংরেজ-ব্যবসায় এবং মুসলিম-রাজনীতি

মুসলিম লীগ ১৯৪০ সালের মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ করে। প্রস্তাবক অপর কেউ নয়, স্বয়ং শের-ই-বঙ্গাল, আবুল কাশেম ফজলুল হক। নানা কারণে সে প্রস্তাব এবং প্রস্তাবক ইতিহাস বিশ্রুত। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দাবী ঘোষণা করেছিল কংগ্রেস সেই একই পীঠস্থান লাহোর থেকে। সে কারণ মুসলমানেরাও "বুঝিলাম, নাহি বুঝিলাম" অবস্থায় পাকিস্তান দাবী করাতে অতি সহজেই সে দাবী সাধারণের দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে পড়ল। এ দাবীর রূপ সম্বন্ধে কোন সম্যক্ ধারণা প্রস্তাবকের ছিল না। সংস্থার প্রধান, মহম্মদ আলি জিন্নারও ছিল কি না সন্দেহ।

পাকিস্তান প্রস্তাব পেশ করে যে আবুল কাশেম ফজলুল হক সর্বভারতীয় মুসলমানী বাহবা পেলেন এবং সর্বভারতীয় হিন্দু-চোখে দুষমন হয়ে পড়লেন লীগ মহলে তারপর থেকেই কোন অজানা কারণে তাঁর আর কোন পাত্তা পেতে দেখা যায় নি।

ফজলুল হক প্রায় তখন হতে ফেরারী। লীগের মাদ্রাজ অধিবেশনে (১৯৪১ সাল) সর্বসম্মতিক্রমে জিন্না কায়েদে-আজম হলেন, অপর পক্ষে পাকিস্তান প্রস্তাব-পেশকারী আবুল কাশেম ফজলুল হক সে সময় থেকে কেবল লীগ পলিটিকসে অনাসক্ত হয়ে পড়লেন না, তাঁকে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ নিরশনে, প্রদেশ সমূহে বড় দুটি দল নিয়ে মন্ত্রীত্ব গঠন প্রভৃতি প্রস্তাব যা' তদানীন্তন লীগ পলিটিকসের বড় বড় নিষিদ্ধ কর্ম ছিল তা' প্রকাশ্যে পেশ করতে দেখা গেল।

এ অবস্থাও বেশিদিন থাকল না। ফজলুল লিখে ফেললেন এক কড়া চিঠি লীগ সেক্রেটারী লিয়াকত আলির কাছে। কায়েদে

আজমের একনায়কত্ব এবং অশোভন অসৌজন্য সমালোচনা করে লেখা সে পত্র সেদিনকার লীগ হাই কমাণ্ডের পক্ষে হজম করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।

এরই ফলে অভিনীত হ'ল হক-বিসর্জন বিয়োগান্ত নাটক। এ নাটকের সবগুলো অভিনেতাই অ-বাঙালী ও মুসলমান-লঘিষ্ঠ প্রদেশের লীগ নেতারা। এঁরা এঁদের স্ব-গোত্রীয় কলকাতা-প্রবাসী অ-বাঙালী ইস্পাহানীদের সহায়তায় সে নাটক প্রায় সর্বসমক্ষেই অভিনয় করতে শুরু করলেন সেই মাদ্রাজ অধিবেশনের পর থেকেই।

রঙ্গ ভূমি কলকাতা, দার্জিলিঙ ও বাঙলা দেশ। দর্শকদের বহুলাংশ বাঙালী। এ নাটক সমালোচনা এখন তক আরম্ভ হয় নি, হলে সহজেই বুঝতে পারা যাবে ফজলুল গুটি-পোকার যতটুকু রেশম দেওয়া সম্ভব ছিল তা লাহোরে বের করে নেবার পর সেই অন্তঃসারশূন্য জীবটাকে গরম জলে সিদ্ধ করবার কেমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল।

পূর্বে বলেছি ফজলুল হক মানুষ হয়েছিলেন উনিশ শতাব্দের শেষাংশে, গড়ে উঠেছিলেন বাঙালী হয়ে, ধরতে পেরেছিলেন বাঙালী মনের বৈশিষ্ট্য, সামাজিক দৃষ্টি এবং জাতীয় উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন ভয়শূন্য শিরশ্চালনা ও ঐকান্তিক চিত্ত প্রবণতা। সে মনে বিকার আসতে বাধ্য লীগের তদানীন্তন কায়েদে-আজম-সুলভ কাণ্ড কারখানায়। এদিক দিয়ে ফজলুল ছিলেন যুগের অনুপযোগী। লক্ষ্ণৌএর "সাতানা" ঘোষণাকারী ফজলুল হক, করাচীতে ঐতিহাসিক মহম্মদ বিন্ কাশেমের উদাহরণ উদ্গাতা এবং কলকাতাতে পাণিপথের কথা স্মরণ করে দেবার প্রধান চারণ হয়ে যে ভাব-গঙ্গা ভারতীয় মুসলমানের মনে নিয়ে এলেন, উনিশ'শ চল্লিশের লীগ হাই-কমাণ্ডের কাছে সে-সব নজীর হ'ল অচল, অধম।

লীগ হাই-কমাণ্ড ভুল করেন নি, ফজলুল হকও ভুল করেন নি।

ফজলুল দেখেছেন স্বদেশে স্বদেশী-আন্দোলনের জোয়ারে কোন্ ভাব-ধারায় সিক্ত হয়েছিল তাঁর স্বদেশবাসী। সেই শতাব্দের গোড়ায় যা দেখেছিলেন তিনি, চল্লিশের পরিপ্রেক্ষিতে কার্যকরী মনে করে সেই পুরানো অস্ত্রগুলো নয়া ধরনে শান দিয়ে প্রয়োগ করলেন। অস্ত্র প্রয়োগ ঠিকই হয়েছিল, যে লীগ গুটিকয়েক খয়েরখাঁ, বা মুসলমান-লঘিষ্ঠ প্রদেশের পাত্তা-না-পাওয়া পোলিটিসিয়ানদের কব্জার মধ্যে আত্মগোপন করেছিল এতদিন, তা' ফজলুলের কৃপায় ও বক্তব্যে চাঙ্গা হয়ে পড়ল এবং জনসাধারণের লক্ষ্যভুক্ত প্রতিষ্ঠান হ'ল।

লীগ হাই-কমাণ্ড যে এ অবস্থা চান নি তা নয়, তারাও এ অবস্থা চেয়েছিলেন এতদিন ধরে, কিন্তু কোন ক্রমেই সর্ব প্রকারের অস্ত্র প্রয়োগেও লীগের অবস্থান্তর আনতে পারেন নি। সে পরিবর্তন লীগে এসেছিল লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে যখন ফজলুল হক ও সেকেন্দার হায়াত খান সে মঞ্চে উপস্থিত হলেন।

বাঙলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক। এসেছেন লীগের নায়ক স্যার খাজা নাজেমুদ্দিনকে সোজাসুজি নির্বাচন দ্বন্দ্বে পরাস্ত করে। ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের যে কেউই লীগ লীগ করে চীৎকার করুন না কেন যতক্ষণ ফজলুল বাঙলার মসনদে গদীয়ান আর লীগ সভামঞ্চে অনুপস্থিত ততদিন লীগের মুসলমান প্রাতিনিধিত্ব দাবী যে অস্বীকৃত থাকবে তা ত' স্বতসিদ্ধ। অতীতে সিমলার মুসলিম লীগের কাউনসিলএর এক মিটিংএ স্বয়ং জিন্না নির্বাচনের পূর্বে ফজলুলের নাম লীগের খাতা থেকে কেটে দেন। প্রধানমন্ত্রী হবার পর প্রাদেশিক লীগের কর্মকর্তারা, প্রধানতঃ ইস্পাহানী ও সুরাবর্দী, আসন্ন অবস্থা বুঝেই ফজলুলকে আবার লীগে যোগদান করতে ধরে পড়লেন। ফজলুল আপত্তি করেন নি এবং বাঙলার কংগ্রেস পলিটিকস সেদিন সে কাজে বরং সহায়তাই করেছিল।

এই তিন চার বছরের মধ্যে একা ফজলুল সে লীগকে যতটা পরিমাণে মুসলমান জনসাধারণের নিকট সুপরিচিত এবং সঙ্গে সঙ্গে

হিন্দু বিদ্বেষের প্রধান লক্ষ্য করে ফেলেছিলেন তা' আর কে করতে পারত? এ প্রতিষ্ঠান এ গতিতে জীবন্ত করবার উদ্দেশ্য ফজলুলের কাছে ছিল অজ্ঞাত। তাঁর কাছে উদ্দেশ্য অজ্ঞেয় থাকলেও এ জীবন্ত শক্তির ব্যবহার বা অপব্যবহার সম্পর্কে কায়েদে-আজমের ধ্যান ধারণায় এতটুকু আবছায়া ছিল না। যতটুকু জীবনীশক্তি লীগ অর্জন করেছে তাতেই তিনি সন্তুষ্ট। সংস্থাটি এর বেশী শক্তিশালী হলে তার পক্ষে আয়ত্তে রাখা যে অসম্ভব তা বুদ্ধিমান ও আইনজ্ঞ মহম্মদ আলি জিন্না, চিরকাল ইলেকট্রিক পাখার নীচে বসে পলিটিকস করে, বেশ বুঝতে পেরেছিলেন।

জিন্না সাহেবের রাজনীতি সমালোচনা বা ভারতবর্ষের সেই যুগের পোলিটিক্যাল পরিপ্রেক্ষিতে তিনি যে কি করে অতি শীঘ্রই মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠানকে ত্রিশের কোটায় কংগ্রেসের প্রতিযোগ্য করে দাঁড় করালেন তার আলোচনা এখানে অবান্তর। কেবল এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে বাঙলাদেশের ত্রিশের কোঠায় ফজলুল হক রাজনীতির আবর্তে পড়ে যতটা "সেকেলে" বাঙালী হয়ে পড়েছিলেন, মহম্মদ আলি জিন্না ভারতবর্ষের রাজনীতির ক্ষেত্রে সেই যুগে তদপেক্ষা "সেকেলে" ছিলেন। মজার কথা ফজলুল হক এপ্লায়েড রাজনীতিতে (যথা প্রজাকে স্বত্ববান করতে অথবা সুদখোরকে সংহত করতে) অনেক নতুনত্বের ইঙ্গিত দেখালেও কি মুসলিম লীগ, কি কংগ্রেস তার দান কোনদিনই স্বীকার করে নি। অপর পক্ষে কেবল থিয়োরীর ওপর নির্ভর করে পাকিস্তানে সম্পূর্ণ বিশ্বাসবান না হয়েও একমাত্র রাজনীতির সুযোগ নিয়ে মহম্মদ আলি জিন্না বাজী মাত্ করে ফেললেন।

জিন্না সাহেব যে একদম "সেকেলে" ছিলেন তা তার বক্তব্য-দ্বারাই প্রমাণ করা যায়। ত্রিশের গোড়াতে যখন সবে বিলেত থেকে দ্বিতীয় রাউণ্ড টেবল কনফারেন্স শেষ করে এসে লীগ পরিচালনার কাজ নিজের হাতে নিলেন তখন থেকে দেশ বিভাগ

পর্বধ্যায় পর্যন্ত মহম্মদ আলি জিন্না একা কংগ্রেসকে, নির্দলীয় ভারতীয় প্রধানদের এবং সময় সময় ইংরেজকে বক্তব্যের মাধ্যমে চুপ করে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় মুসলমান নেতৃত্বকেও নানাবিধ উপায়ে "ঠাণ্ডা" দাওয়াই দিতে হ'ত তাঁকে। একক এত গুরুভার বহন মোটেই সহজসাধ্য নয়। জিন্না সাহেবকে এ-দিক দিয়ে বিচার করলে অসাধারণই বলা যায়।

কিন্তু যখন এ অসাধারণত্ব অর্জন করবার হাতিয়ারটি আলোচনা করা যায় তখন সুষ্ঠুভাবেই ধরা পড়ে যে এ অসাধারণত্ব অসাধারণ একগুঁয়ে গোয়ারতুমি ছাড়া আর কিছুই নয়। যে একগুঁয়েমী কেবলমাত্র যুক্তিবাদে অবিশ্বাসী মনেই বাসা বাঁধতে পারত এবং সে কায়দা জিন্না কোনপ্রকার চেষ্টা না করেও পাকা দাবা খেলোয়াড়ের মত ভারতীয় রাজনৈতিক ছক দেখেই অর্জন করেছিলেন।

সুদীর্ঘ দশ বারো বছর নিয়ে কম্যুনাল এওয়ার্ড এবং পাকিস্তান দাবী বিষয় দুটি আলোচিত হলেও জিন্না সাহেব একমাত্র উনিশ্ শ' তেতাল্লিশ সালের লীগের অধিবেশনে একটু অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলেন। সে দৃষ্টিপাতেই তার দর্শন যে কতদূর "সেকেলে" তা ধরা পড়ে।

জিন্না অতীতে কংগ্রেস রাজনীতি করতেন, লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস-লীগ আঁতাত (১৯১৬ সাল) যখন সম্ভবপর হ'ল তখন তিনি—ফজলুলও—সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বোম্বেতে বাল গঙ্গাধর তিলকের সঙ্গে একযোগে কাজ করা তাঁর পক্ষে আপত্তিকর হয় নি। একদা বোম্বের লাট সাহেব তিলককে অপমান করলে জিন্না লাট সাহেবের মুখের ওপর প্রতিবাদ করে সভাকক্ষ পরিত্যাগও করেছিলেন। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর কলকাতায় লালা লজপত রায়ের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের যে বিশেষ অধিবেশন হয় (১৯২০ সাল) মিঃ মহম্মদ আলি জিন্না সস্ত্রীক কেবল যোগদান করেন নি, তিনি সি, আর, দাশ ও বিপিনচন্দ্র পালের সঙ্গে দাঁড়িয়ে

গান্ধী আনীত নন-কো-অপারেশন প্রস্তাবের ঘোর বিরোধিতাও করেছিলেন।

ভারতবর্ষের রাজনীতিকে "মেঠো" করবার সেই দ্বিতীয় প্রচেষ্টা তিনজনই তিন দিক থেকে বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে বাধা দিয়েছিলেন। যাঁরা কলকাতার ওয়েলিংডন স্কোয়ারের সে অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন তাঁরাই স্মরণ করতে পারবেন যৌবনে কলেজে শেক্সপীয়র-নাটকের সার্থক অভিনেতা মহম্মদ আলি জিন্না কেমন করে বাক্-চাতুর্যে এবং অভিনয় ভঙ্গীতে শ্রোতাদের মোহিত করে ফেলতেন। যদি ভারতবর্ষের মুসলিম জনসাধারণের কাছে ইংরেজী ভাষা সেই ১৯২০ সালের কংগ্রেসে আগত ডেলিগেট বা ভিজিটরদের মত সুপরিচিত থাকত তবে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে তিনি পাকিস্তান দাবী পেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের সমর্থন একমাত্র তাঁর বাককুশলতায় আদায় করে নিতে পারতেন। আর কোন সাহায্য তাঁর দরকার হত না।

ওয়েলিংডন স্কোয়ারের কংগ্রেস অধিবেশনে আনীত নন-কো-অপারেশন প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে উঠে জিন্না গান্ধীজীকে মিঃ গান্ধী বলে সম্বোধন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ডেলিগেটদের আসন থেকে প্রতিবাদ উঠল: Say Mahatma Gandhi. সে প্রতিবাদে জিন্না একটুকুও দমেন নি, কেবল কয়েক সেকেণ্ড নীরব ছিলেন মাত্র। আবার শুরু করলেন: all right, Mahatma Gandhi says.... একবার বলবার সুযোগ পেয়ে গেছেন জিন্না, তখন তাঁকে রোখে কে? হঠাৎ বক্তৃতায় এসে পড়ল মৌলানা মহম্মদ আলির নাম। তাকেও সম্বোধন করলেন মিঃ মহম্মদ আলি বলে। আবার প্রতিবাদ উঠল। জিন্না একই ধরণে চুপ করে থাকলেন মুহূর্তকালের জন্য। যখন মুখ খুললেন তখন জিন্না বক্তা নন, তিনি সভামঞ্চাধিকারী। No. I say he is not a Maulana বললেন জিন্না প্রতিবাদ-প্রতিধ্বনিকে লক্ষ্য করে। I must not call him Maulana

He is Mr. Mahammad Ali. জিন্নাকে তখন বাধা দেবার মত আর কাউকে দেখা যায় নি। এমনি ধরণের বাকবিভূতিসম্পন্ন ছিলেন জিন্না।

তিন মাস পর নাগপুরের অধিবেশনে যখন নন-কো-অপারেশন প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় সেবারেও—সেই শেষবার—জিন্না কংগ্রেসে কেবল উপস্থিতই ছিলেন না, তিনি সে প্রস্তাবের বিরোধিতাও করেছিলেন। গান্ধীজিকে "মহাত্মা" না বলে আবার "মিস্টার" বলে সম্বোধন করাতে এবার মৌলানা মহম্মদ আলি আপত্তি করলেন। দুজনের মধ্যে যে বাদবিতণ্ডা হয়েছিল তা সকলেরই উপভোগ্য হয়েছিল।

বিশের শেষ কোঠায় (১৯২৭ সাল) মাদ্রাজ কংগ্রেসের অধিবেশনান্তে কলকাতার টাউন হলে লীগ অধিবেশন বসে এবং আলি ভাইদের ও মহম্মদ আলি জিন্নার তদারকে সাইমন কমিশন বয়কট ও যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা সেই অধিবেশনে লীগের পক্ষ থেকে গৃহীত হয়। সেদিনকার মির্জাপুর (আজকের শ্রদ্ধানন্দ) পার্কে সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বে একই মঞ্চ থেকে দুই মহম্মদ আলিই আপন আপন বক্তব্য পেশ করেছিলেন।

সাংবাদিক হিসেবে দুজনের সঙ্গেই একবার করে সাক্ষাৎ লাভও আমার হয়েছিল। মৌলানার সঙ্গে মোলাকাতের বিষয়টি মনে নেই, কেবল এটুকু মনে আছে কোন একটা গোপন দলিল "ফরওয়ার্ড"এ প্রকাশ করবার জন্য দিয়েছিলেন।

জিন্না সাহেবের সঙ্গে যে ইণ্টারভিউ-এর সুযোগ পেয়েছিলাম তা বেশ মনে আছে। সাইমন কমিশন বয়কট করতে কংগ্রেস ও লীগের তরফ থেকে কি করণীয় তাই বলেছিলেন। গ্রাণ্ড হোটেলে উঠে ছিলেন। ইস্পাহানীদের শুভাগমন তখনও হয় নি। সামনা-সামনি এবং নিকটে পেয়ে মানুষ-জিন্নাকে লক্ষ্য করবার সুযোগ পেয়েছিলাম সেদিন। দেখলাম, ঘোরতর সাহেব, আচার-ব্যবহার নিখুঁত এবং

আলাপ-পরিচয়ে ভদ্র ও অমায়িক। কংগ্রেস পলিটিকসে যোগদান করতে বিরত থাকলেও সেদিন তাকে ঈর্ষা প্রকাশ করতে শুনিনি।

কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে (১৯২০) যখন এসেছিলেন তখন সঙ্গে মিসেস জিন্না ছিলেন। দম্পতি ছিল আদর্শ, সেকেলে বাঙালী বিলেত ফের্তাদের মত। মিসেস জিন্নার নিরবগুণ্ঠন ও মৌলানা মহম্মদ আলির সহধর্মিনীর বোরখা আবরণ নিয়ে সমালোচনা সেকালের গোড়া মুসলমান মুখপত্রে উঠত।

কায়েদে আজমকে শেষবারের মত দেখি কলকাতার মহম্মদ আলি পার্কে। তখন ইস্পাহানীরা এসে পড়েছে। ফজলুল হক লীগে যোগদান করেছেন, মৌলানা সৌকত আলি—মহম্মদ আলি তখন পরলোকে—জিন্না-নেতৃত্ব মেনে নিয়েছেন। সেদিন জিন্নার অন্য মূর্তি। চোস্ত ইংরেজীতে বক্তৃতা। প্রথমেই সমালোচনার বিষয় হ'ল অমৃতবাজার পত্রিকার রিপোর্ট ও সম্পাদকীয় প্রবন্ধ। This paper of some importance বলে মন্তব্য পেশ করে জানতে চাইলেন পত্রিকার প্রতিনিধি সভায় আছে কিনা। লুকোবার ইচ্ছা থাকলেও উপায় ছিল না—উঠে দাঁড়ালাম। আমার সৌভাগ্য যে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করে আর কোন মন্তব্য করেন নি। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

কেন জিন্না সংবাদপত্রের প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত আছে কি না জানতে চেয়েছিলেন সেদিন? সেদিন থেকেই মনে হয়েছিল কায়েদে আজম অসাধারণত্বের অধিকারী হয়েছেন বা হতে চলেছেন।

সেই তেতাল্লিশের লীগ অধিবেশন, যখন পাকিস্তান ভারতীয়-মনে কায়েম হয়ে পড়েছে, যখন ভারতীয় মুসলমান মন থেকে সে অবাঙ্-মানস-গোচর আদর্শ বিসর্জন দিতে হলে এমন কি কায়েদে আজমকেও বিসর্জন দিতে হ'ত, সেদিন বিদ্যুৎ ঝলকের মত, কেবল একবারই মহম্মদ আলি জিন্না নিজের অতীত রাজনৈতিক জীবনের

প্রতি রেখাপাত করেছিলেন। সে রেখা ক্ষণিকের জন্য হলেও তাতে জিন্না কোন্ আদর্শ জীবনে গ্রহণ করেছিলেন, কতদূর তার দৃষ্টি প্রসারিত, কোনখানে পৌঁছে তিনি কেবল স্থাবর নয় নিশ্চল হয়েও আছেন, তার পরিচয় পাওয়া যায়।

জিন্না সেদিন অতীতের কংগ্রেস এবং কংগ্রেসী নেতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেছিলেন যে, যে দাদাভাই নৌরজি এবং গোপালকৃষ্ণ গোখলের পদতলে বসে তিনি রাজনীতি শিক্ষা করেছিলেন, তাঁদের গড়া সেই আদর্শ সমূলে উৎপাটন করে সব পণ্ড করে দিয়েছেন এই শতাব্দীতে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।

জিন্নার রাজনীতি কোন্ গোত্রের তা ধরা পড়ে আছে ঐ বক্তব্যের মধ্যে। দাদাভাই, গোখলে বা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী অথবা শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর রাজনীতি বিশেষ ধরণের ছিল এবং তাতে "মেঠোমীর" কোনপ্রকার বিকার দেখা যেত না। ভারতীয় রাজনীতিতে গৈরিক গঙ্গামাটি প্রথমে আসে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে এবং বাঙলা দেশে। এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে তা প্লাবনের রূপ নেয় মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর নেতৃত্বে। এমন এক যুগসন্ধিকালে সেই পুরানো রাজনীতির ধারা-বাহকদের, মহম্মদ আলি জিন্না সমেত, সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দিশেহারার মত চুপ করে থাকতে হয়েছিল।

রাজনীতি জনসাধারণের নাগালের মধ্যে এলে রূপান্তর হবেই এবং হয়েওছিল। স্বদেশী আন্দোলন এবং নন-কো-অপারেশন, উভয় যুগেই তা ঘটেছিল। দাদাভাই বা গোখলে প্রভৃতির বিধানসভার বাইরে রাজনীতির স্থান আছে এ বিশ্বাস ছিল না। তাঁরা ছিলেন মনেপ্রাণে কনস্টিটিউশনালিস্ট। তাঁদের এই নিয়মতান্ত্রিক ধ্যান ধারণাকে ধিক্কার দেবার জন্যই সে ধারাকে "ভিক্ষাবৃত্তি" নাম দেওয়া হয়েছিল। সে ধারাবাহকদের সেই যুগে মডারেট এবং নন-কো-অপারেশন যুগে লিবারেল নামে পরিচয় দেওয়া হ'ত। কনস্টিটিউশনাল আন্দোলন ও বিধানসভা মারফৎ আলোচনা মাধ্যমে

পলিটিকসকরা ছিল তাঁদের আদর্শ এবং সে আদর্শচ্যুত হওয়া তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ত।

জিন্না যখন মুসলিম লীগ স্বীয় প্রতিভাবলে কুক্ষিগত করে রাজনীতি শুরু করেছেন তখনও তাঁর সমগোত্রীয় হিন্দু রাজনীতিজ্ঞদের অভাব হয় নি। এঁদের মধ্যে তখন ছিলেন স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু, জয়াকর, হৃদয়নাথ কুন্‌জরু, বাঙলাদেশেও ছিলেন যতীন্দ্রনাথ বসু। এঁদের কারও তখন রাজনীতির আসরে স্থান ছিল না। কিন্তু জিন্নার ছিল।

মুসলিম লীগ হাত করবার পরেও জিন্নার রাজনীতি ও চিন্তাধারা সেই পুরানো কনস্টিটিউশনাল ও বিধানসভার মাধ্যমে সীমায়িত ছিল। তবুও তিনি কিন্তু আসর জমাতে সুযোগ পেলেন, যে সুযোগ তাঁর হিন্দু সমগোত্রীয়দের ভাগ্যে এল না। এর একমাত্র কারণ হ'ল কংগ্রেস যে ঐতিহাসিক কারণে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল সেদিন, মুসলিম লীগ বা তার নেতৃত্ব সে কারণের অধিকারী হবার সুযোগ পায় নি বা গ্রহণ করে নি। ত্রিশের কোঠা থেকে নির্বাচনের খাতিরে এবং অন্যান্য শক্তি প্রয়োগে যতটুকু প্রসার আপনা থেকে এসেছিল সে সুযোগ একদিকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করা এবং অপরদিকে লীগ প্রতিষ্ঠানকে কনস্টিটিউশনাল বিধানে সীমায়িত রাখা জিন্নার দান।

এ প্রসার কেমন করে হ'ল, কে বা কা'রা করল ?—সে মোটেই রহস্যময় ইতিহাস নয়। এতে মুসলিম লীগের কর্মকুশলতা কিছুই নেই, এতে জিন্নার বাহাদুরী দেবারও কিছু নেই অথবা হিন্দুদত্ত কোন বাধাও বিশেষ সাহায্য করে নি। যে অদৃশ্য শক্তি এ কাজ অতি গোপনে সুসম্পন্ন করে ফেলল, এটি মজার কথা বটেই, তা দেশ-ভাগ হয়ে গেলেও, শত সহস্র মানুষের জীবনে রাষ্ট্রবিপ্লবজনিত দুঃখ দুর্দশা আসলেও সাধারণের কাছে অজ্ঞেয় হয়েই আছে।

ঘাত প্রতিঘাতে হিন্দু মতামত আজও একদেশদর্শী—আজও

তাদের বিশ্বাস মুসলমানেরা, মুসলিম লীগ অথবা জিন্না প্রত্যক্ষভাবে এ অবস্থায় জন্য দায়ী। কিন্তু সত্যি তাই কি? যা'রা সুকৌশলে সে কাজ হাসিল করে দূরে দাঁড়িয়ে দর্শক হ'ল তাদের হদিস বা তাদের দানের কথা হিন্দু অথবা মুসলমানদের কাছে ধরা পড়েছে বলে ত' মনে হয় না।

সে এক প্রায়-অজ্ঞাত কাহিনী যা এখন-তক অজ্ঞেয় হয়ে পড়ে আছে। পাকিস্তান দাবীর ডামাডোলে সে কাহিনীর খবর কেউ রাখেন নি। কোন মাস্টার মহাশয়দের দৃষ্টিই সেদিকে পড়ে নি, কারণ কোন সাহেবই সেদিকে তাঁদের চোখ খুলে দেয় নি।

অতীতে স্বদেশী আন্দোলনের দোমুখী ধারা দেখে ইংরেজ যে ভীত হয়ে পড়েছিল তার সঠিক ইতিহাস লেখা না থাকলেও বাঙলা দেশে ইংরেজের প্রতিক্রিয়াগুলো দেখলেই এর শক্তিপ্রবাহ চোখে ধরা পড়ে। বয়কট আন্দোলন প্রতিহত করতে সেদিন মাড়োয়ারীদের উৎসাহ দেওয়া হয়েছিল। মাড়োয়ারী বস্ত্র ব্যবসায়ীদের শুভাগমন বাঙলার সুদূর পল্লী অঞ্চলে শুরু হ'ল।

বাঙালী মুসলমান ঠিক বাঙালী হিন্দুর মতই—ঐতিহাসিক কারণেই—ব্যবসায় বিমুখ ছিলেন। তা না হলে যে বাঙালী মুসলমানকে ইংরেজ শাসকেরা পোলিটিক্যাল উদ্দেশ্য সাধনে ও বয়কট আন্দোলন বিফল করতে বাঙালী হিন্দুর বিরুদ্ধে নিয়োগ করতে সমর্থ হ'ল—এমনকি দাঙ্গাহাঙ্গামার সাহায্য নিয়ে—তাদের অতি সহজেই সে বিলিতি বস্ত্র ক্রয়-বিক্রয়ের ভার দিতে পারত। ইংরেজের উদ্দেশ্য সে অবস্থায় যে আরও সার্থক হ'ত তা কে অস্বীকার করবে?

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দরুণ মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড আইন ব্যবস্থার কথা যেদিন ঘোষণা করা হ'ল সেদিন ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে বিশেষ রকমে শঙ্কিত হ'ল ইংরেজ বণিক ও ইংরেজ শাসকেরা (I. C. S. Officers)। উভয়েই সেদিন চেয়েছিল রক্ষাকবচ। দিল্লীতে ১৯১৮ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন দাশ সমর্থিত প্রস্তাবের

মধ্যে সেই অনাগত ভবিষ্যৎ কিভাবে মডারেট ও একস্ট্রিমিস্ট উভয় দলকে নাড়া দিয়েছিল তার ইঙ্গিত মিসেস বেসান্ত এবং শ্রীনিবাস শাস্ত্রী কর্তৃক চিত্তরঞ্জনের বক্তৃতায় বাধা দেবার মধ্যেই ধরা পড়ে আছে। চিত্তরঞ্জন সমর্থিত প্রস্তাবে থাকল: That the non-official Europeans should not be allowed to form separate electorates on the ground that they represent the Mining or the Tea industries, and if they are allowed such representation it should be limited to their proportion compared to the population of the provinces concerned.

সে প্রস্তাব সমর্থন করতে চিত্তরঞ্জন দাশ যা বলেছিলেন তার মর্মার্থ কেবল ইংরেজের ঘাঁটি বাঙলা দেশ ও কলকাতা ছাড়া অন্যান্য প্রদেশের পক্ষে সেদিন বোঝা কঠিনই ছিল। সেজন্য তাঁর বক্তব্য সেদিন চাপা পড়ে থাকল।

চব্বিশের নির্বাচনে স্বরাজীরা কেন্দ্রের আইন সভায় এসে পড়েছে। তখন দেশের আবহাওয়া সম্পূর্ণ অন্যরূপ। স্বদেশী-যুগের সুয়োরাণী-দুয়োরাণী পলিসি জাতীয় জীবনে শৈশবকালীন গল্প হয়ে পড়েছে তখন, ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়েছে। কেন্দ্রীয় বিধানসভাতে, বাঙলার বিধানসভারই মত, স্বরাজী দাপট সুস্পষ্ট।

সেই চব্বিশ-পঁচিশ সালে "ফিসক্যাল কমিশন বসানো হোক" দাবী পেশ করলেন পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু কেন্দ্রের বিধান সভায়।

সিপাই-বিদ্রোহে, নীল-বিদ্রোহে, স্বদেশী আন্দোলনে ইংরেজ যতটুকু চমকায়নি তার চেয়ে ঢের ঢের বেশী আতঙ্কিত হ'ল সে দাবীর সামনে পড়ে। পলাসী যুদ্ধের অনেক পূর্ব হতে প্রায় অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে এসে এই প্রথমবার বিশের কোঠায় ইংরেজ শুনল ভারতীয় ব্যবসানীতি নিয়ন্ত্রণ দাবী।

রাজনীতি বদলতি, উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং সন্ত্রাসবাদ ত'

ব্যাপক হয়ে পড়েছে তবুও ইংরেজের ঘুমের ব্যাঘাত হয় নি ; কারণ অর্থোপার্জন সমানভাবেই চলেছে এতদিন। পোলেটিক্যাল দাবী ভারতবর্ষে কি হতে পারে তার সম্যক পরিচয় ইংরেজের হয়েছে। প্রতিষেধক উপায় স্বরূপ যা তার করণীয় তাও তখন তার আয়ত্তে। কিন্তু এ যে অর্থনৈতিক দাবী ? এর প্রতিষেধক কি ? ভারতবর্ষে এতদিন কেবল অবাধ ব্যবসা বাণিজ্য চালিয়ে আসে নি তারা, ভারতীয় স্বার্থ-ক্ষুণ্ণ করে নিজেদের বাণিজ্য-স্বার্থ বজায় রাখতে পেরেছে অনায়াসেই।

ফিসক্যাল কমিশন অবশেষে বসল। ভারতীয় বণিকদের তরফ থেকে, প্রধানত বোম্বে অঞ্চল থেকে, (কলকাতা তখন ইংরেজ বাণিজ্যের রাজধানী) বেশ বড় বড় দাবী রাখা হ'ল কমিশনের সামনে। একটা ছিল বিদেশী কোম্পানিগুলিতে ভারতীয় ডিরেক্টর রাখতে হবে। ইংরেজ ব্যবসায়ীরা সে দাবী সরাসরি অস্বীকার করল এবং কমিশনের রায়ও ইংরেজ ব্যবসায়ীর অনুকূলে গেল।

একবার যখন দাবী উঠেছে তখন এর আর নিবৃত্তি যে নেই ইংরেজ তা বুঝতে পেরেছিল এবং সেজন্য হৃদয়দৌর্বল্য তাদের আর যায় নি।

ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থার খসড়া প্রস্তুত করতে কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে (১৯২৭ সাল) যে কমিটি (নেহরু কমিটি) বসেছিল তাঁরা ইংরেজ ব্যবসায়ীদের এরূপভাবে আতঙ্কগ্রস্ত দেখে অবাক হয়েছিলেন। এত টাকা ব্যবসা-বাণিজ্যে এরা এ-দেশে ঢেলেছে, তারা কি মনে করেন, প্রশ্ন করেছিলেন নেহরু রিপোর্ট রচয়িতারা, যে তাঁদের প্রতি বৈষম্যমূলক কোন নীতি গ্রহণ করা হবে ? যদি তাদের কোন বিশেষ দাবী থাকে তবে সেই কথা তারা কমিটির সামনে বলুন, আমরা নিশ্চয়ই তা বিবেচনা করব, মন্তব্য করেছিলেন নেহরু-কমিটির সদস্যেরা।

এ যে বক্তব্য নয়, একান্তভাবে অস্তিত্ব রক্ষা করবার প্রশ্ন, এর

ওপরই ত ইংরেজী স্বত্ব অবস্থিত। ইংরেজ রাজত্ব ও ইংরেজী বাণিজ্য যে অভিন্ন অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসীরা এ দর্শন বুঝতে না পারলে চলে কি করে। তোমাদের বিরুদ্ধে অবিচার (discrimination) কেন করা হবে প্রশ্ন করেছিলেন কমিটি, কিন্তু ইংরেজ ব্যবসায়ীরা সে আশ্বাসে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি।

নেহরু কমিটি ও রিপোর্টের একটু ইতিহাস না জানা থাকলে পরের বিবৃতিগুলো অস্পষ্ট হয়ে পড়বার সম্ভাবনা।

চিত্তরঞ্জন দাশের শেষ মর্মকথা পড়ে আছে ফরিদপুরে প্রদত্ত প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণের মধ্যে। পূর্বে যখন জেলের মধ্য থেকে ইংরেজের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে এগিয়েছিলেন তখন বাধা পেয়েছিলেন গান্ধীজীর কাছ থেকে। ফরিদপুরে আবার ইংরেজকে বোঝাপড়া করতে অনুরোধ করলেন।

সে অনুরোধে সাড়াও দিয়েছিলেন তদানীন্তন সেক্রেটারী অফ স্টেট ফর ইণ্ডিয়া। লর্ড বার্কেনহেড (১৯২৪ সাল) বিলেতের পার্লামেন্টে বক্তৃতা প্রসঙ্গে একটু চ্যালেঞ্জের সুরে তিনি কংগ্রেসী নেতাদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করলেন: বাপু হে, অত হৈ-চৈ করছ কেন? নিজেরা বসে ও একমত হয়ে একটা ব্যবস্থাপত্র দাও না। দেখি কেমন পার! আমি সোজা জানাচ্ছি এমনধারা ব্যবস্থাপত্র আসলে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে তা' বিবেচনা করব।

বার্কেনহেডের এ ঘোষণা মনে রেখে নেহরু কমিটি মাদ্রাজে গঠিত হ'ল। সাহেবরা কিন্তু গোড়া থেকেই এ কমিটির প্রতি উদাস থাকলেন; যদিও কমিটি ভবিষ্যতে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে কি নীতি গ্রহণ করা হবে সে বিষয়ে বড় বড় ইঙ্গিত তাতে করেছিলেন।

সাইমন কমিশন ঘোষিত হ'ল ১৯২৭ সালে, কাজ শুরু হ'ল পরের বৎসর থেকে। একই সময় নেহরু কমিটি বসল। ১৯২৭ সালে কলকাতায় মুসলিম লীগ অধিবেশন বসলে মহম্মদ আলি

জিন্না ও মৌলানা মহম্মদ আলির যুক্ত চেষ্টায় যুক্ত নির্বাচন (Joint electorate) প্রথা সে অধিবেশন সমর্থন করে। কিন্তু পর বৎসর যখন নেহরু কমিটির জন্য কনভেন্‌সন বসল তাতে জিন্না ও মৌলানার দৃষ্টিভঙ্গী বদলে গেছে। এই কনভেন্‌সনে জিন্না সর্ব-প্রথম জানালেন তাঁর প্রস্তাবে যে কেন্দ্রের বিধানসভায় মোট সদস্য-সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত রাখতে হবে। তাঁর প্রস্তাব এবং মৌলানা মহম্মদ আলির সংশোধন প্রস্তাব কনভেন্‌সনে গৃহীত হ'ল না। অসন্তুষ্ট হলেন মুসলমান নেতৃত্ব। নিজেদের সম্প্রদায়ভুক্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসীদের নিয়ে অল-পার্টি কনফারেন্স বসালেন। এই কনফারেন্সেই জিন্না তার দাবীগুলো পেশ করলেন। সেকালের "কংগ্রেসী" মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রধান আলি-ভায়েরা সে কনফারেন্সে যোগদান করেছিলেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাস যে নতুন গতি লাভ করল ত্রিশের কোঠায় তার কারণগুলো নিশ্চয়ই পড়ে আছে এই ১৯২৭-১৯২৯ সালের ঘটনাগুলোর মধ্যে, যখন আগামী কালের লীগ-নায়ক জিন্না যুক্ত নির্বাচনের পরিবর্তে সংরক্ষণ ব্যবস্থার (reservation) প্রতি ঝুঁকে পড়লেন।

ইংরেজ ব্যবসায়ীরা কি ফিস্‌ক্যাল কমিশন, কি নেহরু রিপোর্ট নিয়ে কোনই হৈ চৈ করে নি। সাইমন কমিশন (১৯২৭-২৮) আসলে তারা প্রথম অবগুণ্ঠন-মুক্ত হয়ে বক্তব্য পেশ করলেন। তাদের Associated Chambers of Commerce ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশনের সামনে দাবী জানালেন: a definite and clear provision for the protection of European trade and commerce against discrimination. একই বক্তব্য অন্য ভাষায় ইংরেজ শাসকদের সহায়তার এবং স্যার আবদার রহিমের দ্বারা (১৯২৬ সাল) বাঙলা দেশের বিধানসভায় সুকৌশলে ইংরেজ

ব্যবসায়ীরা সংশোধনী প্রস্তাবের মারফতে পূর্বেই পাশ করে রেখেছিলেন। সে সংশোধনী প্রস্তাবে স্যার আবদার রহিম চেয়েছিলেন যে ভবিষ্যতে যে শাসন ব্যবস্থাই আসুক না কেন তাতে "Just and proper representation of minorities and commercial interests" রক্ষিত থাকবে। এ মাইনরিটি কা'রা এবং এ ব্যবসা-বাণিজ্য কাদের তা বুঝতে একটুও কষ্ট হয় না।

১৯৩০ সালে সে দাবী আর একটু চূড়ান্ত হ'ল। Associated Chambers of Commerce আর একটা circular যোগে দাবী করলেন যে ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে যে বিধান প্রচলিত হোক না কেন তাতে পরিষ্কার ভাবে একটা ধারা যোগ করে রাখতে হবে যে, ইউরোপীয় (অর্থাৎ গ্রেট্ ব্রিটেন ও উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের) বাণিজ্য নিয়ে কোন বৈষম্য গ্রাহ্য হবে না। সোজা কথায় ভারতবর্ষে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা যেসব বাণিজ্য করবার অধিকার ভোগ করবে ইংরেজ ব্যবসায়ীরাও তাই ভোগ করবে।

সাইমন বড় আইনবেত্তা, দেশের বিধানে (constitution) বিদেশী বাণিজ্যের বিরুদ্ধে কোন প্রকার বৈষম্য-নীতি গ্রহণ করা হবে না, এমন একটা ধারা কেমন করে যোগ করা যায় প্রশ্ন তুলে ইংরেজ ব্যবসায়ীদের দাবী বাতিল করে দিলেন। ইংরেজ বণিকের দল একটু ফাঁপরেই পড়লেন। শুরু হ'ল গুপ্ত আলোচনা।

রাউণ্ড টেবল কনফারেন্স বসতে শুরু হ'ল ১৯৩০ সাল থেকে একটির পর একটি করে। দেশে তখন চলেছে তুমুল লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন। হিন্দুস্থান উথল যাবে ধ্বনি উঠেছে। ডাণ্ডী-মার্চ-এ গান্ধীজী চলেছেন, লাঠি ও গুলি সমানভাবে চলেছে। অপমান ও কলেকটিভ ফাইন সমানভাবে চালু।

এরই মধ্যে বসল প্রথম রাউণ্ড টেবল কনফারেন্স যাতে কংগ্রেস অনুপস্থিত। অন্যান্যদের মত ইংরেজ ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি স্যার

জন হারবার্ট সেখানে উপস্থিত। আবার পেশ করলেন সেই দাবী—ইংরেজ ব্যবসায়ীদের পৃথক সত্তার উপর যা প্রতিষ্ঠিত। We Britishers of Britain and North Ireland demand same rights as any subject in India with regard to trade and commerce. India may determine its fiscal policy in any way it likes but behind that tariff wall we would expect to be allowed to work exactly the same way as Indians.

কনফারেন্সের মাইনরিটি সাব কমিটিতে (Minorities sub-committee) হারবার্টের বক্তব্য গ্রাহ্য হ'ল। "At the instance of the British commercial community the principle was generally agreed that there should be no discrimination between British and Indian interests." এরই পরে ১৯৩১ জানুয়ারীতে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী রামসে ম্যাকডোনাল্ড সে নীতি গ্রহণ করে মাইনরিটিদের পোলিটিক্যাল স্বাধীনতা অধিকার কেন্দ্রে ও প্রদেশে স্বীকৃত থাকবে বলে সরকারী ঘোষণা করলেন। প্রথম রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সের কাজ শেষ হ'ল। পৃথক-সত্বা ও পৃথক নির্বাচন নীতি গ্রহণ করা হ'ল।

প্রথম রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সের মাইনরিটি সাবকমিটিতে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে স্যার জন হারবার্টের দৌত্যে যে নীতি গৃহীত হ'ল তাই পরিণামে ফলে ফুলে শোভিত হয়ে কম্যুনাল এ্যওয়ার্ড রূপে দেখা দিল। এ ইতিহাস এখনও অলিখিত।

দ্বিতীয় রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সে কংগ্রেসের তরফ থেকে গান্ধীজী স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। যে অবস্থার মধ্যে তাঁকে যেতে হয়েছিল—গান্ধী-আরউইন সেটেলমেন্ট, গান্ধী উইলিংডন আলাপ-আলোচনা এবং কনফারেন্স অন্তে গান্ধীজী রামসে ম্যাকডোনাল্ডকে ধন্যবাদ দিয়ে তাঁর মনের অবস্থা যে ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন সে আলোচনা এখানে

অবান্তর। তিনি লণ্ডন যাবার প্রাক্কালে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ভারত-বর্ষের মাইনরিটিদের সম্পর্কে একটি নীতি গ্রহণ করেছিল, যে নীতিকে কংগ্রেসের ইতিহাস-লেখক magnum opus বলেই আখ্যা দিয়েছিলেন। শিখ, মুসলমান এবং অন্যান্য ছোট ছোট সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে বোধহয় সে নীতি অপেক্ষা কোন শ্রেয়স্কর ও উদার ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত কোন পার্টিই গ্রহণ করেনি। সে প্রস্তাবে ছিল "....But as the Sikhs in particular and Muslims and other minorities in general had expressed dissatisfaction over the solution of the communal question proposed in the Nehru Report this Congress assures the Sikhs, the Muslims and other minorities that no solution thereof in any future Constitution will be acceptable to the Congress that does not give full satisfaction to the parties concerned". সঙ্গে সঙ্গে সে প্রস্তাবে এও ঘোষণা করা ছিল যে যুক্ত নির্বাচন প্রথা গৃহীত হবে তবে সিন্ধু ও আসামে মুসলমানেরা ও পাঞ্জাবে এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্তে শিখেদের সংখ্যা যেখানে ২৫ পারসেন্টের কম সেখানে তাঁদের আসন রিজার্ভ থাকবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের অন্যান্য আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার অধিকার থাকবে। এর মূল বক্তব্য ছিল রক্ষা কবচে নিয়ন্ত্রিত যুক্ত নির্বাচন (Joint electorate with reservation of seats.

কংগ্রেসের সে নীতির বালাই শিকেয় তোলাই থাকল।

হারবার্টের দূতিয়ালী যে তখন অনেক এগিয়ে পড়েছে তা গান্ধীজী লণ্ডন যাবার পূর্বেই আঁচ করতে পেরেছিলেন।

আরউইনের সঙ্গে কথাবার্তায় যখন ঠিক হ'ল যে দ্বিতীয় রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সে গান্ধীজী যাচ্ছেন তখন তিনি বড়লাটকে অনুরোধ করেছিলেন যে কংগ্রেসকে তিনজন সদস্য-নিয়ে ডেলিগেসন পাঠাবার

অধিকার দিতে হবে এবং তিনজনের নাম লাট সাহেবকে দিলে আরউইন তথাস্তু বলে স্বীকারও করেছিলেন। এঁরা হলেন পণ্ডিত মালব্য, সরোজিনী নাইডু ও ডাঃ আনসারী।

গান্ধীজীর অনুরোধ মত রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সে উপস্থিত হতে পণ্ডিত মালব্য ও নাইডুর নিমন্ত্রণ পত্র আসতে একটুও দেরি হয়নি কিন্তু ডাঃ আনসারী নিমন্ত্রণ পত্র পেলেন না। কেন পেলেন না তা আজ আর বুঝতে একটুও দেরি হয়না। ইংরেজ-ষড়যন্ত্রে কংগ্রেসকে হিন্দু-প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য কোন আখ্যা দেওয়া ভবিষ্যতে সমূহ বিপদের কারণ বলে ঠিক করা ছিল। ডাঃ আনসারীর কংগ্রেসের সদস্য হিসেবে উপস্থিত থাকবার সুযোগ দিলে সবকিছু ভেস্তে যেত।

পরিণামে মহম্মদ আলি জিন্নার সমস্ত পোলিটিক্যাল স্ট্যাণ্ড (stand) পড়েছিল ঐ একই পয়েন্টের ওপর। মহম্মদ আলি জিন্নার বারবার অশোভন এবং অভদ্র আচরণ সত্ত্বেও কংগ্রেস নেতৃত্ব, "সো-বয়" মৌলানা আজাদ (কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট), রাজেন্দ্রপ্রসাদ, গান্ধীজী, সুভাষ বসু প্রভৃতির দ্বারা জিন্নার সঙ্গে ভবিষ্যতের শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন কিন্তু যে কারণে ইংরেজ ডাঃ আনসারীকে দ্বিতীয় রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সে নিমন্ত্রণ করে নি সেই একই কারণে মহম্মদ আলি জিন্নাকে এঁদের বক্তব্য সরাসরি অগ্রাহ্য করতে হয়েছিল।

অবশ্য বাদবিতণ্ডায় পড়ে সময়ে সময়ে জিন্নাকে নিজের দাবী মানানসই করাতে বেগ পেতে হ'ত, তবে মোটের ওপর এ ভেলা তাঁকে পাকিস্তান বৈতরণী পার হতে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেছিল। কোন আবোল-তাবোল তাঁকে বকতে হয়নি। সোজা কথা : তোমরা হিন্দু, কংগ্রেস হিন্দু প্রতিষ্ঠান ; আমি মুসলমান, লীগ মুসলমানের একমাত্র সংস্থা ; যদি এই দাবী স্বীকার না করে নাও, তবে জাহান্নামে যাও।

দ্বিতীয় রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সে ডাঃ আনসারী ব্যতীতই

গান্ধীজী গেলেন (না গেলে কি হত?)। লেবর পার্টি গঠিত পার্লামেণ্ট তখন ভেঙ্গে গেছে। কনসারভেটিভ পার্টি জয়যুক্ত হয়ে ক্যাবিনেট গঠন করেছে। তবে সরাসরি পার্টি সরকার না করে ম্যাকডোনাল্ডকে সামনে রেখে কোয়ালিসন নামে তা চালু রেখেছিল। ওয়েজউড বেনের পরিবর্তে স্যার স্যামুয়েল হোর সেক্রেটারী অফ স্টেট ফর ইণ্ডিয়া হলেন।

এটা যে এক বিরাট পরিবর্তন তা কি অস্বীকার করা চলে? ভারতবর্ষের আজকের দিনের ব্যবসায়ীরা বর্তমান পার্টি সরকারের সঙ্গে যেমন আলাপ আলোচনা চালাতে পারে, হঠাৎ অন্য কোন পার্টি-সরকার কেন্দ্রে আসলে সেই পরিমাণে সহজ মনে এগুতে পারে কি?

প্লিনারী সেসনে গান্ধীজী ইংরেজদের উদ্দেশ্যে অনেক কথা—যা তাঁরা ভারতীয়ের মুখে কোনদিন শোনেনি—বললেন। ইংরেজ মনে মনে নিশ্চয়ই হেসেছিল।

মাইনরিটি সাব কমিটিতে যখন গান্ধীজী উপস্থিত হলেন তখন অবস্থান্তর ঘটেছে। প্রথম রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সে গৃহীত পৃথক নির্বাচন নীতির কথা উঠল। ইংরেজ সে নীতি গ্রহণ করেছে বলে ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের দাবী উঠল সদস্যদের মুখে। ভারতীয় দাবী, জাতীয় দাবীর স্থান নেই সেখানে।

ম্যাকডোনাল্ড কম্যুনাল এ্যাওয়ার্ডের প্রথম ইনস্টলমেণ্ট ঘোষণা করলেন। যে উদ্দেশ্যে সে ঘোষণা করা হ'ল তা পুরোপুরি সার্থক হ'ল। জানান হ'ল এর সঙ্গে পৃথক নির্বাচন প্রথা চালু থাকবে ততদিন যতদিন মুসলমানেরা তা চাইবেন। হিন্দু, ন্যাশানেলিস্ট মুসলমান বা শিখদের যে ভারতবর্ষে কোন অস্তিত্ব আছে তা সে সে ঘোষণায় চাপা পড়েই থাকল।

সঙ্গে সঙ্গে বিলিতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হ'ল যে মুসলমানদের সঙ্গে ভারতবর্ষের "অন্যান্য মাইনরিটিদের" একটা গোপন প্যাক্ট হয়ে

গেছে যে প্যাক্টে ম্যাকডোনাল্ডের এ্যাওয়ার্ড ও পৃথক নির্বাচন দাবী সমর্থিত হয়েছে।

দ্বিতীয় রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সের এই গোপন প্যাক্টের ইতিহাস পরেকার ডামাডোলের বাজারে অজ্ঞেয় হয়ে থাকল এবং সেই কারণেই এর নায়কদের নাম ধাম জনসাধারণের কাছে এখনতক অজ্ঞাতই আছে। পরিণামে কম্যুনাল এ্যাওয়ার্ড নিয়ে যখন বাদবিতণ্ডা ও সভাসমিতিতে প্রতিবাদ উঠেছিল তখন নয়াদিল্লীতে এক কনফারেন্সে (১৯৩৫ সাল) এলাহাবাদের লীডার কাগজের সুবিখ্যাত সম্পাদক, সি, ওয়াই, চিন্তামণি সে রহস্য একটু উদ্‌ঘাটন করেছিলেন: That at least some members of the British Delegation to the Round Table Conference were not completely taken by surprise by the signing of the so-called Minorities Pact at the Second Round Table Conference, and in what light it was viewed by their sympathetic selves was revealed in an extraordinary document that unexpectedly saw the light of the day in March 1932 much to the embarassment of Edward Benthal and Sir Samuel Hoare. সে দলিলের ওপর কোন ঐতিহাসিক মাস্টার মহাশয় অদ্যাবধি আলোকসম্পাত করেছেন বলে মনে হয় না, করলে কলকাতায় সেকালের ইংরেজ ব্যবসায়ীরা তাদের স্বগোত্রায় শাসকদের পরামর্শে ও মুসলমান এবং শিডিউল্ড কাস্ট হিন্দুদের হাত করে ভবিষ্যতের জন্য কোন্ ভারতবর্ষ রচনা করতে অগ্রসর হয়েছিলেন তার সম্যক পরিচয় পাওয়া যেত।

যত প্রকারের ষড়যন্ত্র ভারতবর্ষের মাটিতে হয়ে থাকুক না কেন ব্যাপকতায় এ ষড়যন্ত্র ছিল আরও বিরাটতর। বেনথল (পরে স্যার --এডওয়ার্ড বেনথল) ছিলেন সেই দ্বিতীয় রাউণ্ড টেবল

কনফারেন্সে ভারতবর্ষের ইয়োরোপীয় বাণিজ্যের প্রতিনিধি। গান্ধীজীর সঙ্গে ভবিষ্যৎ ইয়োরোপীয় ব্যবসা বাণিজ্যের সম্পর্কে আলোচনা করতে তিনি অগ্রণী হলেন। তিনি যেমন ছিলেন তাঁদের এ্যাসোসিয়েটেড চেম্বারস অফ কর্মাস-এর প্রতিনিধি তেমনি ভারতীয় বাণিজ্য সংস্থার, ফেডারেটেড চেম্বারস অফ কর্মাস-এর প্রতিনিধিও সেখানে তখন উপস্থিত। পূর্ব্বেই নেহরু রিপোর্ট, ফিসক্যাল কমিশন দাবী প্রভৃতি নিয়ে বেশ সোরগোল পড়ে গেছে দেশে, ভারতীয় মুদ্রার রেশিও নিয়ে তীব্র বাদানুবাদে যেসব প্রশ্ন এতদিন ধরে গোপন আলমারিতে বন্ধ ছিল তা এসে পড়েছে সর্বসাধারণের সম্মুখে। বড় বড় ইকনমিস্ট ও স্বদেশবাসীরা—যথা স্যার কয়াজী জাহাঙ্গীর, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, পুরুষোত্তমদাস, ঠাকুরদাস, ঘনশ্যামদাস বিড়লা, নলিনীরঞ্জন সরকার তখন আসরে উপস্থিত। ইংরেজ বণিকেরা যে ঘাবড়াবে তা ত জানা কথাই।

গান্ধীজীর সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে বেনথল সাহেব জানতে পারলেন তাঁর মনের কথা। লণ্ডনে তখন (১৯৩২ সাল) চলল ষড়যন্ত্রের দ্বিতীয় পর্ব। সে ষড়যন্ত্রে অনেকটা সাহায্য করল সেদিনকার বিলিতি নির্বাচন—যাতে ক্ষমতা ফিরে এল কনসারভেটিভ দলে। দিল্লী প্যাক্ট, গান্ধী-আরউইন আলাপ-আলোচনা যেমন পছন্দ করেনি এদেশী ইংরেজ শাসকেরা তেমনি পছন্দ করেনি এই কনসারভেটিভ পার্টি। ঠুঁটো জগন্নাথের মত ম্যাকডোনাল্ডকে সামনে রেখে কনসারভেটিভ পার্টি ভারতবর্ষে এই ক্রমবর্ধমান জন-জাগরণকে কোমরভাঙ্গা আঘাত দিতে প্রস্তুত।

ভারতবর্ষের ইংরেজ বণিকদের ষড়যন্ত্র এ রকম ব্যাকগ্রাউণ্ডে হয়ে পড়ল পুরোমাত্রায় সার্থক। সেদিন বেনথল রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সে যে সার্থকতা লাভ করেছিলেন এবং যা দিল্লীতে এ্যান্টি-কমুনাল এ্যাওয়ার্ড কনফারেন্সএ 'লীডার' সম্পাদক,

চিন্তামণি কেবল উল্লেখ করেছিলেন, তার কিছুটা গোপন সার্কুলার মারফৎ—চেম্বারের বণিক সদস্যদের অবগতির জন্য—লণ্ডনে দ্বিতীয় রাউণ্ড টেবল কনফারেন্স চলবার সময়েই প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল।

ভারতবর্ষের রাজনীতি, বিশেষ করে বাঙলা দেশের রাজনীতি—কলকাতাতেই ছিল ইংরেজের এসব বিষয়ে পরীক্ষা চালাবার ল্যাবরেটরী—বুঝতে হলে সার্কুলারগুলোর সবিশেষ পরিচয় একান্ত-ভাবে প্রয়োজন। বেনথল লিখেছেন: We went to London determined to achieve some settlement if we could, but our determination in that regard was tempered with an equal determination that there should be no giving way on any essential part of the policy agreed to by Associated Chambers of Commerce in regard to financial and commercial safeguards and by European As ociation on general policy. It was obvious to us, and we had it in mind throughout the Conference, that the united forces of the Congress, the Hindu Sabha and the Federated Chambers of Commerce would be directed towards whittling down the safeguards already proposed.

If we look at the result of the last session (2nd RTC) you will see that Gandhi and the Federated Chambers of Commerce were unable to point to a single concession wrung from the British Government as the result of their visit to St. James Palace. He landed in India with empty hands.

There was another incident too which did him

good. He undertook to settle the communal problem and failed before all the world.

The Muslims were a solid and enthusiastic team ; Ali Imam, the Nationalist Muslim caused no division. They played their cards with great skill throughout ; they promised us support and they gave it in full measure. In return they asked us that we should not forget their economic plight in Bengal and we should 'without pampering them' do what we can to find places for them in European firms so that they may have a chance to improve their material position and the general standing of the community.

On the whole, there was one policy of the British Nation and the British Community in India and that was to make up our minds on a national policy and to stick to it. But after the General Elections, the right wing of the Government made up its mind to break up the Conference and to fight the Conference and the Congress. The Muslims, who did not want responsibility at the centre, were delighted. Government undoubtedly changed their policy and tried to get away with Provincial Autonomy, with a promise of Central Reforms. We had made up our minds that the fight with the Congress was inevitable. We felt and said that the sooner it came the better, but we made up

our minds that for a crushing success we should have all possible friends on our side. The Muslims were all right, the Minorities Pact and Government's general policy ensured that. So were the Princes and Minorities.

The important thing to us seemed to carry the Hindus in the street as represented by such people as Sapru, Jayakar, Patro and others. If we could not get them to fight the Congress we could at least ensure that they would not back the Congress, and that, by one simple method of leaving no doubt in their minds that there was to be no going back on the Federal scheme which broadly was also the accepted policy of the European Community, and we acted accordingly. We pressed upon the Government that the one substantial earnest of good faith which would satisfy these people was to bring in the Provincial and Central Constitution in one place. Provincial Autonomy could not be forced upon India ; the Muslims alone could not work it if Congress Provinces, facing a bitter centre, present grave political difficulties ; each Province would be a Calcutta Corporation of its own. So we joined with strange companions ; Government saw the arguments, and the Conference, instead of breaking up in disorder with 100 per cent of Hindu political India against us, ended in promises of co-operation by 99 per cent of

the Conference, including even such people as Malaviya, while Gandhi himself was indisposed to join the Standing Committee.

The Muslims have become firm allies of Europeans. They are very satisfied with their own position and are prepared to work with us.

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু ত্রিশের কোঠা থেকে পাকিস্তানী দাবী আসা পর্যন্ত বাঙলা দেশের এবং চল্লিশের কোঠায় ভারতীয় রাজনীতির নিশানা যে পড়ে আছে বেনথলের ঐ সার্কুলারগুলোর মধ্যে তা কিন্তু দেশ বিভাগের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত বা পরেও বিশেষ লক্ষভূত হয়নি।

ষড়যন্ত্র তখনও সম্পূর্ণ হয়নি। মাইনরিটি সাবকমিটিতে মতানৈক্য। উদারমতাবলম্বী ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ বোম্বায়ের আইন-ব্যবসায়ী স্যার চিমনলাল সিতলবাদ প্রস্তাব করলেন—কোনো উদ্দেশ্য ছিল কি না, কে জানে?—যে যখন সদস্যেরা সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে একমত হতে পাচ্ছেন না তখন প্রধান মন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ডই একটা আপস করে দিন না—"which every one should accept"?

ম্যাকডোনাল্ড যেন এই ধরনের একটা প্রস্তাবের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন, বললেন: তাহলে তোমরা সকলে লিখে জানাও যে এ প্রস্তাবে তোমাদের সমর্থন আছে! will you, each of you, every member of the Committee sign a request to me, to settle the Community question and pledge yourself to accept my decision? That I think is a fair offer.

মাদ্রাজের স্বনামখ্যাত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী লাফ দিয়ে বলে উঠলেন: এদিকের আমরা সকলেই রাজী।

পণ্ডিত মালব্য সানন্দে সকল সদস্যদের স্বাক্ষর জোগাড় করতে

শুরু করলেন। স্বাক্ষর দিলেন ঘনশ্যাম দাস বিড়লা, সরোজিনী নাইডু, ডাঃ জয়াকর, মুনজে, রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, তেজবাহাদুর সপ্রু, চিমনলাল সিতলবাদ প্রভৃতিরা।

মুসলমানেরা কিন্তু সতর্ক ছিলেন। তাঁরা চিমনলালের প্রস্তাব সমর্থন করলেন এই শর্তে যে সকল দলই এ প্রস্তাব সমর্থন করলে তা কার্যকরী হবে এবং তাঁরা যে মাইনরিটি প্যাক্ট করেছেন অন্যান্যদের সঙ্গে তাও প্রধান মন্ত্রীর আপস-নামার মধ্যে স্থান পাবে। অর্থাৎ ভেটো হাতে রাখলেন।

কেবল একজনই সে দলিলে দস্তখত দেননি। তিনি হলেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। কমিটি-মেম্বারদের মানসিক অবস্থা দেখে এবং ইংরেজ ব্যবসায়ীদের অসাধু উদ্দেশ্য লক্ষ্য করে গান্ধীজী প্রশ্ন করেছিলেন: আমরা ১১০০ মাইল পাড়ি দিয়ে এসেছি কি সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধান করতে?

স্যার এডওয়ার্ড বেনথলকে উদ্দেশ্য করে জানালেন: তোমরা প্যাক্টের সাহায্যে ভারতবর্ষে তোমাদের ব্যবসা কায়েম রাখবে মনে করেছ নাকি? এত একটা শবের ভাগাভাগি ব্যবস্থা। যদি এ ভাগ বাঁটোয়ারায় তোমরা সুখী হও, তবে হও। কংগ্রেস এ বাঁটোয়ারীতে নেই; Congress will wander, no matter for how many years, in the wilderness rather than lend itself to a proposal under which the hardy tree of freedom and responsible Government can never grow এই হ'ল গান্ধীজির প্রত্যুত্তর।

আজ ম্যাকডোনাল্ডী রোয়েদাদ অচল, ইংরেজ ব্যবসায়ীদের কারসাজি অবেজো। কিন্তু সেদিন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর বক্তব্য অগ্রাহ্য হয়ে পড়েছিল তাঁরই শিষ্য-সেবকদের কাছে।

গান্ধীজীর চরিত্রও সমালোচনার বিষয়। ভারতবর্ষীয় রাজনীতি জনগণ-মন-অধীনস্থ করতে তাঁর দান সর্বাপেক্ষা বিরাট। অজিত

জীবন আদর্শ ক্ষুণ্ণ করতে তিনি হতেন কাতর, নিজ দোষ স্বীকার করতে তিনি ছিলেন অকপট। কিন্তু যখনই নিজের শিষ্য-সেবকেরা প্রতিবন্ধক হতেন তখন তিনি প্রতিবাদী না হয়ে দূরে সরে গেছেন, ভারতীয় রাজনীতির অনেকগুলো যুগ-সন্ধিকালে। দ্বিতীয় রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সে ইংরেজ বণিকদের ষড়যন্ত্র ধরে ফেলেছিলেন, নিজে চেষ্টা করেছিলেন মুসলমানদের সঙ্গে একটা আপসে আসতে—পারেন নি; এবং কম্যুনাল এ্যাওয়ার্ড গ্রহণ না করে কংগ্রেস অনির্দিষ্ট কালের জন্য বনবাসে যেতে প্রস্তুত এ ঘোষণা করেও তিনি সেই বক্তব্য নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন নি যখন কংগ্রেসী নেতৃত্ব সে এ্যাওয়ার্ড সম্পর্কে "না-গ্রহণ, না-বিসর্জন" নীতি গ্রহণ করল।

শিডিউল্ড কাস্ট-হিন্দু সম্পর্কে কিন্তু গান্ধীজী আদর্শচ্যুত হননি এবং ভারতবর্ষ সেজন্য তার কাছে ঋণী। কারণ এ বিষয়ে তিনি হস্তক্ষেপ না করলে ইংরেজের কারসাজিতে ভারতবর্ষে আমেরিকার মত নিগ্রো-সমস্যা সমাজদেহে চিরকালের মত দেখা দেবার বেশ সম্ভাবনাই ছিল। কিন্তু সে সমস্যা নিরসনেও তাঁকে ম্যাকডোনাল্ডী রোয়েদাদ মেনে নিতে হ'ল। সে রোয়েদাদে যে আসন-সংখ্যা শিডিউল্ড কাস্টদের ছিল, পুণা প্যাক্টে তার চেয়ে অনেক বেশী তাঁকে স্বীকার করে নিতে হয়েছিল।

কোন প্রকার মন্তব্য না করে বিশের কোঠার একটি ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবেনা। গান্ধীজী প্রবর্তিত নন-কোঅপারেশন আন্দোলনে গোটা ভারতবর্ষে তুমুল আলোড়ন এসে পড়েছে, আর বাঙলাদেশ ও কলকাতা ত' ভেসে চলেছে। সে সর্বগ্রাসী প্লাবনের গতি দেখে কে না ভড়কেছিল সেদিন? ভাইসরয় রিডিং বিলেতের যুবরাজকে ভারতবর্ষ দেখাতে এনেছেন। বম্বেতে নামতেই প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ হয়ে পড়ল। রিডিং অপ্রস্তুত, অন্ততঃ কলকাতায় একই অবস্থা না ঘটে তার জন্য বিশেষ উন্মনা। একটা আপসের কথা উঠল। রিডিং রাজী হলেন যে যুবরাজ ফিরে যাবার

পর একটা রাউণ্ড টেবল কনফারেন্স ডাকবেন ভারতীয় সমস্যা মিটমাট করতে, যদি যুবরাজ-বয়কট আন্দোলন কলকাতায় বন্ধ করা হয়। ইতিহাসে এই প্রথম মিটমাটের চেষ্টা।

রিডিং তখন কলকাতায় বেলভিডিয়ারে এবং তাঁর প্রতিবেশী হয়ে চিত্তরঞ্জন দাশ আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে কয়েদী (১৯২১ সাল)। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য দূতিয়ালীতে ব্যস্ত। আপস প্রস্তাব সবই ঠিক হয়ে গেছে, কেবল আপত্তি উঠল মৌলানা মহম্মদ আলি ও সৌকত আলির জেল-মুক্তি নিয়ে। গান্ধীজী তাঁদের মুক্তি দাবী গ্রাহ্য না হলে এবং হঠাৎ সেদিন বেশী মাত্রায় সন্দেহ দেখিয়ে কবে কা'কে নিয়ে রাউণ্ড টেবল কনফারেন্স বসবে তার সঠিক লিখিত সরকারী প্রতিশ্রুতি না পেলে আপস করতে রাজী হলেন না। আপস ভেঙ্গে গেল।

"স্রোতের তৃণে" বীরেন্দ্র নাথ সাসমল লিখেছেন: "বড়দিনের তখন বোধহয় দিন ছয়েক বাকী আছে, একদিন শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মশায় জেলে (প্রেসিডেনসি জেলে) এসে খবর দিলেন, ভারতের বড়লাট সাহের আমাদের সঙ্গে মীমাংসা করতে রাজী আছেন, এখন কেবল আমরা তাঁর সঙ্গে মীমাংসা করতে সম্মত হলেই হয়। মীমাংসার শর্ত সম্বন্ধে তিনি এই বলেছিলেন যে গভর্ণমেন্ট সারা হিন্দুস্থান থেকে সঙ্গে সঙ্গে ক্রিমিন্যাল এ্যামেণ্ডমেন্ট এ্যাক্ট তুলে নেবেন এবং সে আইন অনুসারে যা'রা ইতিমধ্যে দণ্ডিত কিংবা গ্রেপ্তার হয়েছেন, তাদের সকলকে সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দেওয়া হবে। আর যথাসম্ভব শীঘ্র ভারতের কোন না কোন একস্থানে রাউণ্ড টেবল কনফারেন্স বসবে বলে ভারত গভর্ণমেন্ট ঘোষণা করবেন; এবং সেই কনফারেন্সে কংগ্রেসের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যেমন উপস্থিত থাকতে পারবেন, তেমনি সেখানে পাঞ্জাব, খেলাফত ও স্বরাজ সম্বন্ধেও বিস্তারিত আলোচনা হবে। অন্যপক্ষে, গভর্ণমেন্টের ঈদৃশ কার্যের পরিবর্তে আমরা ২৪শে ডিসেম্বর তারিখের হরতাল বন্ধ

করব এবং যতদিন না রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সের ফলাফল প্রকাশিত হবে, ততদিন আমরা "পিকেটিং" করতে পারব না।"

এই শর্ত সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর অভিমত কি জানবার জন্য, দেশবন্ধু মশায় ও মৌলানা আজাদ সাহেব আমেদাবাদে অনতিবিলম্বে তার করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধী প্রত্যুত্তরে জানিয়েছিলেন—মীমাংসায় তাঁর কোন আপত্তি নেই, তবে আলি ভাইদের এবং ফতোয়া* সংক্রান্ত যাবতীয় কয়েদীকে এখন ছেড়ে দিতে হবে এবং R.T.C, কবে বসবে এবং তাতে অন্য কেউ যোগ দিতে পারবে কি না, পারলে তাদের সংখ্যা ইত্যাদি কিরূপ হবে, এখন থেকে তা' খুলে না বলে দিলে চলবে না। ভক্তিভাজন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এই নূতন শর্ত নিয়ে বেলভিডিয়ারে বড়লাটের কাছে গিয়েছিলেন এবং মুখভার করে ফিরে এসে বলেছিলেন—লর্ড রিডিং ফতোয়া সংক্রান্ত কয়েদীগণকে এখন ছেড়ে দিতে কিছুতেই প্রস্তুত নন, তবে আলি ভাইদের যদি কংগ্রেস থেকে প্রতিনিধি করা হয় তা' হলে তাদের R. T. C-তে যোগদান করতে অনুমতি দেওয়া হবে। R. T. C-এর অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে এইমাত্র জানতে দিয়েছিলেন যে ১৯২২ সালের জানুয়ারী মাসের মধ্যেই কনফারেন্স বসবে বলে গভর্ণমেণ্ট এখন ঘোষণা করবেন এবং তাতে ভারতের সকল রাজনৈতিক সম্প্রদায়ই নিমন্ত্রিত হবেন। মহাত্মার কাছে আবার এই সকল কথা টেলিগ্রাফ করে পাঠান হয়েছিল, কারণ এখানকার কেউ তার বিনানুমতিতে একটা কিছু করতে রাজী ছিলেন না। তিনি প্রথমে পণ্ডিতজীকে ও দেশবন্ধুকে এ প্রকারে মীমাংসা করতে অসম্মতি জানিয়ে টেলিগ্রাফ করেছিলেন, কিন্তু শেষে বোধহয় একদিন পরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির তদানিন্তন সভাপতি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী মশায়ের কাছে সম্মতিসূচক একখানি তার করেছিলেন।

---

* এই ফতোয়া-জারীর জন্যই তাঁদের জেল হয়েছিল—লেখক।

এই তার খানির একখানা টাইপ-কপি নিয়ে পণ্ডিতজী পরদিন সকালে জেলে এসে আমাদের অনেককে জেল অফিসে ডাকিয়েছিলেন। দেশবন্ধু. মৌলানা আজাদ, মৌলানা আক্রাম খাঁ, পণ্ডিত বাজপেয়ী, সুভাষ বোস এবং আরো কয়েকজন ও আমি তাঁর কাছে যথাসময়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। বাহিরের যা'রা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে আসামের কামিনী কুমার চন্দ, মেদনীপুরের সাতকড়ি পতি রায়, নোয়াখালির সত্যেন মিত্র ও দেশবন্ধুর জামাতা সুধীর রায়ের কথা মনে পড়ে। রাজনীতি সম্বন্ধে অনেক তর্কবিতর্ক ও কথাবার্তার পর একখানা কাগজে আমাদের শর্ত সমূহ লিখে তার নীচে আমরা উপস্থিত প্রায় সকলে দস্তখত করে সেখানা পণ্ডিতজীর হাতে দিয়াছিলেন। প্রায় 'সকল' বললাম এইজন্যে যে, খেলাফতের সম্পূর্ণ দাবী পরিপূর্ণ না হলে কোনমতে মীমাংসা হতে পারে না বলে মৌলানা আজাদ সাহেব ও তাঁর দুজন মুসলমান বন্ধু সে কপিতে দস্তখত করতে সম্মত হননি।

যাহোক পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য বেলা বারোটার সময় কাগজখানি নিয়ে প্রথমে বাংলার লাট ও পরে বড়লাট সাহেবের সঙ্গে দেখা করবেন বলে, আমাদের আশ্রম (জেল) থেকে অন্তর্হিত হলেন। কিন্তু বিধির বিধানে যা লেখা নেই, তা ঘটবে কেন? যতদূর স্মরণ হয় তার পরদিন পণ্ডিতজী বলেছিলেন এসে, যে তিনি যখন দেখা করতে গেছেন তখন বড়লাট সাহেব প্রায় দীল্লির পথে বেরিয়ে পড়েছেন। অধিকন্তু তাঁর কর্মচারী সভার কোন সভ্য তখন কলকাতায় উপস্থিত ছিলেন না। সুতরাং তিনি কেবল আমাদের দস্তখতযুক্ত কাগজখানি হাতে নিয়ে পণ্ডিতজীকে বলেছিলেন—তিনি ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে কিছু করতে পারেন কি না চেষ্টা করে দেখবেন। সেই থেকে একাল পর্যন্ত কাগজখানি বোধহয় তাঁর কাছেই আছে এবং তিনি যে সে সম্বন্ধে এখনো কিছু করেননি, তার প্রমাণ জেলে বসেই ঘন ঘন পেয়েছি।"

যুগ সমস্যা সময়মত না মেটালে তা' যে পরের যুগে আরও সমস্যা

পীড়িত হয়, তা ত্রিশের কোঠায় ঐ একই রাউণ্ড টেবল কনফারেন্স দেশে না হয়ে বিদেশে বসে প্রমাণ করে দিল। রাজনীতিতে position of strength বলে একটা থিয়োরী আছে। সেদিক থেকে বিচার করলে গোটা ভারতীয় রাজনীতি ১৯২২ সালে যে উচ্চ সীমা-রেখায় পৌছেছিল ও আত্ম-প্রত্যয় অর্জন করেছিল ১৯৪২-এর "ভারত ছাড়ো" (Quit India) আন্দোলনও মনে হয় সে প্রত্যয়-শক্তিকে অতিক্রম করতে পারেনি।

মৌলানা আজাদ India wins Freedom গ্রন্থে লিখেছেন: Gandhiji then called a conference in Bombay with C. Sankaran Nair as the chairman. In this conference Gandhiji himself made a proposal for a round table conference. His terms were almost the same as those brought earlier by Pandit Malaviya. The Prince of Wales had in the meantime left India and the Government had no further interst in the proposal. They paid no attention whatever to Gandhiji's suggestion and rejected it outright. Mr. Das was furious and said that Gandhiji had committed a great mistake. I could not but accept his judgment as correct.

প্রথম মহারাষ্ট্রে এবং পরে মাদ্রাজে চিত্তরঞ্জন দাশ মুখ খুললেন: who bungled and mismanaged?—ঘোষণায়, ইঙ্গিত ছিল সুস্পষ্ট। সেদিন চিত্তরঞ্জন দাশ শুনেছি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পেয়েছিলেন প্রায় ১০০ খানা টেলিগ্রাম, তার প্রতিটিতেই দাবী ছিল withdraw the charge, কেবল একখানা টেলিগ্রামই নতুন ধরনের ছিল, তাতে বক্তব্য ছিল—explain or withdraw. সে টেলিগ্রাম এসেছিল পণ্ডিত মোতিলাল নেহরুর কাছ থেকে। চিত্তরঞ্জন দাশ

প্রকাশ্যে শেষ পর্যন্ত অভিযোগটি প্রত্যাহার করলেও, ক্ষোভে অন্তরঙ্গদের বলতেন: He starts well, goes on magnificently but bungles ultimately.

স্বরাজ্য পার্টি প্রতিষ্ঠিত হ'ল। গান্ধীজী সরে গেলেন সেই প্রথমবার। কম্যুনাল এ্যাওয়ার্ড (১৯৩১) এলে গান্ধীজী আবার সরে দাঁড়ালেন। প্রায় বার বছর পর পাকিস্তান দাবী গ্রহণ করবার সময় এল (১৯৪৪) গান্ধীজী প্রতিবাদ করলেন। কিন্তু সে প্রতিবাদ কার্যকরী হ'ল না। শিষ্যদের মুখের দিকে তাকিয়ে আবার তাঁকে সরে দাঁড়াতে হ'ল।

বিলেতে রাউণ্ড টেবল কনফারেন্স ইংরেজের দিক দিয়ে সফলই হ'ল। কম্যুনাল এ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করে কংগ্রেসকে বনবাসই যেতে হ'ল। তখন থেকে কিন্তু ইংরেজ ব্যবসায়ীদের—বাঙলা বিধানসভায় বানরের পিঠেভাগের ভূমিকা ১৯৩৭-৪৬ তক গ্রহণ করলেও আর সামনাসামনি কেউ দেখতে পায়নি। সমাজদেহে বিষ প্রয়োগ করে তারা সরে পড়ল। মুসলমানকে অবস্থা গতিকে সামনে এগিয়ে আসতে হল।

সেকালের ইংরেজ ব্যবসায়ীদের এই ভূমিকার কথা উল্লেখ করে ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন: The loss of the privileged position of British capital was certainty. British capital therefore made strenuous efforts by seeking its allies from among other minorities. There was much running to and fro and wheels within wheels were set to work at the Second Round Table Conference as the result of which a combination of reactionary elements torpedoed all the efforts of Mahatma Gandhi to present a united front to Britain for our political and economic freedom.

The Minorities Pact was accepted on Nov. 13.1931, under which the special claims of the European community were laid down in the following way : Equal rights and Privileges to those enjoyed by Indian subjects in all industrial and commercial activities.

দ্বিতীয় রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সে গান্ধীজী কোনই আশা নিয়ে যাননি। তাঁর যাত্রা একবার বাতিলও হয়ে গিয়েছিল, তবুও দূরদর্শী ইংরেজ বুঝেছিল তাদের ষড়যন্ত্রে যদি গান্ধী বা কংগ্রেস অংশীদার থাকে তবে সোনার উপর সোহাগা। তাই গান্ধীজীকে লণ্ডনে নিয়ে যাবার প্রতিটি বাধা দূর করতে উইলিংডনের মত লাটসাহেবও সচেষ্ট ছিলেন। সেখানে সকল দল সমবেত হলে একের পর এক করে জাল ফেলা হয় এবং সে জালে ভারতবর্ষের রুই কাতলা সবাই সাগ্রহে ধরা দেয়।

একমাত্র ব্যতিক্রম ঘটল মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে নিয়ে। তিনি গিয়েছিলেন শেষ বারের মত ইংরেজকে বোঝাতে—Cease to be rulers and become friends. ইংরেজ সাড়া ত দিলই না অধিকন্তু আমদানী করল এমন এক ষড়যন্ত্র যার ফল ভোগ লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ বাঙালী আজো করে চলেছে; হয়ত বা চিরকালই করবে।

গান্ধীজীর সেই বন্ধুত্বের আবেদনে কলকাতার ইংরেজ বণিকের মুখপত্র, ক্যাপিটাল, যে উত্তর দিয়েছিল তা চিরকালের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে ইতিহাসের পাতায়। Danger in India প্রবন্ধে সম্পাদক লিখলেন—The British Community in India cannot and will not place its future at the mercy of so uncertain and nebulous a thing as Indian goodwill. এ যেন গত শতাব্দের ইলবার্ট বিল আন্দোলনকালে সাহেবী কণ্ঠে যে প্রতিবাদ ধ্বনি উঠেছিল এবং যা' উপলক্ষ করে

কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন,—নেটিভের কাছে হবে মোদের বিচার? নেভার, নেভার—তারই সাক্ষাৎ প্রতিধ্বনি। ভারতীয়দের স্নেহধন্য হয়ে আমাদের চলতে হবে, ব্যবসা করতে হবে। নেভার, নেভার।

ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করলেন: The Indian can only throw up his hands in despair and regret that judgment is passed on him without giving him an opportunity of proving his bonafides.

পাকিস্তান কল্পনা আদিতে যিনিই করে থাকুন না কেন এর বনেদ পড়ে আছে ম্যাকডোনাল্ডী এ্যাওয়ার্ডের ওপর এবং সে বনেদের যতকিছু মাল-মসল্লা তার যোগান দিল ঐ রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সের গুপ্ত ও গোপনে অনুষ্ঠিত মাইনরিটি প্যাক্ট। বিধান সভাতে, যথা বাঙলার বিধান সভায়, ইংরেজদের জন্য বা মুসলমানদের জন্য যে সংখ্যা নির্দিষ্ট হল ম্যাকডোনাল্ড-স্যামুয়েল সেই সংখ্যা পূর্বে ঠিক করেছিলেন ঐ প্যাক্টের মারফত।

মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসনব্যবস্থায় সাহেবদের মোট সংখ্যা ছিল ১৬ জন। সেখানে মাইনরিটি প্যাক্টে তাদের সংখ্যা বাড়িয়ে করা হ'ল প্রায় ৩০ জন। ম্যাকডোনাল্ড সেই সংখ্যা গ্রহণ করে খানিকটা তাদের ব্যবসা বাণিজ্য এবং খানিকটা তাদের লোকসংখ্যার মধ্যে ভাগ করে দিলেন। জানান হ'ল যে মুসলমানদের সংখ্যা অনুপাতে এবং সাহেবদের ব্যবসা বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য হেতু সংখ্যা বৃদ্ধি করা হ'ল। স্যার নৃপেন সরকার তৃতীয় রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সে গিয়ে বললেন: বারে। এক্ষেত্রে পরিমাণ (quantity) আর এক্ষেত্রে গুণ (quality) নিয়ে বিচার করলে, অন্যেরা (অর্থাৎ হিন্দুরা) কি দোষ করল?

স্যামুয়েল উত্তর দেন নি, স্যার নৃপেনও বক্তৃতা ভিন্ন এ নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করেননি।

বড় প্রশ্ন হ'ল গান্ধীজী এমন ষড়যন্ত্রের সম্ভাবনা যে আছে তা জেনে শুনেও কেন রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সে গেলেন? ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত তিনি ভারতবর্ষেই পেয়েছিলেন। পিয়ারীলাল তাঁর The Epic Fast বইতে জানিয়েছেন The conception of such a pact was not altogether a new one. Mr. Villiers, a representative of the Bengal European group, had actually adumbrated it in a public speech in India, in which he had held out the threat that unless the Congress behaved, the Europeans would join the Mussalmans and other minorities to fight it.

ভিলিয়ারস ছিলেন সে সময়ের ইউরোপিয়ান এ্যাসোসিয়েসনের কর্মকর্তা এবং যদিও তিনি নিজে ছিলেন দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর সওদাগর, বেনথলের অনেক নীচের স্তরের, তাহলেও রাজনৈতিক কারণে হঠাৎ সামনে এসে পড়েন এবং তার পুরো সুযোগ নেন। কোন সন্ত্রাসবাদী নাকি তাঁকে হত্যা করতে তাঁর অফিসে উপস্থিত হয়েছিল। সমস্ত ঘটনাটিই সে সময়ে একটু "ঢাক ঢাক, গুড় গুড়" অবস্থাতে রাখা হয়েছিল বলে সাংবাদিক মহলে এ ধারণা হয়েছিল যে, ঘটনাটি বানানো। উদ্দেশ্য ছিল ভিলিয়ারসকে রাতারাতি হোমরা চোমরা করে ফেলা এবং ঐ গল্পের জন্য একদিনেই ভিলিয়ারস নাম কিনে ফেললেন।

গান্ধীজী সম্পর্কে পিয়ারীলাল লিখছেন He saw the trap, the unreality of the whole show, the loaded dice. But he decided to face the ordeal. Here were a number of delegates specially selected from organisations that were known for the extremisim of their communal bias, placed in an artificial perspective beyond the influence of vast electorate that

constitutes India's millions. They were not told what they would get at the end of their labours. All that they were assured was that any one of the various groups assembled there could, if its terms were not fully conceded, by its dissent, prevent all the rest from getting anything. To reconcile their inherently irreconcilable claims was as impossible task as squaring a circle.

ইংরেজ শাসক ও ইংরেজ বণিক যে এরূপ অস্ত্রের সাহায্য নেবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আশ্চর্য সত্যি সত্যি কিন্তু হতে হয় তখনই যখন দেখতে পাওয়া যায় যে ষড়যন্ত্র ধরতে পারলেও এবং সে বিষয়ে তাঁর মনের প্রথম প্রতিক্রিয়া পরিষ্কার ভাবে জানালেও সেদিনকার কংগ্রেসী নেতৃত্ব গান্ধীজীকে তাঁর নির্দেশিত পথে—to the wilderness—কেবল যেতে বাধা দেয়নি পরন্তু সে ষড়যন্ত্রের ফলাফল নিয়ে "না-গ্রহণ—না-বর্জন" নীতি গ্রহণ করে ফেলল।

আরও মজার কথা, এত বড় ষড়যন্ত্র যে লণ্ডনে হয়ে গেছে, সে সংবাদ একটু-আধটু পেয়ে থাকলেও যে-বাঙলাদেশ সম্পর্কে সে ষড়যন্ত্র হ'ল সেখানে সে গুপ্ত ষড়যন্ত্রের সংবাদ কংগ্রেস মনে রাখেনি, মনে রাখেনি বাঙলার তৎকালীন নেতারা। ভারতবর্ষের ও বাঙলাদেশের রাজনীতিজ্ঞ পোলিটিসিয়ান, মাস্টারমশায়েরা ও সাংবাদিকেরা কেমন করে এতবড় একটা জলজ্যান্ত ঘটনা ভুলে রইলেন তার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

ষড়যন্ত্রান্তে বেনথল এসোসিয়েটেড চেম্বার অফ কমার্সের বণিক সদস্যদের অবগতির জন্য সমকালীন ও ভবিষ্যতের নিখুঁত চিত্র যা এঁকেছিলেন কেবলমাত্র সেই চিত্রখানি সামনে রাখলে ভারতীয় কংগ্রেসী রাজনীতি হয়ত পাকিস্তান ভিন্নও অন্য কোন পথ আছে কিনা, বাতলাতে পারতেন। তা করেননি বলেই লণ্ডনে অনুষ্ঠিত

ষড়যন্ত্রের সাহায্যে পাকিস্তান গন্তব্যে পৌঁছিল। এতে আশ্চর্য হবার কিছুই ছিল না।

নতুন ও বেশী সদস্যসংখ্যা নিয়ে কনসারভেটিভ পার্টি বিলেতের পার্লামেন্টে পরে এল। ভারতবর্ষে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ ও রাজনৈতিক উত্তাপ যা ডায়ার্কী সত্ত্বেও এসে পড়ছে তা ঠাণ্ডা করতে সে পার্টি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট যেমন এদেশের সাহেব সিভিলিয়ানেরা তেমনি কনসারভেটিভ পার্টি ভবিষ্যতের অমঙ্গলের ইঙ্গিত হিসাবেই দেখেছে। তারা ঠিক করে বসেছিল যে রাউণ্ড টেবলই হোক অথবা স্কোয়ার টেবল কনফারেন্সই হোক, ভারতীয় রাজনীতির আবোল তাবোল, ফেডারেশন, অটোনমি প্রভৃতি বুলিগুলো চিরকালের জন্য ঝেড়ে ফেলে পরিষ্কার করে দেবে।

বেনথলের দল সে সব কথা শুনে বললেন ; করো কি ! ফেডারেশন এক কংগ্রেস ছাড়া কেউ চায় না ; আমরা চাইনে, মুসলমানেরাও চায় না। তবে প্রভিনশিয়াল অটোনমি মুসলমানেরা চায়। তার সঙ্গে ফেডারেশন-টোপটা ঝুলিয়ে রাখ। দেখবে ঐটি দেওয়া থাকলে কংগ্রেসী প্রদেশগুলো টোপটা সহজেই খাবে। অন্যথায় প্রত্যেকটি প্রদেশ কলকাতা কর্পোরেশনের মত স্বয়ম্ভু হয়ে যাবে। টোপ ত টোপ মাত্র, এতে আপত্তি করো না। Government undoubtedly changed their policy and tried to get away with Provincial autonomy with a promise of Central Reforms. এই অঙ্গীকারের ওপর কেবল লক্ষ্য রেখেই কংগ্রেস কম্যুনাল এ্যাওয়ার্ড-টোপ গ্রাস করল। promise কিন্তু ফক্কিকার আশা হয়েই থাকল এবং যুদ্ধকালে ফেডারেশন নিয়ে বাদানুবাদ চিরকালের জন্য বন্ধ করবার উদ্দেশ্যে সে অঙ্গীকারও সরকারীভাবে প্রত্যাহার করা হয়েছিল।

বেনথল বণিকসভার সদস্যদের জানিয়েছিলেন যে কনসার-

ভেটিভেরা ঠিক করেছে যে কংগ্রেসকে শায়েস্তা করবে। সে কথা যে পুরোপুরিভাবে সঠিক তাও প্রমাণিত হ'ল সেই ১৯৩২ সালে। কোথায় গেল গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট, কোথায় গেল রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সের বড় বড় বুলি—কংগ্রেস সংস্থাই বে-আইনী হ'ল। এমনকি জালিনওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের সময় বা পরেও কংগ্রেসকে যে অবস্থার সামনে পড়তে হয়নি সে অবস্থার সামনে সে সংস্থাকে ফেলা হল। ১৯৩২ সালে কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনই বাতিল করে দিল ইংরেজ সরকার।

কলকাতায় সে অধিবেশন হবার কথা ছিল। পণ্ডিত মদন-মোহন মালব্য সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। মনে পড়ে যখন কাশীধাম থেকে সপুত্র বৃদ্ধ পণ্ডিত কলকাতায় যাত্রা করলেন—সঙ্গে আমি। যতই ট্রেন কলকাতার দিকে এগুচ্ছে ততই পুলিসের মহড়া বেড়েই চলেছে। কিউল স্টেশনে ট্রেন এলে যখন কংগ্রেস সেক্রেটারী ডাঃ সৈয়দ মামুদকে গাড়ী থেকে নামান হ'ল তখন বুঝলাম পণ্ডিতজীকে কলকাতায় যেতে দেওয়া হবে না। আসানসোলে ট্রেন থেকে কংগ্রেস প্রেসিডেন্টকে ও অন্যান্য সকলকে জোর করে নামান হ'ল।

পরের ট্রেনে যাঁরা পৌঁছেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন জবাহরলাল-জননী, শ্রীযুক্তা স্বরূপরানী নেহরু। তাঁকেও নামান হ'ল। নেহরু পরিবার এলাহাবাদে মুসলমান পরিবারদের সঙ্গে যে কতটা আত্মীয়তার যোগসূত্র রক্ষা করতেন তার পরিচয় পেয়েছিলাম সেদিন। বৃদ্ধা স্বরূপরানী যে স্টেশনে আটক পড়লেন সে খবর তারযোগে আমাকে এলাহাবাদে জনৈক মুসলমানকে জানাতে অনুরোধ করেছিলেন।

কলকাতায় সেদিন ট্রামের এসপ্লানেড-ময়দানে শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা পুলিসী ব্যূহভেদ করে কংগ্রেস অধিবেশন করতে কি চেষ্টা করেছিলেন তাও দেখেছি।

যা ঘটল কলকাতায় ও আসানসোলে তা হয়ে পড়ল সর্বভারতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

বেনথল এইসব আসন্ন ঘটনাগুলো মনে করে বলেছিলেন যে, এ আঘাত যত তাড়াতাড়ি আসে ততই মঙ্গল।

আজকে সেদিনকের ঘটনাগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে বোঝা যায় ভারতীয় রাজনীতি সে যুগে ছিল কতটা অবাস্তব। বেনথল অতি পরিষ্কার ভাষায় যা জানিয়ে দিলেন গোপন-সার্কুলার মারফৎ তা যদিও অপ্রত্যাশিত ভাবে সর্ব-সাধারণের, বিশেষ করে বিলেতের রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের কাছে ধরা পড়লেও, সেদিকে কেউ কোনদিন লক্ষ্য দেননি বা কোন প্রকার প্রতিষেধক বার করবার চেষ্টা করেননি।

যে ফেডারেশন কেবল টোপের মত ঝুলিয়ে রাখল ইংরেজ, যা কার্যকারী করবার কোন ইচ্ছে তার ছিল না, তাই হয়ে পড়ল বড় বাদবিতণ্ডার বিষয়। সুভাষ বসু তো ঐ ইস্যুর উপর দাঁড়িয়ে অভিযোগ করলেন যে, ভূলাভাই দেশাইয়ের দূতিয়ালিতে কংগ্রেস গোপনে ইংরেজের সঙ্গে ফেডারেশন নিয়ে একটা বিধিব্যবস্থা করে ফেলতে রাজী হয়েছে।

এমন কি যবনিকার আড়াল থেকে যারা পলিটিকস করেন এবং অর্থনীতি বা ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে ইংরেজ বণিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে ব্যস্ত থাকেন সেদিন তাঁরাও বেনথলের লিখিত সেই গোপন দলিলগুলোতে কি তথ্য ছিল তা জেনেও এতটুকু সতর্ক হবার প্রয়োজন বোধ করেননি।

ঘনশ্যামদাস বিরলা নিজে উপস্থিত ছিলেন সেই রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সে। বেনথল Associated Chambers of Commerce-এর প্রতিনিধি আর বিরলা Federated Chambers of Commerce-র কর্মকর্তা এদের সম্পর্কেই বেনথল বলেছিলেন : It was obvious to us, and we had it in mind

throughout the Conference that the united forces of the Congress, the Hindu Sabha and the Federated Chambers of Commerce would be directed towards whittling down the safeguards already proposed.

এ কথা জেনে শুনেও এবং রাউণ্ড টেবল কনফারেন্স অন্তে ঘনশ্যামদাস স্যার স্যামুয়েল হোরকে লিখলেন (In the Shadow of the Mahatma গ্রন্থে) যে আমরাও বেনথলদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজী, কিন্তু তিনি লণ্ডন থেকে ফিরে আসবার পর যেন কেমন হয়ে গেছেন। As regards clear co-operation between the two Communities I regret to have to say that I have not been given much encouragement by Mr. Benthal. In London we acted in the friendliest spirit, each trying to see and appreciate the point of view of the other and I expected that this spirit would continue in India. But he seems to be a changed man just now and the report of a speech which he recently made in Calcutta (a copy of which I enclose herewith) has simply amazed me. That after our friendliest co-operation in London he should call us irreconcilables and try to ridicule Gandhiji is a thing which is beyond my comprehension.

কাকে বোঝা যায়না—বেনথলকে, না সেদিনের ভারতবর্ষের পোলিটিসিয়ান, ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতিদের ?

পঁয়ত্রিসের শাসন ব্যবস্থা একবার চালু হয়ে গেলে ইংরেজকে আর সামনে দেখা যায়নি, সে থাকল গোপনে। এই বিধিব্যবস্থাই করা ছিল—আর ধাপে ধাপে সামনে এসে পড়লেন মহম্মদ আলি

জিন্না, মুসলিম লীগ এবং ভারতীয় মুসলমান এবং তাদের জমাট দাবী।

মজার কথা তবুও কংগ্রেস নেতৃত্ব অন্য কোন পথের খোঁজ করেনি, চুপ করে বসেও থাকেনি। হয়ত বসে থাকবার উপায়ও ছিল না। অসহায়ের মত কেবল আদর্শ, আদর্শ করে চীৎকার করে কংগ্রেস নেতৃত্ব নিজেকে প্রবোধ দিতে লাগল, অপরদিকে সেই ষড়যন্ত্রপ্রসূত সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেশকে যুদ্ধান্তে সিভিল-ওয়ারের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলল।

যদি কংগ্রেসের তরফ থেকে গান্ধীজী রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সে না যেতেন, যদি কংগ্রেস সে কম্যুনাল এ্যাওয়ার্ড না স্বীকার করত, যদি বাঙলাদেশের বিধান সভার জন্য ইংরেজ বণিকদের যে সদস্য-সংখ্যা দেওয়া ছিল তা অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করতে পারত কংগ্রেস নেতৃত্ব, যদি ফজলুল হকের নেতৃত্বে মন্ত্রিত্ব গঠন করতে উৎসাহ দিত, যদি ফেডারেশন সম্পর্কে সঠিক ধারণা বেনথলের ব্লুপ্রিন্ট থেকে করতে পারতেন কংগ্রেসী নেতারা—তাহলে কি হ'ত?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পাকিস্তান কায়েমের গোড়ার কথা

কলকাতার ইংরেজ বণিকের প্রতিষ্ঠিত ল্যাবরেটরিতে আবিষ্কৃত হাতিয়ারের বিরুদ্ধে রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সে গান্ধীজী (১৯৩১ সাল) যে প্রতিঘোষণা করেছিলেন—কংগ্রেস বনবাসে যেতে কবুল তবুও ম্যাকডোনাল্ডী এ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করবে না। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা পরিণামে রক্ষা করতে পারেননি।

দেশে ফিরে এসে ডাঃ আনসারী মহম্মদ আলি জিন্নার সঙ্গে কংগ্রেসী নেতৃত্বের আলাপ আলোচনা করবার ব্যবস্থা করলেন। জিন্না রাজী হলেন। এ রাজী হবার প্রধানতম কারণ হ'ল যথাসাধ্য চেষ্টা করেও কেন্দ্রীয় বিধান সভার নির্বাচনে (নভেম্বর ১৯৩৪ সাল) মুসলীম লীগ কোন প্রকার সুবিধা করতে পারেনি। অপর পক্ষে কংগ্রেস প্রায় সব প্রদেশেই, বিশেষ করে মাদ্রাজে যেখানে এতদিন ধরে জাস্টিস পার্টি অপ্রতিহত ছিল একদম কোণঠেসা করে ফেলল। হিন্দু বাঙলার অদ্ভুত অবস্থা। ম্যাকডোনাল্ডা এ্যাওয়ার্ডের দরুণ বাঙালী হিন্দু পণ্ডিত মালব্যের দল ভারী করে ফেলেছে। প্রদেশে শতকরা ৪৪ জন-সংখ্যা, অতএব মাইনরিটি কিন্তু এ্যাওয়ার্ডে সে সংখ্যা কমিয়ে ৩৯ করা হ'ল। তারপর এল পুনা-প্যাক্ট যাতে 'সাধারণ' সদস্য সংখ্যা আরও কম হয়ে পড়ল। বাঙালী হিন্দু মার-মুখো।

মহম্মদ আলি জিন্না ডাঃ আনসারীর অনুরোধে তাঁরই বাড়ীতে কংগ্রেস নেতৃবর্গের সঙ্গে দেখা করলেন। একদিকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যেরা অপরদিকে জিন্না একক বৈঠকে আলোচনা করতে বসলেন। বৈঠক, ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের মতে, সার্থক হয়নি। তবে ঠিক হ'ল যে ভবিষ্যতে আলোচনা সুষ্ঠুভাবে চালাবার জন্য কংগ্রেসের

পক্ষ থেকে রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও লীগের পক্ষ থেকে জিন্না মিলিত হবেন। অনেকদিন ধরে সে আলাপ আলোচনা চলেছিল কিন্তু ফলপ্রসূ হয়নি।

কেন হ'ল না?—রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সে বেনথলের কাহিনী পড়বার পর সে কৌতূহল আর থাকতে পারে না। কিন্তু এখানে সে প্রশ্ন না তুলে কতদূর সে আলোচনা চলেছিল তাই বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়। রাজেন্দ্রপ্রসাদ জিন্নাকে সরাসরি জানালেন যে ম্যাকডোনাল্ডী এ্যাওয়ার্ডে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য বিধান সভা-গুলোতে যে সদস্যসংখ্যা ঠিক করে দেওয়া আছে কংগ্রেস তা বাতিল করতে ইচ্ছুক নয়, তবে এসব সদস্যদের বিধান সভাতে আসতে হবে যুক্ত নির্বাচন মারফৎ। I told him plainly that there was no likelihood of a compromise unless he (Jinnah) gave up his demand for separate electorate as we (Rajendra Prasad) considered it to be harmful to the growth of nationalism. In fact I told him that the talks could begin only on condition that he agrees to do away with separate electorate.

শুনতেও আশ্চর্য লাগে যে, জিন্না রাজেন্দ্রপ্রসাদের সে বক্তব্য পেশ করবার পরেও আপন বক্তব্য শান্ত মেজাজে জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন: মুসলমানেরা এতদিন ধরে ঐ সুবিধাগুলো ভোগ করে এসেছে, এখন ওগুলো প্রত্যাহার করার কথা বলতে হলে তার পরিবর্তে মূল্যবান কিছু না পেলে, ছাড়তে চাইবে কি? He replied that the Muslims who had been used to these facilities for sometime could not be expected to surrender them unless something substantial was offered them in return.

যাই হোক রাজেন্দ্রপ্রসাদ যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে

আলাপ চালিয়ে গেলেন। জিন্না জানালেন যে-সব অঞ্চলে (constituencies) মুসলমান ভোটারের সংখ্যা সে সব অঞ্চলের মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাতে স্বল্প (তখন ট্যাক্স প্রভৃতির ওপর ভিত্তি করে ভোটাধিকার দেওয়া হ'ত) সেখানে ভোটাধিকার ব্যবস্থা মুসলমানদের খাতিরে আরও সম্প্রসারিত করতে হবে। রাজেন্দ্রপ্রসাদ পাঞ্জাবের পরিসংখ্যা (statistics) জোগাড় করে দেখলেন যে শতকরা দু ভাগ ক্ষেত্রে এরূপ বৈষম্য ঘটতে পারে। অতএব তিনি জিন্নার এ প্রস্তাবে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রাজী হলেন। কিন্তু বাঙলার হিন্দু ও পাঞ্জাবের শিখ নেতারা এ প্রস্তাব অস্বীকার করলেন। I then requested Mr. Jinnah not to insist on the demand as it was of no consequence. The fractional difference in the electorate was so insignificant. Jinnah would not agree and I accepted his demand on behalf of the Congress. But then he insisted on its acceptance by Pandit Malaviya.

তখন দিল্লীতে anti-Communal Award Conference বসেছে তাতে পণ্ডিত মালব্য বাঙলা ও পাঞ্জাবের বিধান সভায় অমুসলমান সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি ও নির্দিষ্ট মুসলমান সদস্য-সংখ্যা কম করবার দাবী উঠিয়েছেন। জিন্না কেবল কংগ্রেস নেতৃত্বের সম্মতিতে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি।

আলাপ আলোচনা ভেঙ্গে গেল। এই শেষবারের মত জিন্না কম্যুনাল এ্যাওয়ার্ডে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা প্রত্যাহার করতে রাজী হয়েছিলেন, এমন একটি নতুন সুবিধা প্রাপ্তির আশায় যা রাজেন্দ্রপ্রসাদ অতি সঙ্গত কারণেই মনে করেছিলেন, অকিঞ্চিৎকর।

বাঙলা দেশের হিন্দু প্রতিনিধিদের পক্ষে যে অবস্থা ম্যাকডোনাল্ডী এ্যাওয়ার্ডের এবং পরে পুনা প্যাক্টের দরুণ এসে পড়েছিল তাতে গররাজী হওয়াও আশ্চর্য ছিল না। এই সামান্য ক্ষতির পরিবর্তে

যদি যুক্ত নির্বাচন প্রথা—জিন্না তা মুসলমানদের গ্রহণ করাতে পারতেন কি না সেটা এখানে বিবেচ্য মোটেই নয়—গৃহীত হ'ত এবং তা যদি চালু থাকত তবে ভারতবর্ষের ইতিহাস কোন্ পথ অনুসরণ করত ?

জিন্নার সঙ্গে রাজেন্দ্রপ্রসাদের আলোচনা ভেঙ্গে যাবার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে রাজেন্দ্রপ্রসাদ স্বীয় জীবনীতে মন্তব্য করেছেন—His (Jinnah's) attitude had undergone a change. He wants the Muslim League to be accepted as the only representative of the Indian Muslims while he classifies Congress of the Hindus. যে জিন্না ত্রিশের গোড়ায় মুসলমানদের তরফ থেকে যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বিশেষ অনিচ্ছা প্রকাশ করেন নি, রাজেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে আলোচনার পরই কেন অন্য মূর্তি ধারণ করলেন ?

এর মধ্যে কোন রহস্যই ছিল না। বাঙলা দেশে লীগ মনোনীত নেতা, খাজা স্যার নাজেমুদ্দিন ৩৫-৩৬ সালে কৃষক-প্রজা পার্টি নেতা, আবুল কাশেম ফজলুল হকের কাছে পরাজিত এবং ৩৬-৩৭ সালে সেই আবুল কাশেম ফজলুল হক প্রথমবার সেই লীগে আবার যোগদান করে ফেলেছেন।

কেন্দ্রীয় বিধান সভার নির্বাচনের পর পঁয়ত্রিশের কম্যুনাল এ্যাওয়ার্ডের অধীনে প্রদেশের নির্বাচনের সময় উপস্থিত। জিন্না তখন লীগের সংস্থা ভালভাবেই গুছিয়ে ফেলেছেন। সেদিনও কিন্তু বাঙলা ও পাঞ্জাবে তাঁর প্রতিপত্তি লাভ হয়নি। সে প্রতিপত্তিও কংগ্রেস নেতৃত্ব তাঁর হাতে সপে দিল বাঙলায় কংগ্রেস-কৃষক-প্রজা পার্টির মধ্যে আঁতাত না করতে দিয়ে।

বেনথলেরা কম্যুনাল এ্যাওয়ার্ডের সহায়তায় দেশ যেমনভাবে চালানর প্লান করেছিল ঠিক তেমনিভাবে চলতে থাকল। এ একসপেরিমেন্টও বাঙলা দেশে চলল এবং নানাবিধ কারণে সর্বভারতীয়

কংগ্রেসী নেতৃত্বের কাছে এর তাৎপর্য ধরাই পড়ল না। বাঙলাদেশের কংগ্রেসী নেতৃত্বের কাছেও সে তাৎপর্য ধরা পড়েনি। যে সন্ত্রাসবাদ বাঙলাদেশের ইংরেজ শাসনকে নানা প্রকারে অসুবিধায় ফেলে এসেছিল এতদিন ধরে তা ইংরেজ যতটা না বুলেটের সাহায্যে প্রতিহত করতে পেরেছিল তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে কাহিল করে ফেলল কম্যুনাল এ্যাওয়ার্ড দেশে চালু করে।

এ স্বীকার করতেই হবে যে কোন কারণে—হয়ত কেন্দ্রীয় নির্বাচনের ফলাফল লক্ষ্য করেই—জিন্না তখনও একগুঁয়ে হয়ে পড়েননি বলেই কংগ্রেসের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে রাজী হয়েছিলেন। তাঁর নতুন দাবী যা রাজেন্দ্রপ্রসাদের কাছে রেখেছিলেন তা বুঝতে কষ্ট হয়না। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্বের "না বর্জন, না গ্রহণ" নীতি গান্ধীজীর মনের প্রথম প্রতিক্রিয়া স্মরণে রেখে—বুঝতে কষ্ট হয় বৈ কি। এতবড় একটা মোড় ফেরানো নীতি—বেনথলের ষড়যন্ত্রের কথা জেনে-শুনেও কেন কংগ্রেস গ্রহণ করল? কোন্ উদ্দেশ্য সাধনে এ বিষকুম্ভ পয়োমুখ গ্রহণ করতে সাহসী হ'ল?

এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে কম্যুনাল এ্যাওয়ার্ড স্বাকার না করলে ন্যাশানেলিষ্ট মুসলমানদের কোন পাত্তাই কংগ্রেসী রাজনীতিতে আর থাকবে না এবং বিরোধিতা করলে তাদের নির্বাচন দ্বন্দ্বে জয়ী হবার আশা সুদূরপরাহত হবে। অপরে কী কথা—স্বয়ং ডাঃ আনসারী, যাঁকে রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সে কংগ্রেস-ডেলিগেট করে নেবার আপ্রাণ চেষ্টা করেও গান্ধীজী সক্ষম হননি, তিনিও অষ্ট্রিয়ার ভিয়েনা শহর থেকে তারযোগে লণ্ডনে গান্ধীজীকে কম্যুনাল এ্যাওয়ার্ড স্বীকার করে নেবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেছিলেন এবং ডাঃ আনসারীর মত বিশিষ্ট মুসলমান ও শিখ নেতাদের অনুরোধ লক্ষ্য করেই—নিজের ঘোর আপত্তি থাকা সত্ত্বেও—গান্ধীজী শেষ পর্যন্ত কেবল অচ্ছুৎদের সম্পর্কটুকু প্রতিপাদ্য বিষয় রেখে নিজের বিরোধী মনোভাব সংহত করেন।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য রইল যে কম্যুনাল এ্যাওয়ার্ডের ফল ভোগ করবে কেবল বাঙলা ও পাঞ্জাব এবং আসাম ও সিন্ধু। অন্য প্রদেশ-গুলোতে ত কংগ্রেসী রাজত্ব কায়েম রাখা যাবে। এবং সর্বোপরি পাঠান ভূমি তখন অনেকাংশে কংগ্রেসী।

কংগ্রেসী নেতৃত্ব পরিণামে ফলাফল যে বিষময় হবে তা ধরতে না পারলেও অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ নীতি গ্রহণ করলেন। মনে মনে আশা থাকল ফেডারেশন কাঠামো চালু হলে, এ কম্যুনাল এ্যাওয়ার্ডের যে কোন প্রকার বিষক্রিয়াই সমাজদেহে দেখা দিক না কেন, একবার কেন্দ্রীয় সরকার কংগ্রেসী হাতে এলে তা' নির্বিষ করতে বেশী বেগ পেতে হবে না।

কার্যক্ষেত্রে কিন্তু দুটো আশাই নিষ্ফল হল, উদ্দেশ্য ভেস্তে গেল। ন্যাশানেলিস্ট মুসলমান, দুই একটা নির্বাচন কেন্দ্র ছাড়া গোটা ভারতবর্ষে কোথাও কোনই পাত্তা পেলেন না। এবং যথাবিহিত বেনথলের পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র হেতু—যুদ্ধকালীন অজুহাত দেখিয়ে—ফেডারেশন প্ল্যান পরিত্যক্ত হ'ল।

যে মাকাল ফল নিয়ে এত বাক্‌বিতণ্ডা তাও আর সামনে ঝুলিয়ে রাখা হ'ল না। তার স্থানে কম্যুনাল এ্যাওয়ার্ড এবং জিন্নার দাবীগুলো একটির পর একটি কেবল অপ্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করার জন্য—যথা বন্দেমাতরমের লেজ কাটা প্রভৃতি—একদিকে যেমন হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বীজ উপ্ত হ'ল অপর দিকে তেমনি এ সব নির্দেশের জন্য মুসলমানদের মধ্যে কোন প্রকার প্রতিক্রিয়া আনতে কংগ্রেসী নেতৃত্ব কেবল অসমর্থই হ'ল না, সরাসরি দেশ বিভাগ দাবীর সামনে এসে হতভম্ব হয়ে পড়ল। তখন দেশবিভাগ রোখে কে? দুটো জিদ দুতরফ থেকে এসে পরিস্থিতি এমন ঘোরাল করে ফেলল যে সে কানাগলি থেকে বাইরে আসা দুষ্কর।

মুসলীম লীগ ভারতীয় মুসলমানদের মুখপাত্র হ'লেও যে একমাত্র সংস্থা নয় একথা যেমন কংগ্রেস বক্তব্য হ'ল ঠিক অনুরূপ ভাবে

লীগের পাণ্ডা জিন্নার নিকট কংগ্রেস কেবলমাত্র হিন্দু প্রতিষ্ঠান হয়ে থাকল।

কার্যক্ষেত্রে কিন্তু উভয় সংস্থাই এ "কদাপি ন" দাবী অস্বীকার করে গেছে। ইণ্টারিম সরকার যখন চল্লিশের কোঠায় এল এবং নেহরু-প্যাটেল মন্ত্রী হলেন তখন—কংগ্রেস জাতীয় প্রতিষ্ঠান এই দাবী প্রমাণ করবার জন্য—কংগ্রেস ন্যাশনেলিস্ট মুসলমানকে মনোনয়ন করে মন্ত্রীর আসনে বসালেন, প্রথম আসফ আলি এবং পরে মৌলানা আজাদকে। অপর পক্ষে লীগের সংজ্ঞা যে কংগ্রেস কেবল হিন্দু প্রতিষ্ঠান এবং এমন কি সিডিউল্ড কাস্ট হিন্দু প্রতিনিধিত্বের দাবা কংগ্রেস করতে পারে না তা হাতে হাতে প্রমাণ করে দিলেন জিন্না যোগেন মণ্ডলকে ল' মিনিস্টার করে।

তবুও বলতে হবে রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সের পর কম্যুনাল এ্যাওয়ার্ড স্বীকার করে নেবার জন্য গান্ধীজীকে সরিয়ে দিয়েও কংগ্রেসকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। লক্ষ্মৌতে কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন বসল ১৯৩৬ সালে, জবাহরলাল নেহরু সভাপতি এবং প্রধান বিবেচ্য বিষয়টি হ'ল কম্যুনাল এ্যাওয়ার্ড। নেহরু সবে ইয়োরোপ থেকে এসেছেন, মাথার মধ্যে গিজ গিজ করছে ইয়োরোপের ফ্যাসিজিম, ন্যাশনাল সোস্যালিজিম, বিভিষিকা-গুলো। সবকিছু নিন্দে করলেন, অতীতের ও বর্তমানের। এ্যাওয়ার্ড যে তৃতীয় পক্ষের দান অপর দুটো পক্ষকে কুক্ষিগত করবার উদ্দেশ্যে এবং যতদিন ভারতবর্ষে স্বাধীনতা না আসবে ততদিন তৃতীয় পক্ষ যে এসব করবেই একথা নেহরু জানালেন। তারপর কম্যুনাল এ্যাওয়ার্ড সম্পর্কে জানালেন তাঁর মনের কথা: I cannot get excited over the communal issue……Yet the present difficulty remains and has to be faced. Especially our sympathy must go to the people of Bengal who have suffered most from these communal decisions,

as well as from the heavy hand of the Government. Whenever opportunity offers to improve their situation in a friendly way, we must sieze it. But always the background of our actions must be national struggle for independence and the social freedom of the masses.

বাঙলা দেশের দুর্ভাগ্য যে সেদিন কংগ্রেসকে গান্ধীজী নির্দেশিত বনবাস-আদর্শ (to the wilderness) বিচ্যুতি হতে দেখে প্রতিবন্ধক হয়নি। রাগ করে কংগ্রেসীরা অনেকে ন্যাশনেলিস্টদের দলে ঝুঁকে পড়েছেন সেদিন। ধীরেশ চক্রবর্তী হলেন সে কংগ্রেসী সভায় বাঙলা দেশের মুখপাত্র। কম্যুনাল এ্যাওয়ার্ড নিয়ে একটি সংশোধনী প্রস্তাবও পেশ করেছিলেন। তা ভোটে পর্যন্ত গেলনা।

বনেদ প্রস্তুত হবার পর লীগ নির্বাচনের পরমুহূর্ত থেকেই পাকিস্তান সৌধ নির্মাণের দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ করলেন। কংগ্রেস মন্ত্রিত্বাধীনে যে আটটি প্রদেশ ছিল, সেখানে সোজা ভাষায় বলতে গেলে, মুসলমানদের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার করা হচ্ছে এই হ'ল অভিযোগ। এই অভিযোগের ওপরই ভিত্তি করে ফজলুল লক্ষ্ণৌএর লীগ অধিবেশনে সেই "সাতনা" বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

পাকিস্তান দাবীর মতই এ অভিযোগ মুখে মুখে এবং সংবাদ-পত্রের বাদবিতণ্ডার সহায়তায় অতি সহজেই দানা বাঁধতে লাগল। কংগ্রেস নেতৃত্ব এ অভিযোগের সামনে পড়ে কি জানি কেন বেসামাল হয়ে পড়লেন। অভিযোগ অসত্য তা তাঁরা জানতেন তবুও তা দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে যেন কাতর ছিলেন। কি গোপন নীতি অনুসরণার্থে তাঁরা নীরব থাকলেন তার কোন হদিশ পাওয়া যায় না।

তখন জিন্নার সঙ্গে পত্রযোগে সরাসরি আলোচনা আরম্ভ হয়েছে। জবাহরলাল নেহরু পত্রযোগে কলকাতার মুসলমানদের আয়ত্তে যে ইংরেজী পত্রখানা ছিল তাতে তাঁর নিজের প্রদেশ

সম্পর্কে যে সব মিথ্যে কথা বলা হচ্ছিল জিন্নার কাছে তা' উল্লেখ করায় এমন এক উত্তর পেলেন যার কোন ধারণাই নেহরুজীর ছিল না।

পরিষ্কার ভাষায় জিন্না বললেন: তুমি ত আচ্ছা লোক। এ অভিযোগ তুমি আমার কাছে করছ? তুমি কি জান না যে আজকের ভারতবর্ষের আটটি প্রদেশে যেখানে কংগ্রেসীরা মন্ত্রিত্বের গদীতে বসে আছে সেখানে মুসলমানের জীবন, স্বাধীনতা, সম্মান সব কিছু বিপন্ন? (Moslem life, liberty, property and honour not safe in Congress provinces)। নেহরু বাত্‌চিত না করে প্যাটেলের কাছে জিন্নার অভিযোগ পেশ করে নীরব হলেন। প্যাটেলও উচ্চবাচ্য কিছু না করে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার কাছে জিন্না আনীত প্রতিটি অভিযোগ অনুসন্ধান করে তাঁর কাছে রিপোর্ট পাঠাতে উপদেশ দিলেন।

কংগ্রেসের কাজ চল্‌ল অন্তপুরে। লীগের কাজ চল্‌ল সদরে। পরিণামে অবশ্য কংগ্রেসী প্রদেশগুলো থেকে লীগ আনীত অভিযোগগুলো প্রমাণ দিয়ে অসত্য বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু প্রচার মহিমায় জিন্না জয়ী হয়ে থাকলেন।

১৯৩৯ সালে যখন রাজেন্দ্রপ্রসাদ লীগ আনীত অভিযোগগুলো তদন্ত করবার উদ্দেশ্যে ফেডারেল কোর্টের প্রধান বিচারক, স্যার মরিস গাওয়ারের নাম জিন্নার কাছে পেশ করলেন তখন কায়েদে আজম ছেলে মানুষদের কাণ্ড-কারখানা দেখে হেসেই অস্থির। জিন্না জানালেন: The case has been placed before the Viceroy to take it up without delay. He is the proper authority. সেজন্য তোমার প্রস্তাব গ্রহণ করে কোনই লাভ হবে না।

অসত্যের বেশাতি, ভাইসরয় কি করবেন? কিন্তু সে মিথ্যে যে ধরা পড়তে দেওয়া হ'ল না তাতে তো বিলক্ষণ লাভ এবং সে

লাভ পুরোমাত্রাতে কায়েদে আজমের ভাগে পড়ল। পরিণামে জিন্না আনীত অভিযোগগুলো ইউরোপ ও আমেরিকার সংবাদপত্র-গুলোর খোরাক হয়ে পড়ল। তারাও যখন বলতে শুরু করল যে অভিযোগগুলো অপ্রমাণিত এবং সেজন্য অসত্য, তখন লীগ মহল দেখল এখন কোন কিছু না করলে দুর্নাম হবার সম্ভাবনা। 'পীরপুর' কমিটি লীগ তখন বসাল। জিন্না যে চৌদ্দ দফা দাবী পেশ করেছিলেন তার কতটুকু কংগ্রেস প্রদেশগুলো মেনে নিয়েছে তার খোঁজ খবর নেওয়া হ'ল সে কমিটির প্রধান কাজ।

কম্যুনাল এ্যাওয়ার্ড গলাধিকরণ করে এবং প্রপাগাণ্ডা যুদ্ধে হেরে যাবার পর দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা বিশের কোঠায় যা ছিল তা আর থাকল না। এর প্রতিক্রিয়া সবচেয়ে বেশী দেখা দিল বাঙলা-দেশে, যে দেশ সম্পর্কে কংগ্রেসী নেতৃত্ব উপযুক্ত প্রতিনিধির অভাবে কোন হদিশ রাখতে পারেনি সেদিন। এরই সাক্ষাৎ প্রতিঘাতে যে নলিনীরঞ্জন সরকার স্বহস্তে কৃষক প্রজা-লীগ মিলন ঘটিয়েছিলেন তাঁকেই মান্ত্রত্বের গদি ছেড়ে আসতে হয়েছিল। সে প্রসঙ্গ এখানে আলোচ্য নয়।

প্রশ্ন উঠতে পারে কংগ্রেস ৩১ সাল থেকে ৪১ সালে কেন লাগ সম্পর্কে এতটা বৈষ্ণবী মনোভাব দেখাল, যে মনোভাব দেখানর জন্য গান্ধীজীকে পর্যন্ত কংগ্রেস থেকে দূরে থাকতে হয়োছল? এই "কেনর" উত্তর যে যতটা খুঁজতে সমর্থ হবেন তিনি ততটাই ধরতে পারবেন সেই যুগসন্ধিকালে ভারতবর্ষের ন্যাশন্যাল কংগ্রেস কি পরিমাণে এবং অকারণে হিন্দু সাম্প্রদায়িক স্বার্থ বিসর্জন দিয়েও লীগকে আপন করতে চেয়েছিল জাতীয় মুক্তি সাধনের উদ্দেশ্যে।

আদর্শের দিক দিয়ে সে চেষ্টা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয় কিন্তু বাস্তব-ক্ষেত্রে দেখা গেল যে সে চেষ্টাতে—সেদিনের পরিপ্রেক্ষিতে—কেবল লীগের দুর্দমনীয় মনোভাব প্রকট হ'ল ও দাবী চূড়ান্ত হ'ল। মহম্মদ আলি জিন্নাকে কায়েদে আজম বানাতে ইংরেজ যতটা সাহায্য

করেছিল, কংগ্রেস তার চেয়ে এক চুলও কম যায়নি। কংগ্রেস যা করেছিল সে যুগে তা না করে, একমাত্র সিভিল ওয়ার ছাড়া, হয়ত গত্যন্তর ছিল না। পরিণামে সে সিভিল ওয়ারও এসে পড়ল এবং আদর্শচ্যুত কংগ্রেসের পক্ষে অসহায় অবস্থায় দর্শক সেজে থাকতে হয়েছিল।

জেল থেকে মুক্তি পাবার পর গান্ধীজী ঘোষণা করলেন (৩৬-৩৭ সাল) যে, ভবিষ্যতে তিনি অস্পৃশ্যতা দূরিকরণে যুক্ত থাকবেন সুভাষ বসু এবং বিঠল ভাই প্যাটেল তখন ছিলেন ভিয়েনাতে। গান্ধীজীর ঘোষণা পড়ে উভয়ে এক যুক্ত ইস্তেহার যোগে জানালেন— গান্ধীজীর ফাঁকা আওয়াজ। (Gandhi is a spent up force.)

দূর থেকে এবং আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে জাতীয় সমস্যা দেখতে কেবল ভারতীয় কম্যুনিষ্ট দল নয়, ভারতীয় কংগ্রেস নেতারাও একদিন সিদ্ধহস্ত বা ওস্তাদ ছিলেন।

দেশে কংগ্রেস নেতৃত্ব না পারল লীগ-নায়কের মন যোগাতে, না পারল সরকারী নীতি বদলাতে।

গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মত সেই ১৯৩৯ সালে সরকার জানাল যে ফেডারেশন প্রস্তাব যুদ্ধকালের জন্য অন্ততঃ বাতিল থাকল।

যুদ্ধে যোগদান এবং ফেডারেশন গঠন চাপা দেবার প্রতিবাদে কংগ্রেসী প্রদেশগুলোতে নিজেদের মন্ত্রিত্বের অবসান ঘটাল কংগ্রেস। অবস্থান্তর কিন্তু কিছুই হ'ল না কোনখানে, আসাম প্রদেশ ব্যতীত। ভারতীয় শিল্পপতিরা এবং রাজা-মহারাজেরা (হিন্দু ও মুসলমান) যুদ্ধপ্রচেষ্টা, কংগ্রেস মন্ত্রিত্বের গদী ছেড়ে দিলেও, অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন।

মহম্মদ আলি জিন্না এই সুযোগের জন্যই যেন অপেক্ষা করছিলেন। কংগ্রেসী মন্ত্রিত্বের আমলে মুসলমানদের ওপর অত্যাচারের গল্পগুলো তো জমানই ছিল; অনেক কলাকৌশলে সে

অভিযোগগুলো যেমন অপ্রমাণ করতে দেননি তেমনি নিজেও প্রত্যাহার করেননি। প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিত্ব অবসান হবার সঙ্গে সঙ্গে জিন্না মুসলমানের জন্য "মুক্তি-দিবস" (Deliverence Day) ঘোষণা করলেন (২২শে নভেম্বর ১৯৩৯ সাল)।

সারা হিন্দুস্তানের মুসলমান সমাজ উথলে পড়ল জিন্নার আবেদনে। অবশ্য মুসলমান সমাজ তখনও একনায়কত্বের খোঁয়াড়ে যায়নি। জিন্নার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠেছিল মুসলমানদের তরফ থেকে। আবদার রহমান সিদ্দিকীর মুখ আলগা ছিল। "মুক্তি দিবস" সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন যে জিন্নার ভীমরতি ধরেছে (suffering from senile decay)। অবশ্য যথারীতি লাগ ওয়াকিং কমিটির সভায় সে উক্তি প্রকাশ্যে প্রত্যাহারও করেছিলেন তিনি।

"মুক্তি দিবস" কিন্তু বেশী রকমে প্রতিপালিত হ'ল মুসলিম গরিষ্ঠ প্রদেশে যেখানে মুসলমানদের প্রতি কোন অত্যাচার হবার কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না। মুসলিম লঘিষ্ঠ প্রদেশে লাটদের শাসনাধীনে কোন অবস্থান্তর না হলেও, গরিষ্ঠ প্রদেশগুলোতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দফা রফা করা হ'ল।

ফেডারেশন স্কীমকে অবশ্যই গোরে যেতে হয়েছিল ইংরেজের "সদিচ্ছার দরুণ" কায়েদে আজমের অঙ্গুলী হেলনে নয়। একদিকে একটির পর একটি করে কংগ্রেসী নেতৃত্বের অসহায় অবস্থান্তর, এবং অন্যদিকে ইংরেজ বাস্তব অবস্থার সুযোগ নিয়ে কনস্টিটিউসনাল জিন্নার দাবী স্বীকার কাজ চালাতে শুরু করল। জিন্না সগর্বে লর্ড লিনলিথগোকে জানালেন: That no declaration shall either in principle or otherwise be made or any Constitution be made by His Majesty's Government or Parliament without the approval and the consent of two major communities of India viz. the Mussalmans and the Hindus.

লিনলিথগো জিন্নার কথাতে সায় দিয়ে জানালেন: কোন ভয় নেই; His Majesty's Government are under no misapprehension as to the importance of the contentment of the Muslims to the stability and success of India. You need, therefore, have no fear. কেবল বর্তমানকে নয়, ভবিষ্যৎকেও পঙ্গু করবার এবং সবকিছু ভেঙে দেবার ব্যবস্থা পাকা করে রাখা হ'ল।

এই পরিস্থিতিতে ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে লাহোর অধিবেশনে লীগ "পাকিস্তান" প্রস্তাব গ্রহণ করল। আবুল কাশেম ফজলুল হক সে প্রস্তাব এনেছিলেন। প্রস্তাবে বলা ছিল—That geographically contiguous units are demarcated into regions which should be so constituted, with such territorial readjustments as may be necessary, that the areas in which Muslims are numerically in a majority as in the north-western and eastern zones of India should be grouped to constitute Independent States in which constituent units shall be autonomous and sovereign.

মৌলানা আজাদ একদিন পাকিস্তান প্রসঙ্গ আলোচনায় বলেছিলেন যে ভারতবর্ষে সংখ্যায় ৮০ মিলিয়ন মুসলমান, তারা কেন ভয় খায়? ফজলুল পাকিস্তান প্রস্তাব পেশ করবার সময় উত্তরে বলেন, যদিও সে উক্তি সত্য তবুও বলতে হবে যে, এরা এমনভাবে ছড়িয়ে আছে যে এমনকি পাঞ্জাবে বা বাঙলাতেও মুসলমানেরা "not in effective majority." অতীতে সিন্ধুপ্রদেশের লীগ মঞ্চ হতে ফজলুল মহম্মদ বিন কাশেমের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন যে, যদি ১২ বছরের মুসলমান ছেলে গুটিকতক লোক যোগাড় করে সিন্ধুপ্রদেশ মুসলমানের অধীনে আনতে পারেন, তবে আমরা কেন ভয় খাব?

ফজলুলের লাহোর বক্তৃতা কিন্তু একটু অন্য রকমের ছিল। ঠিক ফজলুলী কায়দায় দেননি। ইতিহাস বিশেষ করে মুসলমানের অতীত ইতিহাসের নজীর দিয়েই তিনি বক্তৃতা দিতে ভালবাসতেন। কিন্তু লাহোরে তিনি হয়ে পড়েছিলেন যুক্তিবাদী। মতান্তর তখন ধরা না পড়লেও লীগের সঙ্গে মনান্তর যে ঘটতে চলেছে তা অনুমান করা যায় তাঁর লাহোর বক্তৃতা পড়ে। বাঙলার সেই সময়ের রাজনীতির ওলট পালট দেখলে অতি সহজেই সে মনান্তর চোখে পড়ে।

কায়েদে আজম জিন্না লাহোরে পরিষ্কার ভাষায় জানালেন, ভারতবর্ষের ১২০০ বৎসরের ইতিহাসে ঐক্য বলে কিছুই ছিল না। যা ছিল তা হ'ল হিন্দু ভারতবর্ষ, মুসলিম ভারতবর্ষ। বর্তমানে যে ঐক্য দেখতে পাওয়া যায় তা একদম ইংরেজী দান। প্রায় দেড়শত বছর রাজত্ব করে ইংরেজ সেই লোক-দেখানো ঐক্য ভারতবর্ষে রেখে পালাবে না সে বিষয়ে তাঁর দৃঢ় ধারণাই আছে।

পাকিস্তানের দাবী যখন লাহোরে পাশ হ'ল তখন ইংরেজ নাজি জার্মেনীর কাছে মার খাচ্ছে। ভারতবর্ষে কংগ্রেসের দাবীতেও অপ্রসন্ন—অন্ততঃ যে আমেরিকার কাছ থেকে রসদ যোগাড় করতে হচ্ছে সেখানে মুখ দেখাতে একটু লজ্জা পেতে হচ্ছে; এ অবস্থায় পাকিস্তান দাবী পেশ হলে তার মনটা অনেক হাল্কাই হ'ল। যাক একটা প্রতিদাবী এল!

অপরপক্ষে, ভারতবর্ষে বিশেষ করে মুসলমান সমাজে এল প্রতিক্রিয়া। আজাদ-মুসলমান, ন্যাশনেলিস্ট মুসলমান সংস্থাগুলো ভ্যাবাচাকা খেল। বেশ তো উত্তর-পশ্চিম বা উত্তর-পূর্বে পাকিস্তান হবে, কিন্তু আমাদের কি হবে? লাহোরে যদি মুসলমান রাজত্ব হয় তবে লক্ষ্ণৌতে হিন্দু রাজত্ব হবেই হবে। তার কি? সবচেয়ে ঘাবড়ে গেল সেইসব রোমান্টিকেরা যারা পাঞ্জাবে বা বাঙলায় চেয়েছিল পাকিস্তান মুসলমান সংখ্যা-গরিষ্ঠ হেতু এবং হায়দ্রাবাদে চেয়েছিল ঐ ধরণের ওসমানিস্তান মুসলমান রাজপরিবার থাকার

অজুহাতে। চৌধুরী খলিকুজ্জমান সে অধিবেশনে যখন প্রস্তাবটি গৃহীত হতে চলেছে তখন উপস্থিত হলেন এবং As soon as I entered the hall Nawab Sahib of Chattari and Sir Sultan Ahmad called me aside and complained to me that sufficient safeguards for the minority provinces Muslims had not been provided in the resolution and that I should take up the matter. ফজলুল হক হলেন প্রস্তাবক এবং চৌধুরী সাহেব প্রস্তাবের সমর্থক হয়ে জানালেন The Muslims in the minority provinces should not be afraid as to what would happen to them after the partition of India into Hindu India and Muslim India. The same thing could happen to them as to the minorities in the Punjab and Bengal." মুসলমান সমাজে এতদিন যে একমুখী লীগ নিয়ন্ত্রিত ও কায়েদ আজম চালিত আন্দোলনে বেগধারা বহমান ছিল তা যেন থমকে দাঁড়াল।

এ যুগকে উদ্যোগ পর্বাধ্যায় বলা যেতে পারে। কায়েদে আজম সময়ে অসময়ে হিন্দু শিখদের উদ্দেশ্যে বাণী দিয়ে চলেছেন যাতে তারা সহজমনে ও ভারতবর্ষের ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে দেশটাকে ভাগ করে হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান বানাতে রাজী হয়। অস্পৃশ্যদের নিয়ে আন্দোলন করবার সম্ভাবনা নেই। পুনা প্যাক্ট সরকারী সমর্থন পেয়েছে তখন। সেজন্য আধা সরকারী, আধা লীগ সহযোগে দ্রাবিড়দের সঙ্গে গোপনে আঁতাত করবার চেষ্টা চলল। শিখদের হাতে আনবার চেষ্টা কম করা হয়নি। অপরদিকে দৃঢ়হস্তে মুসলমানেরা, বিশেষ করে লীগের সঙ্গে ওঠা-বসা করতে অভ্যস্ত মুসলমানেরা, যাতে পাকিস্তান দাবীতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে না পড়েন তার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হ'ল। সুযোগও এল।

আর্মি ইণ্ডিয়ানিজেসন কমিটি (Army Indianisation Commitee) বড়লাট বসালেন এবং তাতে লীগের চাঁইদের বিশেষ করে পাঞ্জাবী লীগপন্থীদের নিয়ে কমিটি গড়া হ'ল। লাহোরের পর মাদ্রাজ অধিবেশনে মহম্মদ আলি জিন্না কায়েদে আজম বা সোজা কথায় কনস্টিটিউসনাল ডিক্টেটর হন—সোনার পাথরবাটি! কিন্তু অবাস্তব কল্পনা মোটেই নয়। লীগ ওয়ার্কিং কমিটি, এক প্রস্তাবে জানিয়ে দিলেন (১৯৪১ সাল) যে এক কায়েদে আজম বড় লাটের সঙ্গে এইসব কমিটি গঠন বিষয় নিয়ে আলোচনা চালাচ্ছেন। যে পর্যন্ত সন্তোষজনক উত্তর না পাওয়া যায় সে পর্যন্ত কোন মুসলমানই যেন এসব কমিটিতে যোগদান না করেন। সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট মৌলানা আজাদের সঙ্গে পাঞ্জাবের ও বাঙলার প্রধান মন্ত্রীদ্বয়, স্যার সেকেন্দার হায়াত খান এবং আবুল কাশেম ফজলুল হক, যে মোলাকাত করেছিলেন, তা ব্যক্তিগত নিমন্ত্রণ রক্ষা কাজ হলেও, তাঁদের সাবধান করে দেওয়া হ'ল যেন ভবিষ্যতে লীগ প্রেসিডেন্টের অনুমতি ব্যতীত এপ্রকার দেখাশুনা কেউ না করে। বড়লাট ন্যাসানেল ডিফেনস্ কাউনসিল (National Defence Council) গড়বার প্রস্তাব করে বাঙলার ফজলুল হক, পাঞ্জাবের স্যার সেকেন্দার হায়াত এবং আসামের সাহুল্লা, তিনপ্রধানমন্ত্রীকে নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন সেই কাউন্সিলের সদস্য হবার জন্য। তিনজনেই ভাইসরয়ের টোপ গিলে ফেলেছেন।

জিন্না রেগে আগুন। তিনজনকেই ধমক কষলেন: 'কার কথা মত সেখানে যেতে রাজী হলে? যদি নিজেদের ভাল চাও তো এখুনি ইস্তাফা (resignation) দাও'। সেকেন্দার ও সাহুল্লা বিনা বাক্যব্যয়ে সে হুকুম মেনে নিলেন। ফজলুল গররাজী। জিন্নাও হেঁট হবার পাত্র নন। পরিণামে এজন্য ফজলুলকে কাউন্সিল ও লীগ থেকে সরে পড়তে হয়েছিল।

প্রতিক্রিয়া শুরু হ'ল তখুনি বাঙলার লীগ মহলে, কিন্তু সে আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

ভাইসরয়ের সঙ্গে জিন্না পত্রযোগে যে দাবী পেশ করলেন তার মর্মকথা হ'ল ভবিষ্যতের ভাইসরয়ের কাউন্সিলের সদস্য-সংখ্যা সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থানুসারে ঠিক করতে হবে। কায়েদে আজমের দাবী সে কাউন্সিলে হিন্দু ও মুসলমান প্রতিনিধিদের সংখ্যা সমান হবে। যেসব প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিত্বের গদী ছেড়ে দিয়েছে সেখানে বেসরকারী মুসলমান উপদেষ্টা নিতে হবে। ওয়ার কমিটিতে মুসলমানদের সংখ্যা পনের জনের কম যেন না হয়। এবং এসব মুসলমান প্রতিনিধিদের সে কমিটিতে পাঠাবার অধিকার থাকবে একমাত্র মুসলিম লীগের।

কংগ্রেসকে নিয়ে যে আর "খেল" খেলবার সম্ভাবনা নেই তা সেই ১৯৪০ সাল থেকেই ইংরেজ বুঝেছিল। কংগ্রেসও বিলেতের গোল টেব্‌ল কনফারেন্সে গান্ধীজীর মাধ্যমে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল তাতে এটুকু বুঝেছিল যে, ইংরেজ শাসন মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত মুসলমানদের সঙ্গে কোন সুষ্ঠু আলোচনাই সম্ভব নয়। গোটা ১৯৩৯, ১৯৪০ এবং ১৯৪১ সালগুলো যেন কংগ্রেসের বনপর্ব। তখন যেন করবার কিছুই নেই।

মুসলিম ম্যাস কনট্যাক্ট (mass contact) করতে গিয়ে দেখল সমূহ বিপদ। লীগের প্রতিপত্তিই তাতে বেড়ে চলল। লীগের তরফ থেকে আর কিছুই করতে হ'ল না। একা কায়েদে আজম স্বচেষ্টায় লীগকে এমন এক স্ট্রাটেজিক সংস্থা করে ফেলেছেন যা দেখে যেমন কংগ্রেস তেমনি ইংরেজ শাসনকর্তারা সচকিত। আর কি চাই ?

সবদিক দিয়ে অবস্থা বিবেচনা করে ইংরেজ ডিপ্লোমেসি দেখল কনস্টিটিউশনাল ডিক্টেটর জিন্নার বাড়াবাড়ি কমানর সময় আগত।

জিন্নার পত্রের উত্তরে তার দাবীগুলো অগ্রাহ্য করে অতি

পরিষ্কারভাবে লিনলিথগো এবার জানালেন, ওয়ার কমিটিতে কাকে নেওয়া হবে বা না হবে সে গভর্ণর জেনারেলের বিবেচ্য। এ ক্ষমতা কোন রাজনৈতিক দলের হাতে দেওয়া হবে না।

সরাসরি লীগ প্রেসিডেন্টের দাবী লিনলিথগো অগ্রাহ্য করলেন, কিন্তু তাতে কনষ্টিটিউশনাল জিন্না ভেঙে পড়েননি। অথবা সত্ত জাগ্রত লীগ সংস্থাতে কোনই প্রতিক্রিয়া আসেনি। মহম্মদ আলি জিন্নার বাহাদুরীই ছিল সেখানে। তিনি লীগকে বিধান সভা, বড় জোর শহরের ময়দানে নামাতে রাজী ছিলেন, কিন্তু দেশের প্রান্তরে, জঙ্গলে পাঠাতে কিছুতেই সম্মত ছিলেন না। এখানেই তাঁর এবং মৌলানা মহম্মদ আলির নেতৃত্বের পার্থক্য ছিল। ঐদিক দিয়ে বিচার করলে সে সময়ের লীগ নেতৃত্বে যে সব পাণ্ডারা সামনে এসে পড়েছিলেন যথা নবাবজাদা লিয়াকৎ আলি, চৌধুরী খলিকুজ্জমান, নবাব ইসমাইল খান, স্যার সেকেন্দার হায়াত খান, অথবা খাজা স্যার নাজেমুদ্দিন, এদের সবার সঙ্গে আবুল কাশেম ফজলুল হক এবং হুসেন সহিদ সুরাবর্দীর নেতৃত্বে অনেক ব্যবধান ছিল। জনতার পরিচয় লাভ না করেই মহম্মদ আলি জিন্না পাকিস্তান কায়েম করেছিলেন। সেদিনকার পরিপ্রেক্ষিতে তা তাঁর পক্ষে সম্ভবপরই হয়েছিল। আজ তাঁর উত্তরপুরুষদের রক্ত দিয়ে সে জনতা-পরিচিতি লাভ করতে হচ্ছে।

মহম্মদ আলি জিন্নাকে আর একবার ইংরেজ দত্ত অপমান সোজাসুজি একই ধরণে হজম করতে হয়েছিল।

সেই ১৯৩৯ সালে গান্ধীজীকে পলিটিক্স থেকে সরিয়ে দিয়ে এবং নানা ব্যর্থ চেষ্টার পর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সঠিক বুঝতে পারল তৃতীয় পক্ষ যতদিন আছে ততদিন সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিরসন অসম্ভব। A final settlement, of the communal question is impossible so long various parties are to look at the third party. কিন্তু উপায় কি? কংগ্রেস, এমন

কি গান্ধীজীকে কোণ-ঠাসা করে কম্যুনাল এ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করেছিল, পরে মন্ত্রিত্বের অবসান ঘটাল তাতেও ইংরেজ তার নীতি বদলাতে রাজী হ'ল না। বরং লীগের মুক্তি-দিবস প্রভৃতি প্রতিপালনে উল্টো ফল ফল্‌ল। সাম্প্রদায়িকতার বিষ আরও ছড়িয়ে পড়ল। লাহোর প্রস্তাব নিয়ে যে আন্দোলন শুরু হ'ল তাতে মুসলমান সমাজে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল বটে কিন্তু তা ওপর তলায়। সাধারণ মুসলমান বিশেষ করে মুসলিম লঘিষ্ঠ প্রদেশগুলো যেন সে প্রস্তাব সমর্থনের জন্য খেপে উঠল।

কঃ পন্থা?—সেই সনাতন প্রশ্ন। নববর্ষ আবাহন করে রবীন্দ্রনাথ একদিন বলেছিলেন যে, যেদিন ঝড়ের গর্জনে ইংরেজী বক্তৃতা শুনতে পাওয়া যাবে না সেদিন সেই গুরুর কাছে আবার আসতে হবে প্রেরণা নিতে, মন্ত্রপূত হতে। বারবার প্রতিহত হয়ে কংগ্রেস নেতৃত্ব আবার ধন্না দিল মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর কাছে: বাঁচাও। ১৯৪২ সালের Young India পড়ুন এবং দেখুন প্যাটেল-সুভাষ যাঁকে ফাঁকা আওয়াজ (spent up force) বলেছিলেন, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যাঁকে অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা করে দূরে রেখেছিলেন সেই চল্লিশের কোঠায়, সত্যি সাত্য তিনি কি ছিলেন।

গত শতাব্দ অন্তে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষে ফিরে এসে যেমন তোলপাড় করে দিয়েছিলেন সারা দেশ তাঁর বক্তব্যে ও মন্তব্যে ঠিক অনুরূপ হ'ল সমগ্র দেশের রাজনৈতিক অবস্থা বিয়াল্লিশ সালে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর বক্তব্যে ও কর্মকাণ্ডে।

পূর্ব এশিয়ায় যুদ্ধ এসে পড়েছে। সিঙাপুর, মালয়, বার্মা জাপানের করায়ত্ত। ভারতবর্ষের যেন করবার কিছু নেই। ইংরেজ দাবী তো গ্রহণ করবেই না, বরং সে দাবী ভবিষ্যতে যাতে আর না উঠতে পারে তার জন্য যতকিছু অকর্ম ও কুকর্ম সব করতে প্রস্তুত।

এদিকে দশ বছরের পণ্ডশ্রম। পণ্ডশ্রমই বলি কেন না উত্তরোত্তর সাম্প্রদায়িক উস্কানী দেবার ফলে, যে বিবাদ দেশে এসে পড়েছে তা ভেঙে পড়তে চায়। "মুক্তি দিবস" (Deliverence Day) এর পর এল "পাকিস্তান দিবস"—লাহোর প্রস্তাব স্মরণে রাখবার উদ্দেশ্যে। শুরু হ'ল সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা—রেকর্ডের দিক দিয়ে এইটিই হ'ল প্রথম নিছক রাজনৈতিক মতলবে সাধিত সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা। ঢাকা থেকে হিন্দু বাঙালী ভিটে-মাটি ছেড়ে ছুটল ত্রিপুরা রাজ্যে (১৯৪১ সাল)। কলকাতায় রাজা-বাজারে মহরমের তাজিয়া নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে ট্রামের তার কাটবার দাবী করল অ-বাঙালী মুসলমানেরা। আবুল কাশেম ফজলুল হক, খাজা স্যার নাজেমুদ্দিন সে জনতাকে শান্ত করতে উপস্থিত হলে ইট-পাটকেলের গুলি খেয়ে পালালেন। উর্দু বাতচিতে অভ্যস্ত নাজেমুদ্দিনও অপমানিত হয়েছিলেন। কলকাতা মিউনিসিপালিটিতে যুক্ত নির্বাচন বন্ধ করে পৃথক্ নির্বাচন প্রথা চালু করবার বিল বিধান সভায় এসেছে। পূর্বেকার ব্যবস্থানুযায়ী সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে সরকারী চাকরী বণ্টনের যে ব্যবস্থা ছিল তা' বদলে ফেলবার জন্য দাবী উঠেছে এবং সর্বোপার মৌলানা আক্রাম খাঁর "আজাদ" পত্রিকা পরিষ্কার ভাষায় জানালেন, নেংটি ইন্দুরদের জানিয়ে দেবার সময় এসেছে যে পশুরাজ সিংহ কেবল ঘুমন্ত অবস্থায় শুয়ে আছে, সে মরে নি। ক্রমে আমেদাবাদ, বোম্বাই, বিহার শরিফে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ল। সেকালের "আজাদ" পত্রিকার ফাইল ঘাঁটলে গোটা ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে কি চলেছিল তার আভাস পাওয়া যায়। হিন্দু মহাসভা লীগকে এবং লীগ কংগ্রেসকে দোষারোপ করতে ব্যস্ত। হিন্দু-মুসলমান সংবাদপত্রগুলো পরস্পরকে অভিযুক্ত করেছেন। কারও বক্রদৃষ্টি, কারও বা রক্তচক্ষু, বদ্ধমুষ্টি—হাসি কোন মুখেই নেই। দূর থেকে চাপাহাসিতে সুখী একমাত্র ইংরেজ বণিক এবং ইংরেজ শাসকেরা ও তাদের মুখপত্রগুলো।

যদি জাপানী যুদ্ধবাজরা আর একটু দেরী করে (অক্টোবর ১৯৪১) আসরে নামত তবে কি হ'ত?

মুহূর্তটা কেমন ছিল, তা সঠিক ধারণা আজ করা কি সম্ভব? ৪২-এর আন্দোলন জাপানের ওপর লক্ষ্য রেখে আসেনি, সুভাষ বসু জাপানে আছেন কি জার্মেনীতে আছেন তাও সাধারণের লক্ষ্যের বিষয় ছিল না। এ যুদ্ধ জন-যুদ্ধ কি ইম্পিরিয়ালিস্টদের যুদ্ধ তা পরিষ্কার করবার জন্য সে আন্দোলন আসেনি। এ আন্দোলন, অতি সহজেই ইংরেজ কারসাজীতে, কংগ্রেস ও গান্ধী যাতে কোনই সুযোগ না পায় তাঁদের দাবী জোরাল করতে তারই প্রতিক্রিয়া হয়ে দেখা দিয়েছিল। যখন দেশ অভাবে ও অনটনে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়তে আরম্ভ করেছে, যখন তাচ্ছিল্যে ও অপমানে মানুষ মরিয়া হয়ে পড়েছে তখন সেই ঝড়-ঝাপটার মধ্যে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর কাছে থেকে বিয়াল্লিশের ডাক এল। এত বড় ও ব্যাপক আহ্বান অতীত ভারতবর্ষে আর কখন এসেছে কি না সন্দেহ।

আন্দোলন বিফলে গিয়েছিল অনেক কারণে, কিন্তু এর যে স্বতঃস্ফূর্ত রূপ ক্ষণিকের জন্য প্রকাশ পেয়েছিল তাতে সেই মুহূর্তের আভ্যন্তরীণ সামাজিক চিত্রখানিই ধরা পড়েছিল।

সেদিন যা'রা সেই ঘুর্ণাবর্তের বাইরে সমবেদনশীল দর্শক হয়ে থাকতে পেরেছিলেন, কেবল তাঁরাই সেদিনের জাতীয় মর্মবেদনা কিরূপ ছিল তার পরিচয় লাভ করেছিলেন। সেই চল্লিশ দশকের গোড়াতে রবীন্দ্রনাথ আপন জন্মদিন উপলক্ষ করে "সভ্যতার সঙ্কট" (crisis in civilisation) প্রবন্ধে সেদিনকের ভারতবর্ষের কথা চিরকালের জন্য ইতিহাসের পাতায় যুক্ত করে রেখে গেছেন। (১৪ই এপ্রিল, ১৯৪১ সাল)

It is no longer possible for me to retain any respect for that mockery of civilisation which believes in ruling by force and has no faith in

freedom at all. By their miserly denial of all that is best in their civilisation by withholding free human relationship from the Indians the English have effectively closed for us all paths to progress."

জালিনওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করে কবি ইংরেজের কাছে অপাঙক্তেয় হয়ে পড়েছিলেন একদিন। আবার চল্লিশের কোঠায় আরও বড় অভিযোগ করাতে সেদিনকার পেটো-সাহেবদের চক্ষুশূল হয়ে পড়লেন। এদের চোখে গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে ছুটো বড় তুশমন ছিল—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যে ব্যঙ্গ তামাসা এরা করত তা ছিল গুপ্ত। কারণ প্রকাশ্যে করলে নিজেদের বিছাই ধরা পড়বার সম্ভাবনা ছিল। আর মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে এরা crank's cornerএ স্থান দিয়েছিল।

দেশের আবহাওয়া যখন উত্তপ্ত হয়ে পড়েছে, স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপস-এর দৌত্য কোন কাজেই এল না, লীগ প্রেসিডেণ্টের দেশ-বিভাগ দাবী দৃঢ়তর হয়ে পড়ছে, তখন হঠাৎ মাদ্রাজের বিধান সভার কংগ্রেসী দল এক প্রস্তাব গ্রহণ করে ফেলেছিল যাতে সমগ্র দেশ চমকে উঠেছিল। সে প্রস্তাবে জানান হয় যে অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটী ভারতবর্ষে জাতীয় সরকার গঠন করবার জন্য মুসলিম লীগের দেশ বিভাগ দাবী মেনে নিক। প্রস্তাবক দলপতি স্বয়ং চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী। সে প্রস্তাব দলের সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হল। (২৩শে এপ্রিল ১৯৪২ সাল)।

এর প্রতিবাদ কংগ্রেসী মহল হতে তৎক্ষণাৎ উঠেছিল। বাঙলা দেশের কিরণশঙ্কর রায়, দিল্লী হতে কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট মৌলানা আজাদ প্রতিবাদ করলেন এবং কংগ্রেস কমিটীও সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছিল। বাদ্‌বিতণ্ডা নতুন করে শুরু হ'ল। ফলে রাজা-

গোপালাচারী কংগ্রেস থেকে দূরে সরে গেলেন এবং বিয়াল্লিশের "কুইট-ইণ্ডিয়া" আন্দোলনে তাঁকে জেলে যেতে হ'ল না।

গান্ধীজীর সঙ্গে পরে আলোচনায় পত্রযোগে তিনি সে ঐতিহাসিক প্রস্তাব কেন আনলেন তার কারণটিও দিয়েছিলেন। রাজাগোপালাচারী মনে করেছিলেন—যদিও গান্ধীজী তাতে সায় দিতে পারেননি—যে জাপানের ভারত আক্রমণ সম্ভাবনা খুবই বেশী, অতএব তা প্রতিরোধ করতে জাতীয় সরকার গঠন করা উচিত আর সেইজন্যই দরকার দেশ বিভাগ দাবী মেনে নেওয়া।

গান্ধীজী কম্যুনাল এ্যাওয়ার্ডের প্রশ্নে কংগ্রেসী নেতৃত্বের সঙ্গে মতান্তর হওয়াতে যেমন দূরে সরে গিয়েছিলেন, রাজাগোপালাচারীর প্রস্তাব নিয়ে তেমন মনোভাব দেখাননি। তিনি জানালেন: রাজাজীর প্রস্তাব তাঁর সহযোগীদের কাছে অগ্রাহ্য হলেও তাঁর বক্তব্য শোনা উচিত। There is no doubt that Rajaji is handling a cause which has isolated him from his colleagues. The extraordinary energy with which he has thrown himself into the controversy of which he is the author reflects the greatest credit on him. He is entitled to a respectful hearing. His motive is lofty.

গান্ধীজীর নরম সুর দেখে রাজাজী ভাবলেন তাঁর প্রস্তাব গান্ধীজী অগ্রাহ্য করেননি। পত্রযোগে গান্ধীজী কেবল জিজ্ঞাসা করেছিলেন: তুমি যে প্রস্তাব দিয়েছ তা'তে "পাকিস্তান" যে কি বস্তু, এর কি সীমানা এবং কেমন করে লোকের মতামত নিয়ে বা উপেক্ষা করেই কায়েম করতে হবে—এসব বিষয় ভেবেছ কি? লীগের লাহোর প্রস্তাবে এসব দিকগুলো পরিষ্কার করা হয়নি।

যখন কংগ্রেস মহলে নতুন করে "পাকিস্থান" নিয়ে আলোচনা

চলেছে তখন মাদ্রাজের লীগ অধিবেশনে আবুল কাশেম ফজলুল হককে দ্বিতীয়বার লীগ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। তাঁর অপরাধ লীগের চোখে অনেক। সবচেয়ে বড় অপরাধ যে তিনি পত্রযোগে লীগ-প্রেসিডেন্টের মেজাজ ও আচরণ নিয়ে কঠোর মন্তব্য করেছেন। শ্যামা-হক মিনিস্ট্রি বাঙলা দেশে এল এরই শেষ পরিণতি হিসাবে।

প্রায় একই সময়ে সিরাজগঞ্জে জিন্না বাঙলা দেশের লীগের অধিবেশনে সে মন্ত্রীসভার প্রতি কটাক্ষ করে বলেছিলন: এটা এক অদ্ভুত ব্যবস্থা, ২৫০ সদস্য নিয়ে যে হাউস তাতে ১৭ জনকে সরকারী হুইপ এবং সেক্রেটারী করতে দেওয়া হল। ১১৯ জন হ'ল দলের সদস্য এবং এদের মধ্যে ৫০ জনকে কোন না কোন প্রকারে সরকারী কাজ দেওয়া হয়েছে! জিন্নার সে বক্তব্য ছিল অসত্য। সত্যিই শ্যামা-হক মন্ত্রিত্বকালে মন্ত্রী বা হুইপ বা পার্লামেন্টারী সেক্রেটারীর সংখ্যা ছিল সবচেয়ে কম। এবং অতিমাত্রায় বেশী সে সংখ্যা হয়েছিল পরে জিন্না-সমর্থিত নাজেমুদ্দিন সরকার গঠিত হলে।

মোটের ওপর তালে গোলে "কুইট-ইণ্ডিয়া" আন্দোলন এসে গেল ১৯৪২ সালে। সে আন্দোলন সম্পর্কে কনস্টিটিউসনাল জিন্না মতামত স্পষ্ট ভাষায় জানালেন: The latest decision of the Congress resolving to launch a mass movement if the British do not withdraw immediately from India is the culminating point in the policy and programme of Mr. Gandhi and his Hindu Congress of blackmailing the British and coercing them to concede a system of Government and transfer power to that Government which would establish a Hindu Raj immediately after the aegis of the British bayonets thereby throwing the Muslims and other minorities

and their interests at the mercy of the Congress Raj. (31st July 1942)

কাছাকাছি যে ঘটনাগুলো ঘটল তা হ'ল গান্ধীজী সহ কংগ্রেস নেতৃত্বের জেলবাস, কম্যুনিষ্ট পার্টির পুনর্জন্ম লাভ (legalised), মেদিনীপুরে চরম অত্যাচার ও ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পদত্যাগ এবং বাঙলা দেশে আগত দুর্ভাগ্যের ইঙ্গিত।

কংগ্রেস জেলে যাবার পর রাজাগোপালাচারী জানালেন: কংগ্রেস ত জেলে গেল। হয়ত কংগ্রেসের ধারণা সে যা' করতে পারত তা' করেছে। এখন সব দায়িত্ব গিয়ে পড়ল লীগের ওপর। সে দায়িত্ব নতুন পরিপ্রেক্ষিতে আরও বড় হয়ে পড়েছে। নবজন্মলাভ করে কম্যুনিষ্ট পার্টির পি. সি. যোশী, রাজাগোপালাচারীকে সমর্থন করে এবং জিন্নাকে উদ্দেশ্য করে একই ধরণের অনুরোধ করলেন।

সেদিকে কোন উচ্যবাচ্য না করে জিন্না ইংরেজকে প্রশ্ন করলেন: তোমরা কি ভেবেছ? যখন সাময়িক সরকার (Provisional Government) বানাতে সকলের সম্পূর্ণ সহযোগিতা পেলেনা, তখন তোমরা দশ কোটি মুসলমানকে নিয়ে কাজ শুরু করোনা কেন?

কাকস্য পরিবেদনা? অতি ধীর ও সুস্থ মেজাজে ইংরেজ জিন্না-বাণী ও চোখ-রাঙানো সেই ৪২-সাল হতে প্রায় তিন বছর ধরে একটুও টুঁ-টা না করে শুনে এবং দেখে চলল। কনস্টিটিউসনাল জিন্না কোন প্রকারেই অবস্থান্তর ঘটাতে পারেননি, পাকিস্তান কায়েম করা ত দূরের কথা।

পাকিস্তান কি বস্তু তার আকারই বা কি?—তা নিয়ে আলাপ আলোচনা চলল এযুগ ধরে। আত্ম-নিয়ন্ত্রণের (self determination) দোহাই দিয়ে নব-জাত কম্যুনিষ্ট পার্টি পাকিস্তান দাবী সমর্থন করল।

বোম্বাইতে তাদের প্রথম পার্টি অধিবেশনে যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হ'ল তা' আজ সুখপাঠ্যই বটে। রাজাগোপালাচারী সমর্থন পেলেন। এখানে মনে রাখা উচিত হবে যে তখনও অন্ধ্র প্রদেশ গঠিত হয়নি, বলিদান অপেক্ষা করছে।

সেদিন পাকিস্তান দাবী সমর্থন করা যুক্তিযুক্ত হয়েছিল কি না এ প্রশ্নের উত্তর কি রাজাগোপালাচারী বা কি কম্যুনিষ্ট পার্টি দেননি। উভয়েই ইতিহাসের সামনে নীরব। রাজাগোপালাচারী একদিন মাদ্রাজে বলেছিলেন (১৯৪২ সালের জুলাই) যে পাকিস্তান সম্পর্কে তাঁর কল্পনা এবং জিন্না ও কম্যুনিষ্ট পার্টির কল্পনার মধ্যে কোনই বিরোধ নেই। কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে রাজাজীর পাকিস্তান নিয়ে মতবিরোধ না থাকতে পারে—অন্ততঃ প্রকাশ পায়নি, কিন্তু জিন্না-কল্পিত পাকিস্তান যে অন্য বস্তু ছিল তা ১৯৪৫ সালে জিন্না অতি পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন।

রাজাগোপালাচারী এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির সমর্থন না পেলে যে পাকিস্তান দাবী কায়েম হ'ত না এ ধারণাও ঠিক হবে না। লীগের ও কংগ্রেসের স্ব-রচিত মানসিক ব্যূহের গঠন হেতু সে দাবী একদিন আসতই। এঁদের সমর্থনে সে দাবী কেবল জোরাল হ'ল এবং কায়েদে আজমের প্রচার কাজ সহজ হ'ল।

জেলে গিয়ে গান্ধীজী বড়লাটের সঙ্গে পত্রযোগে "কুইট-ইণ্ডিয়া" আন্দোলনের মর্মার্থ এবং দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সুস্পষ্টভাবে জানালেন। তিনি বললেন যে জিন্নাকে নিয়ে সাময়িক গভর্ণমেণ্ট (Provisional Government) গঠন করলে কংগ্রেস কোন আপত্তি করবে না। কিন্তু কি দায় পড়েছে ইংরেজের সেদিকে অগ্রসর হতে। গোলমাল যারা করে থাকে তাদের ত জেলে পুরে রাখা গেল, কনস্টিটিউসনালদের নিয়ে অনেক খেল্ খেলা যাবে।

জিন্না যত কথাই বলেন ইংরেজ ততই চুপ করে থাকে।

কোনদিকে কোনই সুবিধে না করতে পেরে প্রদেশগুলোর প্রতি কায়েদে আজম মনোযোগ দিলেন।

বাঙলা বিধানসভায় পেটো-সাহেবরা ফজলুলী ক্যাবিনেটের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেও যখন হেরে গেল (১৬ই মার্চ, ১৯৪৩) তখন লাটসাহেব, হারবার্ট, জোর করেই তাদের তাড়িয়ে এবং নাজেমুদ্দিন সরকার গঠন করলে জিন্না মুসলিম লীগের ক্রমবর্ধমান প্রতিপত্তির কথা উল্লেখ করে বললেন : We have gone through the crucible fire in Bengal today. Fazlul Huq is no more and I hope for the rest of his life he will be no more. Bengal has shown the way for others. For the last sixteen months Muslims of Bengal have been harassed and persecuted by a man who, I am sorry to say, is a Mussalman. Today it has been rewarded. For I have just got news that the Huq Ministry has been forced to desslove because of a successful vote of no-cofidence by the Muslim League. আজ উভয়েই পরলোকে, কিন্তু জিন্না-মন্তব্য পড়লে গায়ে বিছুটির মত স্পর্শজ্বালা অনুভূত হয়। সে মন্তব্য কেবল অ-সত্য ছিলনা ; সেদিন ফজলুলকে হেয় হতে হয়েছিল এমন সব লোক-নেতাদের কাছে যাঁদের না ছিল সমবেদনশীল দরদী-মন বা কোন সামাজিক কৃতকর্ম।

সিন্ধু প্রদেশে আল্লাবক্স তখন আততায়ীর দ্বারা নিহত, অতএব লীগ সরকার গঠিত হবার সম্ভাবনা এসেছে। আসামে কংগ্রেস সরে যাবার পর সাদুল্লা গভর্ণমেণ্ট গঠিত হয়েছে। পাঞ্জাবে সেকেন্দার হায়াত খান পরলোকে। খিজির হায়াত খান এসেছেন। অতীতে চেষ্টা করেও সেকেন্দারের ইউনিয়নিস্ট গভর্ণমেণ্ট বাতিল করে লীগ সরকার কায়েদে আজাম গঠন করতে পারেননি। এখন সময় এল।

জিন্নার হাতে এসে পড়েছে সেকেন্দার হায়াতের পুত্র যাকে খিজির তাড়িয়ে দিয়েছেন তখন। জিন্না লাহোরে খিজিরকে সমঝাতে গেলেন।

মোটামুটি জিন্না শাসিত লীগের তখন অগ্রগতি। কংগ্রেস জেলে। জিন্নার সাহায্যার্থে রাজাগোপালাচারী ও কম্যুনিষ্ট পার্টি অনেকটা ফেউএর কাজ করে চলেছেন। অতি প্রসন্নচিত্তে জিন্না তখন "কংগ্রেসকে বাঁচাও", "গান্ধীজীকে মুক্ত করো" বলে যেসব অনুরোধগুলো রাজাজী ও কম্যুনিষ্ট পার্টি নেতারা কচ্ছিলেন তা উপলক্ষ্য করে এবং নিজের কনস্টিটিউসনাল গণ্ডী ভুলে একদা ঘোষণা করলেন: if Mr. Gandhi is even now really willing to come to a settlement with the Moslem League on the basis of Pakistan let me tell you that it will be the greatest day both for the Hindus and Muslims.

If he has made up his mind what is there to prevent Mr. Gandhi from writing direct to me? He is writing letters to the Viceroy. Why does he not write to me direct? Who is there that can prevent him from doing so? What is the use of going to the Viceroy and leading deputations and carrying on correspondences? Who is to prevent Mr. Gandhi today? I cannot believe for a single moment—strong as the Government may be in this country you may say anything you like against the Government—I cannot believe that they will have the daring to stop such a letter if it is sent to me. It will be a very serious thing indeed if such a thing is done by the Government.

গান্ধীজী জিন্নাকে জেল থেকে চিঠি লিখে ফেল্‌লেন। লিন্‌লিথ-গাওয়ের গভর্ণমেণ্ট সে চিঠি জিন্নার কাছে ত পাঠালই না, অধিকন্তু সে চিঠি যে পাঠানো হবে না সে কথাও তাঁকে পরিষ্কার করে জানিয়ে সে সিদ্ধান্ত সাধারণে প্রকাশ করে দিয়ে ছাড়্‌ল।

লীগের কেউ কেউ এটাকে চ্যালেঞ্জ (challenge) বলে বর্ণনা করলেন বটে। নতুন পরিস্থিতি নিশ্চয়ই সুখের হয়নি জিন্নার কাছে। একমাস পূর্বে যে ঘোষণা প্রকাশ্যে করেছিলেন এবং যা প্রত্যাহার করেননি কোন অজুহাতে, তাই অগ্রাহ্য করা হ'ল সর্বসমক্ষে এবং তাঁকে নীরবে সে অবস্থা হজম করতে হল।

লজ্জিত হয়ে পড়েছিলেন কনস্টিটিউশনাল জিন্না নিজের অতিশয়োক্তিতে। পরিণামে করাচীতে (৪-ঠা জুন ১৯৪৩) সাংবাদিকদের প্রশ্নে অধৈর্য হয়ে জিন্না বলেছিলেন: তোমরা ঠাট্টা যদি করতে চাও তবে করতে পার, তবে his position was as clear as daylight. At least two Hindus had the frankness to appreciate his point of view. They were P. C. Joshi, General Secretary, All-India Communist Party who had pointed out that Mr. Gandhi's letter had left a loophole by not iucluding whether he was going to meet the Moslem League point of view and Mr. Rajagopalachari who in his recent statement, had conceded that his (Jinnah's) offer had not been accepted and therefore ordinarily it would lapse.

Replying to a questioner who suggested that Mr. Jinnah could not have known the full contents of the letter he said that apparently Mr. Gandhi had merely expressed a desire to meet him and

nothing more. "At present I have no reason to doubt this information"

ওপরের এ ভাষ্য জিন্না দিয়েছিলেন অনেক পরে যখন এ পরিস্থিতি প্রায় ঠাণ্ডা হয়ে এসেছিল। কিন্তু সরকারী সিদ্ধান্ত তাঁকে জানাবার পর জিন্না সেই মে মাসেই যে মন্তব্য করেছিলেন তাতেই তাঁর মানসিক বিকার ভালভাবে বুঝতে পারা যায়। জিন্না তখন বলেছিলেন: Mr. Gandhi's letter can only be considered as a move to embroil the Moslem League with the British Government solely for the purpose of helping his (Gandhiji's) release so that he might do whatever he pleased afterwards.

জেলের বাইরে যাঁরা ছিলেন তাদের কাছে এ সময়টি ছিল আলোচনার যোগ্য অবসর। অন্য কোন কাজ আর নেই। যুদ্ধ চলছে, কংগ্রেস জেলে, অতএব সুস্থির চিত্তে সবকিছু আলোচনার সুযোগ এসেছে তখন। পাকিস্তান কী, তার স্বরূপ, তার আকার, উদ্দেশ্য, ও ব্যবহার নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন স্বয়ং কায়েদে আজম নিজে। দিল্লীর (১৯৪৩) এক বক্তৃতায় তিনি প্রশ্ন করে নিজেই উত্তর দিলেন:

When we passed the Lahore resolution, we did not use the word "Pakistan" at all. Who gave us this word? (shouts: the Hindus): Let me tell you this is their folly. They started damning him on the ground that it was Pakistan. They foisted this word upon us and they talked of pan-Islamism. We ourselves went on for a long time using the phrase—"The Lahore resolution popularly known as Pakistan". But how long are we to have this long

phrase? I say to the Hindu and British friends: we thank you for giving us the word.

সত্যি কি তাই? কে পাকিস্তান কথাটি প্রথমে ত্রিশের কোঠায় ব্যবহার করেছিলেন তার ইতিহাস কি জিন্না সত্যি সত্যি জানতেন না? হতে পারে, তখন সে নীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। কিন্তু পাকিস্তান-রোমানটিস্টরা একদিকে যমুনা অপরদিকে পদ্মা ও দক্ষিণে হায়দ্রাবাদকে নিশানা করে সেদিন, ১৯৩৩ সালে, এর ছক কল্পনা করে ফেলেছিল। কিন্তু সে আলোচনাও এখানে অপ্রাসঙ্গিক, কেবল এটুকু গ্রাহ্য যে সে দাবী তখন ভবিষ্যৎ পাকিস্তানস্রষ্টা জিন্নার কাছে অবাস্তব মনে হলেও, সুচতুর ইংরেজ বনিকদের কাছে অজ্ঞাত ছিল না। তা'রা সে ভাবধারা সযত্নে সেই কম্যুনাল এ্যাওয়ার্ড যুগ থেকেই অন্তরে প্রবাহিত রেখেছিল।

পাকিস্তানের নাম-সংজ্ঞা সাধারণের অগম্য থাকল না। কিন্তু এর আকৃতি কি? মজার কথা রাজাগোপালাচারী এবং অপরেরা যতই এ নিরাকারকে আকার দেবার চেষ্টা করেছেন কায়েদে আজম ততই উদ্বিগ্ন হয়েছেন। কেন? কোন্ গূঢ় কারণ থাকতে পারে যাতে দাবী সুবিন্যস্তভাবে সাধারণের কাছে পেশ করতে জিন্না অনিচ্ছুক ছিলেন?

অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগ কাউন্সিলের মিটিং-এ (New Delhi 7th March 1943) জিন্না জানালেন: There was no map of Pakistan to which the Moslem League was committed directly or indirectly. There were attempts made by individuals to which the Moslem League was not committed. Similarly there was no scheme of Pakistan to which the Moslem League was committed directly or indirectly in any way whatsoever except the Lahore resolution. "I know",

Mr. Jinnah said, "many attempts are being made by our opponents to father upon us some scheme or map and hang the dog after giving it a bad name. I will say : give up these futile attempts."

পরিষ্কার বক্তব্য, কিন্তু যুক্তিসহ কি? কেন সীমানা নির্ধারণে এমন বিমুখ ছিলেন জিন্না? তিনি এর কোনই উত্তর দেননি এবং তিনি ভিন্ন এ প্রশ্নের উত্তর দেবার ক্ষমতা তাঁর জীবিত কালে মুসলিম লীগের কারো ছিল না। পাকিস্তানের দাবী তখন আর দাবিয়ে দেবার অবস্থায় ছিল না। কল্পিত ফেডারেশন-ব্যবস্থা অচল করতে জিন্না-নেতৃত্ব তখন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সেক্ষেত্রে পাকিস্তান দাবী অজ্ঞেয় রাখবার কেবল দুটি কারণই থাকতে পারত। এর একটি ছিল হয়ত জিন্না মনে করেছিলেন কনসারভেটিভ পার্টির সহায়তায় গোটা বাঙলা-আসাম প্রদেশে এবং অন্যদিকে পাঞ্জাব-উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এবং বেলুচিস্থান প্রদেশ নিয়ে পাকিস্তান কায়েম করা যাবে। পাকিস্তানের চৌহদ্দি-সীমানা দেবার চেষ্টা করলে যে দ্বিজাতি-তত্ব (two nation) ও মেজোরিটি দাবীর যুক্তির সহায়তায় পাকিস্তান কায়েম করতে চলেছেন ঐ প্রদেশগুলোর মধ্যে যে অংশ বিশেষে হিন্দু বা শিখ বা অ-মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ আছে তা'রা একই দাবীতে পাকিস্তানের বাইরে যাবার অধিকার চাইতে পারে এবং সে দাবী অস্বীকার করা অসম্ভব হতে পারে। এবং এর প্রত্যক্ষ ফলে কল্পনায় স্থাপিত পাকিস্তান ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বা একদম হাতছাড়া হয়েও যেতে পারে।

অথবা সেই সুদুর কেরালা থেকে উত্তর প্রদেশের মুসলমানদের চীৎকারে বা সহযোগিতায় তিনি যে দাবী অপ্রতিহত করে ফেলেছেন তা'রা পরিণামে পাকিস্তানের সীমানা দেখলে এবং এর কি প্রতিক্রিয়া তাদের জীবনে ঘটতে পারে বিবেচনা করবার সুযোগ পেলে মুষড়ে পড়ে তাঁর দাবীর বিরুদ্ধাচরণও করতে পারে! এই সব চিন্তাতেই

হয়ত জিন্না সেদিন পাকিস্তান অবাঙ্মনসগোচরম্ করেই রেখেছিলেন।

যে আবদুল লতিফ সাহেব পাকিস্তান দাবীর একজন উদ্গাতা, তিনি সহজেই বুঝে ফেললেন পাকিস্তান ও হিন্দুস্তান হলে মুসলমান-লঘিষ্ঠ প্রদেশে কি অবস্থান্তর আসতে পারে। তিনি তখন সরাসরি তোবা তোবা করতে শুরু করলেন। যে রাজগোপালাচারী জিন্নার সঙ্গে আঁতাত করবার জন্য কংগ্রেসীদের সঙ্গে ঝগড়া করতেও গররাজী হননি—পরিণামে তাঁরই দৌলতে গান্ধী-জিন্না আলাপ-আলোচনা ঘটেছিল (১৯৪৪ সালে)—তিনিও জিন্নাকে সম্বোধন করে বললেন : বেশ জবাই করতে চাও। করো। পশ্চিমে লাহোর ও পুবে ঢাকা মৈমেনসিং এলাকায় তোমার পাকিস্তান হবে। এ ভাগাভাগি আমাদের (হিন্দুদের) অকাম্য নয়। জোরাল কেন্দ্রীয় সরকার গড়তে পারব এবং তোমার লঘিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়কে সে সরকারের অধীনে বসবাস করতে হবে। (Have your pound of flesh to the west of Lahore and Dacca, Mymensing in the east. That is the utmost that you can have in terms of your Pakistan resolution and your creed. It will be a good riddance for us, for then we Hindus shall be free to have a strong Central Government under which your Moslem minorities have to live).

কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রথম অধিবেশনে (Bombay 23rd May, 1943) পার্টি বিশ্বাস এবং অ-বিশ্বাস ও লজিক-ম্যাজিকের দ্বন্দ্বে পড়ে প্রস্তাব করলেন যে India would be a federation of unions of Western Punjabis, (dominantly Muslims) Sikhs, Sindhis, Hindusthanis, Rajasthanis, Guzrathis, Assamese, Bengalees etc. etc. কম্যুনিষ্ট পার্টি মনে

করল এমনি ধারা একটা ঘোরালো ঘোষণা দিলে তাদের উদ্দেশ্য সার্থক হবে ; কারণ "for this would give to the Muslims wherever they are in an overwhelming majority in a contiguous territory which is their homeland, the right to form their autonomous states and even to separate if they so desire. In the case of Muslims of the Eastern and Northern districts of Bengal where they form an overwhelming majority they may form themselves into an autonomous region or may form a separate state. Such a declaration therefore concedes the just essence of Pakistan demand and has nothing in common with the separatist theory of dividing India into two nations on the basis of religions."

কম্যুনিস্ট পার্টির পাকিস্তান প্রস্তাব সমর্থনের গুঢ় মতলব ছিল যে লীগের দেশ-বিভাগ দাবী মেনে মুসলমানদের একাধিক স্টেট গঠন করবার অধিকার স্বীকৃত হ'লেই তাদের সুবিধা।

লাহোর প্রস্তাবেও ঐ একাধিক স্টেট পাকিস্তানের থাকবে বলে উল্লেখ ছিল।

পরে যখন পাকিস্তান প্রায় কায়েম হতে চলেছে তখন লাহোর প্রস্তাবে নির্দিষ্ট "স্টেটস" কথাটি সংশোধন করে "স্টেট" বলে চালু করবার সময় এল দিল্লীতে লীগ কনফারেন্স যখন বসল। বাঙলা দেশের লীগ সেক্রেটারী আবুল হাসেম এ সংশোধনে হকচকিয়ে কায়েদে আজমকে প্রশ্ন করলেন: সে কি কথা। লাহোরে পাকিস্তান প্রস্তাবে একাধিক স্টেট বানানোর অধিকার দেওয়া ছিল। এখন সে অধিকার অস্বীকার করে পাকিস্তান কেবল একটি মাত্র রাষ্ট্রই হবে বলে ঘোষণা করা হচ্ছে কেন? ছোট্ট

প্রত্যুত্তরে কায়েদে আজম জানালেন: ছাপার ভুলে "স্টেট"কে "স্টেটস" বলে লাহোর প্রস্তাবে লেখা ছিল। (States was a misprint). হাসেম তখনও হাল ছাড়েননি। আবার প্রশ্ন করলেন: কেন আমি ত সাবজেক্টস কমিটিতে বিষয়টি আলোচনা করেছিলাম, এই বলে চৌধুরী খলিকুজ্জমানকে সাক্ষী মানলেন।

হাসেমের অভিযোগ পরিণামে তালে গোলে ধামা চাপা দেওয়া হলেও আজ অতীতের ইতিহাস আলোচনা করলে বেশ ধরা পড়ে যে হাসেম ঐ একটি মাকাল ফল সামনে ঝুলিয়ে রেখে লাহোর প্রস্তাবে বাঙালী-মুসলমান জনতার সম্মতি অতি সহজেই জোগাড় করতে সমর্থ হয়েছিলেন—পাকিস্তান স্বীকৃত হ'লে পূর্ব ভারতবর্ষে সংখ্যা গরিষ্ঠ বাঙালী-মুসলমান তাদের নিজেদের রাষ্ট্র স্থাপন করতে পারবে। কম্যুনিস্ট পার্টিও হাসেমাইট লীগ-পন্থীদের এই ভাবধারা সমর্থন করত বলেই তাদের প্রস্তাবেও পাকিস্তান একাধিক রাষ্ট্র নিয়ে হবে বলে ঘোষণা করেছিল।

পরে যখন দেশ-বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে প্রদেশ বিভাগ দাবীও এসে পড়ল এবং ভারতবর্ষের মত বাঙলাকেও দুটুকরো করা হবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল তখন হাসেমাইটরা ভরাডুবি হতে পরিত্রাণের আশায় গান্ধীজীর মাধ্যমে এবং শরৎচন্দ্র বসুর সহযোগিতায় "সভারেন বেঙ্গল" দাবী এনেছিলেন। হাসেমের বাঙালী মুসলমানের রাষ্ট্র কল্পনা প্রথম যুগে যেমন একটি কথার মারপ্যাঁচে কায়েদে আজম ও যুক্তপ্রদেশের মুসলমান নায়কেরা বানচাল করেছিলেন তেমনি পরিণামে "সভারেন বেঙ্গল" কল্পনা (idea) কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে অগ্রাহ্য হ'ল।

রাজনীতি নিয়ে ছেলেখেলা করলে কি তার পরিণাম তা' হাসেম এবং হাসেমের দলীয় প্রধান, হোসেন সৈয়দ সুরাবর্দ্দীর কর্মকাণ্ডের প্রতি লক্ষ্য রাখলে বুঝতে পারা যায়। দেশ-বিভাগের পর হাসেম পাকিস্তানে চলে গেলেন, যেমন গিয়েছিলেন নবাবজাদা লিয়াকত আলি প্রভৃতিরা।

কিন্তু সেই সমুদ্র আলোড়নে যখন চারিদিকে বেলাভূমি নিশ্চিহ্ন হবার আশঙ্কা তখন সুরাবর্দ্দী অকূল পাথারে স্ব-সম্প্রদায়ের নিরীহদের পরিত্যাগ করে পালাননি। সুরাবর্দ্দী সেই ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যে মুসলমানদের পাশে দাড়িয়ে গান্ধীজীর সহযোগিতায় তাদের যে আশ্বাসপ্রদানের চেষ্টা করেছিলেন তা চিরকালের জন্য ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে। আতঙ্কগ্রস্ত নরনারীদের সাহায্য সুরাবর্দ্দীই করেছিলেন কিন্তু ক্রূর ইতিহাস এরই জন্য তাঁকে পরিণামে পাকিস্তানের অ-বাঙালী মুসলমান নেতৃত্বের দৃষ্টিতে হেয় ও "দেশদ্রোহী" করে রেখেছিল। বেগম সায়েস্তা ইক্রামুল্লা সুরাবর্দ্দীর সেদিনকার এই কর্মকাণ্ডের উল্লেখ করে লিখেছেন: This act of my cousin was misconstrued by his enemies and eventually cost him his career in Pakistan. বেগম সাহেবা কিন্তু এটুকু যোগ করেননি তাঁর গ্রন্থে, যে আবুল কাশেম ফজলুল হককে প্রতিদিন সুরাবর্দ্দী সাহেব পাকিস্তান কায়েম করতে গিয়ে হেয় ও অশ্রদ্ধা করতেন তিনিই তাঁকে আশ্রয় দিয়ে পুর্নজীবনলাভে সহায়তা করেছিলেন।

দেশ বিভাগের পর সুরাবর্দ্দী যে কয়েক মাস ভারতবর্ষে ছিলেন সে সময়ে আত্মচিন্তা করবার ঢের অবকাশ পেয়েছিলেন। পাকিস্তানের কাল্পনিক রূপ তাঁর নিজের ও দলের অন্যান্য সকলের কাছে কি ছিল তা' তিনি চৌধুরী খলিকুজ্জমানকে এক পত্রের মাধ্যমে জানিয়েছিলেন। সে আদি কল্পনায় গোটা বাঙলাদেশ নিয়ে পাকিস্তান হবার কথা ছিল। We are now all thinking very hard as to what should be the position of the minorities, particularly of the minority Moslems in the Hindu majority provinces. We had not thought about it earlier, as we did not expect Bengal to be partitioned and Moslems being reduced to a minority in any

part of Bengal. কল্পনা বাস্তব হ'ল না। কেন হ'ল না সে প্রশ্ন বড় নয়; বিবেচ্য বিষয় হ'ল ভারতবর্ষের রাজনীতির গতি প্রকৃতি। ভাব-প্রবণ বাঙালী মুসলমান, বাঙালী হিন্দুরই মত, কল্পনা বিলাসী হয়ে রাজনীতি করতে অভ্যস্ত, কিন্তু অ-বাঙালী মুসলমানদের কাছে ছিল তা নগ্ন-বাস্তব ব্যবসা। কল্পনা ভেঙে পড়লে বাঙালী মুসড়ে পড়ে, মাথা উচু করে আর দাঁড়াতে সাহসী হয় না। আর অ-বাঙালীরা বাস্তব রাজনীতি করতে অভ্যস্ত বলে স্বাধিকার কেবল বাড়িয়েই যায়। অতীতের এই মারাত্মক অভিজ্ঞতার কথা বাঙালী মনে আজও দানা বাঁধতে পেরেছে কি না সন্দেহ!

১৯৪২ সাল হতে মোসলেম লীগের জিন্না-নায়কত্বের বসন্ত-কাল। চতুর্দিকই সুশোভিত কিন্তু তেমন ফল-প্রসূ নয়। আল্লাবক্স নিহত, অতএব সিন্ধু হাতের মুঠোর মধ্যে আসবেই, ফজলুল হককে গদিচ্যুত করে হারবার্ট বাঙলায় কেবল নাজেমুদ্দিনের হাতে মসনদ তুলে দিলেন না, তাঁর দলের সরকারী সমর্থকদের মধ্যে ৫০ জনকে মন্ত্রী, হুইপ প্রভৃতি পদে অভিষিক্ত করে গদীয়ান হতে সুযোগ দিলেন। আসামে সাদুল্লা আবার মন্ত্রী হয়েছেন। পাঞ্জাবে সেকেন্দার পরলোকে। পূর্ব-পশ্চিম উভয় দিকেই মঙ্গল-শঙ্খ বাজতে আরম্ভ করেছে। একমাত্র ব্যতিক্রম পাঠান-ভূমি, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ।

জিন্না মনে মনে ঠাহর করতে পেরেছিলেন যে বাঙলা দেশে নাজেমুদ্দিনের দ্বারা সরাসরি লীগ সরকার গঠিত হলেও এবং পেটো সাহেবদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা পেলেও, ফজলুল হক এমন কাণ্ড কারখানা করতে পারেন যাতে লীগ প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনাই বেশী। অতএব নাজেমুদ্দিনকে ও সাদুল্লাকে অনুমতি দিলেন: যেমন করে পার মন্ত্রিত্ব চালিয়ে যাও। অপরদিকে সেকেন্দার

পরলোকে, অতএব জিন্নার ধারণা পাঞ্জাবে ফজলীহোসেনের কল্পিত ও সেকেন্দার দ্বারা গঠিত "ইউনিয়নিস্ট" ক্যাবিনেট হটিয়ে দিয়ে "লীগ" ক্যাবিনেট গঠন করবার সময় এসেছে।

খিজিরের কাছে কায়েদে আজমের অনুশাসনপত্র পৌঁছেছিল ১৯৪৩ সালে। অভিযোগ ছিল সেকেন্দার-পুত্র ক্যাপটেন সৌকত হায়াতকে কেন খিজির মন্ত্রী-পদ থেকে তাড়িয়ে দিলেন? খিজির লীগের পাকিস্তান দাবী কেবল মেনে নেননি, তিনি লীগ অধিবেশনে সে দাবী প্রকাশ্যে সমর্থনও করেছিলেন, তবুও জিন্না তাঁর প্রতি অপ্রসন্ন!

সোজাসুজি কায়েদে আজম খিজিরকে বললেন: তোমাকে ঐ "ইউনিয়নিস্ট" লেবেল উপড়ে ফেলে "লীগ" মন্ত্রীসভা বলে ঘোষণা করতে হবে।

খিজির উত্তরে জানালেন: তা' কেমন করে সম্ভব? সেই ফজলীহোসেন যুগ থেকে এ ধারা চলে আসছে, এতে ত আপত্তি করবার কিছুই নেই! আমরা পাঞ্জাব মুল্লুকে মিলে মিশে ইউনিয়নিস্ট আছি ও থাকতে চাই, তবে হিন্দুস্তানের অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানদের হিতার্থে পাকিস্তান সমর্থন করব। আপনার সঙ্গে ফজলীহোসেনের এ বিষয়ে ত আলাপ আলোচনা হয়েছিল। আপনি তাঁর কথা শুনলেন না বলেই গত নির্বাচনে লীগ দুটি আসনের বেশী বিধান সভায় পায়নি। সেকেন্দারের সঙ্গেও ঐ একই শর্তে আপনার প্যাক্ট হল বলে সেকেন্দার পাঞ্জাবের বাইরের পলিটিক্সে আপনাকে সমর্থন করে আসতেন এবং আপনিও পাঞ্জাবের ঘরোয়া পলিটিক্সে নাক গলাননি। এখন কেন তবে এ দাবী কচ্ছেন?

কায়েদে আজম একটু কোপান্বিত হয়েই উত্তর করলেন: ও সব বাত্‌চিত ছাড়। তুমি ছেলে মানুষ, গভর্ণর গ্লানসির কথায় উঠতে বসতে শিখেছ, আমি যা বলছি বুঝতে পারবে না। যা বলছি তাই করো নচেৎ...

খিজির গররাজি হ'লে লীগ থেকে বিতাড়িত হলেন। তাঁর মন্তব্য: It is obvious that I have been expelled beacuse I refused to accept Mr. Jinnah's demands which sought to end a state of affairs existing for more than six years, (5th June 1944).

কাছের ঘটনাগুলোর উল্লেখ করলে পারিপার্শ্বিক অবস্থা পরিষ্কার হবে। বাঙলায় তখন দুর্ভিক্ষ চলেছে, বিলেতের পার্লামেণ্টে (২৩সে মার্চ, ১৯৪৪) আমেরী সাহেব জানালেন দুর্ভিক্ষে ৬,৮৯,০০০ মানুষ মরেছে। কেসি সাহেব বাঙলার লাট সাহেব এবং ওয়াভেল বড়লাট। ৭ই মে তারিখে গান্ধীজী জেল থেকে মুক্তি পেলেন।

৪২ সাল থেকে ৪৪ সালের এই সময়ের মধ্যে ইংরেজ সরকারের নিকট বারবার সহযোগিতার প্রস্তাব লীগ করলেও এবং কায়েদে আজমের নেতৃত্বে অস্থায়ী সরকার যুদ্ধকালের জন্য গঠিত হলে কংগ্রেস কোনপ্রকার আপত্তি করবে না এ কথা গান্ধীজী জেল থেকে পরিষ্কারভাবে জানালেও, গভর্ণমেণ্ট কায়েদে আজমের কোন কথাতেই সাড়া দেয় নি, অথবা কনস্টিটিউশনাল জিন্না সে দাবী যাতে সরকার অন্তত বিবেচনা করে তার জন্য কোন কিছুই করতে পারেননি। অনেকটা 'বামন গেল ঘর, লাঙ্গল তুলে ধর' গোছের অবস্থা। কংগ্রেস জেলে, অতএব আর কোন দাবী দাওয়া নেই, থাকতে পারে না অন্য কোন দলেরই।

গান্ধীজীকে, আমেরীর কথায়, স্বাস্থ্যের খাতিরে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। তাঁর মুক্তির পরই ভারতবর্ষের রাজনীতি আবার সচল হয়ে পড়ল। রাজাগোপালাচারী ও ভুলাভাই দেশাই আবার কংগ্রেস-লীগ আঁতাত করতে এগুলেন। রাজাজী স্বয়ং কায়েদে আজমের সঙ্গে ও ভুলাভাই নবাবজাদা লিয়াকত আলি খাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন।

রাজাজীর পাকিস্তান ফরমূলা—সীমানা নির্ধারণ ও যুদ্ধান্তে

প্লেবিসাইটের দ্বারা তার রূপ নিরূপণ—কায়েদে আজম এক অশুভ মুহূর্তে লীগ কমিটীর বিবেচনা করবার উপযুক্ত বিষয় বলে মনে করলেন এবং সে মতামত রাজাজীকে জানালেন। এদিকে ভুলাভাই এবং লিয়াকত অস্থায়ী সরকার গঠনে সাম্প্রদায়িক ভারসাম্য বিষয়টি নিয়ে একমত হলেন।

সে মতৈক্য ছিল অপূর্ব এবং অতীতে ম্যাকডোনাল্ডী রোয়েদাদে যে বিষবৃক্ষ রোপণ করা হয়েছিল এ আপস তারই প্রথম ফল বলে মনে করা যেতে পারে। হিন্দু সাম্প্রদায়িক উস্কানীতে কম্যুনাল এ্যাওয়ার্ডের পর এ অপেক্ষা বড় কোন হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয়নি। অস্থায়ী সরকারে অন্যান্য সম্প্রদায়ের একটা-তুটো মন্ত্রী থাকুক বা না থাকুক তাতে কিছু এসে যায় না, কিন্তু কাষ্ট-হিন্দু ও মুসলমানের মন্ত্রী সংখ্যা সে সরকারে থাকবে সমান সমান। অর্থাৎ ভারতবর্ষের ৬০ পারসেণ্ট লোকের মন্ত্রী-প্রতিনিধি সে অস্থায়ী সরকারে হবে ভারতবর্ষের ২৫ পারসেণ্ট লোকের মন্ত্রী-প্রতিনিধির সমসংখ্যক।

ভুলাভাইকে পরিণামে কংগ্রেস এই আঁতাতের জন্য বিসর্জন দিয়েছিল, কিন্তু তাঁর আপসমত কাষ্ট-হিন্দু ও মুসলমান সমসংখ্যক মন্ত্রী-প্রতিনিধি নিয়ে ইণ্টারিম সরকার চালাতে কংগ্রেসের আপত্তি করতে দেখা যায়নি।

আজ অতীতের দিকে তাকালে কত সহজেই চোখে ধরা পড়ে কি কানাগলির মধ্য দিয়েই না ইংরেজ বণিক ও ইংরেজ শাসকেরা হাতছানি দিয়ে সেদিনের হোমরা-চোমরাদের দিগ্‌ভ্রান্ত করেছিল! একবার সে পথে পা বাড়িয়ে থমকে দাঁড়াবার ক্ষমতা ছিল না কোন একটা দলেরই।

আপস চেষ্টা ভারতবর্ষের মাটিতে বসে অতীতে হয়েছে একাধিকবার, ত্রিশের কোঠায় সে চেষ্টা আবার যদি এই মাটিতে বসে করা হত তবে সম্ভবত ভারতবর্ষের পলিটিক্স অন্যপথে চলত; অন্তত

দুর্ভাগা বাঙালীরা অন্যদের অর্জিত অন্যায় ও অপমানগুলোর কাছে যে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় নিজেদের অতীত রাজনৈতিক ঐতিহ্য বিসর্জন দিল তা' হতে কোন প্রকারে নিস্তার পেত।

রাজাজী ফরমূলার ওপর বিশ্বাসী হয়ে গান্ধীজী কায়েদে আজমের সঙ্গে পুনরালোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। কায়েদে আজম যে আপসে গররাজী ছিলেন তাও বলা যায় না, তিনিও উন্মুখ ছিলেন। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী পাকিস্তান নীতিগতভাবে সেদিনই স্বীকার করে নিয়েছিলেন যেদিন তিনি রাজাজী-ফরমূলার ওপর ভিত্তি করে মহম্মদ আলি জিন্নার সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন।

পরিণামে সে আলোচনা ব্যর্থ হল। হবারই কথা—ও পথে সার্থকতা আসতে পারে না, পারেওনি। ভারতবর্ষ ভেঙ্গে পড়ল, কেবল সাম্প্রদায়িক ইন্ধন লাভ হ'ল। গান্ধী-জিন্না আলোচনা যার বেশীর ভাগ পত্রযোগে হয়েছিল তার ঐতিহাসিক মূল্য ঐ যুগসন্ধিক্ষণ বিচারে অমূল্য। দু'জনই সমান আগ্রহ নিয়ে এগিয়েছিলেন, তাতেও আপসে আসতে পারেননি, কারণ দু'জনের মানসিক জগৎ ছিল সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

সে তারতম্য কেমন ছিল কেবল একটি বিষয় উল্লেখ করলেই ধরা পড়বে। গান্ধীজী কায়েদে আজমকে প্রশ্ন করলেন: যে অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান প্ল্যান করতে চাও সে অঞ্চলের অধিবাসীদের ঐ বিষয়ে মতামত দেবার অধিকার থাকবে কি না, এবং থাকলে কি উপায়ে সে মতামত তা'রা জানাবে? Are the people in the regions falling under the plan to have any voice in the matter of separation, how is it to be ascertained? কায়েদে আজম সাফ জবাব দিলেন: এ আলোচনায় ও প্রশ্ন ওঠে না—Does not arise by way of clarification.

সেদিনকার ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বোধহয়

একমাত্র দেশীয় খ্রীষ্টান সম্প্রদায়কে পাকিস্তান বিষয়টি বিবেচনা করতে একটু স্বতন্ত্র ও পরিচ্ছন্নতর দৃষ্টিসম্পন্ন বলা যেতে পারত। অন্যান্যেরা —দলনির্বিশেষেই প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে এদিক বা ওদিকের পাল্লা ভারী করে রেখেছিলেন। গান্ধী-জিন্না আলোচনা পরিণামে ভেঙ্গে গেলে সে সম্প্রদায়ের মুখপাত্র, স্যার মহারাজ সিং, আলোচনায় যে উপকারই হয়েছে—উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশে—সে কথাটি উল্লেখ করে বলেছিলেন : Apart from other points the talks really broke down on the very important question of the plebiscite necessary before any partition of India can be made. Mr. Gandhi desired a common plebiscite while Mr. Jinnah wanted only Muslims to vote. On this point Indian Christians, though they prefer that there should not be any vivisection of India, consider the point of view of Mr. Gandhi to be more fair and more reasonable than that of Mr. Jinnah.

কায়েদে আজমের মন্তব্য হল : If the Muslim League had to consent to Mr. Gandhi it would have brought in a National Government with an overwhelming and solid Hindu majority which would mean virtual Hindu Raj সঙ্গে সঙ্গে জনৈক বিদেশী সংবাদদাতার প্রশ্নের উত্তরে জানালেন : There is only one practical and realistic way of resolving Muslim-Hindu differences. This is to divide India into two sovereign parts of Pakistan and Hindustan.

গান্ধীজীকে এক সংবাদদাতা প্রশ্ন করলেন : মনে হয় ইংরেজ সরকার যুদ্ধকালে কোন প্রকারেই শাসন ক্ষমতা ছাড়তে রাজী

নয় এবং সঙ্গে সঙ্গে এও সন্দেহ করা যায় যে মিঃ জিন্না কেন্দ্রে জাতীয় সরকার গঠিত হয় তা' চান না, কারণ এহেন সরকার কেন্দ্রে হ'লে হিন্দু কর্তৃত্বই এসে পড়বে? উত্তরে গান্ধীজী বললেন: If Mr. Jinnah does not accept my suggestion or if the powers that be do not, I would consider it most unfortunate. That would show that neither of them wants India to be really free at this juncture and give India a full share in winning the War for freedom and democracy. I myself feel firmly that Mr. Jinnah does not block the way but the British Government do not want a just settlement of the Indian claim for independence which is overdue and they are using Jinnah as a cloak for denying freedom to India.

পরে লাহোরের লীগ কাউন্সিল মিটিংএ (30th july 1944) জিন্না-গান্ধী আলোচনা সম্পর্কে কায়েদে আজম তাঁর বক্তব্য আরও সুপরিষ্কার করে জানালেন যে, গান্ধীজী পাকিস্তান যে কি বস্তু তা অপর যে কোন লোকের চেয়ে ভালভাবে বোঝেন।

Mr. Gandhi knows and understands the position better than any living man, for in one of his articles in the *Harijan* he puts the question of Pakistan demand in a nutshell. This was what he said: I hope the Quide-Azam does not represent the considered opinion even of his colleagues. Pakistan, according to him, in a nutshell, is a demand for carving out of India a portion to be wholly treated as an independent and Sovereign State.

I am glad that Mr. Gandhi realises that 1944 is not 1942. He may further take into consideration that 1938-40-41 is not 1944.

এ বিষয়ে শেষ মন্তব্য যা' মহম্মদ আলি জিন্না লাহোরে সেদিন করেছিলেন তা' ইতিহাস্ বিশ্রুত এবং যতদিন পাকিস্তান থাকবে ততদিন লোকপ্রবাদস্বরূপ হয়ে থাকবে।

সে মন্তব্য উদ্ধার করবার পূর্বে জিন্না-গান্ধী আলোচনা বিলেতের সাহেবরা কি ভাবে নিয়েছিলেন তা'ও স্মরণীয়। চার্চিলের কনসারভেটিভ সরকারে লর্ড মুনষ্টার (Lord Munster) ছিলেন আণ্ডার সেক্রেটারী অফ স্টেট ফর ইণ্ডিয়া। তিনি পার্লামেণ্টে জানালেন যে, গান্ধীর পক্ষে রাজাগোপালাচারীর পাকিস্তান ফরমূলার ওপর নির্ভর করে জিন্নার সাথে আলোচনা করতে রাজী হওয়াটাই একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী: It does appear, however, that Mr. Gandhi's association with these particular proposals (C. R. formula) marks a very significant change in his attitude towards the Moslem League. That, in itself, might improve the chances of an agreement between the two major parties. অতএব তাদের কি করণীয় কাজ তা' তাঁ'রা নিশ্চয়ই করবেন।

বাইরের পৃথিবী কেবল দেখল দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এবং যতদিন না যুদ্ধান্তে নতুন নির্বাচনে কনসারভেটিভ সরকার হটে শ্রমিক সরকার বিলেতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ততদিন ভারতবর্ষের রাজনীতি একপাও কি কংগ্রেসীদের কি লীগদের তরফে এগুল। যুদ্ধান্তে যে সব সমস্যা সমাজে দেখা দিল শ্রমিক সরকার সেগুলো সমাধানে স্বভাবতই ব্যস্ত হলেন। অতএব ভারতবর্ষ সম্পর্কে একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা গ্রহণ করবার সময় এসে গেল।

হিন্দুরা, বিশেষ করে বাঙালী হিন্দু, সেদিন রাজাগোপালাচারীর

ফরমূলা নিয়ে উত্তেজিত হলেও এবং কংগ্রেসী নেতৃত্ব থেকে রাজাজী সরে গেলেও তাঁর ফরমূলা অচল পোলিটিকাল পরিস্থিতিকে অবশ্যই খানিকটা গতিশীল করেছিল। কায়েদে আজম সে ফরমূলা বিবেচ্য মনে করাতেই তা' লীগ ওয়ার্কিং কমিটির কাছে এসেছিল। অপরদিকে হিন্দু আপত্তি অগ্রাহ্য করে গান্ধীজী সে ফরমূলার পশ্চাতে যুক্তি দেখেছিলেন নিশ্চয়ই এবং সেজন্য জিন্নার সঙ্গে আলোচনা করতে রাজী হলেন। এ দুটো ধারাকে বেগবান্ করা ছাড়াও রাজাগোপালের ফরমূলা অলক্ষ্যে আর একটি বিষয় খানিকটা পরিষ্কার করে দিল যা জিন্না ধামাচাপা দিয়ে রাখতে ব্যস্ত ছিলেন। এটি হ'ল ভাবী পাকিস্তানের ভৌগোলিক সীমারেখার ইঙ্গিত।

জিন্না-গান্ধী আলোচনা ভেঙ্গে গেল, নতুন করে বাদবিসংবাদ আরম্ভ হ'ল—লীগের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা ও পাকিস্তান কায়েমের পক্ষে এগুলো বড় বড় নিশানা। কিন্তু ভাবী পাকিস্তানের সীমারেখা টানাটানিতে যা ছিল লোকচক্ষুর অন্তরালে তা একদম সদরে এসে পড়ল। রাজাজী সীমানা নিরীখ করতে কেবল পূর্ববাঙলার অঞ্চল গুলোর কথা পেড়েছিলেন, পশ্চিম বাঙলার আর গোটা আসামের কোন উল্লেখ তা'তে থাকল না।

আলোচনা বন্ধ হ'ল কিন্তু পাকিস্তানের সীমানা দেবার এই যে সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা তা'ত জনসাধারণের মনে গেঁথে থাকল। এই পাকিস্তান হাসিল করতে চলেছ?—জনতা মুখর হল।

কায়েদে আজম বিরক্ত হলেন এবং অত্যন্ত রুক্ষ মেজাজে লাহোরে এ বিষয় নিয়ে যে মন্তব্য করলেন তা চিরকালের জন্য লেখা থাকল ইতিহাসের পাতায়। তিনি বললেন: I hope I have made it clear that the procedure and method adopted was hardly conducive to friendly negotiation and the form (C. R. formula) was pure dictation as

it was not open to any modification. This is not calculated to lead to any fruitful results or a solution and settlement of the problem which concerns the destiny of a nation of a hundred million Muslims and their posterity; and as regards the proposal Mr. Gandhi is offering it is a shadow and a husk, a maimed, mutilated and moth-eaten Pakistan and thus trying to pass off having met our Pakistan scheme and Muslim demand.

লাহোরে গৃহীত আদি পাকিস্তান প্রস্তাবের সীমারেখা জিন্না পরিণামে (১৯৪৬ সালে) দিয়েছিলেন। তাতে যেমন বাঙলা দেশকে ভাগ করে দেখান হয়নি, তেমনি আসাম সম্পর্কেও পাকিস্তান দাবী প্রত্যাহার করা হয়নি।

কিন্তু যে পাকিস্তান কায়েদে আজম ১৯৪৭ সালে কায়েম করলেন তা' নিহিত ছিল ঐ রাজাগোপালাচারী ফরমূলার মধ্যেই এবং সে কাঠামোকেই জিন্না লাহোরে বিরক্তির সঙ্গে ঘুন-ধরা, লেংড়া ও বিকৃত চিটে বলে বর্ণনা করেছিলেন।

সে সময় ভারতবর্ষের যে কয়জন পণ্ডিত-লোক চতুর্দ্দিকে গরম আবহাওয়া থাকা সত্ত্বেও স্বাধীন চিন্তা করতে পারতেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন ডাঃ আম্বেদকর। যে সামাজিক অবস্থার মধ্যে তিনি মানুষ হয়েছিলেন তাতে বর্ণ হিন্দুদের প্রতি তিনি স্বভাবতই কঠোর মনোভাব না পোষণ করে থাকতে পারেননি। একই কারণে গান্ধীজীর হিন্দু-বর্ণাশ্রম জীবনধারাকে চালু রাখবার চেষ্টার জন্য ডাঃ আম্বেদকর গান্ধীজিমকেও রঙিন চশমার মধ্য দিয়েই দেখতেন। স্ব-সম্প্রদায়ের জন্য তিনি পুনা-প্যাক্ট গান্ধীজীর কাছ থেকে আদায় করে নিয়েও গান্ধীবাদকে সমর্থন করেননি।

মহাপণ্ডিত ছিলেন তিনি এবং দৃষ্টি ছিল তাঁর সুদূর প্রসারিত।

দেশ স্বাধীনতা লাভ করার পর আম্বেদকর প্রথম আইন-মন্ত্রী হিসেবে ভারতবর্ষের বর্তমান সংবিধান রচনায় অগ্রণী হয়েছিলেন। সহস্র সহস্র অনুগামীসহ গৌতম-বুদ্ধের শরণও নিয়েছিলেন। অকাল-মৃত্যুর জন্য ডাঃ আম্বেদকরের জীবনের এই দিক—চিরজীবন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে কেটেছে বলে—আমরা দেখতে পেলাম না।

একটু ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের অবতারণা এস্থলে অপরিহার্য। ডাঃ আম্বেদকরের সঙ্গে আমার পরিচয় হ'ল ইতিহাসের এমন এক উৎসস্থলে যা কোনদিন আমি কল্পনাও করতে পারিনি। নেপাল তরাই, হিমালয় সাক্ষী, স্তম্ভে উৎকীর্ণ অশোক নির্দেশ, গৌতম-বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনী। ভগ্নস্বাস্থ্য আম্বেদকর সেই ইতিহাস বিশ্রুত স্থানে আমারই মত তীর্থযাত্রী। পরে কুশীনগরে গৌতমের মহাপ্রস্থান তীর্থে আবার দেখা, পুনরায় বারাণসীর সারনাথ-মৃগদাবে।

সেই পুণ্যস্থান সারনাথে মহাবোধি সোসাইটির ভিক্ষু-সন্ন্যাসী সহ আম্বেদকরের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বুঝেছিলাম তীর্থ পরিক্রমায় পরম সন্তুষ্ট আম্বেদকর। মনে বিশেষ কোন ক্ষোভ নেই যেন। আলাপ পরিচয়ে বেরিয়ে এল মানুষ এবং পণ্ডিত আম্বেদকর। বলে চলেছেন উত্তর ভারতের হিমালয় সংলগ্ন মানুষের কৃষ্টির ইতিহাস। সে ইতিহাস সন্ধানে তখন তিনি মগ্ন। উঠল বাঙালী মনের ও প্রাণের কাঠামোর কথা। কেমন করে মহাযান বাঙালীকে বাঙালী করে ফেলেছে, উল্লেখ করলেন আম্বেদকর। তার সবগুলো ইঙ্গিতই যেন ধরতে পেরেছিলাম সেদিন। অনুরোধ করেছিলাম সে ইঙ্গিতগুলোর ভাষা-রূপ দেবার জন্য। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন: বোধহয় আর পারব না। পারেননি।

অনুমতি নিয়ে দেশ-বিভাগ, হিন্দু-হিন্দু এবং হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন করেছিলাম। আম্বেদকরের মনের ওপর যেসব পুরানো দাগগুলো ঘটনা আবর্তে পড়েছিল তা' তখনও সম্পূর্ণভাবে

মোছেনি, বুঝতে পারলাম। আজও কেবল একটি আম্বেদকরী মন্তব্য সটান নির্বিকার অবস্থায় নিজের মানস নদীতে বিশিষ্ট চড়া হয়ে পড়ে আছে। সে যুগ-আলোচনায় শেষ মন্তব্য করেছিলেন: আমরা কেউই ঠিক ঠিক দিগদর্শন (approach) করতে পারিনি, বোধহয় পারাও যেত না। ইতিহাস ছিল বিপক্ষে।

সে মন্তব্য শুনবার কাল-মুহূর্ত্তটি স্মরণে রাখতে যথাসাধ্য প্রয়াসী ছিলাম। সারনাথের নতুন মন্দিরে বুদ্ধ জয়ন্তী উৎসব হেতু দেশ-বিদেশের মানুষের আনাগোনা তখন শেষ হয়ে এসেছে। দূরে নতুন খোঁয়াড় করে সারনাথকে আবার মৃগদাবে পরিণত করবার হাস্যকর চেষ্টা দেখে কৌতূহলী জনতা ঘরে ফিরে যাচ্ছে। ইলেকট্রিক আলোতে উদ্ভাসিত সরকারী মহলগুলো এবং মহাবোধি সোসাইটি-নির্মিত তীর্থযাত্রীদের আবাসগুলো সারনাথের ৪০০০ বছরের পুরানো ইতিহাসকে আবার নতুন করে গড়বার ক্ষীণ চেষ্টা বলেই মনে হয়েছিল। কোন্ অতীতের স্মৃতি স্মরণ করে তিব্বতের লামা-পণ্ডিত ঘৃত-তৈল সহযোগে প্রদীপ সাজিয়ে পুরানো কথা প্রার্থনা মন্ত্রে নিবেদন কচ্ছেন? এ নিঃসঙ্গ তীর্থপুরীতে কেন দাঁড়িয়ে আছে ঐ বিরাট ধামেকস্তূপ? কেন মহাকাল সে সাক্ষীকে সারনাথের অন্যান্য মন্দির-স্তূপের মত নির্মূল করে উৎপাটন করল না?

না, করেনি।

করলে কি আজকের সারনাথ পুরোপুরি নতুন সারনাথ হতে পারত? অশোক স্মৃতি-চিহ্ন নিশ্চিহ্ন হলেই কি অতীত মুছে যেত? কে ইতিহাস রচনা করে, কেন করে, কিজন্য সে ইতিহাস মানুষ ভোলে, আবার কেন সাগ্রহে ফিরিয়ে আনতে ব্যস্ত হয়? কেন ইতিহাস স্বপক্ষে আসে এবং বিপক্ষে যায়? আম্বেদকরের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং আলাপ পরিচয়ে এই কথাগুলোই বার বার মনে এসেছিল।

রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সে কি হয়েছিল, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী প্রভৃতিরা

কি দৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষ দেখতেন, তাঁদের ধ্যান-ধারণা কেমন ছিল, সেকথা আম্বেদকর আলাপ মাধ্যমে উত্থাপন করেছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধেও অভিযোগ এসেছিল সে কথাও উল্লেখ করেছিলেন। ভারতবর্ষের সম্মান বিদেশে তাঁর দ্বারা কখনও কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ হয়নি, বলেছিলেন দৃঢ়কণ্ঠে আম্বেদকর।

পাকিস্তান দাবী এলে তা' না দেখে এবং বিনা আলোচনায় প্রত্যাখ্যান করার কি যুক্তি থাকতে পারে?—প্রশ্ন করেছিলেন। আরব্যোপন্যাসের দৈত্য তখুনি ত স্বরূপ পেল! যখন দাবী হয়ে পড়ল দুর্বার তখন আরম্ভ হ'ল তার সঙ্গে বোঝাপড়ার প্রথম চেষ্টা। তখন সে দৈত্য ঘাড় মটকাবেই, মন্তব্য করলেন।

যেদিন দফায় দফায় দাবী পেশ করেছিলেন জিন্না সেদিন তাঁর পাকিস্তান দাবী ছিল না। যেদিন গরিষ্ঠকে লঘিষ্ঠ না করা হয় প্রশ্ন উঠিয়েছিলেন সেদিন সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে এ প্রশ্ন হিন্দু ও মুসলিম গরিষ্ঠ নিয়ে এবং উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, আপন মনে মন্তব্য করেছিলেন আম্বেদকর।

লীগকে কংগ্রেসের সম-পর্যায়ের আসন দেওয়া কি যুক্তিযুক্ত হ'ত?—প্রশ্ন করেছিলাম আমি।

কেন নয়? প্রত্যুত্তরে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ডাঃ আম্বেদকর। ৪৬এর নির্বাচনের পর লীগ মুসলমানের একমাত্র সংস্থা বলে কি স্বীকৃতি পায়নি? তখন যদি সে সংস্থার ওপরে পূর্বেকার ধারণা কংগ্রেস বদলাতে রাজী হতে পারল, তবে আরও পূর্বে ৩৬ সালের নির্বাচনে একটি ন্যাশানেলিস্ট মুসলমানকে নির্বাচনে জয়ী করতে অক্ষম হয়েও কেন কংগ্রেস পুরানো ধারণা ছাড়ল না? অধীনতা নাশ হলে যে অবস্থা আসে তা'কে বলা হয় স্বাধীনতা। সমাজে সে অবস্থা বাইরে থেকেই এসে থাকে, কিন্তু স্টেটসম্যানসিপ নিজেকেই আয়ত্তে আনতে হয় বিচার বুদ্ধির সহযোগে। বাইরের কেউ তা' দিতে পারে না—বললেন আম্বেদকর।

আম্বেদকর উত্তেজিত হয়েই কথাগুলো বলেছিলেন এবং আরও বলতে যখন আগ্রহী দেখলাম তখন আলোচনার মোড় ঘুরানোর উদ্দেশ্যে মন্তব্য করলাম, কায়েদে আজমের সব দাবীগুলো সটান স্বীকার করে নিলেও তাঁর দাবীর শেষ হ'ত কি? কে জানে?

প্রত্যুত্তরে আম্বেদকর বলেছিলেন—ঐখানেই আসল ভূত লুকিয়ে আছে। হিন্দুর যেমন সন্দেহের অবকাশ ছিল, মুসলমানেরও যে তা থাকতে পারত।

তৃতীয় পক্ষ না থাকলে সে সন্দেহের অবকাশ কি থাকত? —প্রশ্ন আবার করেছিলাম।

একটু চুপ করে থেকে আম্বেদকর বললেন: আমরা হয়ত কেউ-ই ঠিক পথ (approach) বের করতে পারিনি; বোধহয় পারাও যেত না। ইতিহাস ছিল বিপক্ষে।

তাঁর এক অভিভাষণের উল্লেখ করে আলোচনা শেষ করলেন আম্বেদকর। আয়ারল্যাণ্ডের ইতিহাসের ওপর সে মন্তব্য ছিল। আইরিশ নেতা উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের আলষ্টার প্রতিনিধিকে বললেন: Consent to the united Ireland. Ask for any safeguards and they will be granted to you. উত্তর পেলেন: Damn your safeguards. We do not want to be ruled by you.

পাকিস্তান কায়েমের ইতিকথা আম্বেদকরের ঐ মন্তব্য দিয়েই শেষ হওয়া উচিত।

এর পরের ইতিহাস এক শব দেহ নিয়ে কাড়াকাড়ি ও ভাগাভাগির কাহিনী। ভবিষ্যতের বাঙালী সে ইতিহাস পড়লে লজ্জায় ও ঘৃণায় মাথা হেট করবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই আমার নেই।

তবে পাকিস্তান অবতারণার শেষ বক্তব্যটি এখানে যোগ করে না রাখলে ইতিহাসের গভীর ইঙ্গিত সহজে ধরা পড়বে না। ক্যাবিনেট

মিশন যখন এদেশে অস্থায়ী (Interim) সরকার ও কনস্টিটুয়েন্ট এ্যাসেমব্লী গঠনে ব্যস্ত, তখন কংগ্রেস প্রথমটি অস্বীকার করে দ্বিতীয়টি সমর্থন করেছিল। তখনও বাদবিতণ্ডা শেষ হয়নি, টালবাহানা লীগ ও কংগ্রেস উভয় পক্ষ থেকেই চলেছে। হঠাৎ কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মৌলানা আজাদ ভাইসরয়, লর্ড ওয়াভেলকে এক চিঠিতে (১৩ই জুন ১৯৪৫ সাল) পরিষ্কার ভাবে জানালেন যে, কংগ্রেস দ্বিতীয় ব্যবস্থাও (Constituent Assembly) সমর্থন করবে না যদি প্রাদেশিক বিধান সভাগুলোতে ইয়োরোপীয়েরা (যথা বাঙালা বিধান সভার সাহেব সদস্যেরা) সে নির্বাচনে নিজেরা দাঁড়ায় অথবা ভোট দেয়।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসনব্যবস্থা ঘোষিত হবার সময় চিত্তরঞ্জন দাশ ভারতবর্ষের রাজনীতিতে এই বেনে ও পেটো সাহেবদের আবির্ভাব আশঙ্কা করে ১৯১৮ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে তাদের পৃথক্ নির্বাচন দাবী অগ্রাহ্য করে বা সদস্য সংখ্যা ওদের লোকসংখ্যা অনুরূপ ঠিক করা উচিত হবে বলে প্রস্তাব এনেছিলেন। সে দাবী অস্বীকার করে তখনকার বাঙলা বিধান সভার ১৫০ জন নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্যদের মধ্যে সাহেবদের জন্য ১৬টি পৃথক্ আসন দেওয়া হ'ল। এতগুলো সদস্য থাকলেও সে সভায় এরা বিশেষ কোন উপদ্রব (mischief) করতে পারেনি; কারণ সদস্য-সংখ্যার ভারকেন্দ্র পড়েছিল নির্বাচিত বৃহত্তর হিন্দু-মুসলমান বাঙালী সদস্যদের হাতে। এদের সকলেরই ওপর ছিল চিত্তরঞ্জন দাশের স্ব-প্রতিভাদত্ত প্রভাব, যাতে সহজেই তিনি স-পার্ষদ লাট সাহেবের সবকিছু বাধা ও প্রতিবন্ধক বানচাল করতে পেরেছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাশের এই কর্মকাণ্ডের ওপর নজর রেখেই স্যার সামুয়েল হোর পঁয়ত্রিশের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ রচনা করলেন যার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বাঙলা দেশে চিত্তরঞ্জন-যুগের পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

৩৫ সালের এর ব্যবস্থায় ২৫০ জন সদস্যের মধ্যে সাহেবদের জন্য

আসন থাকল প্রায় ৩০টি। এমনভাবে সদস্যসংখ্যা ঠিক করা হ'ল, যাতে ভারসাম্য রাখবার দায়িত্ব থাকল—কোন অঘটন না ঘটলে—ঐ সাহেবদের হাতে। এদের দেশের ও দশের স্বার্থ নষ্ট করবার যে কতটা ক্ষমতা ছিল তা বাঙলা ভিন্ন আর কোন প্রদেশই বুঝতে পারেনি সেদিন। কারণ বাঙলা দেশের কলকাতাতেই ছিল সাহেবদের রাজনীতির গবেষণাগার। চিত্তরঞ্জন দাশ যে কেন ১৯১৮ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে সাহেবদের ভোটাধিকার সংহত করবার প্রস্তাব এনেছিলেন তার অন্তর্নিহিত গূঢ় তত্ত্ব কংগ্রেস-নেতৃত্ব ধরতে পারেননি বলেই রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সে গান্ধীজীর ঐক্য চেষ্টা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছিল।

প্রায় ত্রিশ বছর পরে (১৯১৮-১৯৪৬) সেই কংগ্রেস-নেতৃত্ব ইয়োরোপীয় বণিক্ ষড়যন্ত্রের সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনা প্রথম ধরতে পারলেন। মৌলানা আজাদ পত্রে ভাইসরয়কে জানালেন : Congress would reject even the long term proposals of the Cabinet Mission if they were not amended in one particular—that European members of Bengal and Assam Legislative Assemblies should not participate in election to the Constituent Assembly either by voting or by standing as candidates.

রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সে নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতা স্মরণ করে গান্ধীজী হরিজন পত্রে লিখলেন : That Europeans will neither vote nor offer themselves for election should be a certainty if Constituent Assembly worthy of name is to be formed.

কংগ্রেসের দৃঢ়তা লক্ষ্য করে এবার (১৯৪৬ সাল) ইংরেজ শাসক এ দাবী অগ্রাহ্য করেনি। রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সে বেন্থলদের কথা ভাগ্যক্রমে নেতাদের মনে পড়েছিল তাই রক্ষে।

প্রকাশ্যে ক্যাবিনেট মিশন কনস্টিটুয়েন্ট এসেমব্লী গঠনে যে ধারাগুলো রচনা করেছিলেন তার কোন অদলবদল হ'ল না বটে, কিন্তু বাঙলা দেশে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে যে বিধানসভা গঠিত হ'ল তার ইয়োরোপীয় সদস্যেরা কনস্টিটুয়েন্ট এসেমব্লীর সদস্য নির্বাচন ব্যাপারে কেবল নিরস্তই ছিলেন না, তাদের সেই সিদ্ধান্ত পূর্বাহ্নেই বিধানসভার কংগ্রেসী দলের সভাপতি, কিরণশঙ্কর রায়কেও জানিয়েছিলেন।

পি. জে. গ্রিফিথস এককালে বাঙলা দেশের সিভিলিয়ান অফিসার ছিলেন। ক্লাইভ স্ট্রীটের পেটো সাহেবদের মুখপাত্র হয়ে চল্লিশের কোঠায় কেন্দ্রীয় বিধানসভার সদস্য হন। সিভিলিয়ানদের চাকরীতে ইস্তাফা দিয়ে ব্যবসায়ীদের মুখপাত্র হবার রেওয়াজ ইংরেজ আমল থেকেই চলে আসছে এবং এখনও অব্যাহত আছে। ব্যবসায়ীদের অনেক সুবিধে হয় বলেই এ অফিসারদের বেশী মাইনে দিয়ে এমনি করে হাত করা হয়ে থাকে।

যখন ক্যাবিনেট মিশন দিল্লীতে সর্বদলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় কচ্ছেন তখন গ্রিফিথস কেন্দ্রীয় বিধানসভার ইয়োরোপীয় দলের মুখপাত্র। ক্যাবিনেট মিশন দেখা করবার জন্য তাঁকেও ডাকলেন (১২ এপ্রিল ১৯৪৬ সাল)। দেখা সাক্ষাৎএর পর গ্রিফিথস সাংবাদিকদের জানালেন: Europeans are in full support of complete and immediate self-government for India. We are looking forward to remaining in India as traders and businessmen with the goodwill and friendship of the Indian people which we know, we shall have. অতঃপর ভারতবর্ষে ইংরেজ ব্যবসায়ীরা কেবল ভারতীয় অনুগ্রহের ওপর নির্ভর করে ব্যবসা করবে, এই হ'ল তাঁর বক্তব্য।

সে ঘোষণা যে কি যুগান্তরকারী তা' কি বাঙলা দেশ, বা ভারতবর্ষ সেদিন বুঝতে পেরেছিল কিনা সন্দেহ। যে ইস্ট ইণ্ডিয়া

কোম্পানি পলাসী যুদ্ধের (১৭৫৭ সাল) পর থেকেই ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত কেবল ভোল পালটে কভু মানদণ্ড কভু রাজদণ্ড চালিয়ে ভারতবর্ষ শাসন করে চলেছিল তার পূর্ণচ্ছেদের ইঙ্গিত ছিল গ্রিফিথ্‌সের সে ঘোষণায়। রাহুগ্রস্ত ভারতবর্ষ মুক্তিলাভ করল সেদিন।

রাহু সরে দাঁড়ালেও শনি ভারতবর্ষের আকাশে তখন চলমান। তার উপদ্রব চলেছিল সমানে ১৯৪৭ সালের পরেও।

ভারতবর্ষের রন্ধ্রে শনি যে দশা এনেছিল তা বিচার করলে অনেক মজার মজার লক্ষণ চোখে পড়ে। সেখানেও দেখতে পাওয়া যায় এসব গ্রহ বা উপগ্রহের কক্ষপথই ছিল কলকাতার আকাশে। কি বেঙ্গল চেম্বারস´ অফ কমার্স´ অথবা ইউরোপীয়ান এ্যাসোসিয়েসন তাদের পীঠস্থান, নন-কোপারেশন আন্দোলন, মন্টেগু চেমস্‌ফোর্ড শাসন ব্যবস্থা চালু হবার পর থেকে—দিল্লীতে ভারতবর্ষের রাজধানী চলে গেলেও—কলকাতায় প্রতিটি বৎসারন্তে নব-বৎসর যাপন করতে আসতেন স-পরিষদ বড় লাট বাহাদুর এবং তাঁর সঙ্গে ভারতবর্ষের রাজা-মহারাজা, নবাব-নিজাম প্রভৃতিরা।

কলকাতাই ছিল ইংরেজ বাণিজ্যের ভারকেন্দ্র ; অতএব কি চেম্বার বা কি এ্যাসোসিয়েশন তারাও স্বাভাবিক কারণে এখানে ঘাঁটি বেঁধে ভারতবর্ষকে আয়ত্তে রাখবার প্রয়াস করত। যে কোন সমস্যা উঠত তার সমাধানের জন্য নিত্য নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা বা প্রতিষেধক এখানে এদের স্থাপিত—কিন্তু অদৃশ্য—পরীক্ষাগারে আবিষ্কার করা হত। কি সাহেবদের পৃথক্ নির্বাচন দাবী, কি কম্যুনাল এ্যাওয়ার্ড রচনা করবার শলা পরামর্শ আদিতে কলকাতায় এইসব সাহেবদের পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করে তবে ভারতবর্ষের সমাজ-ক্ষেত্রে ছাড়া হত।

পাকিস্তান নিয়ে পরিণামে কি নীতি গ্রহণ করা হবে তারও প্রথম ইঙ্গিত এই কলকাতায় সাহেবরা ঠিক করেছিলেন (১৯৩৩

সাল, অক্টোবর মাসে) কায়েদে আজম পাকিস্তান শ্লোগান দেবার অনেক পূর্বে।

ব্যবসা-বিমুখ বাঙালী-হিন্দু চেম্বার কি করত তা বড় বেশী বুঝত বলে মনে হয়না, তবে এ্যাসোসিয়েশন-এর রাজনীতির কর্ম-তালিকার প্রতি লক্ষ্য রাখত। সন্ত্রাসবাদ উৎখাত করতে ইংরেজ যখন জাতীয়তাবাদের প্রতি প্রকাশ্যে আঘাত দিতে উদ্যত হ'ত তখন বাঙালী-হিন্দু উৎকণ্ঠা ও উষ্মা প্রকাশও করত। কিন্তু গোপনে কি যোগসাজস এ্যাসোসিয়েশন করত তা' কিন্তু কোনদিনই কি বিশের কোঠায় বা ত্রিশের কোঠায় বাঙালী-হিন্দুরা আবিষ্কার করতে পারেনি।

যেমন বাঙালী-হিন্দু চেম্বার এবং এ্যাসোসিয়েশন-এর গুপ্ত কার্য-কলাপ সম্পর্কে বাধ্য হয়ে নিরাসক্ত ছিল তেমনি সর্ব-ভারতীয় কংগ্রেস এদের সম্পর্কে উদাসীন ছিল। রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সে গান্ধীজী যাবার পূর্বে ভিলিয়ারস সুস্পষ্টভাবে আগামী ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত দিলেও কংগ্রেস নেতৃত্ব তা' লক্ষ্যই করেনি।

চল্লিশের কোঠায় ভারতবর্ষ পরিণামে কি রূপ নেবে তার পরিচয় পেয়ে চেম্বার এবং এ্যাসোসিয়েশন কিন্তু তাদের পুরানো ভোল একদম পাল্টে ফেলল। গ্রিফিথ্‌স্‌এর ঘোষণায় তার পুরো পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু শনি তখনও নিজের কক্ষে ভ্রাম্যমান। শনিরও আদি কক্ষপথ পড়েছিল কলকাতার আকাশে। সারা বাঙলা দেশ জর্জরিত হলেও এর ক্ষমতা সম্পর্কে সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব এমনকি ১৯৪৬ সালেও—যতক্ষণ না ভরাডুবির মত অবস্থা এসেছে, ততক্ষণ সাবধান হননি!

এ শনি হ'ল ইংরেজ-সিভিলিয়ান। এরা না চেম্বার, না এ্যাসোসিয়েশন-এর মত স-শব্দে তার অবস্থিতি জানাত। এরা একান্তে, নীরবে ও গোপনে সরকারী মহলের রন্ধ্রে বসে দেশ ও দশকে দুর্দশাগ্রস্ত করে চলেছিল শেষদিন পর্যন্ত।

আদি কর্মস্থল বাঙলায় যখন লাট সাহেব হারবার্ট মন্ত্রীদের অগ্রাহ্য করে নিজেই শাসনভার গ্রহণ করেছেন তখন এই শনিদের পোয়া-বারো। ডিনায়েল (Denial) পলিসি দ্বারা শস্য-ভাণ্ডার, নৌকা ও যানবাহন নষ্ট করার কাজ ছিল এদের হাতে। আজাদ হিন্দ ফৌজ নেতাদের বিচারে যখন দেশ ফেটে পড়েছে তখন সেই আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক আন্দোলনে পরিণত করতে এরাই সক্ষম হয়েছিল। এদের দৌলতেই "সিভিল ওয়ার" যখন কলকাতার রাস্তায় ঘটল ১৯৪৬ সালের আগষ্ট মাসে তখন শহরের ২৮টি প্রধান কর্মকর্তাদের মধ্যে ২৬টি হয়ে পড়ল অ-বাঙালী মুসলমান ও ছটি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান অফিসার। এ হ'ল নতুন পরীক্ষা যার কোন নজীর অতীতে দেখা যায়নি।

কলকাতা ও বাঙলার শাসন ব্যবস্থায় শনিগ্রহেরা যে পরীক্ষা সার্থক করে তুলেছিল ১৯৩৯-১৯৪৬ সালের মধ্যে তাই বিরাট ব্যাপকতা নিয়ে প্ল্যান করল গোটা ভারতবর্ষের ওপর যখন ওয়াভেলের অন্তর্বর্তী সরকারে মোসলেম লীগ যোগদান করে ফেলল। একই প্ল্যানে যোগাযোগ ও পরিবহণ বিভাগে কাজ শুরু হোল। আবদার রব নিস্তার ছিলেন পরিবহন মন্ত্রী। সব হিন্দু ও শিখ অফিসার-গুলোকে দিল্লী থেকে তাড়িয়ে হয় মুসলমান অথবা এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান অফিসার আনলেন ভবিষ্যতে "কোন কিছু" করবার উদ্দেশ্যে।

১৯৪৮ সালে ইংরেজ ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাবে—সে ঘোষণা যখন আসেনি তখন নেহরু লক্ষ্ণৌতে (১৯৪৬ সাল, নভেম্বর ২১) অন্তবর্তী সরকারের অন্দর মহলে কি চলেছে তার প্রতি আলোকপাত করে বল্লেন : Wavell is gradually removing the wheel of the car, that there is mental alliance between the League and senior British officers. Moslem League nominees were enabled to disturb the personnel of their officers by importing officers into New Delhi

Sceretariat sympathetic to the League ; they streng-thened their hold on the administration by putting them into key positions in their own departments.

প্যাটেল যখন নাগপুরে মুখ খুললেন (১৯৪৬ সালের নভেম্বরে) তখন অবস্থান্তর কেমন হতে চলেছে তা পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় তাঁর উক্তিতে: There were British bureaucrats in every department of the State who were found mortgaging India's interests in their routine work. When in charge of the State Department he found that the Political Department in league with certain Princes was busy in hatching a conspiracy to break up the unity of India. The Bastar State was about to be mortgaged to Nizam. The Department at first sought to withhold the papers. The Department then took the plea that papers were under Law Department because the Prince was minor. I told "as they (British officers) were going away they should not bother about their wards."

"I came to the conclusion that the best course was to hasten the departure of these foreigners even at the cost of the portions of the country. It was then that I felt that there was one way to make the country safe and strong and that was the unification of the rest of India.

"I felt that if we did not accept partition, India would be split into many bits and would be completely ruined. My experience of one year of office

convinced me that the way we have been proceeding would lead us to disaster. We would not have had one Pakistan but several. We would have Pakistan cells in every office".

১৯৪৮ সালে যে ইংরেজ ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাবে বলে ঘোষণা ছিল তার পশ্চাতে এইসব ইংরেজ সিভিলিয়ান-শনিরা কি ষড়যন্ত্র করতে ব্যস্ত ছিলেন তার স্বরূপ অনেক পূর্বেই প্রকাশ পেল। শনি রন্ধ্র ছাড়ল।

মৌলানা আজাদ লর্ড ওয়াভেলকে যে সার্টিফিকেট দিয়েছেন তাতে এই বাস্তব চিত্র এতটুকুও মলিন হয় না।

কেবল ১৫টি বছর পূর্বে এইসব গ্রহ-উপগ্রহদের সদুপদেশ দিয়ে গান্ধীজী দ্বিতীয় রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সে (১৯৩১ সাল) বলেছিলেন: cease to be rulers and become friends. এ কথা তারা কেবল অগ্রাহ্যই করেনি তার পরিবর্তে শনির মন্ত্রণায় ষড়যন্ত্র করে নতুন পরিস্থিতি আনল। এ বেনে-রাজনীতির প্রতি লক্ষ্য রেখে বলা হয়েছিল: There can be one safeguard against discrimination for all times, that safeguard is the goodwill and co-operation, প্রত্যুত্তরে এদের মুখপত্র "Capital" যে মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিল তা অন্যস্থানে উদ্ধার করেছি। এখানে আবার করছি: The British community in India cannot and will not place its future at the mercy of so uncertain and nebulous a thing as Indian goodwill.

বিংশ শতাব্দীর ইংরেজ শাসক ও বণিকের ষড়যন্ত্র সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ বণিকের ষড়যন্ত্র থেকে অনেক ব্যাপক, অনেক সুদূর প্রসারী ও প্রায় চিরস্থায়ী প্রভাববিশিষ্ট হয়ে পড়েছিল। এদের দয়াতেই ভারতবর্ষের ইতিহাস নতুন পথে চলতে শুরু করল সেই

নতুন পথে চলতে গিয়ে কোন্ প্রদেশকে, কোন্ মানুষগুলোকে কি বলি দান করতে হল তা লেখা আছে সেই ১৯১৮ সাল (যখন চিত্তরঞ্জন দাশ ইংরেজের পৃথক্ নির্বাচন দাবীর বিরোধিতা করেছিলেন) থেকে ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসের দৈনিক সংবাদ-পত্রের পাতার মধ্যে। কোন পণ্ডিত মাস্টার মশায় এ ইতিহাস উদ্ঘাটনে উৎসাহ প্রকাশ করেননি।

দেশ-বিভাগ ফল মাত্র। যে বৃক্ষ এ ফলদান করল তা' থাকল অ-দৃষ্ট।

দেশ বিভাগের পূর্ব মুহূর্তে (এপ্রিল ১৯৪৬ সাল) রয়টারের বিশেষ প্রতিনিধি গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করে প্রশ্ন করেছিলেন: Do you subscribe to the opinion that Britain will be morally obliged to stay in India if outstanding Hindu-Moslem differences have not been resolved by June 1948? উত্তরে গান্ধীজী বলেছিলেন: This is a question that has never been put to me before. It would be a good thing if the British were to go today—thirteen months mean more mischief to India.

পরে উত্তরটি বিশদ ব্যাখ্যা করে গান্ধীজী জানিয়েছিলেন সেদিনের সাধারণ মানুষের মনের কথা। এমন চরম অবস্থা তখন এসে পড়েছে যখন প্রতিটি প্রদেশে "ইংরেজ! বাঁচাও, বাঁচাও" ধ্বনি উঠেছে। হিন্দু মুসলমানকে, মুসলমান হিন্দুকে ঘোরতর শত্রু মনে করে ইংরেজের করুণা ভিক্ষায় তখন ব্যাকুল। যে পরীক্ষা বাঙলা দেশে আদিতে করা হয়েছিল—সেদিন সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব তা দেখতে পারলেও বুঝতে অক্ষম ছিলেন—তা যখন বৃহত্তর ভারত-বর্ষের দিকে দিকে শুরু হোল তখন চমকে উঠলেন এবং এসপার ওসপার ব্যবস্থায় রাজী হলেন। ওয়াভেল সে ক্ষেত্রে কি করতে চেয়েছিলেন, জিন্নার সুমতি এসেছিল কি আসেনি, জবাহরলাল

নেহরু বেশী কথা বলে সব ভেস্তে দিলেন কি দিলেন না—এসব প্রশ্নই তখন অবান্তর হয়ে পড়েছে।

দেশ-বিভাগ ঘটালেও ইংরেজকে প্রশংসা করব। কারণ যেদিন এ্যাটলি সরকার ভারতবর্ষ ত্যাগ করা ঠিক করে ঘোষণা করলেন তখন অতীতে সংঘটিত ষড়যন্ত্রের ফলাফল এসে পড়লেও এদেশের সাধারণ বে-সরকারী ইংরেজ যদি সে ঘোষণা গোটা সম্প্রদায় ভিত্তিতে মেনে না নিত, যদি কোন দুরভিসন্ধি সাধনে ইচ্ছুক হত তবে সেই কালটি ছিল তাদের পক্ষে সুবর্ণ সুযোগ। অরাজকতা এবং অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বে ভারতবর্ষ তখন দোদুল্যমান। ইংরেজ বণিক মোটের উপর সতর্ক ছিল বলেই ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান সত্বর আত্মস্থ হতে পেরেছিল।

ভারতবর্ষে অবস্থিত ইংরেজ শাসককুলের অনেকেই, বিশেষ করে কেন্দ্রের অফিসারেরা, (অর্থাৎ নয়াদিল্লীতে ভারত সরকারের পোলিটিক্যাল দপ্তর) কলকাতায় যেমন প্রত্যক্ষ সংগ্রাম (Dircet Action) মারফত সিভিল ওয়ার শুরু করেছিল, তেমনি দিল্লী, পাঞ্জাব এমন কি সর্ব ভারতীয় ভিত্তিতে অন্যান্য স্থানেও একটা কিছু করবার মতলব করেছিল।

১৯৪৮ সাল পর্যন্ত দেশ শাসন তাদের হাতে থাকলে তারা কতদূর নিজেদের মতলব হাসিল করতে পারত তা আজকে কেবল গবেষণার বিষয় মাত্র।

কলকাতার হিন্দু, আলিগড়ের মুসলমান

কি কুক্ষণেই না গোপাল কৃষ্ণ গোখলে স্বদেশী যুগের জন-আলোড়ন উপলক্ষ করে বড়লাট লর্ড কার্জনকে বাঙলাদেশ সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন! সেদিন থেকে কারণে-অকারণে অতীতের অর্ধশতাব্দ ধরে ইংরেজ শাসকদের সতর্ক দৃষ্টি পড়ে রইল এই দেশের মানুষগুলোর কর্ম ও চিন্তাধারার ওপর।

প্রাক কার্জন-যুগে ইংরেজ শাসকের হিন্দু-বাঙালীদের নিয়ে তাদের সামাজিক শিক্ষা এবং অন্যান্য পরীক্ষাগুলো চালাতে বেশ সক্ষম হয়েছিলেন; কিন্তু পরবর্তী যুগে রাজনৈতিক ও আধ-মেশালি অর্থনৈতিক পরীক্ষাগুলো তেমনিভাবে চালু করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেও সার্থক হতে পারেননি।

পূর্বেকার যুগের পরীক্ষাগুলো অনেকাংশে সার্থক হবার দরুণ যে আশু ফল বাঙালী হিন্দু সমাজে ফলতে শুরু করল সেগুলো নানা রঙে এবং নানা আকারে লোক-চক্ষুর সামনে এমন ভঙ্গীতে ঝুলতে লাগল যে সর্বভারতীয় বাহবা পেল বাঙালীরা। "ধন্য ধন্য বাঙালী" ধ্বনি উঠল নানা অঞ্চল থেকে। সে সামাজিক পরীক্ষা সার্থক হওয়ায় বাঙালী হিন্দু সমাজ কী লাভ করল এবং কী হারাল তার কোনো তুলনামূলক হিসাব হয়নি।

বাঙলা দেশ যে ভারতবর্ষের অঞ্চলবিশেষ এবং অতীতে অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় তাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য যে থাকতে পারে না সে ধারণা ভুলে বসল বাঙালীরা সেই বিলিতি পরীক্ষাগুলো তাদের সমাজে কার্যকরী হবার পর থেকেই। ইংরেজের পেছনে পেছনে বাঙালী হিন্দু ছুটল ভারতবর্ষের দিকপ্রান্তে, এমনকি সুদূর আফগানিস্তানের কাবুলে ও তিব্বতের লাসায়, নিজেদের

অর্জিত এবং দানে প্রাপ্ত বিদেশী কল্পনানুযায়ী নতুন ভারতবর্ষ গড়ে তোলবার দুরাশা নিয়ে।

উদ্দেশ্য মোটের ওপর সাধুই ছিল। বাঙলার বাইরে বাঙালীর দান, আজ স্বীকৃত না হলেও, সে যুগে মোটেই সামান্য ছিল না। অবশ্য এর প্রতিদানও বাঙালী পেয়েছিল। গোখলের বাঙালী সম্পর্কে ঐ উপমা বিশেষ উপলক্ষে দেওয়া হলেও তা' ভারতবর্ষের পক্ষ হতে বাঙালীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন বলে গ্রহণ করা চলে।

যতদিন বাঙালীর কর্মপ্রচেষ্টা নিছক সমাজক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল ততদিন ইংরেজের সস্নেহ দৃষ্টি বাঙালী হিন্দুর ওপর নিয়ত বর্ষিত হত। কিন্তু শতাব্দ শেষ হবার বেশ কিছু পূর্ব থেকে যেই বাঙালীর দৃষ্টি রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পড়ল—অবশ্য এ কাজ অতি স্বাভাবিক কারণেই তাকে করতে হয়েছিল—তখন থেকেই ইংরেজের দৃষ্টিকোণ বদলাতে শুরু হ'ল।

যেমন সামাজিক পরীক্ষাগুলো বাঙলাদেশ মারফত সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে চালু করতে চেয়েছিল ইংরেজ, তেমনি যে-সব নতুন ইঙ্গিত দেখা দিতে লাগল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তার প্রতিষেধক খোঁজে তা'রা ল্যাবোরেটরী গড়ে তুলতে প্রয়াসী হ'ল এই বাঙলা দেশেই এবং ঐ বাঙালী হিন্দু-সমাজ নিয়ে।

এ সব রাজনৈতিক পরীক্ষার রূপ বদলাল যুগ হতে যুগান্তরে। ইংরেজ যে শাসক সে ধারণা প্রকট করে প্রকাশ না করলেও, কোনদিনই ছাড়েনি। এর বিশেষ রূপ নিল পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার মাধ্যমে। ব্যবস্থা-পত্র অবশ্য অতি পুরানো এবং অমর হয়ে আছে মানুষের সমাজে। এরই রূপরেখা খুঁজে পাওয়া যাবে চাতুর্বর্ণের অথবা জিজিয়া কর প্রবর্তনের মধ্যে। ভারতবর্ষে ইংরেজের হাতে যে আকার পেল তা কিন্তু আদি ও অকৃত্রিম বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। মুসলিম লীগ জন্মাবার অনেক পূর্বেই এ আবিষ্কার ইংরেজ নিজেদের সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব দাবী পূরণে

করে ফেলেছিল তাদের কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত ল্যাবরেটরীতে। এর পীঠস্থান ছিল কলকাতা কর্পোরেশন, যেখানে শহরের ইংরেজ বাসিন্দারা ভোটে স্ব-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি পাঠাত কর্পোরেশন সভাতে। গরজে পড়ে একই ব্যবস্থা অন্য সম্প্রদায়ের পক্ষেও চালু তাকে করতে হ'ল শতাব্দের গোড়ায়। পরিণামে এই দাবী যে দেশের সত্বাকেও পৃথক করে ফেলবে এ ধারণা তার আদিতে হয়েছিল কি না সন্দেহ তবে একথা অতি সত্য ইংরেজ কিছুতেই আপন সমাজ বা দেশে এ নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করতে রাজী হত না।

বাঙালী হিন্দু বিলিতি সামাজিক পরীক্ষা আয়ত্ত এবং ইংরেজী রাজনৈতিক দর্শনের ইতিহাস হজম করে ফেলবার দরুণ পৃথক নির্বাচনের ভবিষ্যৎ পোলিটিক্যাল ফলাফল সম্পর্কে গোড়া হতেই সন্দিহান ছিল। কিন্তু যথাসাধ্য আপত্তি করলেও, না পারল ইংরেজকে তার নিজের ইতিহাসের ওপর শ্রদ্ধাশীল হতে বা মতামত বদলাতে অথবা না পারল প্রতিবন্ধকগুলো হঠাতে। নানা প্রক্রিয়ায় চেষ্টা চলেছিল কিন্তু তাতে প্রতিবন্ধকগুলো বেশ জোরাল হয়ে পড়ল এবং দেশ-বিভাগে তার পরিসমাপ্তি ঘটল।

ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি রাখলে কেবল ছুটো প্রদেশে এই পৃথক নির্বাচনের তীব্র প্রতিক্রিয়া আশা করা যেত। সে ছুটো হ'ল বাঙলা দেশ এবং যুক্ত (আজকের উত্তর) প্রদেশ। প্রথমটিতে লোকসংখ্যার অনুপাতে বাঙালী মুসলমান সমধিক (হিন্দু ৪৪ পারসেণ্ট) কিন্তু কি সামাজিক বা কি রাজনৈতিক নেতৃত্ব, ইংরেজী পরীক্ষাগুলো সার্থক করে ফেলবার পর থেকেই, অনায়াসেই গিয়ে পড়েছিল বাঙালী হিন্দুর হাতে। এবং দ্বিতীয়টিতে পুরানো সামাজিক কাঠামো ইংরেজী শাসন এসে পড়বার পরেও চালু থাকবার জন্য যুক্তপ্রদেশের মুসলমানদের সংখ্যা (১৪ পারসেণ্ট) লোক অনুপাতে সামান্য হলেও প্রদেশের কি সামাজিক বা কি রাজনৈতিক নেতৃত্ব—যতটুকু চেতনাবোধ সাধারণের মধ্যে গোড়ার এসে থাকুক না কেন—অব্যাহত

অবস্থায় পড়ে থাকল কেবল গুটিকতক বনেদী মুসলমান পরিবারের কর্মধারার ওপর।

যে কার্য-কারণে বাঙলাদেশে বৈচিত্র্য এল অথচ যুক্তপ্রদেশে এল না, তা' মূলতঃ নিহিত ছিল ইংরেজের বাঙলাদেশে পরীক্ষা-কেন্দ্র (experimental laboratory) স্থাপনের এবং বাঙালী হিন্দু সমাজের আলগা কাঠামোর মধ্যে। ইংরেজ যে আগ্রহ নিয়ে নানা-রকমের পরীক্ষা বাঙালী সমাজে আদিযুগে চালাল তার একটা ক্ষুদ্র শাখাও যদি যুগের তারতম্য সত্ত্বেও যুক্তপ্রদেশে খুললে যুক্তপ্রদেশের বনেদী মুসলমান সমাজে কি প্রতিক্রিয়া আসত তা দেখবার অবকাশ মিলতও বা। নীলকর হাঙ্গামা ও আন্দোলন বাঙলাদেশে এল গত শতাব্দীর মধ্যাহ্নে এবং উত্তর ভারতে দেখা দিল এ শতাব্দের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর। কেন এ আন্দোলন বিহারে এত বিলম্বে এল ? এরও মূল কারণ হ'ল ইংরেজ সেখানে ছিল অনেকটা অদৃশ্য ; তার কর্মকাণ্ডের ভিত্তিই ছিল বাঙলাদেশের মহানগর কলকাতায়।

বাঙালী রাজনীতিতে নাক গলাতে গিয়েই স্বদেশী আন্দোলনের মারফত এসে পড়ল ইংরেজদত্ত বাধার সামনে। এ আন্দোলনের নেতৃত্ব গোড়ায় ও পরিণামে সীমাবদ্ধ ছিল ঐ ইংরেজী পরীক্ষা-কেন্দ্রে পাস করা এবং নতুন দৃষ্টিসম্পন্ন বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে।

যুগটা ছিল ইংরেজের বাণিজ্যের দিক থেকে পুরোপরি স্বর্ণযুগ। তাদের বাণিজ্যসম্ভার ছড়িয়ে পড়ছে পৃথিবীর দিকে দিকে। স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃত্ব যা'রা করেছিলেন তাঁদের কাজ-কর্মগুলো যতই শিশুসুলভ হয়ে থাকুক না কেন এ আন্দোলনের ধাক্কা খেয়ে—ইতিপূর্বে সমগোত্রের ধাক্কা খেতে হয়েছে আমেরিকায়—ইংরেজ হ'ল সন্ত্রস্থ। তার ল্যাবোরেটরীতে চলল নতুন পরীক্ষা। কেবল সার্থক সামাজিক পরীক্ষা এবং "ল ও অর্ডারের" ওপর নির্ভর করে রাজত্ব চালান যে আর সম্ভবপর নয় তা' বুঝতে পেরে নতুন ধরণের ব্যবস্থা-পত্র আবিষ্কার কাজ শুরু হ'ল।

ব্যবস্থা-পত্র, পূর্বেই বলেছি, কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে আদিযুগে দেওয়া থাকলেও এর পরিপূর্ণ প্রয়োগ ইংরেজ শুরু করল যুক্তপ্রদেশের প্রতি লক্ষ্য রেখে। সে সমাজের সেকালের বৈশিষ্ট্যগুলো চোখের সামনে না তুলে ধরলে পরিণামে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ত্রিশের দশকে গোটা ভারতবর্ষের রাজনীতিক্ষেত্রে যে প্রকাণ্ড অবস্থান্তর ঘটাল তা সঠিকভাবে অনুধাবন করা যায় না। একদা ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত বিরক্তিসহকারে বলেছিলেন—যা ভারতবর্ষ তাই যুক্ত প্রদেশ! ব্যঙ্গোক্তি হলেও সে উপমা ঐতিহাসিক সত্য। কি বাঙলাদেশ বা পাঞ্জাব—ভারতবর্ষের অথবা পাকিস্তানের—আজকে যে পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে প্রায় দিশেহারা তা' তাদের ভাগ্যে আদৌ আসত কি না সে বিষয়ে বেশ সন্দেহ করা যায়, যদি না যুক্তপ্রদেশের সামাজিক সমস্যাগুলো সে যুগে ইংরেজী ব্যবস্থাপত্রানুযায়ী যে রূপ নিয়েছিল তা না নিত। মোটামুটিভাবে বেশ বলা যেতে পারে যে কেবল যুক্তপ্রদেশেই ভারতবর্ষের ও পাকিস্তানের বর্তমান অবস্থান্তরের জন্য দায়ী।

দিল্লীর মোঘল কাঠামে ঘূণ ধরলে যুক্তপ্রদেশে (আজকের উত্তরপ্রদেশ এবং অতীতের অযোধ্যা-রোহিলাখণ্ড) মুসলিম প্রভাব এসে পড়ে। সে প্রভাবের কেন্দ্রস্থলে ছিল নবাবী আমল—যার পত্তন হ'ল আঠারো শতকে তুর্কমান বংশের দ্বারা। বক্সারে বাঙলার নবাব মীরকাশেম যখন ইংরেজের বিরুদ্ধে "যুদ্ধং দেহি" বলে দাঁড়িয়েছেন তখন (১৭৬৪ সালে) তাঁর পাশে স্থান নিয়েছিলেন অযোধ্যার নবাব বংশের তৃতীয় পুরুষ সুজা-উদ-দৌলা।

যুদ্ধের ফলাফল আশানুরূপ হয়নি। যুদ্ধ পরাজয়ের রন্ধ্রপথে সুজার ভাগ্যে শনির অশুভ আগমন ঘটল। ইংরেজের দৃষ্টি বাঙলা-বিহার অতিক্রম করে আরও দূরে পৌঁছাল। বক্সার থেকে প্রত্যাবর্তন করে সুজা রাজ্যের রাজধানী ফৈজাবাদ থেকে লক্ষ্ণৌএ স্থানান্তরিত করলেন।

চতুর্থ নবাব আসফ-উদ-দৌলা (১৭৭৫ সাল) যখন মসনদে আসীন তখন ইংরেজের আধিপত্যের ছায়া অযোধ্যাখণ্ডকে গ্রাস করেছে। ইংরেজের কারসাজীতে অযোধ্যার নবাব ওয়াজীর সর্বপ্রথম দিল্লীর বাদশাহের আনুগত্য অস্বীকার করে আপন স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। সুজার বেগম ও আসফের মা (বাহু বেগম) ইংরেজের কাছে অভিযোগ করলেন স্বীয় ক্ষমতার বলে আসফ তাঁদের প্রায় ছাব্বিস লক্ষ মুদ্রার অস্থাবর সম্পত্তি আত্মসাৎ করেছেন। পারিবারিক আবর্তে পাক খেয়ে ইংরেজ বণিক-শাসকের সিংহাসনাভিমুখে প্রবেশের সুযোগ এল।

যুদ্ধবিগ্রহ ত লেগেই আছে সে জন্য প্রতিনিয়ত অর্থের প্রয়োজন ; এ ছাড়াও বেগমদের এই অভিযোগ ইংরেজ কর্মচারীদের রাতারাতি ধনী হবার সুযোগও এনে দিল। এডম্যাণ্ড বার্কের ওয়ারেন হেস্টিংশের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলোর মধ্যে অযোধ্যার বেগমদের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করা ছিল অন্যতম প্রধান।

নবাবের রাজ্য পরিচালনা করবার ক্ষমতা কেড়ে নেবার পর সুজার ছোট তরফের বেগম-জাত (খুরদ বেগম) ওয়াজেদ আলি সা ইংরেজদত্ত সনদ "রাজা" ও বাৎসরিক এক লক্ষ টাকার পেনসন নিয়ে কলকাতার গার্ডেনরীচে নির্বাসিত জীবন যাপন করতে থাকেন। ওয়াজেদ আলির সঙ্গে নবাব পরিবারের অনেকেই মর্যাদানুযায়ী পেনসন-বৃত্তি গ্রহণ করে কলকাতায় বসবাস করলেও সকলেই লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগ করেন নি। এদের মধ্যেই ছিলেন হজরত বেগম যিনি সিপাই বিদ্রোহ কালে যুক্ত-প্রদেশের অন্যান্য রাজপুত ও ও মুসলমান জায়গীরদারদের মত ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন এবং শেষপর্যন্ত সঙ্গী সাথী সহ ইংরেজের প্রতিহিংসা থেকে রক্ষা পাবার আশায় নেপাল রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

ব্যবসা বাণিজ্যের দিক হতে যেমন কলকাতা অথবা তীর্থস্থান হিসাবে বারাণসী খ্যাত, নবাবী আমলের লক্ষ্ণৌ-এর তেমন কোন

মর্যাদা ছিল না। অযোধ্যার রাজধানীরূপে এর সুনাম বা দুর্নাম সব কিছু জুড়ে থাকত নবাব পরিবারের জীবন-যাত্রার সঙ্গে।

সে ধারায় ছেদ এল ওয়াজেদ আলির কলকাতায় নির্বাসনের পর। ক্ষমতাচ্যুত এবং রুজি-রোজগার বন্ধ হল প্রায় ৬০,০০০ পাইক বরকন্দাজ, তাঁতি, আতরওয়ালা, নাচওয়ালা ও নাচওয়ালীদের। লক্ষ্ণৌ দরবারের অনুকরণে গোটা অযোধ্যার ছোট বড় জায়গীরদার-দের, যাদের অধিকাংশই ছিল রাজপুত, তাদের দরবারও হতশ্রী হয়ে পড়ল। হজরত বেগমের মত বা ঝান্সীর রাণীর মত এদের অনেকেই সেই বিদ্রোহে যোগদান করেছিল ইংরেজ তাড়ানোর উদ্দেশ্যে। যে "বেঙ্গল আর্মিতে" প্রথম বিদ্রোহের সূচনা দেখা যায়, সেই বেঙ্গল আর্মির মঙ্গল পাণ্ডে নিজেও সেই প্রদেশের মানুষ। প্রধানত এই যুক্তপ্রদেশের চাষীশ্রেণীর মানুষ নিয়ে বেঙ্গল আর্মি গঠিত ছিল।

বিদ্রোহান্তে লক্ষ্ণৌ এবং সমস্ত অযোধ্যার সমাজে ওলোট পালোট এসে গেল। জায়গীরদারদের কেউ কেউ প্রাণে বাঁচলেও সকলেই পথের পথিক। আশ্রিত সেপাই শান্ত্রীরা পলাতক। নিরাপত্তার জন্য যে-সব কেল্লা-দুর্গ এরা বংশানুক্রমে ভোগ দখল করে আসছিল সে সব, তাদের ধন-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবার সঙ্গে, কেড়ে নেওয়া হ'ল এবং অতীতের ধারা মুছে ফেলবার উদ্দেশ্যে কোথায় বা মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হল। এক লক্ষ্ণৌ এলেকাতেই এই জায়গীরদারদের প্রায় ১০০টি কেল্লা নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছিল। মামুদাবাদের রাজা নবাব আলি বিদ্রোহে অংশ গ্রহণে প্রাণ হারালে তাঁর জমিদারী বাজেয়াপ্ত হতে চলেছিল। তাঁর বেগম শিশুপুত্র আমীর হোসেনের নামে ক্ষমা ভিক্ষা করে কোনপ্রকারে সম্পত্তি রক্ষা করলেন। অনেকেই কিন্তু রক্ষা পেলেন না।

নতুনের পত্তন শুরু হল ১৮৫৯ সাল থেকে। যে সব নতুন তালুকদার যুক্তপ্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হলেন তাদের যে কি ধ্যান ধারণা গ্রহণ করতে হল তা সহজেই অনুমেয়। এর সঙ্গে বাঙলাদেশে পলাশী

যুদ্ধের পর থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বেকার যুগে যে অবস্থা এসেছিল তার সঙ্গে খানিকটা বাহ্যিক মিল থাকলেও প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত গরমিল ছিল। বাঙলায় অনেকে সুপ্রিম কোর্টের আনাচে কানাচের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে নীলামে জমীদারীর পর জমীদারী কিনে রাতারাতি জমীদার হয়ে পড়েছিলেন। যুক্তপ্রদেশে কিন্তু দীর্ঘমাত্রা দেওয়া থাকল ইংরেজ আনুগত্যের ওপর। যে সব পরিবার প্রমাণ করতে সমর্থ হ'ল যে বিদ্রোহ দমনে তা'রা সাহায্য করেছিল তারাই হলেন কুলীন-তালুকদার। যা'রা অতীতের নবাবীধারা বদলে নতুন ইংরেজী শাসন-ব্যবস্থা চালু করতে এগিয়ে এলেন নায়েব তহশীলদার হয়ে তারাই হলেন দু' নম্বর কুলীন। এ পত্তন চলেছিল অনেকদিন ধরে। বাঙালী তালুকদার রাজা দক্ষিণা রন্‌জন লক্ষ্ণৌ-এ ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন পত্তন করে সেই গোষ্ঠীতে উচ্চস্থান লাভ করেছিলেন।

যুক্তপ্রদেশের গোটা সমাজ-ব্যবস্থা লক্ষ্ণৌ-এর নবাবী ঢঙ-এ চলত। সে চাল চলন লক্ষ্য করলে অতীতে মুর্শিদাবাদের অনুকরণে বাঙলা দেশের জমীদারদের কাছারী-কেন্দ্রীভূত সমাজ-ব্যবস্থা কেমন ধরণের ছিল তার ধারণা করা যায়। চৌধুরী খলিকুজ্জমান মানুষ হয়েছিলেন এই লক্ষ্ণৌ সমাজে বর্তমান শতাব্দের প্রারম্ভে। তিনি তাঁর "Pathway to Pakistan" গ্রন্থে সে সমাজের চিত্র খানিকটা ধরে রেখেছেন। সে সময় নবাব-পরিবার লুপ্ত এবং নবাবের সামাজিক পদ-মর্যাদা অল্পবিস্তরভাবে আত্মসাৎ করে ফেলেছে যুক্তপ্রদেশের তিনশতাধিক তালুকদার গোষ্ঠীপতিরা। এ সব তালুকদারদের দৃষ্টি সেদিনও পড়ে থাকত লক্ষ্ণৌ-এর ওপর, কারণ জীবন উপভোগ ও পয়সা-উড়ানর এমন দ্বিতীয় শহর উত্তর-ভারতে আর ছিল না। (It was both the *de facto* capital of the province and a pleasure resort for them with immense opportunities for wasting money)

এদের রুচিবিকারও ছিল হরেক রকমের। গোন্দা তালুকের হিন্দু রাজা কৃষ্ণদত্ত রাম তার সিপাইকে জুতোপিটিয়ে প্রায় মেরে ফেলেছিলেন এই অপরাধে যে সে রাজা-সাহেব খানা খেতে যাবার পূর্বেই পেটা-ঘড়ীতে বারোটার ঘণ্টা বাজিয়ে ফেলেছিল। ঘড়ী ত রাজা-সাহেবের অনুগমন করবে—মুর্খ-সিপাই সে সত্য আবিষ্কার করতে পারেনি। মুসলমান তালুকদার রাজা মহম্মদ সিদ্দীকের দিল দরিয়া মেজাজ। বাঁদী বাইজী রাজা-সাহেবের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হলে তিনি তাঁর চারকোটি মুদ্রার ভূ-সম্পত্তি খোস-মেজাজে উইল করে বাইজীকে লিখে দিলেন!

এই সব তালুকদারেরা উঠতি এবং নবাবজাদারা পড়তি। তালুকদারদের জমিদারী হতে সব কিছু ভোগ্য ও অর্থের যোগান আসত। আর নবাবজাদাদের সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হত ইংরেজ-সরকার দত্ত পেনসন বৃত্তির ওপর। সে পেনসনের মাত্রাও বংশ পরম্পরায় ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে পড়ছিল। অনেক নবাবজাদাদের একটি বা দুটি কামরায় "মহল" করতে হত। যে পেনসন তাঁরা পেতেন তা' প্রথম চালু হয়েছিল সেই সুজা-উদ-দৌলার স্ত্রী বাহু বেগমের আমল থেকে। বেগম ইংরেজ সরকারকে অর্থঋণ দিলেন এই সর্তে যে এর সুদ হতে নবাবজাদাদের বংশানুক্রমে পেনসন দেওয়া হবে। কোন পেনসন-গৃহীতার মৃত্যু হলে যে অর্থ তাকে দেওয়া হত তার অর্ধেক সরকারে বাজেয়াপ্ত হবে এবং অপরার্ধ মৃতের উত্তর-পুরুষদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। শতাধিক বছর ধরে এই নিয়মে পেনসন-ব্যবস্থা যে নাম-মাত্রে চালু থাকবে এবং প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ আকিঞ্চিতকর হয়ে পড়বে তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। নবাবী ঠাট বজায় রাখা দুষ্কর হত নবাবজাদাদের পক্ষে, তালুকদারদের সমপর্যায়ে চলাফেরা করা ত দূরের কথা।

কলকাতার আদি যুগের জমিদার বাবুদের চাল-চলনের সঙ্গে লক্ষ্ণৌ-এর নবাবী ঠাটের তুলনা চলে। অর্থাৎ উনিশ শতাব্দীর শেষাংশে

ও বিংশ শতাব্দের গোড়াতে লক্ষ্ণৌ-এর সমাজ চিত্র ছিল আঠারো শতাব্দের শেষাংশের ও উনিশ শতাব্দের গোড়ার কলকাতার সমাজ চিত্রের মত। কলকাতার সে সমাজ চিত্র চিরকালের জন্য অঙ্কিত করে রেখেছেন কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর "হুতুম প্যাঁচার নকসা"তে। আর লক্ষ্ণৌ-এর ছবি শেষবারের মত দিয়েছেন চৌধুরী খলিকুজ্জমান: নবাবজাদারা ভদ্র, সভ্য সমাজের মানুষ ও আদর আপ্যায়নে অত্যন্ত অমায়িক। দিনের বেলায় কদাচিৎ তাঁদের জেনানা মহলের বাইরে দেখা যেত। ঘুড়ি উড়ানো তাদের একমাত্র ব্যসন-ক্রীড়া ছিল। কিন্তু সাঁজের আলো জ্বল্‌লে তাদের মন চঞ্চল হয়ে পড়ত। চুড়িদার আঙরেখায় দেহ আবরিত, চোখে শুরমা, গোঁপে আতর এবং শিরে সাদা লক্ষ্ণৌ টুপি পরে নবাবজাদাদের তখন একমাত্র গন্তব্য স্থল হ'ত সহরের চকে—নাচওয়ালীদের মহলে। প্রত্যেক নবাবজাদার নাচওয়ালী রক্ষিতা থাকত। কিন্তু ভাগ্যের বিড়ম্বনায় উঠতি তালুক-দারেরা পয়সার জোরে তাদেরও বাজেয়াপ্ত করে ফেলল! They (the Nawabzadas) were a gentle lot, tall, graceful, very courteous and affable, provided you could get near them, for mostly they were either in Zenana or flying kites, if not taking opium. During the day they looked completely dirty but you could barely recognise the same people in the evening after dusk, in their white *angrakha*, tight *pyjamas* and fine white caps, with their mouths full of betelnut and their dress wafting a bewitching odour of oriental perfume as they walked towards the *chawk* where most of them had their dancing girls in their pay, so long as the Talukdars with bigger purses did not take them away from them.

লক্ষ্ণৌ-এর এই তালুকদার ও নবাবজাদাদের সঙ্গে সে কালের কলকাতার বাবুদের জীবন-যাত্রার আর একটা বিষয়ে গভীর মিল ছিল। সে'টি হ'ল উভয়ের মামলা-প্রীতি। "দীয়তাম ভুজ্যতাম" ব্যবস্থা চালু রাখবার জন্য অর্থের প্রয়োজন। ঋণ করতে হ'ত হামেসা, কিন্তু সে ঋণ পরিশোধ করবার কথা আদৌ এদের স্মরণে থাকত না। ফলে মামলায় অতি সহজেই জড়িয়ে পড়তে হ'ত। সোনা, জহরত হাতছাড়া হবার পর ভু-সম্পত্তি লাটে উঠত। কিন্তু তাতেও এরা কদাচিৎ মুষড়ে পড়তেন। মামলা-দায়ের হবার সঙ্গে সঙ্গে যে সব ঘটনা ঘটত দাবি-দাওয়া নিয়ে বা আদালতে জবাবদিহি করতে, সে গুলোই হ'ত এদের মো-সাহেব ও রক্ষিতা-বাইজীদের দৈনন্দিন আলাপ আলোচনার বিষয় বস্তু।

এই ধরণে সামাজিক জীবন যাপনে যেমন অতীতে কলকাতার বাবু-সমাজের পরিবারগুলো সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বিত্তশালী করে ফেলেছিল ইংরেজ ও বাঙালী ব্যারিস্টার, উকীল এটর্নীদের, ঠিক একই ধরণে লক্ষ্ণৌ-এর বা যুক্তপ্রদেশের তালুকদারেরা বড়লোক করে ফেললেন লক্ষ্ণৌ বা এলাহাবাদের হিন্দু ও মুসলমান উকীল এবং ব্যারিস্টারদের। এই সব মামলা-বাজ তালুকদারদের সম্পর্কে চৌধুরী খলিকুজ্জমান নিজে উকীল হয়েও মন্তব্য করেছেন that is how they were nursing a class of lawyers which was to end the very system which gave rise to them. কলকাতার হুতুমী নক্সায় চিত্রিত জমিদার বাবুরা কেমন করে পরের যুগে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল কেউ যদি তার অনুসন্ধান করেন তিনিও ঐ একই উপসংহারে উপস্থিত হবেন। দেখতে পাবেন যে সে জমিদার শ্রেণী পরিণামে কলকাতার উকীল-ব্যারিস্টার-এটর্নী সম্প্রদায়ের ভক্ষ্য হয়ে উদরে স্থান লাভ করেছিল।

আর একটি গুরুতর ব্যবস্থা সম্পর্কে উভয় প্রদেশের তুলনা করা সম্ভব। সিপাই বিদ্রোহের পর যেমন যুক্তপ্রদেশ হয়ে পড়ল

মুসলমান তালুকদারদের অধ্যুষিত এলেকা তেমনি পূর্বযুগে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর থেকে বাঙলা-দেশ হয়ে পড়েছিল হিন্দু জমিদারদের এলেকা। যুক্তপ্রদেশের মুসলমান তালুকদারদের শতকরা প্রায় পচানব্বই ভাগ প্রজা হ'ল হিন্দু চাষী ঠিক যেমন বাঙলা দেশের হিন্দু জমিদারদের সমসংখ্যক প্রজা ছিল মুসলমান চাষী। এ তারতম্যে যে সামাজিক প্রতিক্রিয়া যুক্তপ্রদেশে দেখা দিল বিংশ শতাব্দের প্রারম্ভে, তা' বাঙলা দেশে দেখা দিয়েছিল অনেক পূর্বেই। চৌধুরী সাহেব যুক্তপ্রদেশের সে পরিস্থিতি সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা' উভয় প্রদেশে সমভাবে প্রযোজ্য : It was an open secret that the entire Muslim social and economic order was bound up with zemindari and the services, military and civil. Their share in business was scanty and particularly ninety five percent of trade and business was in the hands of the Hindus. The tenantry was also 95 percent Hindu and as such the talks of the abolition of zemindari in U. P. had clearly a communal basis.

দুই প্রদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোতে অদ্ভুত ধরণের মিল থাকলেও একটা বিষয়ে ঘোরতর গরমিল ছিল। এবং সেই একটি গরমিলের জন্য যুক্ত প্রদেশ অতীতের কঙ্কালস্বরূপ বাঙলার অগ্রগতিকে বার বার কেবল প্রতিহত করেনি পরিণামে সমগ্র ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করতে বাধ্য করেছে। ইতিহাসের চোখে যুক্তপ্রদেশের সৃষ্ট এই প্রতিবন্ধক এখনও আলোচ্য বিষয়বস্তু হয়নি।

যে সব কার্য-কারণে বাঙলা দেশে বৈচিত্র্য এল, সমাজে গতির সঞ্চার হ'ল অথচ যুক্তপ্রদেশে পরের যুগেও এলনা তার মূল কারণ নিহিত ছিল ইংরেজের বাঙলা দেশে, বিশেষ করে কলকাতায়, পরীক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠাতে এবং বাঙালী হিন্দুর সেই পরীক্ষা-কেন্দ্রে

আগ্রহভরে যোগদান করবার মধ্যে। বাঙালী হিন্দু কেবল ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করেনি সেই সঙ্গে আদর করে ঘরে স্থাপনা করে এসেছে পশ্চিমী ভাবধারা, আচার ব্যবহার, সামাজিক আদপ-কায়দা। ইংরেজী সাহিত্য, দর্শন এবং লোকাচার সমসাময়িক কালে ভারতবর্ষের আর কোন অঞ্চলেরই কোন সমাজ তেমনভাবে গ্রহণ করেনি যেমনভাবে করেছিল বাঙালী হিন্দু। এবং এইসব নতুন বিলিতি ধারাগুলোকে আবাহন জানাতে বাঙালী হিন্দু পুরানো সবকিছু বিসর্জন দিতেও এতটুকু ইতস্তত করেনি। বাঙালী-প্রধান রামমোহন রায়, ইংরেজ-সৃষ্ট ল্যাবরেটরিতে পুরানো ধারার রেশ মাত্র ধরে রাখবার চেষ্টা দেখে অস্বস্তি বোধ করেছিলেন।

যখন ইংরেজী ভাবধারা লক্ষ্ণৌ এবং যুক্তপ্রদেশে পৌঁছিল তখন যুগ ও দেশ বেশ ভালভাবেই বদলতির মুখে। তবুও কিন্তু লক্ষ্ণৌ-এর মুসলমান সমাজ অতীতের আসবাবগুলো ছাড়তে পারল না।

নবাবী আমল শেষ হ'ল নবাব সাদাৎ আলি খার (ষষ্ঠ নবাব, ১৭৯৮ সাল) সঙ্গে সঙ্গে। ইংরেজের সনদ ও পেনসনের ওপরে নির্ভর করে "রাজা" গাজী-উদ-দীন হায়দার (১৮১৯ সাল) হতে "রাজা" ওয়াজেদ আলি সা (১৮৫৬ সাল) মসনদে কাঠের পুতুল হয়ে বসে থাকলেন। সিপাই বিদ্রোহান্তে নবাবী-ধারার মূলচ্ছেদ করে ইংরেজী রাজত্ব কায়েম ও ইংরেজী শাসনব্যবস্থা শুরু হল। তখন ১৮৬০ সাল।

এর পনের বছর পরে উত্তর ভারতের মুসলিম নেতৃস্থানীয় উলেমাদের মতামত অগ্রাহ্য করে এবং সরকারী সাহায্যে আলিগড়ে শিক্ষালয়ের ভিত্তি স্থাপন করলেন স্যার সৈয়দ আহমদ। সিপাই বিদ্রোহান্তে উলেমাদের সহ্য করতে হয়েছিল সর্বপ্রকার নির্যাতন ও অপমান; কারণ সে বিদ্রোহে জন-নেতৃত্বের ভার পড়েছিল তাঁদেরি ওপর। এদেরি কাছে ইংরেজ রাজত্ব স্থাপনের হেতু হিন্দুস্তান দার-উল-ইসলাম (মুসলমানী রাজ্য) আর থাকল না, এবং ইংরেজী শিক্ষা হয়ে পড়েছিল হারাম।

আলিগড়-স্কুল প্রতিষ্ঠিত হবার কয়েক বছর পুর্বেই যুক্তপ্রদেশের সাহারাণপুর জেলার দেওবন্দ গ্রামে মৌলানা মহম্মদ কাশেম নানোতয়ী (Maulana Mohammad Qashem Nanatawi) উলেমা-ইমামদের শিক্ষা-ব্যবস্থা অটুট রাখতে দারুল-উলম (Darul Ulm) প্রতিষ্ঠা করলেন। উদ্দেশ্য থাকল নতুনের পীড়নে পুরাতনের ধারা বিলুপ্ত না হয়ে যায়।

আলিগড়ে সৈয়দ আহমদের মাদ্রাসাতুল-উলম (১৮৭৫ সাল) নাম পালটে হ'ল মহোমেডান এ্যাঙলো-ওরিয়েণ্টাল কলেজ (Mahammedan Anglo-Oriental College) ১৮৭৭ সালে। কলেজের সীলমোহরে প্রতীক চিহ্ন থাকল আরবের খেজুর গাছ, ইংলণ্ডের রাজমুকুট ও ইসলামের অর্ধচন্দ্র। নাম ও প্রতীক চিহ্ন হতেই স্যার সৈয়দ কি উদ্দেশ্যে কলেজ স্থাপনা করলেন অনেকটা বুঝতে পারা যায়।

শাসককুলের অনুকম্পা দেওবন্দ কোনদিনই পায়নি। পেল আলিগড়। দেওবন্দ অতীতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারা অব্যাহত রাখতে গিয়ে নির্ভর করল সমাজের দয়া ও দাক্ষিণ্যের ওপর আর আলিগড় মধ্যবিত্ত ও ওপরতলার তালুকদার-নবাবজাদাদের এবং বিশেষ করে ইংরেজ শাসকশ্রেণীর ওপর।

ইতিহাসের বিচারে উচ্চমান দুটি প্রতিষ্ঠানের যে কোনটিকেই দেওয়া হোক না কেন, আলিগড় পরিণামে হয়ে পড়ল ইংরেজ-আনুগত্য শেখানোর কেন্দ্রস্থল এবং দেওবন্দ হয়ে রইল মুসলমানী বিদ্রোহী-মনের আবাস স্থল। দেওবন্দই জন্ম দিয়েছিল সেই সব মুসলমান বিদ্রোহী নেতাদের যা'রা সুযোগ পেলেই সে ঘৃণাকে রূপদান দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। তাঁদের সেই স্বাধীনতা-কল্পনা বিকৃত হতে পারত কিন্তু তা'তে ইংরেজের ভারতবর্ষে থাকবার কোন অধিকার স্বীকৃতি পেত না। তাঁদের সেই স্বাধীন হিন্দুস্তানের কল্পনা থেকে প্রেরণা পেয়ে দেওবন্দের মৌলানা মহম্মদ হাসান (Shaikh-ul

Hind) ও মৌলানা ওবেয়াদ-উল্লা সিন্ধী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে ইংরেজ বিতাড়ন কাজে সাহায্য পাবার আশায় ছুটেছিলেন বহির্ভারতের মুসলিম রাষ্ট্রে। এদেরি উৎসাহে ভারতীয় মুসলিম "মুজাহিদেরা" খেলাফত রক্ষার্থে ঘরবাড়ী ছেড়ে হাঁটাপথে তুরস্ক অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে এমনকি দুই-একজন হিন্দুও উপস্থিত হয়েছিলেন আফগানিস্তানের কাবুল শহরে।

দেওবন্দের দৃষ্টি অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই পশ্চিমের মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ওপর পড়ে থাকত এবং সেজন্য এদের গুপ্ত ষড়যন্ত্রের কাহিনী পাঞ্জাবে ও আফগানিস্তানে যতটা সুপরিচিত পূবের বাঙলা দেশে ততটা হয়নি। এই ছিল দেওবন্দের ঐতিহ্য।

আলিগড় সাম্প্রদায়িক স্বার্থের কারণে উত্তর ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজের কাছে অতি আদরণীয় হয়ে পড়ল, অনেকটা আদি যুগের কলকাতার হিন্দু কলেজের মত। হিন্দু কলেজের ছেলেরা অতীতে যেমন হিন্দু সমাজের প্রতি মারমুখী হয়ে পড়েছিলেন, আলিগড়ের ছেলেরা তেমনি মুসলমান-দাবি চালু করতে বাস্তববাদী হয়ে পড়লেন। উভয় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকেরা ছিলেন বিদেশী, কিন্তু কলকাতায় তাঁ'রা হিন্দু-ছেলেদের চোখের সামনে তুলে ধরলেন র‍্যাসনালেজিমের আদর্শ, আর আলিগড়ে আনলেন চোরাগুপ্তা ধরণের রাজনীতি এবং সে আবর্তে পড়ে যা' ঘটল তা' চৌধুরী সাহেব ভাষ্য দিয়েছেন: If there had been no Aligarh, the Muslims would have been deprived of their share in the administration of the country and in all other departments of life in which English education was required for filling the posts.

আলিগড় সম্পর্কে এই ধারণা গোড়া হ'তেই উত্তর ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজে বদ্ধমূল হয়েছিল। হিন্দু কলেজ যেমন বাঙালীর মনকে নাড়াচাড়া দিয়েছিল তেমনভাবে আলিগড়

মুসলমান সমাজের দিগ্‌দর্শন কোনদিনই যে হয়নি সেকথা যুক্তপ্রদেশের ইংরেজী শিক্ষিতেরা চিন্তা করতেও পারেননি। পাকিস্তান দাবিদার মহম্মদ আলি জিন্না এবং সে কল্পনা রূপায়ণের প্রধান অংশীদার আবুল কাশেম ফজলুল হক ত' দূরের কথা এমনকি লক্ষ্ণৌ-এ কংগ্রেস-লীগ আঁতাত (১৯১৬ সাল) রচনা করতে যে অন্যান্য লীগ-প্রধানেরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের ক'জন আলিগড়ের ছাত্র ছিলেন? অপর দিকে আলিগড় গড়ে ওঠবার পূর্বেও যেমন তেমনি দেশ-বিভাগের পূর্বদিনেও যুক্তপ্রদেশের মুসলমান জনসংখ্যা সামান্যতম হ'লেও সামাজিক কারণে মুসলিম-প্রাধান্য সেখানে বরাবর প্রবলই ছিল, যেমন প্রবল ছিল শিক্ষার দৌলতে হিন্দু-প্রাধান্য বাঙলা দেশে।

আলিগড়ের বৈশিষ্ট্য ছিল স্যার সৈয়দ আহমদের আধুনিক শিক্ষা মুসলমান সমাজে প্রবর্তনের মধ্যে। তাঁর পূর্বে যুক্তপ্রদেশে উলেমাদের মতামত অগ্রাহ্য ক'রে সেদিকে কেউ অগ্রসর হ'ননি। ফলে সাবেকী মুসলমানী আদপ-কায়দা লোপ পেতে বসল নবাবজাদা ও তালুকদার অধ্যুষিত অঞ্চলে। ইংরেজী ভাষার মান উঠতে লাগল, হিন্দী প্রথম প্রতিষ্ঠা পেল যুক্তপ্রদেশে সরকারী ব্যবস্থায়। আলিগড়ের পক্ষ হ'তে আপত্তি উঠেছিল। কলেজ সেক্রেটারী নবাব মহসীন-উল-মুলক এমনকি সেণ্ট্রাল উর্দু ডিফেন্স এ্যাসোসিয়েসনও গঠন করেছিলেন। কিন্তু যেই যুক্তপ্রদেশের লাটসাহেব ধমক দিলেন অমনি অনুগত নবাব চুপ ক'রে গেলেন। যুক্তপ্রদেশে হিন্দীর পুনর্জন্মলাভ ঘটেছে এই শতাব্দের গোড়ায় ইংরেজের দাক্ষিণ্যে। হিন্দী বা উর্দু ভাষাভাষীদের কোন কিছুই করতে হয়নি।

পরিণামে আলিগড়ের নতুনত্ব থাকল এইটুকু যে সেখানে ইংরেজী-উর্দু শিক্ষিতেরা ক্রিকেটিয়ার-খেলোয়াড় হয়েও "মৌলানা" হতে পারতেন।

দেওবন্দ ও আলিগড় উর্দুর আবাহন জানাবার অনেক

পূর্বেই যুক্তপ্রদেশ তা' করেছিল। সে আবাহনে যেমন উৎসাহী ছিলেন দরবারী মুসলমান তেমনি হিন্দু। যুক্ত-প্রদেশের বাজপাই, শুক্লা, মিশ্র, চোবে, দোবে, তেওয়ারী, অথবা কাক, ধর, সপ্রু, নেহরু, ভাট-মোল্লাদের উর্দু-প্রীতি মুসলমান পরিবারদের তুলনায় কম ছিল না। আলিগড়ে উর্দুর নয়া-জমানা রূপে হালি (modern) সমর্থিত ইসলামী কৃষ্টির রূপায়ণে যুক্তপ্রদেশের নবাব এবং তালুকদারেরা ও তাঁদের আশ্রিত হিন্দু ও মুসলমান পরিবারগুলো যখন সমধিক আগ্রহী তখন কলকাতায় ডিরোজীয় নিয়ন্ত্রিত র‍্যাসানালেজিমের ভাবধারায় সিক্ত "ইয়ং বেঙ্গল" বিস্মৃত, মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দ-বদ্ধ মেঘনাদবধ-কাব্য, দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ পুরানো হয়ে পড়েছে, এমনকি বঙ্কিমী যুগও অনেক এগিয়ে গেছে এবং বালক রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মেলায় কবিতা পড়তে শুরু করেছেন।

কালো আচকানে ও তুর্কী ফেজে আবৃত হয়ে আলিগড়ের ছেলেরা যখন লক্ষ্ণৌ-এ মহরম-কাহিনী নিয়ে লোকোৎসব চালু করতে প্রয়াসী অথবা যখন হাকিম তসাদক হোসেন (নবাব মির্জা সাক নামে পরিচিত) Masnaivi-Zahr-i-Ishq লিখছেন এবং অশ্লীল সাহিত্য বলে সরকারী হুকুমে সে কেতাব বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে, তখন কলকাতার ছেলেরা বিলেত গিয়ে কেবলমাত্র ইংরেজ ছেলেদের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে ফেরেননি তাঁদের অন্যতম সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী চাকরী থেকে বরখাস্তও হয়েছেন (১৮৭২ সাল) এবং অপর একজন, বিহারীলাল গুপ্ত, কলকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে সরকারকে জানিয়ে দিয়েছেন যে আদালতে কোন আসামীর বিচার কাজে, সে আসামী ভারতীয় বা ইংরেজ হোক না কেন, তা'তে দেহের বর্ণ বিবেচনা করে সাদা বিচারক নিয়োগ-ব্যবস্থা অচল।

বিহারী গুপ্তের সেই প্রতিবাদ পত্রই হ'ল ইলবার্ট বিলের বনেদ। সেই বিল নিয়ে যখন কলকাতা নড়চড় হয়ে পড়েছে তাতে বঙ্গে সাড়া

দিয়েছিল, এমনকি এর মুসলমান প্রতিনিধি তায়েবজীও এগিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু কি আলিগড়, কি লক্ষ্ণৌ সে প্রতিবাদের ইঙ্গিতও বুঝতে পারেনি। বরং আলিগড়ের ও যুক্তপ্রদেশের মুসলমান ছেলেরা তখন যতটা মুসলমানী হয়ে পড়েছে ততটা ভারতীয়ত্ব হারাতে বসেছে। নতুন ধরনে মুসলমানী ইতিহাস মর্মস্পর্শী ক'রে লেখা শুরু হচ্ছে—যাতে প্রমাণিত হ'তে লাগল মুসলমানেরা বিদেশী, রাজার জাত। বিশ বছর সবে তখন পূর্ণ হয়েছে যখন এই অযোধ্যার হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত-নেতৃত্ব একযোগে ইংরেজ তাড়ানো কাজে সব-রকমের ঝক্কী মাথায় নিয়ে অগ্রসর হয়েছিল দিল্লীর বাদশাকে আবার মসনদে বসাতে! সে কথা তখন বিস্মৃত।

মুসলমান বনেদিত্ব প্রমাণে উর্দুভাষা নিশ্চয়ই কাজে এসেছিল সেদিন। কিন্তু সমপরিমাণে সে উৎসাহ বিস্মরণ ক'রে দিয়েছিল যে ভারতীয় মুসলমানেরা, ভারতীয় হিন্দুদের মতন, ভারতীয় মাত্র। এমনকি, দেওবন্দ, যদিও আলিগড়ের ফাঁকা ইসলামী-ফিরিঙ্গীপনার প্রতি কোনদিন মমত্ববোধ না দেখালেও, সিপাই বিদ্রোহের সময় যেমন মুসলমান এবং অমুসলমান একসঙ্গে বিদেশী শাসনের অবসান ঘটাতে এগিয়ে এসেছিল তেমনি ভবিষ্যতেও সে কাজ হাত মিলিয়ে করতে যে হবে এবং তাই যে স্বাধীনতা অর্জনের একমাত্র পথ, এইসব নতুন উর্দুলেখকদের লেখায় ভুলতে রাজি হয়েছিল।

দেওবন্দ-দূতেরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৮ সাল) মধ্যে ভারতবর্ষের বাইরের মুসলমান-রাজ্যগুলো হ'তে সাহায্য পাবার আশায় তথায় উপস্থিত হয়ে প্রথম বুঝতে পারলেন স্বাধীনতা অর্জন করবার প্রকৃত পথ কোথায়? গরিষ্ঠ অ-মুসলমানের সহযোগিতা ভিন্ন ইংরেজকে ভারতবর্ষ হ'তে তাড়ানো অসম্ভব একথা দেওবন্দ-দূতেরা বিভিন্ন মুসলমান রাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয়দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনান্তে এবং নিজেরা নানাপ্রকারের বিপর্যয়ের সামনে পড়ে সে সত্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হ'লেন।

দেওবন্দের মৌলানা মহম্মদ হাসান নিজে ছুটেছিলেন মক্কায় (১৯১৫ সাল), তুরস্ক তখন যুদ্ধে লিপ্ত। মক্কাধামের তুর্কী-গভর্নর মৌলানাকে খুব উৎসাহ দিলেন, ফতোয়া জারি করলেন যাতে সমস্ত মুসলমান দেশগুলো ইংরেজের বিরুদ্ধে "জেহাদ" ঘোষণা করে। সমস্ত দেশগুলো দূরের কথা তুরস্কের অধীনস্থ আরবও সেই বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে তুরস্কের বিরুদ্ধেই জেহাদ ঘোষণা ক'রে নিজেদের মুক্তির পথ তখন খুঁজতে ব্যস্ত! মৌলানা মদিনায় গেলেন, তুর্কীদের কাছ থেকে অনেক উৎসাহ পেলেন, এমনকি প্যান-ইসলাম ও প্যান-তুরাণ শ্লোগান যাঁর মাথা থেকে আবিষ্কৃত হয়েছিল সেই এনভার পাশার সঙ্গেও দেখা করলেন। এনভারের তখন পতন হয়নি, জামাল ও তালাত পাশাকে সঙ্গে করে তুরস্ক নিয়ে দাবা খেলায় তখন তিনি মত্ত। মৌলানা এনভারের নিকট হ'তে সর্বরকমে উৎসাহ পেলেন—এই ত সুযোগ!

তুর্কীরা উৎসাহ দিতে ব্যস্ত, কিন্তু আরবেরা? "আমরা মুসলমান" এ শ্লোগানে ভারতীয় মাটিতে ইংরেজী যুগে হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানকে দাঁড় করান সম্ভবপর হয়েছে অনেকদিন ধরে, কিন্তু সে শ্লোগানে তুরস্কের অধীনে আরবদের বাস করতে বলা সে যুগেই অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। যে পরিমাণে মৌলানা হাসান তুর্কী-উৎসাহ পেলেন ঠিক ততোধিক পরিমাণে আরবদের চোখে হয়ে পড়লেন দুষমণ।

এনভার পাশা মৌলানাকে ইসলামের নবজাগরণের দূত ব'লে সম্বোধন ক'রে যে পরিচয়-নামা দিলেন তার কপি ভারতবর্ষে পৌঁছিলে নিশ্চয়ই উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের মুসলমান জন-নেতাদের মনে অনেক আশার স্বপ্নের উদয় হয়েছিল, কিন্তু সমপরিমাণে মৌলানার কাজকর্ম আরব-জাতীয় মনে তাঁর প্রতি ঘৃণা ও ধিক্কার এনেছিল। জাতীয়তা-বোধহীন ভারতীয় মুসলমান-মন সে ঘৃণা ও ধিক্কারের কারণ অনুসন্ধানে তখন অসমর্থ ছিল। এরই পরিণামে যখন

যুদ্ধকালে ব্রিটিশ সাহায্যে মক্কার সরিফ হোসেন তুরস্ক শাসন খতম করতে দাঁড়ালেন (১৯১৬ সাল) তখন ইংরেজ শাসকেরা অতি সহজেই মৌলানা হাসান ও তাঁর সঙ্গীদের গ্রেপ্তার ক'রে নির্বাসনে পাঠাল।

দেওবন্দের অন্যতম দূত, মৌলানা ওবেয়াদ-উল্লা সিন্ধী, বেলুচিস্তান অতিক্রম ক'রে একই উদ্দেশ্যে কাবুলে প্রায় একই সময়ে পৌঁছিলেন। ইংরেজের অনুগত আমীর হবিবুল্লা মসনদে আসীন। আফগানিস্তান তুরস্কের মত যুদ্ধের হিড়িকে পড়েনি। কাবুলে যেমন তুর্কী-জার্মেন চরদের আনাগোনা ছিল তেমনি ইংরেজদের। "মুজাহিদেরা" তখন হাঁটাপথে কাবুলে পৌঁছেছেন।

বাইরের দুনিয়া যে বদলে যাচ্ছে ভারতবর্ষের মুসলমান নেতৃত্ব প্যান-ইসলাম শ্লোগানের মোহে সেদিকে আদৌ পরিচিত না থাকায় এই সব "মুজাহিদেরা" কাবুলে উপস্থিত হ'লে সরাসরি জেলে স্থানলাভ করলেন। মৌলানা ওবেয়াদ-উল্লা নিজে আমীরের সঙ্গে আলোচনা ক'রে, ইসলামের দোহাই দিয়েও আফগানের মনোভাব বদলাতে পারেননি। মৌলানা প্রধান মন্ত্রী ও বড় বড় সর্দারদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় আপন বক্তব্য পেশ করলেন যে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা হ'ল তাঁর ব্রত। সর্দারেরা তখন চোখে আঙুল দিয়ে তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন তাঁর কল্পনা অবাস্তব। শুধুমাত্র মুসলমান সম্প্রদায়ের সাহায্যের ওপর ভরসা ক'রে জেহাদ ঘোষণা ক'রে ইংরেজকে হিন্দুস্তান থেকে সরানোর চিন্তা পাগলামী মাত্র।

যখন ওবেয়াদ-উল্লা কাবুলে ধর্না দিয়ে বসে আছেন তখন তুর্কী-জার্মেন মিশন সেখানে উপস্থিত। সে মিশনে ছিলেন রাজা মহেন্দ্র-প্রতাপ, অজিত সিং ও মৌলানা বরকত-উল্লা। এঁদের ধ্যান-ধারণা পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে পরিচিতি লাভের ফলে দেওবন্দের ট্রেনিং পাওয়া মুসলমানদের অপেক্ষা অনেকটা আধুনিক ও যুগোপযোগী ছিল। মৌলানা এদের সংস্পর্শে এসে জীবনে প্রথম বুঝতে পারলেন

স্বদেশের স্বাধীনতা কোন্ পথে আসবে। আলোচনা শুরু হ'ল এবং কাবুলেই স্থাপিত হ'ল সাময়িক ভারতীয় সরকার (Provisional Government of India), রাজা মহেন্দ্র-প্রতাপ হ'লেন এর প্রেসিডেন্ট এবং মৌলানা বরকত-উল্লা সেক্রেটারী।

পরিণামে রাজা মহেন্দ্র-প্রতাপ, মৌলানা বরকত-উল্লা ও অজিত সিংকে কাবুল হ'তে অন্যত্র সরে পড়তে হ'ল ভারতবর্ষের ইংরেজ সরকারের চাপে। মৌলানা ওবেয়াদ-উল্লাকেও সঙ্গী-সাথী সহ জেলে যেতে হ'ল। তাঁর সৌভাগ্যই যে, মৌলানা হাসানের মত ইংরেজের হাতে পড়তে হয়নি। পরে আমানুল্লা আমীর হ'লে মৌলানা মুক্তিলাভ করলেন বটে তবে তাঁর সাথী সুফি অম্বাপ্রসাদের জীবনদীপ আফগানী জেলেই নিভে যায়। মৌলানার দৃষ্টিকোণ কাবুল থেকেই বদলাতে থাকে; বুঝতে পারলেন স্বদেশের স্বাধীনতা বাইরে থেকে আসতে পারে না; স্বাধীনতা কেবল মুসলমানের নয়, কেবল হিন্দুরও নয়, সমগ্র জনসাধারণের। পাঞ্জাবের তদানীন্তন গভর্নর, স্যার মাইকেল ও'ডায়ারের 'India as I knew it' গ্রন্থে কাবুলস্থিত ও মৌলানা-চালিত Provisional Government of India কি করেছিল, কি আত্মত্যাগ এ-আন্দোলনের নায়কদের করতে হয়েছিল বিদেশের মাটিতে স্বদেশের স্বাধীনতা আনবার জন্য তার খানিকটা চিত্র পাওয়া যায়। স্যার জন রাউলাট যে রিপোর্ট দাখিল করেন তা'তে একদিকে যেমন বিবেকানন্দ-তিলক-অরবিন্দ তেমনি অপরদিকে হাসান-বরকত-উল্লা-ওবেয়াদ-উল্লা-হরদয়াল-বীরেন্দ্র প্রভৃতির নাম ধরা পড়ে আছে।

দেওবন্দের প্রতিনিধিরা ফিরিঙ্গীপনার বিরোধিতা করে যখন বাইরের জগতে এসে স্বাধীনতা ও জাতীয়তার স্বরূপ ধরতে সক্ষম হ'লেন তখন আলিগড়ের আধুনিকেরা একদিকে ইংরেজী আনুগত্য দেখাতে অভ্যস্ত অপরদিকে মৌলভী জাকা-উল্লা, সিবলি, নুমানী, মহম্মদ হোসেন পানিপথী (হালি নামে খ্যাত) প্রভৃতি শক্তিমান

উর্দুভাষী লেখকের লেখনীতে অনুপ্রাণিত হয়ে ঘোর প্যান-ইসলামী।

যুক্তপ্রদেশে বহিরাগত হিন্দু উকীল ও মুন্সীরাও মুসলমান আদপ-কায়দার সঙ্গে পরিচিত হয়ে একদিকে উর্দুভাষী ও অপরদিকে মুসলমানী আচার ও আচরণে সুপটু হয়ে উঠেছেন। একেই বলা হয় যুক্তপ্রদেশের ঐতিহ্য।

যে-সব কারণে কলকাতার বাঙালী হিন্দু-সমাজের প্রতিনিধিরা শতাব্দের পূর্ব থেকেই ইংরেজ-বিরোধী হয়ে পড়েছিলেন সেই কারণ-গুলো যে আলিগড়ে একেবারে দেখা যায়নি এমন নয়। কিন্তু তা' যাতে সহজেই নির্মূল হয় তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চলত যেমন শাসক-কূলের পক্ষ থেকে তেমনি আলিগড়ের অভিভাবকদের পক্ষ থেকেও।

এ অভিভাবকদের প্রধানতম ছিলেন স্যার সৈয়দ আহমদ নিজেই। সকলেই তাঁর সম্পর্কে একমত যে, তিনিই সিপাই বিদ্রোহের পর বুঝতে পেরেছিলেন যে, পুরানো ইসলামী শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিবর্তন করবার সময় এসেছে। নিজে সরকারী কর্মচারী (সদর আমিন) হ'লেও ইংরেজী অক্ষর জ্ঞান তাঁর ছিল না। সিপাই বিদ্রোহে এবং যুক্তপ্রদেশে যেমন দেওবন্দ প্রতিষ্ঠাতা মৌলানা নানোতয়ী হয়েছিলেন বিদ্রোহী দল-নেতা তেমনি এই সদর আমিন সৈয়দ আহমদ হয়েছিলেন ইংরেজ পরিত্রাতা ও তাদের স্বার্থ রক্ষক। বিজনোরে বিদ্রোহীরা উপস্থিত হ'লে সৈয়দ আহমদ তাদের শান্ত ক'রে ইংরেজদের নিশ্চিন্ত করলেন। দ্বিতীয়বার বিদ্রোহী-নেতা গোলাম কাদিরের আত্মীয় গাজিয়াবাদের নবাব মামুদ খাঁ উপস্থিত হ'লে সৈয়দ আবার মধ্যস্থ হয়ে ইংরেজদের নিরাপদে মীরাটে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেন। পরে যখন তিনজন হিন্দু জমিদার একসঙ্গে মামুদ খাঁকে তাড়িয়ে দিলেন (এদের নেতা প্রতাপ সিং পরে "রাজা" হয়েছিলেন) তখন ইংরেজরা বিজনোরের শাসন ব্যবস্থা দেখাশুনার ভার সৈয়দ আহমদ ও তহশীলদার তোরাব আলি খাঁনের ওপর

দিয়েছিলেন। বিদ্রোহান্তে ইংরেজী শিক্ষা যে অতি প্রয়োজন সমাজের পক্ষে, তা' বুঝতে পেরে ইংরেজ শাসক কর্মচারীদের সহায়তায় সৈয়দ সে শিক্ষা প্রচলনে অগ্রণী হ'লেন। তাঁর পক্ষে এ ব্রত গ্রহণ করা অনেকটা পূর্বযুগে কলকাতায় ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনে হিন্দু-প্রধানেরা যা' করেছিলেন তার সমতুল্য।

পূর্বযুগে রাজনীতির বালাই বড় একটা ছিল না, তাই বাঙালীর দৃষ্টি কেবলমাত্র সীমাবদ্ধ রইল শিক্ষা ও সমাজ-ব্যবস্থায় নতুনত্ব আমদানি করতে। স্যার সৈয়দের সময় রাজনীতি একটা নির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ ক'রে ফেল্‌ছে। শুধুমাত্র সিপাই বিদ্রোহে এ অবস্থান্তর আসেনি, তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছে সমসাময়িক অন্যান্য বহু কারণ। জনমানসে প্রতিক্রিয়াও দেখা দিয়েছে তখন। একটা খুব বড় ইস্যু তখন মাথা চাড়া দিয়ে সাধারণের গোচরে এসে পড়েছে। এদেশের ছেলেদের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় কৃতিত্বলাভে শাসকদের মনে সন্দেহ এনে ফেলেছে যে পরীক্ষা নেবার ব্যবস্থা না বদলালে কালক্রমে ভারতীয়দের হাতে গোটা শাসন-ব্যবস্থা চলে যাবে। নতুন ব্যবস্থায় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীর বয়স পূর্বাপেক্ষা আরও কমিয়ে দেওয়া হ'ল। উদ্দেশ্য থাকল এত অল্প বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া শেষ ক'রে বিলেতে গিয়ে এ-পরীক্ষা দেবার সুযোগ ভারতীয়েরা নিতে পারবে না।

সবে প্রতিষ্ঠিত কলকাতার ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েসন (১৮৭৬ সাল) দ্বারা আহূত জনসভায় পরীক্ষার বয়স কমানো প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে দাবি করা হ'ল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা একই সময়ে এদেশে ও বিলেতে নিতে হবে। কলকাতার টাউন হলের এক সভায় (১৮৭৭ সাল) স্থির হ'ল যে, এ আন্দোলন সর্বভারতীয় ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে এবং সেইজন্য সদ্য সিভিল সার্ভিস থেকে বিতাড়িত সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী বিভিন্ন প্রদেশের শহরগুলোতে গিয়ে তথাকার স্থানীয় নেতৃবর্গের সহিত

আলাপ-আলোচনা ক'রে কলকাতায় গৃহীত সিদ্ধান্ত যাতে সর্বভারতীয় সমর্থন লাভ করে তার ব্যবস্থা করবেন।

সুরেন্দ্রনাথের সেই উত্তর-ভারতবর্ষ সফর হয়েছিল সমগ্র ভারতবর্ষের জন-গণ-মন একত্রীকরণের প্রথম প্রয়াস। লাহোর, অমৃতসর, মীরাট, দিল্লী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, আলিগড়, এলাহাবাদ, বারাণসী ও পাটনায় সুরেন্দ্রনাথ উপস্থিত হ'লেন এবং সে প্রস্তাবের পূর্ণ সমর্থন পেলেন। যে-সব লোক-নেতাদের সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মেজর জেনারেল হিদায়েত খাঁন বাহাদুর (পাটনা), স্যার সৈয়দ আহমদ (আলিগড়), পণ্ডিত অযোধ্যানাথ, পণ্ডিত বিশ্বম্ভর (এলাহাবাদ) ও রাজা আমীর হোসেন (মামুদাবাদ)।

সুরেন্দ্রনাথের কাছে এঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা খ্যাতনামা ছিলেন আলিগড় কলেজ প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহমদ এবং সেজন্য সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে অন্যান্যদের তুলনায় স্যার সৈয়দকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। আত্মজীবনী রচনায় সুরেন্দ্রনাথ যথেষ্ট বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা ভারতীয় জাতিগঠনের গোড়ার কথা যাতে ভবিষ্যৎ বংশধরেরা সহজে ধরতে পারেন তা' লিপি-বদ্ধ ক'রে রেখেছেন। স্যার সৈয়দ সম্পর্কে সুরেন্দ্রনাথের বক্তব্য বিচার করলে সমসাময়িক দৃষ্টিতে এই খ্যাতনামা লোক-নেতা যা'কে উত্তর ভারতীয় এবং ইংরেজী-শিক্ষিত মুসলমান-সমাজ, ভারতীয় হিন্দু-সমাজ যেমন রাজা রামমোহন রায়কে উচ্চাসন দিয়েছেন, তেমনি উচ্চাসন দিয়েছেন, তা' কতখানি সার্থক বুঝতে পারা যায়।

সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ The most famous of those whom I met was undoubtedly Sir Syed Ahmad, the founder of Aligarh College and one of the greatest leaders of the Moslem community under British rule. He did not know a word of English, but, none other

than any other Mohammedan leader of his generation, he realised how necessary English education was for the advancement of his community, and he had the will to resolve and genius to organise a movement for imparting it upon a scale of far reaching comprehensiveness, and under conditions of permanence and utility that have immortalised his name.

He received me with the utmost kindness, and our friendly relations continued, notwithstanding differences of opinion, which the Congress movement subsequently gave rise to. He presided over the Civil Service meeting at Aligarh which accepted the Calcutta Resolutions among which was one in favour of simultanious examinations.

কিন্তু দশ বছর পরে স্যার সৈয়দ আপন মত বদলে ফেললেন। সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন: It is worthy of note, however, that as a member of the Public Service Commission of 1887, he signed the report of the majority and not joined Sir Ramesh Chandra Mitter and Rai Bahadur Nulkar in their support of simultanieous examinations.

কেন স্যার সৈয়দের মতিগতি পরিবর্তিত হ'ল? তখন ভারতের রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলমান বৈষম্যের প্রশ্ন ত' আসেনি এবং সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা নেবার ব্যবস্থা স্বদেশে ও বিলেতে একই সময়ে হ'লে কেবল হিন্দুদেরই সুবিধা হবে এবং মুসলমানদের হবে না এ ধারণা করাও যুক্তিযুক্ত হবে না।

স্যার সৈয়দের মত পরিবর্ত্তনের কেবলমাত্র একটি কারণই থাকা সম্ভব, তা' হ'ল এই যে, বিদেশী শাসকেরা সেদিনের সেই ভারতীয় দাবি আপন সম্প্রদায়ের স্বার্থের খাতিরে সু-নজরে দেখতে পারেননি এবং সাহেবরা এ দাবি সমর্থন করলেন না ব'লে স্যার সৈয়দও তাঁর পূর্বমতে আর স্থির থাকতে পারেননি। শাসক-কুলের সাহায্যে ও আনুকূল্যে তাঁর কলেজ এবং নিজেরও প্রতিষ্ঠা-লাভ হয়েছিল। তাই স্যার সৈয়দ আলিগড়ের পক্ষ থেকে কলকাতার সেই প্রথম দাবি পূর্বে সমর্থন জানালেও পরিণামে ত্যাগ করেছিলেন।

১৮৮৫ খৃস্টাব্দে কংগ্রেস-সংস্থা গঠিত হয়েছে। তার পূর্বে ও পরে কলকাতাকে কেন্দ্র ক'রে কয়েকটি আন্দোলন-ধারা সর্বভারতে ছড়িয়ে পড়াতে কলকাতা বিশেষকরে যুক্তপ্রদেশের শাসক-কুলের বিষ-নজরে পড়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ সরাসরি স্যার সৈয়দের সঙ্গে মতবিরোধের কারণগুলো লিপিবদ্ধ না করলেও কংগ্রেস সংস্থাই যে এর প্রধান কারণ সে ইঙ্গিত করেছেন। পরিণামে কংগ্রেসের পাল্টা হিসাবে স্যার সৈয়দ যুক্তপ্রদেশে একটা নতুন সংস্থাও দাঁড় করাতে চেষ্টা করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন: It can serve no useful purpose to recall at this distance of time the memory of controversies that are now past and well might be forgotten. We lost his (Sir Syed's) championship and the great weight of his personal influence and authority in the controversies that gathered round the Congress movement. His "Patriotic Association" (United India Patriotic Association, 1888) was started in opposition to it. But even the greatest among us has his limitations. The Patriotic Association has disappeared; the Congress has continued to live and flourish.

Patriotic Association-এর উদ্দেশ্য ছিল (1) to inform Parliament and people of England that the communities of India, aristocrats and princes are not with the Congress and contradict its statements (2) to inform them about the opinion of Hindu and Muslim organisations which are opposed to the Congress (3) to help maintenance of Law and Order and strengthening British Rule in India and to wean away people from the Congress. ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত এ্যাসোসিয়েসন চলেছিল। পরে নাম পাল্টে একে মহোমেডান এ্যাঙ্‌লো-ওরিয়েন্টাল ডিফেন্স এ্যাসোসিয়েসন করা হ'ল এবং উদ্দেশ্য থাকল to protect Moslem political rights and prevent political agitation from spreading among Mohamedans.

সুরেন্দ্রনাথ বন্ধু হিসাবেই স্যার সৈয়দকে বরাবর মান্য ক'রে আসতেন এবং সেজন্য পরলোকগত নেতার প্রতি কেবল শ্রদ্ধাঞ্জলিই দিয়েছেন, সমালোচনা করবার প্রয়োজন বোধ করেননি। কিন্তু সে যুগে স্যার সৈয়দের কর্মধারায় যে বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছিল পরবর্তী যুগে যুক্তপ্রদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে তা' অতিমাত্রায় প্রতিক্রিয়াশীল যে হয়ে পড়েছিল কি ক'রে অস্বীকার করা যায়? স্যার সৈয়দের ভূমিকা সে যুগে যা হয়েছিল তা' যদি না হ'ত তবে হয়ত ভারতবর্ষের ইতিহাসই ভিন্নপথগামী হত।

কেন স্যার সৈয়দ সেই আদিযুগেই কংগ্রেস-বিরোধী হ'লেন, কেন পাল্টা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে সচেষ্ট হলেন? সেদিন কংগ্রেস যে আদর্শে বিশ্বাসী ছিল তার সঙ্গে স্যার সৈয়দের আদর্শের মধ্যে বড় ধরণের মতভেদ তো ছিল না, হিন্দু-মুসলমান প্রশ্ন তখনও আসেনি।

এই সব "কেনর" উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে সেই কারণগুলোর মধ্যে যার জন্য স্যার সৈয়দ সত্তর দশকে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার দাবিতে সুরেন্দ্রনাথকে সমর্থন করেছিলেন, কিন্তু পরের দশকে পারেননি। কেবল পরীক্ষার দাবি নয় অন্যান্য যে দাবিগুলি পরের যুগে আসতে লাগল তাতে সাম্প্রদায়িকতার কোন দুষ্ট গন্ধ না থাকলেও স্যার সৈয়দকে আর দেশীয় দলে থাকতে দেখা যায়নি।

যখন স্যার সৈয়দ ধাপে ধাপে কংগ্রেস-বিরোধী হয়ে মুসলমান সম্প্রদায়কে কংগ্রেস সংস্থা থেকে দূরে রাখবার বিধি-ব্যবস্থা করছিলেন তখন দেওবন্দ তাঁর প্রতিবাদী। রাজনীতিক্ষেত্রে ইংরেজের অনুগত হয়ে যেমন কংগ্রেসের প্রতি স্যার সৈয়দ তাঁর দৃষ্টিকোণ বদলান ঠিক অনুরূপ-ভাবেই সে-কালের যুক্তপ্রদেশের মুসলমান সমাজের ওপর ইসলামী আইন-কানুনের প্রভাবও তাঁর কাছে অচল ও অনাবশ্যক ব'লে মনে হয়েছিল এবং এদিকেও তিনি সংস্কার করতে প্রয়াসী হ'লেন। It was unfortunate that in his (Sir Syed) advocacy of Western Civilisation and his radical approach towards a modern interpretation of the Quran he went too far and alienated his supporters from his plan of religious reform. (Dr. Ziya-ul-Hasan Faruqi)

দেওবন্দ উভয় দিক হ'তেই স্যার সৈয়দের বিরোধিতা করেছিল। দেওবন্দ প্রতিষ্ঠাতা মৌলানা নানাতোয়ীর মৃত্যুর পর মৌলানা রসীদ আহমদ দেওবন্দের প্রধান হয়ে স্যার সৈয়দের কংগ্রেস সম্পর্কে মতামতের প্রতিবাদ ক'রে "ফতোয়া" দিলেন। He was traditionalist but in the field of politics he was progressive and gave a "fatwa" declaring that in worldly matters co-operation with the Hindus was permissible provided it did not violate any basic

principle of Islam. The occasion for this "fatwa" arose with the establishment of the Indian National Congress in 1885 and Sir Syed's vigorous stand against it. (Dr. Faruqi)

স্যার সৈয়দ কেন কংগ্রেস-বিরোধী হয়ে পড়লেন সে রহস্য উদ্ঘাটন ক'রে ডাঃ জিয়া-উল-হাসান ফারোকী দায়ী করেছেন আলিগড় কলেজের তদানীন্তন প্রিন্সিপ্যাল বেক সাহেবকে। আলিগড়ের প্রিন্সিপ্যাল সাহেবরা যে সেই আদিযুগ থেকে প্রতিষ্ঠানটিকে ইংরেজের রাজনীতির ঘাঁটি হিসাবে পরিচালনা করতেন তা' বাইরের লোকদের কাছে আদৌ অজ্ঞাত ছিল না এবং এর সর্বশেষ স্বীকৃতি ক'রে গেছেন চৌধুরী খলিকুজ্জমান তাঁর গ্রন্থে। বেক সাহেব সম্পর্কে ডাঃ ফারোকী লিখেছেন: The critics of Sir Syed's policy hold that one Mr. Beck, a personification of British conservatism and the Prinicipal of Aligarh College (1883-93) served as an imperial agent and succeeded in weaning him away from his earlier broadmindedness to a level of narrow communalism.

বেক সাহেব কি নিজের খেয়ালমত এই অনুগত মুসলমান প্রধানকে কংগ্রেসের প্রতিবাদীরূপে দাঁড় করিয়েছিলেন? সে প্রশ্নের উত্তর সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী এলাহাবাদে কংগ্রেসের চতুর্থ অধিবেশন পণ্ড করতে যুক্তপ্রদেশের লাটসাহেব কি করেছিলেন তার যে কাহিনী আত্মজীবনীতে লিপিবদ্ধ করেছেন তারই মধ্যে পাওয়া যাবে। বেক সাহেব, স্যার সৈয়দ নিজে এবং তাঁদের মতাবলম্বী হিন্দু-মুসলমান তালুকদারেরা সকলেই সেই লাটসাহেবের এজেন্টরূপে কাজ ক'রে চলেছিলেন তখন।

পরে স্যার সৈয়দ কেবল কংগ্রেস-বিরোধী ছিলেন না, মিশর বিদ্রোহে এবং তুর্ক-গ্রীক যুদ্ধে (১৮৯৭ সাল) তিনি সে

সব মুসলমান রাষ্ট্রের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে পারেননি। আলিগড় কলেজ পত্রিকায় (Aligarh Institute Gazette) তুরস্ক সুলতান, আবদুল হামিদ, খেলাফত দাবি করতে পারেন না এবং ইংরেজ তুরস্কের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলেও ভারতীয়দের বিশেষকরে মুসলমানদের ইংরেজ-আনুগত্য অটুট রাখা কর্তব্য ব'লে স্যার সৈয়দ অভিমত দিয়েছিলেন (even if they [the British] were compelled to pursue an unfriendly policy towards Turkey.) হায়, খেলাফত !

এ তো ঐতিহাসিক সত্য যে, কংগ্রেস-সংস্থা কল্পনা আদিতে এসেছিল অভিজ্ঞ সিভিল সার্ভিস কর্মচারীদের মাথায়। "নীলকর দর্পণ" নিয়ে অভিযুক্ত স্বনামখ্যাত লঙ সাহেব সিপাই বিদ্রোহের সময় লর্ড ক্যানিং ভারতীয় সমাজের কোন বিষয়ে কি মনোভাব পোষণ করতেন এবং তার সঙ্গে কোন পরিচয় শাসক-কুলের না থাকাটাই যে সবচেয়ে বড় অন্তরায় হয়েছিল তা' ব্যক্ত ক'রে গেছেন। বিদ্রোহান্তে সাদা-কালা নিয়ে বিবাদ-বিসম্বাদ, অত্যাচার ও অপমান হামেসা লেগেই থাকত ; তারপর একে একে এল অস্ত্র-রক্ষা নিষেধ আইন (Arms Act), লেখনি সংযত করা আইন (Vernacular Press Act) এবং সর্বশেষে ইলবার্ট-বিল। অপরদিকে চলল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি শাসন-ব্যবস্থা। কংগ্রেস জন্মলাভ করবার পূর্বেই প্রতিবাদ জমাট হয়ে উঠতে লাগল কলকাতাকে কেন্দ্র ক'রে। আবার সিপাই বিদ্রোহের মত মারাত্মক ধরণের কোন কিছু সমাজ-দেহে প্রকট না হয় তার জন্যই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা।

বড়লাটের সম্মতি নিয়ে এবং শাসক-কুলের প্রতিনিধি হয়ে এ্যালেন অক্টেভান হিউম সাহেব কংগ্রেস কল্পনা করলেও একথা কিন্তু সত্য নয় যে, আপামর শাসক-গোষ্ঠী সেদিন হিউম ও তার দুইচারজন সহকর্মীদের সহায়তায় সৃষ্ট এ প্রতিষ্ঠানকে ভাল চোখে দেখতেন। এমনকি, বড়লাটও শীঘ্রই কংগ্রেস সম্পর্কে তার পূর্বমত পরিবর্তন

করেছিলেন। সিভিল সার্ভিস দলের যাঁরা হিউমের কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠা-প্রয়াস বানচাল করতে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী ছিলেন তাদের নেতৃত্ব করতেন যুক্তপ্রদেশের গভর্নর, স্যার অকল্যাণ্ড কলভিন। অপর পক্ষে এই স্যার অকল্যাণ্ডই ছিলেন স্যার সৈয়দ আহমদের এ্যাঙ্‌লো-ওরিয়েণ্টাল কলেজ ও "পেট্রোয়োটিক এ্যাসোসিয়েসন" প্রতিষ্ঠার প্রধান সহায়ক।

এলাহবাদে কংগ্রেসের চতুর্থ অধিবেশন বসে ১৮৮৮ সালে। এই হ'ল আলিগড় অধ্যুষিত যুক্তপ্রদেশে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন। সে অধিবেশন যাতে এলাহাবাদে সুসম্পন্ন না হয় তার জন্য স্যার অকল্যাণ্ড যথাসাধ্য চেষ্টিত ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী আত্মজীবনীতে লিখেছেন: I have a distinct recollection of the Congress of 1888, the first Indian National Congress session held in Allahabad. Those were the early days of the Congress, and the interst that the novel demonstration exerted in a place that had never witnessed anything like it was great. It was stimulated by certain incidents. Nothing is so helpful to an infant cause, seething with enthusiasm as opposition. Sir Auckland Colvin, who in 1884, on the eve of Lord Ripon's departure for England, had recognised the birth of a new life in India, now fiercely assailed the Congress, which was typical of that life. He was a pupil of Lord Dufferin. Lord Dufferin had, just before he vacated Viceroyalty, denounced the Congress and its programme, and referred to the educated Community as a "microscopic minority." Indian officialdom took

its cue from him. Mr. Hume's stirring pamphlets appealing to educated Indian to rally round the Congress provoked the ire of Lt. Governor of the United Provinces, who not only wielded his pen in a wordy controversy, but threw many difficulties in the way of the holding of the sessiom of the Congress at Allahabad.

Raja Shiva Prasad of Benares, the trusted friend of the officials, entered Congress pandal as a deligate. That he should have joined the Congress was a marvel. But it was a diplomatic move. His object was soon disclosed in the course of the speech that he delivered. He came not indeed to bless but to curse and he received the retort courteous from Mr. Eardley Norton in a speech of witherng scorn and indignation.

লেফটন্যাণ্ট গভর্নরের এমনি ধারা রাজত্বে এবং সরকারী অনুকম্পায় প্রতিষ্ঠালাভ যাঁ'রা করেছিলেন তাঁ'রা হিন্দু বা মুসলমান যাই হোক না কেন, কংগ্রেস-বিরোধী হ'লে আশ্চর্য হবার কি থাকতে পারে? স্যার সৈয়দ তাঁর যুগের তালুকদার প্রতিনিধি রাজা শিবপ্রসাদের মত সরকারী অনুগ্রহ-প্রার্থী ছিলেন মাত্র।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানও সে যুগে সরকারীমত-বিরোধী ছিল না, খানিকটা সমালোচক ছিল মাত্র। ঠিকভাবে বিচার করলে বলতে হয় সমগ্র ভারতবর্ষে কেবলমাত্র কলকাতা তখন সমালোচকের ভূমিকা ছেড়ে প্রতিবাদীর ভূমিকা গ্রহণ করতে চলেছে।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা নিয়ে বাদানুবাদের সমতুল্য আর একটি বিষয় সেদিন এসে পড়েছিল যার ফলে কলকাতা ও আলিগড়ের

দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য "একাল সেকালের" মত হয়ে পড়েছিল। এটি হ'ল প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় বিধান সভায় মনোনয়ন ব্যবস্থার পরিবর্তন নিয়ে। মনোনয়ন প্রথার পরিবর্তে নির্বাচন প্রথার দাবি কলকাতায় এসে গেছে। মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তখন বড়লাটের সভার মনোনীত সদস্য। বড়লাট ডেকে পাঠালেন এবং অনুরোধ বা হুকুম করলেন যাতে তিনি মনোনয়ন ব্যবস্থা সমর্থন করেন। মহারাজা সরকারী মতে মত দিলেন (১৮৭৩ সাল)। ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েসনের মুখপাত্র হ'লেন মহারাজা, অতএব তার মুখপত্র "হিন্দু পেট্রিয়ট" যে এতদিন ধরে মনোনয়ন ব্যবস্থা সমালোচনা ক'রে আসছিল বাধ্য হয়ে চুপ ক'রে থাকল। They could not disavow him, one of their most trusted colleagues— বলেছেন সুরেন্দ্রনাথ।

এই ছিল সবচেয়ে আগুয়ান কেন্দ্র কলকাতার উপরতলার অবস্থা, অতএব তালুকদার ও নবাবজাদাদের যুক্তপ্রদেশের আলিগড় প্রতিনিধি স্যার সৈয়দের ধ্যান-ধারণা কি ঢঙ-এর ছিল বা আশা করা যেত তা' সহজেই অনুমেয়। চৌধুরী খলিকুজ্জমান তাঁর গ্রন্থে স্যার সৈয়দের মনোনয়ন প্রথার সমর্থনে বক্তব্যগুলো প্রায় "ঐতিহাসিক" ব'লে ধরে নিয়ে কেবল সে-কালের রাজনীতির পটভূমিকা সম্পর্কে নিজের অজ্ঞতার প্রমাণ দিয়েছেন। স্যার সৈয়দ যে while defending the nomination of a certain number of Municipal representatives as against the Hindu proposal of total representation by election কলকাতা ও আলিগড়ের রাজনৈতিক ভাবান্তর ও মতান্তরের কথাই অলক্ষ্যে বলেছিলেন তো প্রমাণ করতে একটুও অসুবিধা হয় না।

এ মনোনয়ন-প্রথা নিয়ে বিবাদ-বিসম্বাদ যুক্তপ্রদেশের যে কোন মিউনিসিপ্যালিটি তো দূরের কথা ভারতবর্ষের একমাত্র

কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটি ছাড়া আর কোনটি নিয়ে দানা বাঁধতে পারত না তা' যে কোন ইতিহাসের ছাত্রের কাছে সুপরিচিত। কংগ্রেস যখন ভূমিষ্ঠ হয়নি, তখন কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটি ইংরেজ সদস্যদের কবল থেকে মুক্ত করতে বাঙালী সদস্যেরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। বাঙালীর সেই যুক্ত প্রচেষ্টায়, সিভিল সাভিস পরীক্ষা নিয়ে আন্দোলনের মত, বড় বাধা এসেছিল যুক্তপ্রদেশের আলিগড় থেকে। স্যার সৈয়দের রাজনীতি আলোচনা করলে কেবল এই কথাই অনুমান করা চলে যে, তিনি সমকালীন এবং তাঁরই মতন মনোনীত হিন্দু-সদস্যেরা যেমন সরকারী নীতি সমর্থন করতেন, তিনিও তাই করতেন। যুক্তপ্রদেশের সরকারী নীতি ছিল কংগ্রেসের বিরুদ্ধতাসাধন। স্যার সৈয়দের রাজনীতি তাই কংগ্রেস-বিরোধী হয়ে পড়েছিল।

বাঙলা ও যুক্তপ্রদেশের অথবা কলকাতা ও আলিগড়ের মধ্যে যে প্রধান অনৈক্য আদিতে ও পরিণামে ছিল বা দেখা দিয়েছিল তা' সীমায়িত থাকল ভাবজগতে। বাঙলার মধ্যবিত্ত হিন্দু প্রতিনিধিরা সংখ্যালঘু হ'লেও সকল বাধা মুক্ত ক'রে দেশকে ক্রমপ্রসারতার পথে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, আর যুক্তপ্রদেশের তালুকদার নবাবজাদাদের মুসলমান প্রতিনিধিরা স্ব-প্রদেশে আরও সংখ্যালঘু হ'লেও সেই অগ্রগতির দ্বার রুদ্ধ ক'রে চলেছিল প্রতি পদক্ষেপে। যুগের পর যুগ ধরে আলিগড় কেবল তুলেছে সাম্প্রদায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিচ্ছিন্ন প্রাচীর যার পরিণামে দেশের স্কন্ধে অনিবার্যভাবে নেমে এল দ্বিখণ্ডিকরণের খড়গ। মুসলমান সমাজের কাছে আলিগড়কে যে নয়া-মুসলিম জাগরণের ধ্বজা স্বরূপ ব'লে ধরা হ'ত তা' মোটেই প্রমাণসাপেক্ষ নয়। আলিগড় হয়ে পড়েছিল সরকারী সাহায্যে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়ার কেন্দ্রস্থল।

নয়া মুসলিম জাগরণ যদি কেউ আনতে সাহায্য করে থাকে সে দাবি করতে পারত সরকার-নিন্দিত ও ধিকৃত দেওবন্দ। দেওবন্দ

ছিল ব'লেই আলিগড় যা' স্যার মহম্মদ ইকবাল বিদ্রূপ ক'রে ভারতীয় মুসলমান সম্পর্কে বলেছিলেন সে সমাজ তা' হয়নি—আচারে খৃষ্টান, ব্যবহারে হিন্দু—

Waz'aa main tum hu Nasara
Tu Tamaddun main yahood.

স্যার সৈয়দের দেহান্তে তাঁরই নির্দেশানুসারে চলতে শুরু করলেন তাঁর অনুগামীরা—আলিগড়ের কর্মকর্তারা। মনোনয়ন-প্রথা কায়েম রাখা অসাধ্য হ'ল। আংশিক যুক্ত-নির্বাচন-প্রথা শুরু হ'ল ১৮৯২ সালে। সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন দাবি স্বীকৃত হ'ল অন্যদিকে সরকারী অভিযোগ শুরু হ'ল—কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটি গোল্লায় যেতে বসেছে। লর্ড কার্জন প্রথমে কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির প্রতিনিধিত্ব খর্ব করে, পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে (১৯০৪ সাল) এবং সর্বোপরি বঙ্গভঙ্গ ক'রে (জুলাই ২০, ১৯০৫) সে দাবি দাবিয়ে রাখতে ও তার প্রতিষেধক বিধি-ব্যবস্থাগুলোকে আরও চড়াপর্দায় তুলে ধরলেন।

কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ক্ষমতা হরণ বিল ম্যাকেনজী বিল নামে খ্যাত। স্যার আলেকজাণ্ডার ম্যাকেনজী ছিলেন হোম-সেক্রেটারী। ১৮৯৯ সালে বিলটি আইনে পরিণত হ'লে মিউনিসিপ্যালিটির ২৮ জন মেম্বার একযোগে সদস্যপদে ইস্তাফা দিয়ে যে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন, কার্জনের মুখের ওপর, আলিগড় তো দূরের কথা ভারতবর্ষের অন্য যে-কোন প্রদেশের পক্ষে তা' কল্পনার অতীত ছিল। আজ অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করলে সহজেই অনুমান করা যায় যে, বাঙলা দেশের রাজনীতিতে যে গঙ্গাধারা বিগত ১৯০০ সাল থেকে ইংরেজের প্রতিকূলে প্রধাবিত, গঙ্গা আনয়নের সেই জয়মাল্য ঐ অষ্টাবিংশতি কণ্ঠের প্রাপ্য।

সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী তখন কলকাতার মিউনিসিপ্যালিটির প্রতিনিধি হয়ে বাঙলা বিধান সভার সদস্য। ম্যাকেনজী বিল

আলোচনকালে সরকার পক্ষ থেকে স্যার এডওয়ার্ড বেকার নিজে এসে অনুরোধ করলেন: "Surendranath, don't burn your boats", meaning that I should say nothing that would commit me to an absolute refusal to take further part or share in the work of the Corporation after it had been reconstituted under the New Act. I said, 'That is impossible' and have remained outside the Corporation ever since Sept. 1, 1899, when the twenty-eight Commissioners tendered their resignation. Once or twice I was pressed to reconsider my decision by men like Narendranath Sen and Nalin Behari Sircar but I remained obdurate; and to me it fell by a strange irony of fate to revise the Mackenzie Act and to democratise the constitution of the Corporation (March 7, 1923).

স্যার সৈয়দ আহমদ কর্তৃক বন্দিত মনোনয়ন-প্রথা অচল হয়ে পড়ল এ শতাব্দের গোড়া থেকেই। নতুন কি পথ স্থির করা যায় তা' নিয়ে বিচার-বিবেচনা আরম্ভ হ'ল শাসক মহলে। মর্লে-মিণ্টো রিফরম আসবার সময় উপস্থিত হ'ল কার্জন বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গেই। ১৯০৬ সালে বিলেতের পার্লামেণ্টে বাজেট পেশ করতে মর্লে (সেক্রেটারী অফ স্টেট ফর ইণ্ডিয়া) আগামী শাসন-সংস্কারের কথা জানালেন। এবার কি রক্ষাকবচ শাসন-ব্যবস্থায় আনা যায় তা' শাসক-কূলের বিবেচ্য বিষয় হ'ল। নির্বাচন-প্রথা গৃহীত হবেই, সে ব্যবস্থা সংহত করা যায় কি উপায়ে?

আবার যুক্তপ্রদেশের ওপর দৃষ্টি পড়ল। স্যার সৈয়দ পরলোকে, তবে তাঁর সুহৃদ এবং সরকারী মহলের বশংবদ নবাব মহসীন-উল-মুলক তখন আলিগড় কলেজের সেক্রেটারী। তাঁকে সামনে আনা

হ'ল। নির্বাচন-প্রথা যদি একান্তই রোধ না করা যায় তবে এর কার্যকারিতা যতটা সম্ভবপর সীমাবদ্ধ ক'রে রাখতে হবে।

বিধান সভার আদি যুগে যখন বিধান সভাতে কেবল মনোনীত সদস্যেরাই আসতেন তখন বে-সরকারীদের মত সরকারী কর্মচারীদেরও সদস্য করা হ'ত। তবে তাদের ভোট দেবার ক্ষমতা অপ্রতিহতই থাকত (Act of 1876)। বিধান সভা ১৮৯২ সালে সংস্কৃত হ'লেও মনোনীত সরকারী কর্মচারীদের ভোটদানে কোনরূপ বাধা দেওয়া হ'ত না ব'লেই রমেশচন্দ্র দত্ত অথবা চীফ সেক্রেটারী কটন সাহেব (উভয়েই কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট হয়েছিলেন) সরকারের বিরুদ্ধে দরকার হ'লে ভোট দিতেন। যতটা পরিমাণে নির্বাচন-ব্যবস্থা প্রসারিত হ'তে লাগল ঠিক অনুরূপে মনোনীত সরকারী সদস্যদের ভোট দেবার ক্ষমতা সংকুচিত হ'তে লাগল। এ নির্বাচন প্রথানুসারে কিন্তু পৃথক সাম্প্রদায়িক নির্বাচনী কেন্দ্র (একমাত্র সাহেবদের ছাড়া) বা ব্যবস্থা অথবা শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করবার প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। ১৮৯২ সালের যুক্ত-নির্বাচনী ব্যবস্থা অনুসারে তিনজন সদস্য নির্বাচিত হ'লেন, নাটোরের মহারাজা, তাহিরপুরের রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় এবং নবাব সিরাজুল ইসলাম। ভোটাধিকার ক্ষুণ্ণ ছিল তা' সত্ত্বেও এই তিন মহারাজা, রাজা ও নবাব, হিন্দু-মুসলমান ভোটে কাউন্সিলে আসতে পেরেছিলেন।

মর্লে-মিণ্টো রিফরমে (১৯০৯ সাল) নির্বাচন-প্রথা যে আরও জোরদার হবে শাসক-কূল পূর্ব থেকেই অনুমান করতে পেরেছিলেন। মর্লের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তোড়জোড় শুরু হ'ল। নবাব মহসীন-উল-মুলকের বন্ধু ও আলিগড় কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, আর্কবাল্ড সাহেব (W. A. J. Archbald) সে শুভ মুহূর্তে সিমলায়। তাঁকে দূত ক'রে আলিগড়ের মুসলিম-নেতৃত্ব আগামী রিফরমে নির্বাচন-ব্যবস্থা সাম্প্রদায়িক ভিত্তির ওপর দাঁড় করবার ষড়যন্ত্র চালাল। কার্জন-কৃত পূর্ব বাঙলা গঠনে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি বেশ ভাল

রকমেই তখন সমাজে দেখা দিলেও এ দাবির কেন্দ্র স্থাপিত হ'ল ঐ যুক্তপ্রদেশের তালুকদার ও নবাবজাদাদের সমাজে। এ ষড়যন্ত্রের নায়ক ছিলেন বড়লাটের সেক্রেটারী কর্নেল ডানলপ স্মিথ। মহসীন-উল-মুলকের চিঠি গেল আর্কবাল্ড সাহেবের কাছে, আর্কবাল্ড সে চিঠি পাঠালেন স্মিথের কাছে, স্মিথ সে চিঠি পেশ করলেন বড়লাট মিণ্টোর কাছে। চিঠি পড়ে এবং আপন মন্তব্য জুড়ে মিণ্টো সে চিঠি বিলেতে লর্ড মর্লে'র গোচরে আনলেন। বড়লাটের মন্তব্য হ'ল : I think it worthwhile to enclose you a copy of a letter to Mr. Archbald, Principal of Aligarh College from Mohsinul Mulk, the manager of the College. It was only put before me today and is important in illustrating the trend of Mohamedan thought, and the apprehension that Mohamedan interests may be neglected in dealing with any increase of representation on the legislative Councils.

যুক্তপ্রদেশের নবাবের এই পত্রের ওপর নির্ভর ক'রে পরিণামে ১৯০৬ সালের আগস্ট মাসে মুসলিম ডেপুটেশন বড়লাটের কাছে যান যাতে বিধান সভায় নির্বাচনে মুসলিম-স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না হয় তার জন্য দরবার করতে।

সেদিনের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম প্রতিনিধিত্বের দাবি কোথায় ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা ছিল, এবং কোন্ প্রদেশের মুসলমানেরা যুক্ত নির্বাচনে ভরসা পেতেন না! সে কি মুসলিম-গরিষ্ঠ পূর্ববঙ্গে অথবা মুসলিম-লঘিষ্ঠ যুক্তপ্রদেশে ?

ব্যামফিল্ড ফুলারের আমল তখন এবং সেজন্য পূর্ব বাঙলার অবস্থা কেমন হয়ে পড়েছিল সুরেন্দ্রনাথ তার বর্ণনা দিয়েছেন : The policy of the Government, especially that of East Bengal under Sir Bampylde Fuller, added to the tension

of the situation. He declared, half in jest, half in seriousness, to the amazement of all sober-minded men, that he had two wives, Hindu and Mohamedan, but that the Mohamedan was the favourite wife.···The Civil Service took their cue from him ; and the administration was conducted upon lines in the closest conformity with the policy which he had so facetiously announced. অতএব পূর্ব বাঙলার দিকে দৃষ্টি রেখে যুক্ত নির্বাচনে অঘটন ঘটার দুর্ভাবনা নিশ্চয়ই যুক্তপ্রদেশের মুসলিম নেতৃত্বের আসেনি। পূর্ব বাঙলায় মুসলিম নেতৃত্ব তখন পুরো দস্তুর জোরদার।

সেদিনকার পশ্চিম বাঙলার (বিহার এবং ওড়িষ্যা তখনও এ প্রদেশের সঙ্গে সংযুক্ত) কথাই ওঠে না, কারণ এই প্রদেশের রাজধানী কলকাতাই তখন হয়ে পড়েছে সবকিছু নষ্টের গোড়া। মনোনয়ন ব্যবস্থা তো ছার, অবাধ নির্বাচন-প্রথা চালু করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী রাজনীতি দর্শনের আধুনিকতম ভাবধারাগুলো যে কি রকমে সমাজ সহজে হজম করতে পারে তার জন্য শুরু হয়েছে নতুন আন্দোলন।

লর্ড কার্জন (১৯৯৮ সালে) ভারতবর্ষের বড়লাট হয়ে এসে এবং নিজেকে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের ধারক ও বাহক মনে ক'রে সেদিনকার ভারতবর্ষের শাসন-ব্যবস্থার অন্তর্গত পারস্য উপসাগরস্থ দ্বীপগুলো একবার দেখতে গিয়েছিলেন। পেট্রোলিয়াম-তেল নিয়ে সেখানে যে বিরাট শিল্প আজ গড়ে উঠেছে তখন তার গোড়া-পত্তনের কাজ চলছিল। কার্জন যখন উপস্থিত তখন সেখানে বিলেতের "টাইমস" পত্রিকার প্রতিনিধি ভ্যালেনটাইন চিরলও একই উদ্দেশ্যে উপস্থিত। কার্জন চিরলকে ভারতবর্ষ পরিদর্শন করবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। চিরল নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যখন কলকাতায় উপস্থিত তখন চলেছে

স্বদেশী আন্দোলনের মোহড়া। চিরল সবকিছু দেখে তার কাগজে লিখলেন, বাঙলা-দেশ দু টুকরো করা প্রশ্ন আজ গৌণ, ভবিষ্যতে বাঙলা দেশ যুক্ত কি দুটো প্রদেশ হবে সে প্রশ্নও আজ বড় নয়। আজ বিচার্য বিষয় হ'ল "Whether British rule itself was to endure in Bengal or, for the matter of that, anywhere in India". অতএব বুঝতে একটুও দেরী হয়না যে পুব-বাঙলা কি পশ্চিম-বাঙলার মানুসগুলোর তরফ থেকে ওকালতি করে যুক্তপ্রদেশের নবাব সাহেব আর্কবাল্ড সাহেবের মাধ্যমে বড়লাট মিণ্টোর কাছে স্বতন্ত্রনির্বাচন নিয়ে আর্জী পেশ করেননি।

যুক্তপ্রদেশের দিক থেকে বিচার করলে সহজেই কিন্তু ধরা পড়ে যে অবাধ নির্বাচন ব্যবস্থা চালু হলে সে প্রদেশে মুসলিম-নেতৃত্ব রক্ষা করা দুষ্করই হ'ত। নবাব সাহেব যুক্তপ্রদেশের স্বার্থই যে সর্বভারতীয় মুসলমান স্বার্থ এই সনাতন ধারণা নিয়ে অগ্রসর হয়ে আর্কবাল্ড সাহেবকে পত্র লিখে থাকবেন। এবং সে মন্তব্য অনুমোদন করেই বড়লাট নির্বাচন ব্যাপারে যে মুসলমানেরা সন্দিগ্ধ সে কথা মর্লে'কে জানালেন।

মুসলিম ডেপুটেসন সিমলায় কি বলবেন তাও প্রিনসিপ্যাল আর্কবাল্ড ডানলপের সঙ্গে পরামর্শ করে নবাব সাহেবকে জানালেন। চৌধুরী খলিকুজ্জমান লিখেছেন: Mr. Archbald indeed, after meeting the Secretary of the Viceroy, Mr. Dunlop Smith, had written to Nawab Mohsinul Mulk to the effect that the address should express loyalty to the Crown and that hope might be expressed that Muslim opinion would be given due weight in regard to future initiation of reforms. He also suggested that in his opinion it would be wise for the Muslims to claim nomination

or representation on the basis of religion, because the time for elections had not yet arrived.

যখন পূব ও পশ্চিম বাঙলায় চলেছে তমুল গণ-আন্দোলন তখন তার পশ্চিম-প্রান্তে অবস্থিত যুক্তপ্রদেশের আলিগড় কেন্দ্রীভূত নবাবজাদাদের সামনে রেখে কংগ্রেস আন্দোলন-বিরোধী অ্যাঙলো-ইণ্ডিয়ান শাসক-কুল যে কোন মোক্ষম অস্ত্রের খোঁজে আছেন সে সন্দেহ অনেকেই করেছিলেন। তাদের উদ্দেশ্যেই চৌধুরী সাহেব লিখেছেন : There is a section of people who think that the claim for seperate elections was a command performance having been initiated by the British Government through Mr. Archbald, এবং মৌলানা তুফল আহমদ তাঁর গ্রন্থে "Roshan mustaqbil"-এ খোলাখুলি ভাবেই সে সন্দেহ প্রকাশ করাতে চৌধুরী সাহেব লিখেছেন : Maulana Tufall Ahmad has done a great wrong to Nawab Mohsinul Mulk by saying that the demand for seperate elections was made at the instance of Mr. Dunlop Smith. কেবল মৌলানা তুফল আহমদ নয় এমনকি মৌলানা মহম্মদ আলিও—তিনিই ছিলেন সেই সিমলা ডেপুটেসনের কনিষ্ঠতম মেম্বর—ইঙ্গিত করে গেছেন যে ডেপুটেসন পাঠানোর ব্যবস্থা ছিল—কর্তার ইচ্ছায় কর্ম (Command performance) মাত্র।

বাদানুবাদে না গিয়ে এ সত্যটুকু খোঁজ করা আদৌ কষ্টসাধ্য নয় যে সিমলা ডেপুটেসন পাঠানো হয়েছিল যুক্তপ্রদেশের মুসলিম নেতৃত্বাধীনে, উদ্দেশ্য ছিল সে প্রদেশে মুসলিম প্রতিষ্ঠা খর্ব না হয়। দাবি দৃষ্টি-কটু হতে পারে বলেই তো' ভারতীয় মুসলিম দাবি বলে দেখানো হয়েছে। আগা খান অভিভাষণ পড়লেও তিনি চৌধুরী খলিকুজ্জমানের মতে পৃথক নির্বাচনের বিরোধীই ছিলেন। নবাব

মহসীন-উল-মুলকই সাহেবদের উপদেশানুসারে এ ব্যবস্থার একান্ত সমর্থক ছিলেন। নবাব সাহেব বিশেষভাবে খ্যাতিলাভ করেছিলন তাঁ'র ইংরেজ-আনুগত্যের জন্য।

একদা আলিগড় কলেজের ছেলেরা সাহেব প্রফেসর ও প্রিন্সিপ্যালের অত্যাচারে স্ট্রাইক করে ফেলেছিল। যাতে সাহেবরা না চটে তার জন্য নবাব সাহেব তাদের অনুকূলে মতামত দিয়েছিলেন। কলেজের ট্রাস্টিরা কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটি অনুসন্ধানের পর নবাবের কাণ্ড কারখানার তীব্র সমালোচনা করেন। The committee's report was not very favourable to the Secretary, Nawab Mosin-ul Mulk. He was so heart-broken after the incident that he died at Simla. যে ব্যাপার নিয়ে এই অবস্থা কলেজে এসে পড়ল তার ব্যাখ্যা করে চৌধুরী সাহেব লিখেছেন Raja Ghulam Hussain was the hero of the strike and from him I learnt that the students had begun to feel that the English staff of the College were acting rather as agents of the Government than as professors of the College. A group of Aligarh College trustees also shared the views of the students. Nawab Mosin-ul Mulk did not consider it politically sound to antagonise the English professors as a class but the younger section of the Trustees, particularly Maulana Shaukat Ali and Mahammad Ali in the heat of controversy wrote letters to Nawab Mosin-ul Mulk in a language and tone which I deprecate. এমন ধারা ইংরেজের হাতের পুতুল ছিলেন যে নবাব সাহেব তাঁকে মুসলমানের 'রক্ষা-কবচ', সাম্প্রদায়িক নির্বাচনের স্বাধীন আবিষ্কারক বলে মনে করেন মুসলমান লেখকেরা!

অপরদিকে সিমলা ডেপুটেসন কল্পনা করবার অনেক পূর্বে আয়ারল্যাণ্ডে ইংরেজ শাসকেরা সেদিন "no concession without division" নীতি আপন সমাজস্থ মানুষের ওপর চালু করে ফেলেছেন এবং কলকাতার মিউনিসিপ্যালিটিতে অথবা বিধান সভাতে কেবল স্ব-সম্প্রদায়ের ভোটার-প্রতিনিধিদের দ্বারা নির্বাচিত করে ইংরেজ সদস্যদের তথায় পাঠাবার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। সেই একই ব্যবস্থা কেবল রাজনীতির গরজে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য মর্লে-মিণ্টো শাসন সংস্কারে বিধিবদ্ধ করে ফেলে। উদ্দেশ্য একই no concession without division এবং সে divisionও পরিণামে এসে গেল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিনকার ইংরেজ শাসককুলের এই পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা সম্পর্কে ধ্যান ধারণা কি ছিল তার পরিচয় দিতে লিখেছেন : And they necessarily thought that what was good for them was equally good for the Mahommedan community overlooking the fact that their case stood apart from that of Mahommedans, that the Hindus and Mahommedans were bound to form sooner or later, a united nationality, and that the communal system was a hindrance to the development of Indian nationhood. সুরেন্দ্রনাথ যখন আত্মজীবনী লেখেন তখন কেবল লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট কার্যকরী ছিল, দেশ-বিভাগ অধ্যায় লিখবার সম্ভাবনা তখনও দেখা দেয়নি।

১৯০৬ সালের অক্টোবর মাসে মোসলেম ডেপুটেসন সিমলায় উপস্থিত হ'ল এবং ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় মোসলেম লীগ প্রতিষ্ঠা হল। পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার দাবি পেশ করবার পর যুক্তপ্রদেশের মুসলিম নেতৃত্ব হয়ত বুঝতে পারলেন যে, যে-প্রদেশে তারা সংখ্যায় লঘিষ্ঠ সেখানে লীগ প্রতিষ্ঠা করে পৃথক্ নির্বাচনের মহিমা কীর্তন করলে

লোক-চক্ষুর অন্তরালেই থেকে যাবার সম্ভাবনা। ঢাকা তখন পূর্ব-বাঙলার রাজধানী এবং মুসলমান জনমত সরকারী উস্কানীতে হিন্দু-বিরোধী হলেও, যুক্তপ্রদেশের মুসলমান জনমত অপেক্ষা ঢের জাগ্রত। এরও পশ্চাতে যে সরকারী অনুমোদন ছিল না তা' হলপ করে বলা যায় না। কারণ মর্যাদার বিচারে ঢাকার আসান মঞ্জিলের নবাব সলিমূল্লা যুক্তপ্রদেশের তৃতীয় শ্রেণীর তালুকদারের সম-পর্যায়ে গৃহীত হতে পারতেন কিনা সন্দেহ। সেখানে আলিগড়ের নবাব মহসীন-উল-মুলকের নিমন্ত্রণে সর্বভারতীয় মুসলমান নেতৃবর্গ যে উপস্থিত হলেন তার প্রধান কারণই হল ঢাকা—আলিগড় নয়—মুসলমান অধ্যুষিত রাজধানী। আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকায় লীগ প্রতিষ্ঠা হলেও আর কখনও সে সংস্থার অধিবেশন সেখানে বসেনি। লীগ হেড-কোয়ার্টারস প্রথমে আলিগড়ে এবং পরে লক্ষ্ণৌএ থাকল। বাঙালীর মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খাবার ব্যবস্থা আজকের নয়।

১৯০৬ সালে ঢাকায় লীগ প্রতিষ্ঠা কালে মৌলানা আবুল কালাম আজাদও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর মতে the leaders of the League were naturally opposed to the demand for political independence raised by the Congress. They felt that if the Muslims joined in any such demand, the British would not support their claims for special treatment in elective bodies and services. In fact they described the Congress as a disloyal organisation of rebels and distrusted even moderate political leaders such as Gokhale or Sir Ferozsah Mehta. During this phase the British Government always used the Muslim League as a counter to the demands of the Congress.

বাঙলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের যেমন রূপায়ণ হতে লাগল তার

প্রতিষেধক হিসেবে, বিশেষ করে যুক্তপ্রদেশের মুসলমানকে কলকাতাতে আমদানী করা হতে লাগল। অবশেষে কলকাতা এবং বাঙলাদেশ সম্পর্কে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হ'ল এবং ইংরেজ শাসকেরা মনে মনে গভীর সন্দেহ করতে লাগল যে এ দেশের কোন হিন্দুই আর বিশ্বস্ত হতে পারে না। যুক্তপ্রদেশ থেকে মুসলমান এনে বাঙলাদেশের গোয়েন্দা বিভাগ ভর্ত্তি করা হতে লাগল হিন্দুর ওপর নজর রাখতে। হিন্দুর মন বিষিয়ে উঠতে লাগল। মৌলানা আজাদ লিখেছেন: One other factor was responsible for the revolutionaries' dislike of Muslims. The Government felt that the political awakening among the Hindus of Bengal was so great that no Hindu could be fully trusted in dealing with the revolutionary activities. They, therefore, imported a number of Muslim officers from the United Provinces for the manning of the Intelligence Branch of Police. The result was that the Hindus of Bengal began to feel that Muslims as such were against political freedom and against the Hindu community.

মৌলানা আজাদের বক্তব্য মনে রাখলে একথা সহজে বোঝা যায় কেন মৌলভী সামসুল আলমের ওপরে মুরারীপুকুর (আলিপুর) বোমা ষড়যন্ত্র মামলা (১৯০৮-১৯০৯ সাল) দায়ের ও তদারকের ভার ন্যস্ত ছিল। হিন্দু-বাঙালী পুলিশ অফিসার যে সে যুগে ছিল না এমন নয়, মুরারীপুকুরের বাগান-বাড়ী অথবা "বন্দেমাতরম" অফিস খানাতল্লাসীর কাজে পুলিশ ইনস্পেক্টর পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী ছিলেন কিন্তু নথীপত্র, গোপন সলা-পরামর্শ অথবা কা'র ওপর নজর রাখা কর্ত্তব্য এসব মারাত্মক ধরণের পুলিসী কাজ সেদিন মুসলমান গোয়েন্দা অফিসারদের ছাড়া চলত না।

মলে´-মিণ্টো শাসনে পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা মুসলমানদের জন্য করা থাকলেও দেশের অভ্যন্তরে বিশেষ কোন অবস্থান্তর কিন্তু আসেনি। এর প্রধান কারণ হল যে বিধান সভায় নির্বাচিত সদস্যেরা একমত হ'লে এবং কোন প্রস্তাব সমর্থন করলে, এমন কি সে প্রস্তাব গৃহীত হলেও তা যে কার্যকরী হবে তার কোনই নিশ্চয়তা ছিল না। সে আমলের বিধান সভাগুলো গোখলে, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি খ্যাতনামা সদস্যেরা হাউসে থাকলেও, অনেকটা উপদেশক সংস্থার (advisory body) মত ছিল। বক্তব্য ও মন্তব্য পেশ করবার অধিকার দেওয়া ছিল কিন্তু তা' গ্রাহ্য হবে এ অধিকার স্বীকার করা হয়নি। মণ্টেগু-শাসন ব্যবস্থায় "ডায়ার্কী" যখন চালু তখন ভোটের জোরে কতগুলো বিষয় (transferred subjects) নিয়ে ওলোট পালট ও সরকারী ব্যবস্থা বানচাল করে দেওয়া যেত। এবং এই অধিকারের পূর্ণ সুযোগ নিয়ে বাঙলা দেশের বিধান সভায় স্বরাজীরা অঘটন ঘটিয়েছিল।

সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচন ব্যবস্থা যুক্তপ্রদেশের মোসলেম নেতারা যে পরের কথা শুনেই সর্বভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের দাবি রূপে পেশ করেছিলেন তা' মলে´-মিণ্টো শাসন ব্যবস্থা চালু হবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশ পেল। যুক্তপ্রদেশে মুসলমান লোকসংখ্যা যতই অকিঞ্চিৎকর হোক না কেন সামাজিক মর্যাদায় এবং অতীতের ঐতিহ্যে সে প্রদেশের মাতব্বর তো মুসলমানেরাই ছিলেন, শাসন কার্যের দেশীয় বিভাগ তো সেই সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের হাতেই ছিল। সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদে সে ব্যবস্থা অচল হ'ল, বিধান সভায় সংখ্যানুপাতে ১০০ জনের মধ্যে কেবল ১৪ জন মুসলমান প্রতিনিধি নির্বাচিত করে পাঠাবার সুযোগ মিলল। বরং অবাধ ও অসাম্প্রদায়িক নির্বাচন ব্যবস্থায় তাদের বেশী সংখ্যক প্রতিনিধি সভায় পাঠানোর সম্ভাবনা ছিল, বিশেষ করে যুক্তপ্রদেশে, যেখানে সিপাই বিদ্রোহের স্মৃতি অনেকদিন ধরে জীবন্ত

ছিল এবং রাজনীতির পরিচয় সাধারণ হিন্দু চাষীর বিশেষ কিছুই হয়নি।

লক্ষ্ণৌ-এ কংগ্রেস-লীগ আঁতাত (১৯১৬ সাল) প্রধানত এই সমস্যা দূর করবার উদ্দেশ্য নিয়েই হয়েছিল। আর একবার সাম্প্রদায়িক নির্বাচন ব্যবস্থা পরিত্যাগ করবার সুযোগ এসেছিল, কিন্তু বিষ যখন একবার ছড়ান হয়েছে তখন তার প্রতিক্রিয়া এড়ান অসম্ভবই। বিহারের স্বনামখ্যাত মজরুল হক সাহেব যুক্তপ্রদেশের তালুকদারদের দ্বারা আমদানী এই সাম্প্রদায়িক বিধিব্যবস্থা সন্তুষ্ট-চিত্তে গ্রহণ করতে পারেননি। ১৯১৫ সালের বোম্বাই মোসলেম লীগ অধিবেশনে সভাপতি হিসাবে যখন সাম্প্রদায়িক নির্বাচনের বিরুদ্ধে ভাষণ দেন তখন The anti-Congress Muslim element in Bombay encouraged by Government officials, created hooliganism in the session led by Seth Sulaiman Kasam Mitha. There was so much roudism that the opening session had to be adjourned and next day it had to meet in the Taj Mahal Hotel. There a committee was appointed to discuss the settlement of communal matters with the Congress.

অতএব সাম্প্রদায়িক নির্বাচন-ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রেখে সাম্প্রদায়িক ভারসাম্য আনতে হবে। লক্ষ্ণৌ-এ চৌধুরী খলিকুজ্জমানের মতে the main question before the Congress and the League was in regard to separate electorate and weightage for Muslim minority provinces. বাঙলা থেকে আবুল কাশেম ফজলুল হক, মৌলানা আক্রাম খাঁ, আবুল কাশেম উপস্থিত। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, সৌকত আলি ও মহম্মদ আলি তখন শত শত বাঙালী হিন্দুর মত অন্তরীণে আবদ্ধ। বাঙলার প্রতিনিধি হিসাবে ফজলুল প্রস্তাব করলেন যে

মোসলেম লঘিষ্ঠ প্রদেশগুলোতে মুসলমান সদস্য সংখ্যা জন-সংখ্যানুপাতে অধিক করলে বাঙলা দেশে তাঁ'রা শতকরা ৪০ জন মুসলমানের প্রতিনিধিত্বে রাজী হবেন। ফজলুলের প্রস্তাব পেশ করবার পর পাঞ্জাবের মুসলমান প্রতিনিধি সেখানকার বিধানসভায় ৫০ জন মুসলমান এবং ৫০ জন অমুসলমান নিয়ে সভা করতে রাজী হলেন। চৌধুরী খলিকুজ্জমান লিখেছেন: When in the meeting of the Council of the Moslem League Mr. Fazlul Huq, on behalf of Bengal, agreed to accept only forty percent Moslem seats to enable the minority provinces to secure weightage on a separate electorate basis and then the Punjab delegates agreed to a fifty-fifty basis of representation for the Moslems and for the non-Moslems, with separate electorates, the matter for all practical purposes was settled, because the Hindus were in no mood to pick holes in the Moslem League demand.

এ ব্যবস্থাই পরিণামে মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিফরম গ্রহণ করেছিল এবং ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। মুসলমান লেখকদের মতে এ ব্যবস্থায় বাঙলা ও পাঞ্জাবের বিধান সভায় মুসলমান আসন-সংখ্যা যথাক্রমে তেরো ও পাঁচ পারসেণ্ট কমানো হল এবং অপর পক্ষে বোম্বাই-র মোট কুড়ি পারসেণ্ট মুসলমান-সংখ্যার জন্য তেত্রিশ পারসেণ্ট আসন বাড়ানো হ'ল, যুক্তপ্রদেশের মোট চোদ্দ পারসেণ্ট মুসলমান জনসংখ্যার জন্য ত্রিশ পারসেণ্ট, বিহারের মোট তেরো পারসেণ্টের জন্য উনত্রিশ পারসেণ্ট, মাদ্রাজের মোট সাত পারসেণ্টের জন্য পনেরো পারসেণ্ট ও মধ্যপ্রদেশের মোট চার পারসেণ্টের জন্য পনেরো পারসেণ্ট মুসলমান আসন-সংখ্যা বাড়ানো হয়েছিল।

আদিকালে বিধানসভা অথবা মিউনিসিপ্যালিটিতে মনোনয়ন ব্যবস্থা বদলাতে কলকাতা অগ্রণী আলিগড় প্রতিবন্ধক। আংশিক নির্বাচন ব্যবস্থা শুরু হলে আলিগড় সাম্প্রদায়িক পথে সে প্রবাহ চলমান করে দেখল গতি মন্দ, আবার আসন সংরক্ষণ (weightage) করে সে ধারা প্রবাহিত করে পরিণামে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে কম্যুনাল এ্যাওয়ার্ড এনে ফেলল। কম্যুনাল এ্যাওয়ার্ডের দরুণ আবার সেই যুক্তপ্রদেশে যে সমস্যা দেখা দিল তাই দেশটাকে দুভাগে খণ্ডিত করতে বাধ্য করল।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সে যুগের (১৯১২-১৩ সাল) মোসলেম রাজনীতির ঠাঁট কেমন ছিল তার ব্যাখ্যা করে লিখেছেন :

The leadership of Muslim politics at the time was in the hands of Aligarh praty. Its members regarded themselves as the Trustees of Sir Syed Ahmad's politics. Their basic tenet was that Mussalmans must be loyal to the British crown and remain aloof from the freedom movement. When **Al Helal** (Azad's mouthpiece) raised a different slogan and its popularity and circulation increased fast, they felt that their leadership was threatened. They, therefore, began to oppose **Al Helal** and even went to the extent of threatening to kill its editor.

মৌলানা আজাদ ছিলেন উর্দুভাষাভাষী এবং সমাজগতভাবে আলিগড়ের রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ মোকাবিলা তাঁকে করতে হত, অতএব আলিগড় ঐতিহ্য যে কোন ধাতুতে গড়া তার সঠিক পরিচয় তাঁর ছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তুরস্কের বাদশাহকে রক্ষার জন্য যে খেলাফত আন্দোলন সৃষ্ট হয় এবং যে আন্দোলনকে জালিনওয়ালাবাগ

হত্যাকাণ্ডের ফলে উদ্ভব বিক্ষোভের সঙ্গে যুক্ত করে মহাত্মা গান্ধী নন-কো-অপারেসন আন্দোলন সর্বভারতে গড়ে তুললেন তাতে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে আলিগড়-নিন্দিত মুসলমান উলেমা সমাজ নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করবার আবার সুযোগ পেলেন। ভারতবর্ষের রাজনীতি অজানা, অচেনা এবং সর্বরকমে ঘুণ-ধরা একটি বিদেশী রাষ্ট্রের মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা রক্ষণের চেষ্টার সঙ্গে এমনিভাবে যুক্ত করা সমীচীন হয়েছিল কিনা সে প্রশ্ন উত্থাপন না করে এ বক্তব্য পেশ করা অনায়াসেই যেতে পারে যে লীগ অপেক্ষা খেলফতী আন্দোলনই ভারতীয় মুসলমান রাজনীতি ধারাকে ব্যাপকরূপ গ্রহণে প্রভূত সাহায্য করেছিল। খেলাফত আন্দোলন যখন বিশের কোঠায় প্রবল আকার ধারণ করল তখন লীগের অস্তিত্ব কাগজ-কলমেই পড়ে থাকত—holding its session wherever Khelafat conferences or Congress sessions were held.

স্বদেশী (১৯০৬) ও ননকোঅপারেসন আন্দোলনের (১৯২০ সাল) মধ্যবর্তী কালে অনেকটা কংগ্রেসের যে অবস্থা ছিল খেলফতী আন্দোলন (১৯২০-২৪ সাল) অবসানে মোসলেম লীগেরও সেই অবস্থা হল। শাসক-শ্রেণী ও মুসলমান সমাজের উচুতলার ভাগ্যবানেরা সহজেই বুঝতে পারলেন লীগ-সংস্থাকে হাতের মুঠোর মধ্যে রাখতে পারলে একদিকে যেমন অন্য রাজনৈতিক দলগুলোর দাবি দাওয়া সীমিত রাখা যাবে তেমনি নিজেদের নানা সুযোগ সুবিধা মিলবে। এ যুগে পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশের বনেদী মুসলমানরা বিশেষ করে লীগ রাজনীতিতে যুক্ত থাকতেন। বাঙলা দেশের যে বিশিষ্ট মুসলমান পরিবারকে কেন্দ্র করে আদিতে লীগ-সংস্থা গড়ে উঠেছিল সেই ঢাকা-নবাবকেও কিন্তু আর লীগ মহলে পাত্তা পেতে দেখা যায়নি। যা'রাই লীগ মহলে আসা-যাওয়া করতেন সে যুগে তা'রাই নাইট, খান বাহাদুর প্রভৃতি উপাধি সহজেই পেতেন।

ভাগ্যের পরিহাসই বলতে হবে যে ১৯১৮ সালে দিল্লীতে আবুল

কাশেম ফজলুল হকের অধিনায়কত্বে আহূত লীগের অধিবেশনে খেলাফত আন্দোলনের গোড়াপত্তন হয়। ডাঃ আনসারী তুরস্কের বাদশাহের এবং খেলাফতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রস্তাব আনলে আর কেউ নয় ভবিষ্যতের পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদ আলি জিন্না সে প্রস্তাবে ঘোরতর আপত্তি জানান। আপত্তি এই অজুহাতে যে লীগের কনস্টিটিউসনে এমন কোন ধারা নাই যাতে কোন বিদেশী রাষ্ট্র সম্পর্কে কোন আলোচনা করা যেতে পারে। অনেকেই জিন্নার আপত্তিতে অবাক হয়েছিলেন। জিন্নার আপত্তি অগ্রাহ্য হ'ল এবং প্রস্তাব পাস হ'ল! জিন্না ও মামুদাবাদের রাজা লীগ-মঞ্চ ছেড়ে চলে গেলেন। লীগ ছাড়লেও কংগ্রেসের মঞ্চ জিন্না তখনও ছাড়েননি। কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে নন-কো-অপারেশন প্রস্তাব চিত্তরঞ্জন দাশ এবং বিপিনচন্দ্র পালের মত জিন্নাও বিরোধীতা করেছিলেন। পরে নাগপুরের অধিবেশনেও উপস্থিত হয়ে আর একবার সে প্রস্তাবে আপত্তি জানিয়ে যখন দেখলেন তা অগ্রাহ্য হ'ল তখন কনাস্টটিউসনাল জিন্না মেঠো পলিটিক্স থেকে সরে দাঁড়ালেন।

কংগ্রেস-খেলাফত যুক্ত আন্দোলন প্রায় ১৯২৪ সাল পর্যন্ত নির্বিবাদে চলল। রাজনীতি ক্ষেত্রে বিশেষ কোন সুফল না ফললেও, সে আন্দোলনে অভূতপূর্ব মুসলমান জন-জাগরণ ঘটেছিল। কিন্তু এ কাজের জন্য সম্পূর্ণ কৃতিত্ব ইংরেজী ভাষায় অনভিজ্ঞ এবং দেওবন্দ-ধারাবাহী উলেমা সম্প্রদায়ের।

খেলাফতী আন্দোলনে ভাটা পড়ল যখন কামাল আতাতুর্ক এক ধাক্কায় খেলাফতের অতীত আদর্শের সিম্বল বাদসাহকে সমুদ্রের লোনা-জলে ঠেলে ফেলে দিয়ে নতুন তুরস্ক গড়ে তুলতে চাইলেন। ভারতীয় মুসলমান উলেমা সম্প্রদায় এতকাল ধরে যে ঐতিহ্যের ওপর নির্ভর করে রাজনীতি করে চলেছিলেন, দেখলেন সব ফাঁকা।

কংগ্রেস ও ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর মধ্যে ভারতীয় রাজনীতির ভবিষ্যৎ নিয়ে যে মতদ্বৈধ এতদিন চলে আসছিল তা' যত জোরালো হতে দেখা গেল ত্রিশ দশক আসতে না আসতে ততোধিক গোলমেলে হয়ে পড়ল হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট স্বত্ত্বেও। এমন কি চিত্তরঞ্জন দাশ যে "বেঙ্গল প্যাক্ট" করেছিলেন তাতেও সে গোলমাল থামল না। কংগ্রেসের গোহাটী অধিবেশনে (১৯২৬ সাল) হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নতুন করে দেখবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হ'ল। লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট অনুসারে সাম্প্রদায়িক ভিত্তির ওপর নির্ভর করে যে আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থা করা হয়েছিল তা' কি যুক্তপ্রদেশ, কি পাঞ্জাবের মুসলমানদের কাছে উপযুক্ত হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে তখন!

খেলাফতী আন্দোলন শেষ হলে জিন্না আবার লীগে যোগদান করলেন তখন যখন এই নতুন অভিযোগ দানা বাঁধতে শুরু করেছে। কেবল নতুন করে আসন সংরক্ষণ নয় এরই সঙ্গে যুক্ত থাকল অন্যান্য দাবি, যথা: উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ গড়তে হবে এবং সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দাবি হল যে, কেন্দ্রের বিধান সভায় মুসলমান সদস্য-সংখ্যা এক তৃতীয়াংশ করতে হবে।

দাবি জোরদার হয়ে পড়তে লাগল। নবজাগ্রত মুসলমান সমাজে এল নানা বিচিত্র চিন্তা-ধারা। শাসক-শ্রেণীর প্রত্যক্ষ আবির্ভাব আর নেই, সেখানে এসে গেছে সেই নয়া মুসলমান প্রতিনিধিরা যাদের সম্পর্কে চৌধুরী খলিকুজ্জমান বলেছেন: The measure of sacrifice for these custodians of the political citadel of the community consisted in their attending annual sessions, receiving a chorus of praise from the equally honourable hosts in some big city for having undertaken the journey in a first class railway compartment at great inconvenience

to themselves. ইতিমধ্যে সাইমন কমিশন দেশে এসে গেছে, রাউণ্ড টেবল কনফারেনস বসেছে (১৯৩০-১৯৩২) কম্যুনাল এ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে এবং সাঁইত্রিশের নির্বাচনে যুক্তপ্রদেশের বিধানসভার মোট ২২৮টি আসনের মধ্যে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ৬৬টি থাকলেও মোসলেম লীগ কেবলমাত্র ৩৬টিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ২৯টিতে জয়ী হ'ল।

মোটের ওপর যে রাজনৈতিক চিত্র যুক্তপ্রদেশের মুসলমানদের কাছে সে নির্বাচনের পর দেখা দিল তা' সব রকমে নৈরাশ্যজনক। যে সম্প্রদায় সংখ্যা-লঘু হলেও সেই সিপাই বিদ্রোহের পর হতে এবং আলিগড় প্রতিষ্ঠালাভ করবার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে আধিপত্য ও নেতৃত্ব করে চলেছিল তারা সাঁইত্রিশের পর হারিয়ে গেল। হারিয়ে গেল তাবাও যাদের ভবিষ্যৎ শুভ কামনা আশা করে গত শতাব্দের শেষভাগ হতে একটির ওপর একটি রক্ষা-কবচ আমদানী করা হচ্ছিল।

অন্যদিকে বাঙলা দেশের যে হিন্দু সম্প্রদায় কেবল দেশের ভবিষ্যৎ সামনে রেখে এবং সম্প্রদায়-গত আসন সংরক্ষণ দাবি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে একটির পর একটি প্রস্তাব দিয়ে আসছিল—গত শতাব্দ শেষ হতে না হতে এবং যে প্রস্তাবগুলো প্রধানত যুক্তপ্রদেশের মুসলমানদের বিরোধীতার জন্য অগ্রাহ্য হ'ল—তা'রাও দেখল যে সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধির আশঙ্কা তাদের মনে উঠেছিল তা' কত সত্য! তাদের আদর্শ ছিল অবাধ যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা। সে ব্যবস্থা চালু হ'লে, ইংরেজের কারসাজিতে তাদের সম্প্রদায়-গত অবস্থা পরিণামে সাঁইত্রিশে যা হয়েছিল তদপেক্ষা শোচনীয় হতে পারত, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তা'রা সেই ব্যবস্থাতেই বিশ্বাসী ছিল এই হেতু যে সে প্রকার নির্বাচন ব্যবস্থায় যে কেউই জয়ী হোক না কেন তা'কে সমানভাবে উভয় সম্প্রদায়ের বিশ্বাস-ভাজন ও সমর্থন লাভ করতে হবে। এমনি ধারায় অগ্রসর হলে, তা'রা

মনে করেছিল, ইংরেজের স্থান ভবিষ্যতে এদেশে থাকবে না এবং সিপাই বিদ্রোহের সময় যেমন দুটো সম্প্রদায়ই সমস্ত রকমের ঝক্কী মাথায় করে একসঙ্গে দাঁড়িয়েছিল ভবিষ্যতেও তেমনি নিবিড় সহযোগে দেশের মঙ্গল সাধনে সমর্থ হবে। যুক্তপ্রদেশ তথা আলিগড় সে সুযোগ আনতে দিল না।

বাঙলা দেশের কংগ্রেস-নেতৃত্বের অপমৃত্যু কম্যুনাল এ্যাওয়ার্ড ও পুণা-প্যাক্টের পর অনুষ্ঠিত সাঁইত্রিশের নির্বাচনে ঘটল। যুক্ত-প্রদেশের মুসলমানী নেতৃত্বও এতদিন ইংরেজের হাত ধরে অগ্রসর হয়ে সাঁইত্রিশের নির্বাচনের পর একই অবস্থার সম্মুখীন হ'ল। হয়ত বা ধন্বন্তরী ঔষধ প্রয়োগে বাঙলায় তখনও নতুন জীবন লাভ সম্ভবপর হত এবং পরিণামে দেশ যে সমস্যার সামনে এসে পড়েছিল তা' এড়িয়ে চলতেও বা পারত। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে বাঙলা-দেশে ফজলুল হকের নেতৃত্বে যে কৃষক-প্রজা পার্টি জয়লাভ করল তার সঙ্গে আঁতাত করতে পারলে সে সম্ভাবনা বাস্তব রূপ নিতে পারতও বা।

যুক্তপ্রদেশ পুনরায় প্রতিবন্ধক হয়ে সেদিকে বাঙলা-দেশকে অগ্রসর হতে দিল না এবং বাঙলা-দেশের নেতৃত্বও দেশের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে যুক্তপ্রদেশের সেই নির্দেশ অগ্রাহ্য করবার হিম্মত দেখাতে পারল না। এ বাধা এবার এল যুক্তপ্রদেশের অ-মুসলমানী কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছ থেকে। এরা কিন্তু পরিণামে স্বীকার করেছেন যে সাঁইত্রিশের নির্বাচনে একা ফজলুল হক বাঙলা দেশে অসম্ভবকে সম্ভব করে ফেলেছিলেন। মৌলানা আজাদের কথায়ঃ In Bengal, the Governor of the province had practically made up his mind to form a League Government but the success of the Krishak-Praja party upset his calculations. এহেন অঘটন যেখানে ঘটল সেখানে কংগ্রেসের তরফ থেকে কোন কিছু করণীয় আছে কি না সে কথা কংগ্রেস নেতৃত্ব

বিচার তো করলেনই না বরং ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের নির্দেশ-নামায় বাঙলার প্রাদেশিক নেতৃত্বের হাত পা' বেঁধে রাখলেন এবং প্রাদেশিক নেতৃত্বও সে জড়-ভরতের ভূমিকা গ্রহণ করতে গররাজী হলেন না।

ডাঃ প্রসাদের সেই নির্দেশ-নামা বিশ্লেষণ করলে বেশ বুঝতে পারা যায় যে কংগ্রেস নেতৃত্ব অজ্ঞাতসারেই র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের কম্যুনাল এ্যাওয়ার্ড কার্যকরী করে ফেল্‌লেন। কি বাঙলা, বা কি পাঞ্জাব নির্বাচনে যে কোনদিন কংগ্রেসী সদস্য সংখ্যা-গরিষ্ঠ হতে পারবে না তাতো বাস্তব ভাষ্য। অন্য প্রদেশে যে কংগ্রেস জয়ী হ'ল তারও প্রকৃত রূপ থাকল সাম্প্রদায়িক। কংগ্রেসের জয় সেখানে হ'ল হিন্দু-গরিষ্ঠ বলেই। যে আদর্শের বালাই নিয়ে কংগ্রেস এতদিন বড়াই করে এসেছিল সে সংস্থা "জাতীয়", "সাম্প্রদায়িক" নয়, তার মৃত্যু ঘটল সাঁইত্রিশের নির্বাচনে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দোহাই দিয়ে সে অভিযোগ অস্বীকার করা অপচেষ্টা মাত্র। কারণ সেখানে সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের কোন স্থানই ছিল না। এ অভিযোগ অগ্রাহ্য করা সম্ভবপর হ'ত যদি হিন্দু গরিষ্ঠ প্রদেশে কংগ্রেস-মনোনীত মুসলমান প্রার্থীরা সে নির্বাচনে জয়ী হতে পারতেন। সে ক্ষেত্রেও নিরাশ হতে হল বিশেষ করে যুক্ত-প্রদেশে যার ওপর লক্ষ্য রেখেই কংগ্রেস-নেতৃত্ব গোটা ভারতবর্ষের অ-সাম্প্রদায়িক ভবিষ্যৎ কল্পনা করতেন। তালিবনগরের তালুকদার লীগের মনোনীত সদস্য হয়ে নির্বাচনে জয়ী হবার পর মৃত্যুমুখে পড়লে সে শুন্য আসনে রফি আহমদ কিদোয়াই কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী হয়ে বাই-ইলেকসনে জয়ী হলেন কোন প্রকারে এবং কংগ্রেসের মুখরক্ষা হল।

নির্বাচনে কংগ্রেসী বা ন্যাশানেলিস্ট মুসলমানদের এত বড় বিপর্যয় ঘটলেও কংগ্রেস-নেতৃত্বের দৃষ্টি পড়ে থাকল ঐ যুক্তপ্রদেশের ওপর। ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের ঢালাই নির্দেশ দেওয়া থাকল যে

কংগ্রেস-সদস্যেরা বিধান-সভায় অন্য কোন দলের সহযোগে কাজ করতে পারবে না। বাঙলা-দেশের মোট ২৫০টি আসনে গঠিত বিধান সভায় ৫০টি কংগ্রেস সদস্যেরা অন্য কোন পার্টির সঙ্গে যুক্ত না হয়েও যে কোন পার্টিকে সমর্থন করতে পারে এ ক্ষমতাটুকু কংগ্রেস-নেতৃত্ব না দেওয়াতেই কংগ্রেসের সঙ্গে কোন আঁতাত কৃষক-প্রজা পার্টির সঙ্গে হ'ল না।

কেন কংগ্রেস-নেতৃত্বের দৃষ্টি আলিগড় নেতৃত্বের মত যুক্তপ্রদেশ নিয়ে সীমাবদ্ধ থাকল সে প্রশ্ন বিচার করলে ভারতবর্ষের জন-গণ-মন-অধিনায়কত্বের দাবি যে কত হালকা তা সহজেই অনুমান করা যায়। দেশের বিরাটত্ব বা সমাজ-বৈচিত্র্য ভুলে আমরা মনে করি যে আবহাওয়া অথবা পারিপার্শ্বিকের মধ্যে আমরা গড়ে উঠেছি সেইটিই সমগ্র ভারতবর্ষের একমাত্র রূপ। অন্তত রাজনীতি ক্ষেত্রে দেশের একক রূপ বা অভিব্যক্তি তখনও আসেনি—এখনও এসেছে কিনা তাতেও সন্দেহ থাকতে পারে—তা' কংগ্রেস-নেতৃত্বের যুক্তপ্রদেশের ওপর নিবদ্ধ লক্ষ্য হতেই ধরা পড়ে।

এ কথা অনস্বীকার্য যে সে নির্বাচনে যুক্তপ্রদেশের হিন্দু-কৃষক-গোষ্ঠী স্যার ম্যালকলম হেলি এবং স্যার হ্যারি হেগের মত জবরদস্ত গভরনরদের ও ততোধিক প্রতাপশালী তালুকদারদের সমবেত চেষ্টা ব্যর্থ করে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীদের জয়যুক্ত করে বিধানসভায় পাঠিয়েছিল। যুক্তপ্রদেশের পক্ষে এ ঘটনা হয়ে পড়ল অভাবনীয় যা কংগ্রেস-নেতৃত্ব কখনও বাস্তব বলে মনে করতে পারেননি। সরকারী মহল বা তালুকদারদের দরবারও এমন করে কৃষক-সমাজ সংঘবদ্ধ হয়ে কংগ্রেসের সমর্থন করবে তা' কল্পনা করতে পারেনি। কংগ্রেস-নেতৃত্ব চমকাল, সরকার-তালুকদার গোষ্ঠী মুসড়ে পড়ল। ১৪৪টি হিন্দু আসনের মধ্যে কংগ্রেস ১৩৪টি জয়লাভ করল একমাত্র কৃষকের দাক্ষিণ্যে। যুক্তপ্রদেশের হিন্দু কৃষকের

স্বাধীন স্বত্বা, কংগ্রেস-নেতৃত্বের কাছে প্রথম প্রকাশ হ'ল ১৯৩৭ সালে, সিপাই বিদ্রোহের ৮০ বছর পরে। গভরনর ও তালুকদারদের একতিয়ার যুক্তপ্রদেশে অব্যাহত আছে এই ধারণাতেই এমনকি মহম্মদ আলি জিন্নাও তাঁদের গঠিত কৃষক-পার্টির (Agricultural Party) সঙ্গে আঁতাত করতে রাজী ছিলেন নির্বাচনের পূর্বেই।

যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেস-নেতৃত্বের কাছে সাঁইত্রিশের নির্বাচন যতই অপ্রত্যাশিত সাফল্যমণ্ডিত হয়ে থাকুক না কেন এবং তার সাক্ষাৎ প্রতিক্রিয়া স্বরূপ লাটসাহেবের বাড়ী যতই শোক-বিহ্বল হয়ে পড়ুক না কেন—(When the actual result was declared Government House became a mourning den) নির্বাচনের মারফত যে এ অবস্থা অনায়াসেই আসতে পারে তা-তো বাঙলা-দেশের কাছে তখন অতি সাধারণ ঘটনা ! বিশের কোঠায় চিত্তরঞ্জন দাশ স্বরাজ পার্টি গঠন করে যে নজীর প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন যুক্তপ্রদেশ সাঁইত্রিশেও যথাসাধ্য চেষ্টা করেও সে নজীর প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেস নেতৃত্ব একটিও কংগ্রেসী বা ন্যাশানেলিস্ট মুসলমান প্রার্থী জয়ী করাতে পারেননি সাঁইত্রিশের নির্বাচনে; অপরদিকে বাঙলা-দেশে স্বরাজীরা ১৯২৩ সালে কেবল হিন্দু-মুসলমান প্রার্থীদের জয়যুক্ত করে বসে থাকেননি তাদের সমবেত চেষ্টায় ডায়ার্কী শাসন-ব্যবস্থা অচল করে ফেলেছিলেন।

অথচ যুক্তপ্রদেশের দিক থেকে এ নির্বাচনের সাফল্য অভূতপূর্ব। এবং এমনি ভাবনায় আচ্ছন্ন হবার জন্যই যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেস-নেতৃত্ব সে নির্বাচনের অপর বৈশিষ্ট্যগুলো দেখেও তার তাৎপর্য ধরতে পারেননি। হিন্দু কৃষক যেমন গভরনরের মনোনীত তালুকদার প্রার্থীগুলোকে গলাধাক্কা দিয়ে বহিষ্কার করে দিলেন তেমনি মুসলমান কৃষককুলও কংগ্রেস-ন্যাশানেলিস্ট ও খয়ের-খাঁ উভয় প্রকার মুসলমান প্রার্থীদের একই সময় আবর্জনা

স্বরূপ দূর করে দিয়েছিলেন। মোট মুসলমান আসন-সংখ্যা ছিল ৬৬টি। মোসলেম লীগ এর মধ্যে ৩৬টিতে প্রার্থী দাঁড় করেছিলেন এবং ২৯টিতে জয়ী হলেন। কংগ্রেস একটিতেও জয়ী হতে পারল না।

ন্যাশানেলিস্ট ও খয়ের-খাঁ প্রার্থীদের প্রতি যুক্তপ্রদেশের মুসলমান ভোটারদের যে মনোভাব নির্বাচনে ধরা পড়ল তার ইঙ্গিত কংগ্রেস নেতৃত্ব ভালভাবে ধরতে পেরেছিলেন বলে মনে হয়না। ঠিক অনুরূপ কারণেই বাঙলা-দেশে ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি মোসলেম লীগের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজয়ী হ'ল তা' কংগ্রেস-নেতৃত্ব পরে স্বীকার করে গেলেও (মৌলানা আজাদের মন্তব্য) এর বিশেষ ইঙ্গিত ধরতে অসমর্থ হয়েছিলেন।

ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের ঢালাই হুকুম-নামা হল এর প্রধান দলিল। সেই এক নির্দেশে বাঙলা দেশ কংগ্রেস চৌহদ্দির বাইরে গিয়ে পড়ল। সে হুকুম-নামা হ'ল যে প্রদেশে নির্বাচনে কংগ্রেস অধিক সংখ্যক না হবে সেখানে সে পার্টি চুপ করে বসে থাকবে। মন্ত্রিত্ব গ্রহণ না করলেও তার যে অন্য কোন করণীয় কাজ থাকতে পারে তা অস্বীকৃত হ'ল। এ হুকুম-নামায় বাঙলা বা পাঞ্জাব এ দুটোর কোনটাই কোনকালে এক কম্যুনাল এ্যাওয়ার্ডের কল্যাণে কিছু করতে পারবে না তা কংগ্রেস-নেতৃত্বের কাছে অজ্ঞাত থাকার কথা নয়। তার ওপর পুণা প্যাক্টের দরুণ বাঙলা দেশের মোট হিন্দু (সাধারণ) আসন-সংখ্যা আরও অল্প-সংখ্যক হবে তাও সকলেই জানতেন। এ স্বত্বেও বাঙলা দেশের কংগ্রেস পার্টি মন্ত্রিত্বে অংশীদার না হয়েও যে তার অন্য কিছু করণীয় থাকতে পারে তা যেমন কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতারা চিন্তা করেননি তেমনি প্রাদেশিক কংগ্রেস পার্টিও বিচার বিবেচনা করবার অবকাশ পাননি। কংগ্রেসী নিষেধাজ্ঞা বাঙলা দেশকে জড়ভরত করে ফেল্‌ল সেই যুগ হতে।

অপরপক্ষে যুক্তপ্রদেশে কংগ্রেস হিন্দু আসনে সাফল্য লাভ

করলেও একটি ন্যাশানেলিস্ট বা কংগ্রেসী মুসলমান প্রার্থীকে জয়ী করাতে না পারায় এক নতুন সমস্যার উদ্ভব হ'ল। কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণে কোন বাধা না থাকলেও সে মন্ত্রিত্বে মুসলমানকেও আসন দিতে হবে। সে মুসলমান সদস্য কোথায় পাওয়া যাবে?—যে কংগ্রেসী পলিসির বিরোধাচরণ করবে না। কোন প্রকারে বাই-ইলেকসনের মারফত রফি আহমদ কিদোয়াই একমাত্র জয়ী কংগ্রেসী দলভুক্ত সদস্য মাত্র।

মৌলানা আজাদ যুক্তপ্রদেশে ছুটলেন, নিদলীয় মুসলমান সদস্যদের সঙ্গে যে আঁতাত করবার চেষ্টা করলেন তা' ব্যর্থ হল প্রাদেশিক কংগ্রেস-নেতৃত্বের বিরোধীতায়। তিনজন মুসলমান মন্ত্রী হবেন। কিদোয়াই ত আছেনই, হাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিম কংগ্রেসী দলে যোগদান করতে রাজী আছেন। বাকী একজন? পণ্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্থ, মোহনলাল সাকসেনা প্রভৃতি বরাবর ইচ্ছা প্রকাশ করে এসেছিলেন যে এ যাবত যে চৌধুরী খলিকুজ্জমান কংগ্রেসে ছিলেন—নির্বাচনের সময় মোসলেম লীগ দলের নেতা হলেও—তাঁকে মন্ত্রিত্বের গদিতে নিতে হবে। তিনিই পথ পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন বলেই তো রফি আহমদ কিদোয়াই সাধারণ নির্বাচনে হেরে গিয়েও বাই-ইলকসনে জয়ী হলেন। মৌলানা আজাদ চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করলেন, পন্থ হামেশা তাঁর সঙ্গে মোলাকাত করলেন, মোহনলাল আর চৌধুরী সাহেব তো একাত্মা। তাঁর কথামত চৌধুরী-সাহেবও জবাহর লাল নেহরুর সঙ্গে "আনন্দভবনে" সাক্ষাৎ করলেন।

প্রায় সবই ঠিক যে যুক্তপ্রদেশে চৌধুরী সাহেবকে মন্ত্রিত্বে অধিষ্ঠিত করে তথাকথিত "কংগ্রেস-লীগ" কোয়ালিসন মন্ত্রিত্ব গঠন করা হবে।

কিন্তু অনেকগুলো কারণে খলিকুজ্জমানকে মন্ত্রী করা গেল না। প্রধানতম কারণ হ'ল যে উলেমা সম্প্রদায় যুক্তপ্রদেশে ন্যাশানেলিস্ট

মুসলমান সদস্য নির্বাচনে দাঁড় করেছিলেন তাঁদের সকলেই হারিয়ে দিয়েছিলেন এই চৌধুরী সাহেব। অতএব তাঁকে মন্ত্রী করলে উলেমাদের শত্রু করতে হয়। মৌলানা আজাদ বিরোধী হলেন।

পরিণামে চৌধুরী সাহেব পাকিস্তানে চলে যাবার পর সে সব আলাপ আলোচনার বিষয়বস্তু চাপা দিয়ে অনেক বাজে কথার অবতারণা করেছেন তাঁর গ্রন্থে। তবুও তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছু বলে গেছেন। তাঁর হিন্দু বন্ধুরা কিন্তু কেউ মুখ খোলেন নি। খুললে স্বতই প্রমাণিত হ'ত যুক্তপ্রদেশে হিন্দু ও মুসলমান সদস্য নিয়ে মন্ত্রিত্ব গঠনে মঞ্চের অন্তরালে যে কাঠ খড় পোড়ান হয়েছিল তার একাংশও যদি বাঙলা দেশের হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য সেই নির্বাচনের অব্যবহিত পরে ব্যয় করা যেত তবে হয়ত গোটা ভারতবর্ষের রাজনীতি অন্য পথে চলত।

কেন এবং কি প্রকারে যুক্তপ্রদেশে কংগ্রেসী-নেতৃত্বের সব কল্পনা অসম্ভব হ'ল সে গোপন ইতিহাস কেউই প্রকাশ করেননি। ভারত-বর্ষের দ্বিখণ্ডীকরণের প্রত্যক্ষ কারণগুলো সেই কাহিনীর মধ্যে লুকিয়ে আছে। মৌলানা আজাদ তাঁর গ্রন্থে আকার-ইঙ্গিতে জবাহর লাল নেহরু, সর্দার প্যাটেল, ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রভৃতি নেতৃবর্গকে ইন্ধন-জোগাড়ী বলে মন্তব্য করেছেন। ইতিহাসের কাছে মৌলানা সাহেব নিজেও অবস্থান্তরের জন্য তাদের অপেক্ষা কোন অংশেই কম দায়ী নন।

কংগ্রেস সাঁইত্রিশের নির্বাচনে জয়ী হয়ে বড়লাটের ওপর "গোসা" করে ছয়টা প্রদেশে—যুক্তপ্রদেশ, বিহার, ওড়িষ্যা, মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং মধ্যপ্রদেশ-বেরার—মন্ত্রিত্বের আসন গ্রহণ করতে গররাজী হলে লর্ড লিনলিথগাওয়ের প্রতিশ্রুতিতে শান্ত হন এবং পূর্ব ধারণা ছেড়ে মন্ত্রিত্বে বহাল হতে সিদ্ধান্ত করেন। সেই উপলক্ষে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এক বৈঠক জুন মাসে গান্ধীজীর আশ্রম, ওয়ার্ধাতে বসে এবং সেখানে হবু কংগ্রেস মন্ত্রীরা কত টাকা

মাইনে নেবেন এবং দরবারে অথবা লাটসাহেবদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা কালে তাদের আচার ব্যবহার কি ধরণের হবে প্রভৃতি বিষয়গুলো সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হয়। গান্ধীজী নিজে সে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

ওড়িষ্যার প্রথম প্রধানমন্ত্রী এবং আজকের যুক্তপ্রদেশের গভরনর শ্রীবিশ্বনাথ দাশ সে বৈঠকে আহুত ছিলেন। সম্প্রতি ভারতীয় সংস্কৃতি-ভবনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত "নেহরু স্মরণীয়" সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি সেই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীতে কি আলোচনা হয়েছিল সে সম্পর্কে একটু দৃষ্টিপাত করেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে কমিটীতে গান্ধীজীর বক্তৃতান্তে যুক্তপ্রদেশের হবু প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ হঠাৎ সভায় দাঁড়িয়ে প্রস্তাব করেন "to take Chaudhuri Khaliquzzaman into the U. P. Cabinet" কারণ তা' হলে যুক্তপ্রদেশে মোসলেম লীগ নির্মূল হবে।

উপস্থিত সকলেই বেশ বিস্মিত হলেন। গান্ধীজী প্রথমেই প্যাটেলের মতামত জানতে চাইলেন, কারণ প্যাটেলই ছিলেন কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ডের সম্পাদক। সরাসরি পন্থের প্রস্তাবের ওপর কোন মন্তব্য না করে প্যাটেল জানালেন যুক্তপ্রদেশে মোসলেম লীগের কোন পাত্তা না থাকলে গোটা দেশের কোথায়ও থাকবে না। প্যাটেলের বক্তব্য ঠিকমত না হওয়ায় গান্ধীজী নেহরু ও আজাদকে প্রস্তাব সম্পর্কে মন্তব্য পেশ করতে অনুরোধ করেন। উভয়েই পন্থের প্রস্তাবের বিরোধীতা করেন। প্রস্তাব যেমন বাতিল হ'ল তেমনি হ'ল ভারতবর্ষে পাকিস্তান-বনেদের গোড়া পত্তন। On this, sharp reaction and protest came from both Maulana Sahib and Pandit Jawaharlalji. Subsequently Pantji withdrew his proposal. Gandhiji kept quiet and the proposal was dropped. মৌলানা

আজাদ যে কেন চৌধুরী খলিকুজ্জমানকে মন্ত্রী করতে অনিচ্ছুক ছিলেন তার ইঙ্গিত পূর্বেই দেওয়া আছে।

একদিকে বাঙলা ও পাঞ্জাবের মত হিন্দু লঘিষ্ঠ প্রদেশের কংগ্রেস সদস্যদের জড় ভরত করে—আসাম প্রদেশ সে অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়েছিল কেবল সুভাষ বসুর দৃষ্টি-পটুতায়, অন্যথায় আসাম মুক্তিলাভ না করে পরিণামে পাকিস্তানের গর্ভে নিশ্চয়ই বিলীন হত—অপরদিকে মোসলেম "ম্যাচ কণ্টাক্টের" ধুয়ো তুলে অন্যান্য হিন্দু-গরিষ্ঠ প্রদেশের মোসলেম জনতাকে মোসলেম লীগের আয়ত্বে পড়তে কংগ্রেস-নেতৃত্ব যেমন সাহায্য করেছিল ঠিক তেমনি এক চৌধুরী সাহেবকে মন্ত্রী না করাতে যুক্তপ্রদেশে লীগ-সংস্থাকে নব-জীবন দান করল সেই কংগ্রেস নেতৃত্ব।

চৌধুরী সাহেব বিরোধী দল গড়ে তুললেন। সে দলে যোগদান করলেন অতীতের খেলাফত ও আলিগড়ের ধুরন্ধরেরা। সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'ল যে ভাল-মন্দ বিচার না করে কংগ্রেস শাসন-ব্যবস্থায় যা কিছু করবে তার বিরুদ্ধাচরণ করবে লীগের দল। এই পলিসি অনুযায়ী বিরোধাচরণ করলে লীগ যুক্তপ্রদেশে শীঘ্রই প্রভাবশালী হয়ে পড়বে।

প্রপাগ্যাণ্ডা শুরু হ'ল এবং এই নতুন পরিস্থিতিতে যুক্তপ্রদেশ এক নতুন রূপ নিল। বাঙলায় লীগ-মন্ত্রিত্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রী-পদ্ম প্রতীক উল্টে দিতে আপত্তি হ'ল না কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অতীতের রেশ সম্পূর্ণ লুপ্ত হল না। হিন্দু ও মুসলমান উভয়ে মিলে অন্ধকূপ স্মৃতিস্তম্ভ দূর করতে তখনও সমান আগ্রহী। কিন্তু যুক্তপ্রদেশের এতকালের নবাবী ঠাট বজায় না রাখলে সর্বনাশ! চৌধুরী সাহেবের ভাষায় অবস্থা দাড়াল: Soon after the Congress Government came into power the Hindus generally, not only in cities, but in towns and villages also, started thinking in terms of a Hindu

Raj which created ill-will between the communities. বলাবাহুল্য ব্যক্তিবিশেষের অপ্রসন্ন মনোভাব শীঘ্রই সাম্প্রদায়িক রূপ নিল যুক্তপ্রদেশে। হোরেস আলেকজাণ্ডার তাঁর India since Cripps গ্রন্থে যুক্তপ্রদেশে লীগ-নায়ক চৌধুরী খলিকুজ্জমানকে মন্ত্রী না করাতে যে অবস্থার উদ্ভব হ'ল তার উল্লেখ করে মন্তব্য করেছেন : report had it that the failure thus to continue the cooperation resulted in such embitterment that it laid the foundation of a firm demand for Pakistan which evoked no zeal in Bengal or the Punjab but was sponsored by the leaders in the U. P. যুক্তপ্রদেশে চৌধুরী খলিকুজ্জমান এবং তাঁর মনোনীত নবাব ইসমাইল খাঁনকে নিয়ে কোয়ালিসন সরকার না গঠন করাতে পুরানো খেলাফতী নেতৃবর্গ, যথা, মৌলানা সৌকত আলি, মৌলানা হসরত মোহানী এবং আলিগড়ের ধুরন্ধরেরা এবং তালুকদারেরা যে অবস্থা সৃষ্টি করলেন তার ওপর মন্তব্য করে চৌধুরী সাহেব তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন : One result of the revival of Muslim mass consciousness was an increase in the number of riots ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ঐ একই বিষয়ের ওপর মন্তব্য করে বলেছেন : Possibly if the proposed agreement between Independent Moslems and the Congress (in the U. P.) had materialised the communal animosity which the Moslem League whipped up later might never have brought about.

কি সেই গূঢ় ঐতিহাসিক কারণগুলো যার জন্য সেই সিপাই বিদ্রোহের পরের যুগ হতে দেশ বিভাগের পূর্বদিন পর্যন্ত এই এক যুক্তপ্রদেশের হিন্দু-মুসলমান নেতৃত্ব—এখনও সে ধারা সম্পূর্ণভাবে অচল হয়নি—সমগ্র উত্তর ভারতবর্ষের অগ্রগতি ব্যহত করে ফেলতে

সক্ষম হ'ল? আবার কেনই বা এই হতভাগ্য বাঙলা দেশ বারবার নতুন পথের সন্ধান দেবার জন্য—এবং যেতক দেশ-বিভাগ হেতু তার অপমৃত্যু না ঘটল, বারবার সাম্প্রদায়িক, প্রাদেশিক ও ভাষার বৈষম্য অগ্রাহ্য করে বাইরে ছুটেছিল নতুন ভারতবর্ষ গড়বার কল্পনা নিয়ে।

সাঁইত্রিশ সালের পর যুক্তপ্রদেশের ওপরের মহলের চালু নবাবী ঠাট প্রথম বাধা পেল। প্রতিক্রিয়া কিছুটা কনস্টিটিউসন্যাল এবং কিছুটা সাম্প্রদায়িক রূপ পেল। শতাব্দের গোড়ায় নির্বাচন প্রথা চালু হবার আশঙ্কায় যেমন স্যার সৈয়দ ও তাঁর মৃত্যুর পর নবাব মহসীন-উল-মুলককে (১৮৯৩ ও ১৯০৬ সাল) আলিগড়ের সাহেব প্রিন্সিপ্যালদের কথা মত অগ্রণী হয়ে সে অগ্রগতিকে ব্যাহত করেছিলেন, সমগোত্রীয় তালুকদার ও নবাবজাদাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সিমলায় ডেপুটেসনে অংশীদার হয়েছিলেন, তেমনি ত্রিশ বছর পর তাঁদের উত্তর-পুরুষেরা ১৯৩৭ সালে লক্ষ্ণৌ-এ নতুন পরিস্থিতি আলোচনা করতে লীগ অধিবেশন আহ্বান করলেন। উদ্দেশ্য শতাব্দের প্রারম্ভে বা গোড়ায় যা' ছিল সাঁইত্রিশ সালেও তাই ছিল—কি করে নবাব ও তালুকদারদের লীলাভূমি, যুক্তপ্রদেশ, রক্ষা করা যায়।

এ লীগ অধিবেশনের তাৎপর্য ও ইঙ্গিত ন্যাশানেলিস্ট মোসলেম প্রতিনিধি পরিবেষ্টিত হয়ে যুক্তপ্রদেশের তথা গোটা ভারতবর্ষের কর্মকর্তৃত্ব প্রাপ্ত কংগ্রেস নেতৃত্ব একেবারেই ধরতে পারেননি। এবং এই অক্ষমতাই পরিণামে হয়ে পড়ল পাকিস্তান দাবীর প্রধানতম হাতিয়ার। কংগ্রেস নেতৃত্ব অজ্ঞতার পরিচয় দিলেও যুক্তপ্রদেশের মোসলেম নেতৃত্ব কিন্তু এ অধিবেশনের তাৎপর্য অনায়াসেই বুঝতে পেরেছিলেন। চৌধুরী খলিকুজ্জমান লিখেছেন: What would have happened if the Punjab and Bengal Premiers had not agreed to come to the rescue of the Moslem

League organisation in the United Provinces I need not dilate upon. Briefly it would have remained merely the Moslem League of the Minority provinces and in time to come would have had to surrender to the Congress. Sir Sikander and Fazlul Huq saved Moslem India by throwing their full weight at the crucial hour behind the Moslem cause.

ভারতবর্ষের ইতিহাসের গতিধারা বদলে দিল আর একবার লক্ষ্ণৌ-এর নবাব এবং আলিগড়ের ক্রিকেট খেলোয়াড়েরা। দেওবন্দ এর গতিরোধ করতে চেষ্টা যে করেনি তা নয়; সেই স্যার সৈয়দ আহমদের মনোনয়ন-ব্যবস্থা সমর্থন করবার যুগ থেকে চৌধুরী খলিকুজ্জমান এবং নবাব ইসমাইল খানকে মন্ত্রিত্বের গদিতে না বসান পর্যন্ত দেশে যে সব ছোট বড় শক্তি-ধারাগুলো বিক্ষিপ্তভাবে কাজ করে আসছিল তা' সেদিন এমন রূপ নিল যা দেওবন্দকে কোথায় ভাষিয়ে নিয়ে গেল তা কে জানে! চৌধুরী সাহেব জানিয়েছেন: The Moslem League in U. P. was rising like a tide. The Jamiat Ulema had begun to recede and the Arhars who had a strong centre at Meerut had been silenced, when in a meeting held by them Sayed Ahmad Ashraf, who was Secretary of the Meerut Moslem League, snatched the loudspeaker from the hands of an Arhar as a protest against his violent abuse of the League. The public was found to be with him and the Arhar retreated.

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ইসলাম রাজনীতির পারম্পর্য

যুক্ত বাঙলার শেষ অধ্যায়ের রাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে হ'লে এবং আবুল কাশেম ফজলুল হককে ভালভাবে জানতে হ'লে অতীতের ইতিহাসের ওপর দৃষ্টিপাত প্রয়োজন। যে অবস্থার মধ্যে ১৯৩৬-৩৭ সালে ফজলুল হক বাঙলা দেশের প্রধান মন্ত্রী হলেন এবং আরো অতীতে, ১৯২৪-২৫ সালে, মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসনতন্ত্রাধীনে প্রথম মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন এবং পরিণামে ১৯৪২ সালে যে অবস্থার মধ্যে তিনি মন্ত্রিত্বের গদী পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন তা' একান্তভাবে আলোচনার বিষয়বস্তু।

সাঁইত্রিশের নির্বাচনে বাঙলার বিধানসভা যে ধাতুতে গঠিত হ'ল তা'তে কোন দলই—কি কংগ্রেস, কি কৃষক-প্রজা বা কি মোসলেম লীগের মত পোলিটিক্যাল দল অথবা হিন্দু বা মুসলমান সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী এককভাবে সংখ্যা গরিষ্ঠ হতে পারেনি। বিধান সভার কাঠামোতে যে দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য দেখা গেল তা' হ'ল পেটো-সাহেব প্রতিনিধিদের প্রাধান্য। এমনকি মণ্টেগু-চেমসফোর্ড আইনাধীনে যে সভা গঠিত হয়েছিল—বহুল পরিমাণে সরকারী কর্মচারী ও বেসরকারী মনোনীত সদস্য থাকা সত্ত্বেও—তাতেও সাহেবদের এত প্রাধান্য দেওয়া ছিল না। সাঁইত্রিশের ব্যবস্থায় সাহেবদের ভোটানুগ্রহ-প্রার্থী হতে হবে যে কোন মন্ত্রিসভার এই ছিল গুপ্ত সরকারী মতলব বাঙলা দেশের জন্য।

ইংরেজ শাসনের এইটি শেষাঙ্ক। সে অভিনয়ে প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে মঞ্চের ওপর অনেক রথী ও মহারথীর দর্শনলাভ হলেও এবং পাদপীঠের পশ্চাতে অনেক চক্রাবর্ত ও চক্রব্যূহ নির্মিত থাকলেও যদি সেদিন এক আবুল কাশেম ফজলুল হক কোন নতুন পথের

সহযাত্রী হতেন বা হতে পারতেন তবে ভারতবর্ষের ইতিহাস যে পথে অগ্রসর হতে শুরু করল তা' করত কিনা সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়।

ফজলুলের রাজনৈতিক জীবনের এই অধ্যায় দেশের ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

ফজলুল প্রধানমন্ত্রী হলেন ৩৬-৩৭ সালে কিন্তু রাজনীতি করে এসেছেন সেই স্বদেশী যুগ থেকে। মন্ত্রিত্বের গদি প্রথম পেলেন মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসনব্যবস্থাকালে (২৪-২৫ সালে)। যে অবস্থায় যুক্ত বাঙলার রাজনীতির শেষ অধ্যায়ের যবনিকা পতন বিয়াল্লিশ সালে ঘটল এবং তাঁকে মন্ত্রিত্বের পদে ইস্তফা দিতে হয়েছিল তা' একান্তভাবেই নাটকীয়।

সাঁইত্রিশ সালে যে মন্ত্রিসভা ফজলুল গড়লেন তাতে বাঙালী মুসলমানের মনের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত যে হয়েছিল তা' মনে হয় না। সে মন্ত্রিসভাকে শ্রেণী-স্বার্থের দিক দিয়ে দেখলে একদম জমিদার-পুষ্ট বলা যেত, যদিও এই জমিদার-মন্ত্রীদের সহায়তায় পরিণামে ফজলুল ভূমি-রাজস্ব বিভাগে ওলোট পালোট করেছিলেন।

পোলিটিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করলে এতে যে পরিমাণে অ-বাঙালী প্রভাবিত মোসলেম-লীগ ভাবধারা এসে পড়েছিল সে অনুপাতে বাঙালী মুসলমান আকাঙ্ক্ষিত প্রজার দাবী স্বীকৃত হয়নি। পাঁচজন হিন্দু-মন্ত্রীর মধ্যে দু'জন সিডিউলড-কাষ্ট প্রতিনিধি এবং অপর দু'জন ছিলেন নন-পোলিটিক্যাল অথবা চাকুরেলোক। কেবল একজনই ছিলেন পোলিটিক্যাল—তিনি হলেন নলিনীরঞ্জন সরকার। ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের দাবির দিক দিয়ে বিচার করলে বলা যায় যে ফজলুলের একমাত্র সুহৃদ ছিলেন ঐ নলিনীবাবুই।

বাঙালী মুসলমানদের দাবির প্রশ্ন বিচার করলে দেখা যায় যে ঐ মন্ত্রিসভায় ফজলুলের পাশে দাঁড়াতে পারতেন একমাত্র মৌলভী সৈয়দ নৌসের আলি। নলিনী এবং নৌসের পরিণামে

অ-বাঙালী মুসলমানদের চাপে মন্ত্রিসভা থেকে তাড়িত হলে ফজলুল অসহায় অবস্থায় পড়লেন।

তাঁদের পরিবর্তে মন্ত্রিসভাতে তমিজুদ্দীন খাঁ ও সামসুদ্দীন আহম্মদ স্থান পেলেন। এঁরা উভয়ই বাঙালী মুসলমান হলেও নৌসের বা নলিনীর স্থান পূরণ করতে পারেন নি। নৌসের তখনও অনেকটা আদর্শবাদী বাঙালী—আর তমিজুদ্দীনের সে ভাবমোহ কেটে গেছে, তিনি ধাপে ধাপে "কেরিয়ার" গড়তে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন তখন। নলিনী ও নৌসের মন্ত্রিত্বের পদে ইস্তফা দিলেও ফজলুলেরই মন্ত্রিসভা থাকল কিন্তু ফজলুল স্বগৃহে "একঘরে"। তাঁর "হ্যাপি ফ্যামিলী" চৌচির।

সে অবস্থান্তর হতে দেখা গেল বিধান সভার প্রথম বাজেটে মন্ত্রীদের ও সদস্যদের মাইনের বিল আলোচনা কালে। সে বিল আলোচনায় বিরোধী পক্ষ থেকে সামসুদ্দীন আহম্মদ কৃষক-প্রজা পার্টির প্রোগ্রাম উল্লেখ করে প্রশ্ন করেছিলেন: ফজলুল নিজে পার্টি-লিডার হিসাবে ঠিক করেছিলেন যে মন্ত্রীদের মাইনে এক হাজার টাকার বেশী হবে না, তবে কেমন করে তিনি এত শীঘ্র সে ব্যবস্থাপত্র অগ্রাহ্য করে মন্ত্রীদের মাইনে বেশী ধার্য করতে চলেছেন?

কৃষক-প্রজা-পার্টির আসল ধাত্রী নলিনী সরকার তখন রাজস্বমন্ত্রী হয়েছেন। তিনি প্রত্যুত্তরে জানালেন: ঠিক কথা, পার্টি হাজার টাকাই মন্ত্রীদের মাইনে ঠিক করেছিলেন বটে, কিন্তু পরে যে সামসুদ্দীনের পরামর্শে লীগ-প্রজাপার্টির যুক্ত মিটিংএ এই বিষয়টির চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্থগিত রাখা হয়েছিল সে কথার উল্লেখ করতে তিনি বিরত থাকলেন কেন?

শরৎ বসু উঠে বললেন: যদি অ-কংগ্রেসী হিন্দু ও মুসলমান সদস্যেরা কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সভাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল করে তবে আমি ঘোষণা করছি যে কংগ্রেস বাঙলাদেশে মুসলমান প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রীদের বেতন ৫০০ টাকা ধার্য করবে।

শরৎ বাবুর সে ঘোষণা একটু দেরীতে এসেছিল। অতি সহজেই এবং ঐ প্রস্তাবে কংগ্রেস-প্রজাপার্টি সমন্বিত সরকার গড়া একদা সম্ভবপর ছিল যখন ফজলুল নিজেই আগ্রহভরে কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতাত করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। ইতিমধ্যে প্রজা-লীগ কোয়ালিসন সরকার গঠিত হয়েছে এবং ফজলুলই প্রধানমন্ত্রী।

ফজলুল প্রত্যুত্তরে বললেন: শরৎ বসুর প্রস্তাব গ্রহণ করে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলালে ইসলাম ও দেশের স্বার্থ রক্ষা হবে না। শরৎ যা বললেন তা যদি তাঁর নিজের পক্ষে ঘটে তবে তিনি ১০০ টাকা মাইনে নিতেও রাজী হবেন।

জালালুদ্দীন হাসেমী বলেছিলেন (১৯৩৮ সালের বাজেট আলোচনা কালে) বাঙলাদেশে কংগ্রেসী-প্রজাপার্টি সরকার হ'ল না সঠিক নেতৃত্বের অভাবের জন্য (for want of leadership and proper handling of things.)

কংগ্রেস এবং সামসুদ্দীন-আবু হোসেন সরকার পরিচালিত স্বতন্ত্র কৃষক-প্রজা দল ছাড়াও বিরোধীপক্ষে "ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট প্রজা" নামে একটি উপদল ছিল। এদের নেতৃত্ব করতেন তমিজুদ্দীন খাঁ। ননকোঅপারেসন-খেলাফৎ যুগে (বিশের কোঠায়) তিনি ওকালতি ব্যবসা বর্জন করে পলিটিকসে ঢুকে পড়েছিলেন এবং পরিণামে অনেকদিন পাকিস্তান পলিটিকসে (১৯৬৩ সালেও) ভাসমান ছিলেন। ফজলুলের প্রথম মন্ত্রিসভায় তাঁর স্থান হয়নি। বোধহয় সেজন্যই তিনি বিরোধীপক্ষে মনের ক্ষোভে যোগদান করেছিলেন। প্রথমে স্পীকার হবার জন্য চেষ্টাও করেছিলেন কিন্তু ভোটে হেরে গেলেন। সরাসরি বিরোধীপক্ষে যোগদান করতে তবুও ইতস্তত করছিলেন। বুদ্ধিমান লোক সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন যে ইয়োরোপীয়ান ভোটের ওপর নির্ভরশীল কোয়ালিসন সরকারের মন্ত্রিত্বে ঢুকবার সহজ ও সরল পথই পড়ে আছে বিরোধী দলে যোগদানের মধ্য দিয়ে।

বাজেট আলোচনার পরই বিরোধীপক্ষে যোগদান করবার সিদ্ধান্ত তমিজুদ্দীন খাঁ গ্রহণ করেন। আত্মপক্ষ সমর্থনে যে যুক্তি দিয়েছিলেন তা' কিন্তু ধোপে টেকেনা। তিনি বলেছিলেন যে প্রজাস্বত্ব আইন রচনা নিয়ে ফজলুল-সরকার বিশেষ কিছু করলেন না বলেই তিনি বিরোধী পক্ষে যোগ দিলেন। সত্য কথা হ'ল প্রজাস্বত্ব (Tenancy) এবং পরে মহাজন (Money-Lender) সংযত করবার আইন রচনা করতে ফজলুল তখন অনেকদূর এগিয়েছেন। পার্লামেণ্টারী পদ্ধতিতে কাজ সমাধা করতে যতটুকু দেরী করতে হয় তার চেয়ে বেশী গড়িমসি দেখাননি। তবুও বলতে হবে তমিজুদ্দীন একটা খাঁটি ও জ্যান্ত সামাজিক ইস্যুর দোহাই দিয়ে বিরোধী পক্ষে যোগদান করেছিলেন।

তমিজুদ্দীনের পর হেম নস্কর তাঁর গুটিকতক চেলা উপ-চেলা নিয়ে বিরোধী দল-ভারী করলেন। এঁরাও এলেন ঐ একই উদ্দেশ্য সাধনে। কেন একা মোসলেম লীগ পালিত, বশম্বদ এবং বর্ণহিন্দু বিরোধী সানুজ মুকুন্দ মল্লিক মহাশয়কে "সিডিউল্ড কাস্ট" প্রতিনিধি হয়ে মন্ত্রিত্বের গদীতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বসে থাকতে দেওয়া হবে?

এ সব নতুন গ্রহ সমাবেশের দরুণ ফজলুল নিশ্চয়ই তাঁর অতীত ও তিক্ত অভিজ্ঞতার (১৯২৪-২৫) কথা স্মরণ করে থাকবেন। তিনি বিচলিত হয়ে পড়লেন যখন দ্বিতীয় বাজেট (১৯৩৮ সাল) আলোচনার পূর্বেই নৌসের আলি মন্ত্রিসভা থেকে তাড়িত হলেন। যে ইস্যুর ওপর এবং যে সব কার্য-কারণ হেতু এবং যে পদ্ধতিতে নৌসের আলি ফজলুল ক্যাবিনেট থেকে বিতাড়িত হলেন তা' একান্ত ভাবেই মূলগত (Fundamental) বৈষম্য হেতু। এরই পশ্চাতে প্রথমে দেখতে পাওয়া যায় ইস্পাহানী-সাহবুদ্দীন-সুরাবর্দী ষড়যন্ত্রের গোড়া পত্তন।

নৌসের আলি মন্ত্রী ছিলেন অতএব তিনি যে মন্ত্রী-পদলোভী

হয়ে মন্ত্রিসভা থেকে সরে পড়লেন এ অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে আসতে পারে না। বাঙালী মুসলমান সমাজে যশোরের জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবে নৌসের তখন সুপরিচিত। এ সুনাম অর্জনে তাঁকে সর্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য করেছিলেন সেই বোর্ডের এক মনোনীত হিন্দু সদস্য যাঁর সঙ্গে তাঁর বাক্‌বিতণ্ডা ও তর্কাতর্কি অতি সহজেই "পাবলিসিটি" পেত এবং নৌসেরের নাম সুবে বাঙলায় ছড়িয়ে পড়েছিল। নৌসের যে তখন "জাতীয়তাবাদী" বাঙালী ছিলেন তাও নয়। বন্দবিলা সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যখন গ্রামবাসীর গৃহস্থালীর আসবাবপত্র নিলামে চড়িয়েছে পুলিস সুপারিন্‌টেডেন্ট এলিসন ও তাঁর দুইজন বিশ্বস্ত এবং একান্ত অনুগত হিন্দু ও মুসলমান পুলিস অফিসার, তখন নৌসের সে কাজে সরকারের সহায়তাই করেছিলেন।

তবুও নৌসের চরিত্রে এবং পলিটিকসে বেশ বৈশিষ্ট্য ছিল যাতে তাঁকে নেতৃত্বের মর্যাদা লাভে সহায়তা করেছিল। বিধানসভায় কোয়ালিশন সরকারের মন্ত্রী হিসেবে (পাবলিক হেলথ তাঁর অধীনে ছিল) নৌসের যে সব বক্তৃতা দিতেন বা যে সব তথ্য অকপটে পরিবেশন করতেন তা'তে বেশ কিছু নতুনত্ব ছিল। তার বক্তব্যগুলো সেদিন যে পরিমাণে কোয়ালিসনের লীগ সেক্‌সনকে বে-কায়দায় ফেলত ততোধিক কংগ্রেস ও অন্যান্য বিরোধী দলকে উল্লসিত করত। বিরোধীপক্ষ থেকে অপর যে কোন মন্ত্রীর বক্তব্য সমালোচনা না করে কংগ্রেসীরা ছাড়তেন না। অনেক সময়েই সে সমালোচনা—নলিনাক্ষের হাতে পড়লে তা কথাই নেই—তিক্তও হত। কিন্তু নৌসের আলির বক্তৃতা তাঁ'রা কেবল নীববেই শুনতেন না অনেক সময়ে সরবে অনুমোদনও করতেন।

একদিনের কথা মনে আছে। নৌসের হেল্‌থ মিনিস্টার হিসাবে (১৯৩৭ সাল) তাঁর "ডিম্যাণ্ড" (Demand) হাউসে পেশ করে কলকাতার হাসপাতালগুলোর কথা পাড়লেন এবং দেশের লোক

যে সেখানে নাস্তানাবুদ হয়ে থাকেন তাও স্বীকার করলেন। এ বিষয়ে উন্নতি সাধনে যে তাঁর ধারণা সামান্য (poverty of idea) আছে তা কবুল করে বললেন যে, তিনি শীঘ্রই কলকাতার বিশিষ্ট চিকিৎসকদের নিয়ে, যথা নীলরতন সরকার, বিধানচন্দ্র রায়, একটি কনফারেন্স আহ্বান ও ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি ঠিক করবেন।

নৌসেরের অভিপ্রায় শুনে তমিজুদ্দীন খাঁ তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে সেদিন বলেছিলেন : his speech breaths the spirit of service by a popular Minister. শরৎবাবুও চুপ করে ছিলেন না। তিনি বলেছিলেন : Sir, before you pass on to the next item, will you permit me to express the appreciation of this side of the House of the spirit which animated the utterances of the Hon. Minister. বিধান সভায় সেদিন যে সব সাংবাদিকের যাওয়া-আসা ছিল তাঁদের অনুমান করতে একটুও দেরী হয়নি যে, কোয়ালিশনের তরফ থেকে প্রথম বলি হবেন নৌসের আলি। হয়েছিলেনও।

কিন্তু যে প্রধানতম কারণে নৌসের পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন তা' ছিল সম্পূর্ণভাবে অন্য গোত্রের। এই "যশুরে বাঙাল" ডিস্ট্রীক্ট বোর্ড পরিচালনা করে দেখেছিলেন যে যুক্ত নির্বাচনে বাঙালী মুসলমানদের তথা কথিত বাঙালী হিন্দুদের "প্রতিপত্তি" অগ্রাহ্য করে জয়লাভ করা মোটেই দুরূহ ব্যাপার নয়। নৌসের যুক্ত নির্বাচন সেই কারণে পছন্দ করতেন। অতীতে বিধান সভায়—পূর্বেই বলেছি—ডিস্ট্রীক্ট ও মিউনিসিপ্যালিটীতে যুক্ত নির্বাচন প্রথা চালু রাখবার প্রস্তাব যেমন ফজলুল তেমনি নৌসেরও—সুরাবর্দী ও মোমিনের বিরোধীতা অগ্রাহ্য করে—সমর্থন করেছিলেন সেই একই কারণে (১৯৩৩ সাল)।

আটত্রিশের নতুন পরিপ্রেক্ষিতে লীগের দাবি অনুযায়ী এবং

ইস্পাহানী-সুরাবর্দী-সিদ্দিকী-সাহবুদ্দীনদের ষড়যন্ত্রের জন্য কলকাতা করপোরেশনে চালু সেই যুক্ত নির্বাচন প্রথা রহিত করে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করবার সময় তখন এসে গেছে। ফজলুল সে দাবি অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। কিন্তু নৌসের সে দাবি মেনে নিতে অস্বীকার করাতে মন্ত্রিসভা ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন (অক্টোবর ১৯৩৮ সাল)। তখন থেকেই তাঁর ভাগ্য বিড়ম্বনা শুরু হ'ল।

কলকাতার দপ্তরী-পাড়ার মুসলমান জনতা—এঁরা কিন্তু ছিলেন খাটি বাঙালী—এদের এক ভগ্নাংশের নেতৃত্ব ভার সেই ছেচল্লিসের হাঙ্গামার দিনে এসে পড়েছিল "বেকার" হোস্টেলের কলেজ ছাত্রদের হাতে। সিভিল ওয়ার শুরু হলে সেদিন এই কলেজের ছাত্রেরা নৌসের আলি এবং তাঁর পরিবারের ওপর চড়াও হয়েছিল। তখনও সে দাঙ্গা বেশীদূর গড়ায়নি। দেখলাম খালি গায়ে একখানি পায়জামায় নিম্নাঙ্গ আবৃত নৌসেরকে এবং তাঁর পরিবারস্থ সকলকে "উদ্ধার" করে পুলিসের লরী নিয়ে চলেছে আমহার্স্ট স্ট্রীট থানায়। পাকিস্তান দাবি রূপায়ণে সেদিন হয়ে আছে এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। সেদিন কেবল হিন্দু-মুসলমান বিরোধ ঘটেনি। লীগের দাবি যে সব মুসলমান—বাঙালীই তার মধ্যে ছিল বেশী—অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করত তাদেরও অত্যাচার ও অবমাননা সহ্য করতে হয়েছে প্রচুর।

দিন দিন কোয়ালিসন সদস্য সংখ্যা হয় মন্ত্রিত্ব-পদ না পাওয়াতে বা ক্রমবর্ধমান লীগের দাবি মানবার জন্য মতবিরোধ এসে পড়াতে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে লাগল। ফজলুল সে আশঙ্কা পূর্বেই করেছিলেন এবং এ অবস্থা নিরসনের মানসে তিনি নির্বাচনের পরই কংগ্রেসী দুয়ারে ধরণা দিয়েছিলেন। আশঙ্কা বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে দেখে বিচলিত হয়ে পড়লেন। এটুকু বুঝতে তাঁর দেরী হয়নি যে বিরোধী পক্ষ যদি কোন প্রকারে ১৩।১৪টি কোয়ালিসনের সদস্যকে দলত্যাগ করাতে পারে তবে যে ইয়োরোপীয়ান ভোটের ওপর নির্ভর করে তাকে চলতে হচ্ছে সে অবস্থাও নড়চড় হয়ে যাবে এবং এ

দলভাঙ্গা যে একেবারেই অসম্ভব নয় তা'ও সদস্যদের মতিগতি দেখে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন।

অতীতে যখন মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন ব্যবস্থায় দ্বিতীয় মন্ত্রি-সভায় তিনি প্রথমবার মন্ত্রী হলেন (১৯২৪ সাল) এবং তাঁর বিরুদ্ধে নো-কনফিডেন্স মোসন সর্বপ্রথম এল (২০শে ফেব্রুয়ারী) তখন এক ভোটে ফজলুল রক্ষা পেয়েছিলেন। মোসনের পক্ষে ৬৩ এবং বিপক্ষে ৬৪টি ভোট পড়েছিল। এই ৬৪টির ২৭টি সরকারী কর্মচারী এবং ১৫টি নামেমাত্র নির্বাচিত বেসরকারী ইয়োরোপিয়ান সদস্যদের ভোট ছিল। খাঁটী নির্বাচিত হিন্দু-মুসলমান সদস্যদের ভোটের কেবল ক্ষুদ্র একাংশ—২২টি ভোট—মন্ত্রিসভা পেয়েছিল। অপর পক্ষে বিরোধী পক্ষের ৬৩টি ভোটের প্রায় সবগুলিই নির্বাচিত হিন্দু-মুসলমান সদস্যেরা দিয়েছিল। তখন হাউস গঠিত ছিল মোট ১৬০ সদস্য নিয়ে এবং স্বরাজীদের মোট সংখ্যা ছিল ৪৫ (২৫টি হিন্দু ও ২০টি মুসলমান)। চিত্তরঞ্জন দাশ হাউসে সদস্য পরিচালন ভার নিজের হাতে রেখেছিলেন এবং সরাসরি নো-কনফিডেন্স (No-confidence) মোসন আনবার পূর্বে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাবির প্রশ্ন নিয়ে একবার শক্তি পরীক্ষাও করেছিলেন। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত সে মোশন পেশ করলেন এবং সরকারী বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁর মোশন গৃহীত হল। ৭৫টি সদস্য মোশনের পক্ষে ও ৪৫টি বিপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন।

এমনি ভাবে শক্তি পরীক্ষা করেও মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে প্রথম অনাস্থা প্রস্তাব চিত্তরঞ্জন দাশ হাউসে পাশ করাতে পারেননি।

সাঁইত্রিশের বিধানসভাতেও এমনি ভাবে শক্তি পরীক্ষার সুযোগ এসেছিল স্পীকার নির্বাচন করবার সময়। কিন্তু কংগ্রেসীরা সে সুযোগ নেয়নি বা তার তাৎপর্য বুঝতে পারে নি।

চিত্তরঞ্জন দাশ প্রথম নো-কনফিডেন্স মোশন হাউসে পাশ

করাতে না পারলেও মন্ত্রিসভা যে বেশীদিন টিকতে পারবেনা তা' অতি সহজেই ধরতে পেরেছিলেন।

সেদিন চিত্তরঞ্জন দাশের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন আবুল কাশেম ফজলুল হক। বাঙলা দেশ ও বাঙালীকে চিত্তরঞ্জন দাশ যেমন করে চিনেছিলেন আবুল কাশেম ফজলুল হকেরও সে পরিচয় এক তিল কম ছিল না। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর কংগ্রেস যে অনুসন্ধান কমিটি বসিয়েছিল সে কমিটিতে জাতীয়তাবাদী ও "মোসলেম গোখলে" মহম্মদ আলি জিন্না স্থান পাননি বা সে সুযোগ পাবার ইচ্ছাও তাঁর হয়ত ছিল না কিন্তু সে স্থান পেয়েছিলেন ফজলুল হক, যেমন পেয়েছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ। লাহোরে উপস্থিত হবার নিমন্ত্রণ উভয়েরই কাছে এসেছিল। চিত্তরঞ্জন সর্বস্ব উৎসর্গ করে সে কাজ সমাধা করেছিলেন, তার পরিচয় পাওয়া যায় জবাহরলাল নেহরুর আত্মজীবনীতে। ফজলুল ব্যক্তিগত কারণে সে জাতীয় কাজে যোগদান করতে পারেননি; যাত্রা করবার দিনে তাঁর একমাত্র পুত্র বসন্ত-রোগে পরলোক যাত্রী হন। পুত্রশোকে ফজলুল মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন।

সেই চব্বিশের বিধানসভায় মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করলেন কুমার শিবশেখরেশ্বর রায়, চিত্তরঞ্জন দাশের ইঙ্গিতে। ব্যঙ্গ করে ফজলুল বললেন: In this case promptings of patriotism have marvellously coincided with intense selfish interest. ব্যঙ্গ হলেও ফজলুলের মন্তব্য পরিণামে সত্যে পরিণত হয়েছিল। এই শিবশেখরই যখন লর্ড লিটন মন্ত্রীর পদ দান করলেন তা' বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করেছিলেন। আবার তিনি যখন একটা বড় ধরণের "ইস্যুর" ওপরে দাঁড়িয়ে মন্ত্রীর পদে ইস্তফা দিলেন তখন আর এক জমিদার, বিজয়প্রসাদ সিংহরায়, সে পদ অতি সহজ মনেই গ্রহণ করেছিলেন।

প্রথম নো-কনফিডেন্স মোশন হাউসে গ্রহণ করাতে অসমর্থ

হলেও চিত্তরঞ্জন দাশ প্রায় প্রতিটি বাজেট "ডিমাণ্ড" ভোটের আধিক্যে নাকচ করে দিলেন। এগুলো সবই ছিল ড্যায়ার্কিক্যাল শাসন ব্যবস্থায় মন্ত্রীদের অধিকার-বহির্ভূত দফা। তাই লাট সাহেব "সার্টিফিকেট" আইন বলে মন্‌জুর করলেন।

সর্বশেষে এল মন্ত্রীদের খোদ এলাকার দাবিগুলো। আবগারী বিভাগের দাবি যখন হাউসে পেশ করা হ'ল তখন সে দাবি বিধানসভা অগ্রাহ্য করল। ৬৩টি বিপক্ষে ও ৬১টি পক্ষে। সভা বিচলিত হয়ে পড়ল—কি হয়, কি হয় ভাবনায়। সর্বোপরি এল মন্ত্রীদের বেতনের দাবি। সে দাবিও অগ্রাহ্য হ'ল—একটি ভোটের জোরে। ৬৩টি বিপক্ষে ও ৬২টি পক্ষে ভোট পড়ল।

লর্ড লিটন চমকেছিলেন যেমন চমকেছিল গোটা বাঙলা দেশ ও গোটা ভারতবর্ষ চিত্তরঞ্জন দাশের অভাবনীয় সাফল্যে। লিটন সরাসরি বিধানসভার মতামত অগ্রাহ্য না করে, এক ভোটের দাবিতে এত বড় একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত হবে না বলে মতামত দিয়ে বিধানসভাকেই ছ'মাসের নোটিশ দিলেন এই মর্মে যে, আগামী আগষ্ট মাসে আবার সভা বসবে এবং মন্ত্রীদের মাইনের দাবি চূড়ান্তভাবে তখন বিবেচিত হবে।

দুপক্ষ থেকেই তখন সমানভাবে আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করে সেই আগামী ভোট-যুদ্ধের প্রস্তুতি চলল। ভোটের দিন—পূর্বেই বলেছি—দেশবন্ধুর "ফরওয়ার্ড" পত্রিকা ফলাও করে ঢাকার রায় বাহাদুর পিয়ারীলাল দাশের নিকট লিখিত ফজলুল হকের এবং সে সঙ্গে দেশবন্ধুর দ্বারা পরাজিত তাঁর ভাই,এ্যাডভোকেট জেনারেল ও পরে ল' মেম্বর, সত্যরঞ্জন দাশের গোপন পত্রের মর্মার্থ প্রকাশ করে দেয়।

১৯২৪ সালের ২৬শে আগষ্ট তারিখে বিধানসভা আবার বসল। হাউসে কটন সাহেব প্রেসিডেন্ট। উত্তেজনায় ভরপূর। টাউনহলের বাইরের জনতা উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল। দোতলার কক্ষেও চিত্ত-চাঞ্চল্য

কম নয়। চিত্তরঞ্জন দাশের সাগরেদ, নলিনীরঞ্জন সরকার, মেম্বর-চুরি করে হাত পাকালেন সেই উপলক্ষেই।

হাউস বসলে ফজলুল চিত্তরঞ্জনকে প্রশ্ন করলেন: যে চিঠি আপনি ছেপেছেন, ওখানা কে লিখেছে, বলবেন? আমার কাগজ-পত্রের মধ্যে তো কোন কপি দেখছি না? অভিজ্ঞ আইন ব্যবসায়ীর উপযুক্ত প্রশ্ন।

কিন্তু যাঁকে সে প্রশ্ন করা হ'ল তিনি তো সেদিন এ ব্যবসায়ে বাঙলা দেশের প্রথম শ্রেণীর অন্যতম। ব্যাকরণের প্রথম পুরুষের সহায়তায় চিত্তরঞ্জন দাশ উত্তরে বললেন: এটুকু দেখা যাচ্ছে যে চিঠির লেখক এ, কে, ফজলুল হক এবং যে কোন আদালতে হাজির হলে সে সই প্রমাণ করা যাবে।

সে উত্তর ও প্রত্যুত্তরে কে কা'কে কতখানি ধাপ্পা দিলেন আজ তা' বিচার্য নয়। তবে চট্টগ্রামের উৎকট স্বরাজী এবং চিত্তরঞ্জন দাশের একান্ত আপনার জন নুরুল হক চৌধুরী, ফজলুল হককে আদালতে যেতে আহ্বান জানালেও ফজলুল সেখানে যাননি।

হাউস এবার এক ভোটের পরিবর্তে দু' ভোটে মন্ত্রীদের মাইনের দাবি অগ্রাহ্য করল। দাবির পক্ষে ৬৪ ও বিপক্ষে ৬৬টি ভোট পড়ল। যে সব সদস্য সেদিন সেই পার্লামেণ্টারী-পলাশীতে অনুপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেন: নবাব নবাব আলি চৌধুরী, নগেন্দ্রনারায়ণ রায়, তড়িৎভূষণ রায়, শৈলেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, ব্রজেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী এবং ডাঃ হাসান সুরাবর্দ্দী।

নবাব আলি চৌধুরী (বগুড়ার মহম্মদ আলির পিতামহ) মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন ব্যবস্থায় প্রথম বার স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ে সঙ্গে মিনিস্টার হয়েছিলেন। দ্বিতীয় মন্ত্রিসভায় তিনি স্থান পাননি। সেখানে এলেন স্বনামধন্য সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, আবদুল করিম গজনভী ও আবুল কাশেম ফজলুল হক। নবাব সাহেব কি সেই রোষে সেদিন ভোট দিতে আসেননি? তাঁকে হাউসে

আসতে বাধা দেবার জন্য তাঁর বাড়ীতে যে ভলানটিয়ার-পিকেট বসানো হয়নি সে তো সকলেরই জানা কথা।

লিটন বিচলিত হলেন। সর্বভারতে একমাত্র বাঙলাদেশে চিত্তরঞ্জন দাশ ডায়ার্কী বানচাল করলেন! হোক না মন্ত্রীদের মাইনে না-মঞ্জুর, তবুও ভবিষ্যতে সে দাবি হাউস মেনে নেবে এই ভরসায় লিটন নবাব আলি ও সন্তোষের রাজা মন্মথনাথ রায়-চৌধুরীকে মন্ত্রী নির্বাচন করলেন।

আবার বিধান সভা বসল। এবার ফজলুল মন্ত্রীদের মাইনের দাবির বিরোধীতা করে বললেন, there is no possibility of getting a stable Ministry under the conditions prevailing at present এবং জানালেন এ অবস্থা নিরসন করা সরকারী কর্তব্য। স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র তখন ডায়ার্কীর অপর অর্ধাংশের মেম্বর, তিনি ফজলুলের বিরোধিতা করতে দেখে রেগে আগুন।

চিত্তরঞ্জন দাশ উত্তরে জানালেন: ফজলুল হকের বক্তব্য বুঝতে কষ্ট হয় না, কিন্তু প্রভাস মিত্রের কাণ্ড কারখানা অবাকই করে। ফজলুল হক বললেন বর্তমানে যে অবস্থা চলেছে তাতে স্থায়ী মন্ত্রীসভা গঠন অসম্ভব, যদিও ফজলুল হক সে মন্তব্যে আসতে যে বক্তব্য পেশ করলেন তা' তাঁর গ্রাহ্য নয়। তবুও ফজলুলের মন্তব্য তিনি বোঝেন ও সম্মান করেন। ফজলুল ডায়ার্কিক্যাল গভর্ণমেণ্টে এখনও বিশ্বাসী, কেবল বর্তমানের অবস্থা বিচারে স্থায়ী মন্ত্রিসভা হতে পারে না বলেই বিরোধিতা কচ্ছেন। কিন্তু সার প্রভাসচন্দ্র মিত্র কোথায় দাঁড়িয়ে বক্তব্য পেশ করছেন? "মুডিম্যান" কমিটিতে তিনি পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে এলেন যে, ডায়ার্কিক্যাল সরকারে তাঁর একটুও আস্থা নেই। অথচ এখানে সেই ডায়ার্কিক্যাল সরকার কেবল সমর্থনই কচ্ছেন না, এর বিরোধিতা যাঁরা কচ্ছেন তাঁদের সমালোচনা করতেও কসুর কচ্ছেন না। ব্যাপার কি?

চিত্তরঞ্জনের যুক্তিজালে পড়ে প্রভাস নিরুত্তর এবং সম-পড়ুয়ার সেই দুর্দশা দেখে যেমন ফজলুল তেমনি হাউসের অন্যান্য সদস্যেরা হেসে উঠল। এবার আরও বেশী সংখ্যক ভোটে মন্ত্রী-বেতন দাবি অগ্রাহ্য করল বিধান সভা। ৬৯ জন বিপক্ষে এবং ৬৩ জন পক্ষে ভোট দিল।

১৯২৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আবার ডায়ার্কীর পুনর্জীবন দেবার চেষ্টা হয়। এবার মন্ত্রী নির্বাচন না করে মন্ত্রীদের মাইনের দাবি পেশ করা হল। সে দাবি হাউস মেনে নিল অনেক বেশী ভোটে। ৯৫টি পক্ষে এবং ৩৮টি (স্বরাজী) বিপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন।

চিত্তরঞ্জন দাশ সেদিন পরলোকে এবং লিটন নিজে পার্টি-হুইপের কাজ করেছিলেন। তাতেও বেশী সুবিধে হত না, যদি মন্ত্রিত্বের গদি-প্রাপ্তির লোভ ঐ ভাবে অনিশ্চিত করে না রাখা হত।

মন্ত্রীদের মাইনের দাবি গৃহীত হবার পর লিটন, সার আবদার রহিমকে মন্ত্রিসভা গঠন করতে আহ্বান করলেন। দুর্ভাগ্য তাঁর, ভবিষ্যতে কি হবে বা না হবে তা' চিন্তা না করেই আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেসনে এমন এক হিন্দু-বিদ্বেষী বক্তৃতা দিয়েছিলেন যার জন্য কোন হিন্দু সদস্যই তাঁর মন্ত্রিসভায় যোগদান করতে ভরসা পাননি।

ব্যোমকেশ চক্রবর্তী ও আবদুল করিম গজনভী, স্যার আবদার রহিমের পরিবর্তে, মন্ত্রী হলেন। আবার নো-কনফিডেন্স মোসন এল। এমন ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন বারেন্দ্র ব্যোমকেশ মোসনের সামনে পড়ে আঁতকে উঠলেন। মোসন হাউসে পেশ হবার পূর্বে পদত্যাগ করতেও চাইলেন। কিন্তু পালাবার পথ তখন বন্ধ। ৫৭টি পক্ষে ও ৬৮টি বিপক্ষের ভোটে ব্যোমকেশ চক্রবর্তী এবং ৬২টি পক্ষে ও ৬৬টি বিপক্ষের ভোটে গজনভী ধূলিস্যাৎ হলেন। এ ভোটাভুটিতে স্বরাজীদের মত সম-উৎসাহী ছিলেন স্যার আবদার রহিম।

নিজে মন্ত্রী হতে পারেননি বলে গজনভী-চক্রবর্তী (গজ-চক্র) মন্ত্রিত্বের বিরুদ্ধে যে যুক্তি সেদিন আবদার রহিম দিয়েছিলেন তাতে কি পরিমাণে মন্ত্রিত্ব পদ-প্রাপ্তি-লোভ তাঁকে পেয়ে বসেছিল তা' আন্দাজ করা যায়। সেদিন স্যার আবদার রহিম স্যার আবদুল করিমকে renegade (বিশ্বাসঘাতক) এবং গজনভী প্রত্যুত্তরে তাঁকে (শকুনি) vulture আখ্যায় সম্বোধন করেছিলেন।

পরের দলে এলেন স্যার প্রভাস মিত্র ও নবাব মুসারফ হোসেন। তাঁদেরও গদী ছাড়তে হয়েছিল।

আবুল কাশেম ফজলুল হক সেই মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন ব্যবস্থায় বিধান সভার সদস্য থাকলেও আর মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেননি।

সাঁইত্রিশ সালে ফজলুল যখন কংগ্রেসীদের সঙ্গে আঁতাত করতে সক্ষম হলেন না এবং গোঁজামিল দিয়ে মুসলিম লীগ ও সর্বোপরি পেটো সাহেবদের ভোটের ওপর নির্ভর করে মন্ত্রিসভা গড়লেন, তখন ভিন্ন পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও তাঁর মনে মনে বিশের কোঠায় বাঙলার বিধান সভায় কি ঘটেছিল সে চিত্র নিশ্চয় স্মরণে ছিল। মন্ত্রীর পদ-প্রাপ্তি উদ্দেশ্যে ও তাতে বিফল মনোরথ হলে মুসলমান সদস্যেরা—হিন্দুদের রেকর্ডও কোনক্রমে ন্যূন ছিল না—কি যে না করতে পারত তা' গোটা মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন ব্যবস্থা কালে ফজলুল লক্ষ করে এসেছেন। এ থেকে মুক্তি পাবার জন্যই তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতাত করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। কিন্তু তা' হ'ল না।

অপর দিকে ১৯৩৭ সালের আগষ্ট মাসে বিধান সভা বসবার সঙ্গে সঙ্গে ফজলুল দেখলেন জগাখিচুড়ী অবস্থা। কংগ্রেস রন্ধ্রে রন্ধ্রে সরকারী ত্রুটী খোঁজে বদ্ধপরিকর, সরকারী বড় বড় সাহেব কর্মচারীরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে তাঁদের সহায়তা করছে। বাঙালী মুসলমানদের উপদলটি (তমিজুদ্দীনের দল) কথায় কথায় কংগ্রেসের

প্রশংসা করে মন্ত্রিসভার সমালোচনা করতে মুখর। মন্ত্রিসভার মধ্যে নৌসের আলি বাঙালীদের দাবি প্রতিষ্ঠা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কোয়ালিশন দলের ইস্পাহানী-সাহবুদ্দীন-সুরাবর্দ্দী-সিদ্দিকী অকারণে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বাঙালী হিন্দুদের খেপাতে উঠে পড়ে লেগেছে, এবং হোম মিনিস্টার, নাজেমুদ্দিন, অভিজ্ঞ পলিটিসিয়ান হয়েও সরকারী বক্তব্যগুলো যে ঠাঁটে পেশ করতে শুরু করেছেন তাতে মন্ত্রিসভার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। যে পেটো-সাহেবরা মন্ত্রিসভাকে সমর্থন জানাতেন তাঁদের ভোটগুলো সরকারী পক্ষে পড়লেও দুই এক সময় তাদের বক্তব্যগুলো ঝাঁঝালো হয়ে পড়ছে। এর ওপর থাকল মুসলিম লীগের ভাবধারা। পূর্বেই বলেছি যে লীগের জন্মকালে এবং জন্মদাতা হিসেবে ফজলুল যতটা দায়ী ছিলেন, ততটা সেদিন আর কে ছিল? তবুও কলকাতার অ-বাঙালী মুসলমানদের প্ররোচনায় মহম্মদ আলি জিন্না সে প্রতিষ্ঠান করায়ত্ত করবার সঙ্গে সঙ্গে ফজলুলকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন (১৯৩৩ সালে)। ১৯৩৭ সালে লীগের দাবি, হিন্দু-দত্ত বাধা-বিরোধ, ইংরেজ-দত্ত উস্কানি এবং নতুন শাসন ব্যবস্থায় মুসলমানদের আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের দরুণ যে নতুন পরিবেশ সৃষ্ট হল তা অস্বীকার করা যেমন ফজলুলের পক্ষে তেমনি ভারতবর্ষের অন্য কা'রো পক্ষে অসম্ভবই ছিল। আর কেনই বা ফজলুল লীগের দাবি অগ্রাহ্য করবেন?

হিন্দু দত্ত বাধা নিশ্চয়ই ছিল। অবশ্য সে বিরোধের যে রসাল ও ভয়াল বর্ণনা ফজলুল হকের নামে আলতাফ হোসেন সংবাদপত্রে যোগান দিতেন তা অনেকাংশে নিছক প্রপাগ্যাণ্ডাই ছিল। তবুও বিরোধ ছিল! এ বিরোধ রূপ পেল কংগ্রেসী "ম্যাচ কনট্যাক্ট" (mass contact) এর মাধ্যমে যাতে পরিণামে লীগের অস্তিত্ব লুপ্ত হল কংগ্রেসী ম্যাপে। হয়ত বিশের কোঠায় যখন নন-কোঅপারেশন ও খেলাফত আন্দোলন প্রায় একাঙ্গী হয়ে পড়েছিল তখন এরূপ "ম্যাচ কনট্যাক্ট"-এর চেষ্টা করা যেতে পারত। কিন্তু ত্রিশের শেষ

কোঠায় মহম্মদ আলি জিন্নার পলিটিকস ও ইংরেজের কারসাজিতে লীগ যে নব রূপ পেল তা' কেবল উত্তর প্রদেশের কংগ্রেসী-নেতৃত্বই অস্বীকার করতে পারত, অন্য স্থানে বাঙলায় বা পাঞ্জাবে সে চেষ্টা অসম্ভবই ছিল। কংগ্রেসী নেতৃত্ব শুধু সেদিন নয় তার অনেক পরেও ভারতবর্ষের প্রাদেশিক ভাবধারার তারতম্য বোঝেননি বা বুঝতে চেষ্টাও করেননি।

হিন্দু দন্ত বাধার দ্বিতীয় রূপদান হ'ল হিন্দু ধরণ ধারণ শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে ঢুকবার প্রচেষ্টা-মাধ্যমে। মাদ্রাজে বিধান সভা বসেছে (১৯৩৭ সাল) স্পীকার, শাম্বমূর্তি, হুকুম করলেন যে সভার কাজ প্রতিদিন বন্দেমাতরম্ গান করবার পর আরম্ভ হবে। উঠল মুসলমানদের প্রতিবাদ। সে প্রতিবাদ দানা বাঁধতে লাগল। জিন্না সাহেবের চৌদ্দ দফা দাবির একটি হ'ল : বন্দেমাতরম্ ছাড়তে হবে। নতুন লীগের প্রথম অধিবেশনে (লাক্ষ্ণৌ ১৯৩৭, অক্টোবর) আর কেউ নয় "মহম্মদী" (তখন আজাদ) সম্পাদক মৌলানা আক্রাম খাঁ ও বদরুদ্দুজা সাহেব বন্দেমাতরমের ইতিহাস জানিয়ে এ সঙ্গীতের বিরোধিতা করে প্রস্তাব গ্রহণ করালেন।

পূর্ব যুগে যা অনায়াসসাধ্য ছিল পরবর্তী যুগে যে তা' অচল সে সম্পর্কে ধারণা কংগ্রেস নেতৃত্বের তখনও হয়নি।

অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুগের শেষাংশে যখন বন্দেমাতরম জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণ করা হয় তখন মুসলমানদের যে প্রতিনিধিরা কংগ্রেসে উপস্থিত থাকতেন তাঁরা এর প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা সাগ্রহেই গ্রহণ করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের একান্ত পার্শ্বচর বিহারী-মুসলমান লিয়াকৎ হোসেনের নাম সেকালের কলকাতার গোলদীঘিতে যাদেরই যাতায়াত ছিল তাঁরাই জানতেন। স্বদেশী যুগের সেই অক্লান্ত কর্মী জেলে জেলে দীর্ঘ দিন কাটিয়ে জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছেছিলেন বিশের শেষ কোঠায়। তখন

তিনি দরিদ্র ছাত্রদের দরদী বন্ধু। কলেজ স্কোয়ারে বক্তৃতা তখনও দিতেন, স্বদেশী ব্রত গ্রহণে তখনও পঞ্চমুখ। তিনি বেঞ্চের ওপর দাঁড়ালেই তাঁকে ঘিরে ছাত্র-দল ভিড় করত। প্রথমেই বন্দেমাতরম ধ্বনি দিয়ে বৃদ্ধ বক্তৃতা শুরু করতেন। যদি দেখতেন তাঁর ক্ষীণ স্বরে জনতা প্রতিধ্বনি দিতে দ্বিধাগ্রস্ত, তখন ক্রোধে আগুন হয়ে বলতেন—"বলো শালা, বন্দেমাতরম্!" বৃদ্ধের সেই আজন্ম অর্জিত বিশ্বাস নিয়ে চাপল্য দেখাতে সাহসী হ'ত না কেউ সেদিন। পরিপূর্ণ ও সহজ গলায় বন্দেমাতরম ধ্বনি শুনলে লিয়াকৎ হোসেন হতেন পরিতুষ্ট।

এও ছিল অতীতের ধারা। উনিশ শ সাঁইত্রিশে সে ধারা অচল হ'ল আপামর মুসলমানের কাছে।

পরিণামে মোতিলাল নেহরু-সুভাষ-আজাদ কমিটি এ বাধা অতিক্রম করতে যে উপদেশ দিলেন তাও অগ্রাহ্য হয়ে পড়ল উভয় সম্প্রদায়েরই কাছে। "লেজকাটা বন্দেমাতরম" তাঁ'রা দাঁড় করালেন, তা' না মানল হিন্দু, না মানল মুসলমানেরা। মনে পড়ে সেদিন সেই "লেজকাটা বন্দেমাতরম্" গ্রহণ করবার জন্য শরৎ চন্দ্র বসু মহাশয় আলবার্ট হলে অনুষ্ঠিত সভায় কত না যুক্তিজালের অবতারণা করেছিলেন! কেবল বন্দেমাতরম্ নয়, গান্ধীজী যে নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থা উদ্ভাবন করলেন, তার উপযোগিতা অস্বীকার করবার উপায় না থাকলেও তার সংস্কৃত নামকরণে—বিদ্যামন্দির—মুসলমানের চোখে সন্দেহের বিষয় বস্তু হয়ে পড়ল। এ ছোট বড় আপত্তিগুলোর যৌক্তিকতা নিয়ে এখনও দু'তরফ থেকেই তর্কাতর্কি অনন্ত কাল ধরে চালান যেতে পারে, কিন্তু অস্বীকার করবার কোনই উপায় নেই যে এই সব আপত্তি ও দাবির ওপর ভিত্তি করেই ত্রিশের কোঠায় মুসলমানেরা পায়ের নীচেকার মাটি শক্ত বোধ করেছিলেন। এই বাধাই তাঁদের জাতীয়তাবোধের বনেদ হয়ে পড়ল।

একদিকে মহম্মদ আলি জিন্নার মুসলমান স্বার্থ রক্ষার জন্য

চৌদ্দ দফা দাবি পেশ এবং অন্যদিকে জবাহরলাল নেহরুর সাম্প্রদায়িক ভিত্তির ওপর পলিটিক্যাল সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে দেখে অবাক হওয়া—দুইই সে যুগ-সন্ধিকালের রাজনৈতিক বাস্তব ও অবাস্তব বোধের ইঙ্গিত। আবুল কাশেম ফজলুল হক এমনি এক যুগে মুসলমান-গরিষ্ঠ বাঙলা দেশের প্রধানমন্ত্রী হন এবং ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় লীগের রাজনৈতিক দাবি নিয়ে ওকালতি করবার ভার তাঁকেই বইতে হয়।

বাঙলা দেশের নতুন বিধানসভার অধিবেশন ১৯৩৭ সালের আগষ্ট মাসে শুরু হ'ল। প্রথম দিকটায় ফজলুল কংগ্রেসী পক্ষ সম্পর্কে যে মনোভাব পোষণ করতেন তার দুই একটা ইঙ্গিত পূর্বেই দিয়েছি। বিধানসভায় তর্কাতর্কিতে যে সব আগুনে তুবড়ি এদিকে ওদিকে ছিটকে পড়ত তা'তে শরৎ বসু উদ্বেগ প্রকাশ করলে ফজলুল হক সে বক্তব্য সরলভাবেই সমর্থন করে নিজের তরফ থেকে বাক্য সংযমের আশ্বাস দিতেন।

বেশীদিন এ অবস্থা রইল না। পার্টির চাপ, সাহেবদের ওপর নির্ভরশীলতা, বিরোধী পক্ষের গুপ্ত আঘাত, হেম নস্কর, তমিজুদ্দীন খাঁ এবং পরিণামে নৌসের আলির দলত্যাগে ফজলুলের "হ্যাপি ফ্যামিলি"তে ১৯৩৮ সালেই বড় ধরণের ভাঙ্গন দেখা দিল।

কলকাতায় এপ্রিল মাসে (১৯৪৮ সাল) অল-ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগের স্পেসাল সেসন। ফজলুল হক অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান রূপে সেই পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে বাঙলার মুসলমানদের যে অধোগতি শুরু হয়েছে তার ইতিহাস তুলে ধরেন এবং তমিজুদ্দীন ও সামসুদ্দীনের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করলেন: এই সব দলত্যাগী মুসলমানেরা কি দেখছেন না যে কংগ্রেসী-প্রদেশে কংগ্রেস অন্য দলের কোনও পরোয়া না করেই মন্ত্রিসভা গঠন করেছে? এই দলত্যাগী মুসলমানেরা সংখ্যায় ৩০ জনের বেশী হবে না, কংগ্রেসের সঙ্গে যোগদান করে এদের কি লাভ হবে? এরা প্রজাস্বার্থ রক্ষার

যে প্রোগ্রামের কথা বলে তার সঙ্গে সরকারী কোয়ালিসন পার্টির প্রোগ্রামের পার্থক্য কোথায় ?

নিজের সম্পর্কে বললেন সাম্প্রতিক কালে বার বার কংগ্রেস পক্ষ থেকে আমার কাছে অনুরোধ এসেছে (overtures) যে কংগ্রেসীদের সঙ্গে কোয়ালিসন করে আমি তার প্রধানমন্ত্রী হই। জানি সে অনুরোধে সাড়া দিলে আমার প্রধানমন্ত্রিত্ব অনেকদিন ধরে দৃঢ় থাকবে কিন্তু তাতে মুসলমান স্বার্থ বজায় থাকবে কি ?

শেষ মন্তব্য ফজলুলী ধরণে করলেন : আবার যদি "পাণিপথের" পুনরাবৃত্তি ঘটে তবে মুসলমানেরা নিশ্চয়ই তাদের পূর্বপুরুষের ধারা অব্যাহতই রাখবে। (If Panipat and Thaneswar must repeat themselves let Muslims be prepared to give as glorious an account as did their forbears.)

উত্তাপ ক্রমবর্ধমান। প্রাদেশিক সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে যুক্ত হল সর্বভারতীয় সাম্প্রদায়িক ও অন্যান্য শ্রেণী স্বার্থ।

আবহাওয়া যখন প্রায় শ্বাসরোধী, তখন লক্ষ্ণৌতে লীগের বাৎসরিক অধিবেশন বসল এবং তা'তে একই মঞ্চে দেখা দিলেন পাঞ্জাবের স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খান ও বাঙলার আবুল কাশেম ফজলুল হক। ফজলুলের ইতিহাস বিশ্রুত "সাতানা" বক্তৃতা এই মঞ্চ থেকেই দেওয়া হয়েছিল। শেরে-ই-বঙ্গাল জয়ধ্বনির মধ্যে শোনালেন : অন্য প্রদেশে মুসলমানের প্রতি কোন অত্যাচার হ'লে বাঙলায় তার প্রতিহিংসা নেওয়া হবে। ফজলুলের রাজনীতি জ্ঞানের চরম ছেলেমানুষীর নিদর্শন হয়ে আছে ঐ "সাতানা" বক্তৃতা। পরিণামে তিনি যে ঐ বক্তব্য প্রত্যাহার করেছিলেন তাও মনে পড়ে না। তবে ভুলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ভুলতে তাঁকে দেওয়া হয়নি।

ফজলুল 'সাতানা' বক্তৃতা দিলেন অক্টোবর মাসে। সে সময়ে বাঙলা দেশের রাজনীতির গতিবিধির প্রতি লক্ষ রাখলেই বুঝতে পারা যায় তার মনের কোণে কোন্ প্রতিক্রিয়া সচল হয়ে পড়েছিল ?

পূর্ব থেকেই চলেছে দল ভাঙ্গাভাঙ্গি এবং যে পদ্ধতিতে সে কর্ম সম্পাদিত হতে চলেছিল তা' বিশের কোঠায় ফজলুল উপলব্ধি করেছিলেন যখন স্বরাজীদের হাতে তাঁর পরাজয় ঘটেছিল।

তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী বেশী পরিমাণে বদলাতে লাগল তখন থেকেই। হিন্দু বাঙালী পলিটিসিয়ানেরা যখন বিধানসভায় অতীতের বিশের কোঠার রাজনীতির কেবল প্রহসন অভিনয় করতে ব্যস্ত তখন অবাঙালী মুসলমান সদস্যেরা ফজলুলকে নিজেদের গণ্ডীর মধ্যে টেনে আনবার জন্য পথ পরিষ্কার করে কেবল ক্ষান্ত হননি, যাতে ফজলুল নিজের অতীত ধুয়ে মুছে ফেলে দেন তারও ব্যবস্থা করেছিলেন।

তবুও বিশেষ অবস্থান্তর ঘটতনা যদি সেদিন কংগ্রেস পলিটিক্স হয় আদর্শ ছুঁয়ে বসে থাকত বা বাইরের লক্ষণগুলো দেখে তাদের অচল ও মরচেপড়া পলিসিগুলো বদলাত।

কংগ্রেসের অচল পলিসিগুলো যে কি ছিল তার পরিচয় দিলেন জবাহরলাল নেহরু (১৯৩৫ সালে) কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হয়ে। লক্ষ্ণৌএ অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটিএর অধিবেশনে নেহরু বললেন: কম্যুনাল এ্যাওয়ার্ডে আমি বিশেষ উদ্বেগ বোধ করিনা—I cannot get excited over the Communal Award. উদ্বিগ্ন নেহরু কিন্তু পরিণামে হয়েছিলেন। তখন দেশ ভাগাভাগি সমস্যা এসে পড়েছে। নেহরু সেদিন এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন যে দেশ বিভাগ ছাড়া আর কোন প্রস্তাব এমন কি বিচার করতেও রাজী হননি।

আজ বাঙালী হিন্দু-মুসলমান কম্যুনাল এ্যাওয়ার্ড যে কি বস্তু এবং এর কি পরিণাম, দেশ-বিভাগ যে কি মধুময় তা' হয়ত বুঝেছেন এবং ভবিষ্যতে হয়ত আরও বুঝবেন। আজ কেবল একটা প্রশ্নই জিজ্ঞাস্য কম্যুনাল এ্যাওয়ার্ড এবং তার স্বাভাবিক পরিণতি দেশ-বিভাগ ছাড়া কি গত্যন্তর একেবারেই ছিল না?

বিষয়টির সকল সম্ভাব্যগুলো এখন পর্যন্ত আলোচনা শুরু হয়নি। এখানে সে আলোচনা অবান্তর হয়ে পড়বে, তবুও ইতিহাসের ইঙ্গিতগুলো ধরে রাখা যুক্তিসঙ্গত।

হিন্দু-মুসলমান সহযোগ বা অসহযোগ ভারতবর্ষের ইতিহাসে, বিশেষ করে উত্তর ভারতবর্ষের অঞ্চলগুলোতে সবচেয়ে বেশী দীর্ঘমাত্রা পেয়ে এসেছে ইংরেজ রাজত্ব শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে। প্রথম দিকটায় মুসলমানেরা ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করেছেন কিন্তু তার জন্য হিন্দুদের কোন সুবিধা হয়নি। পরবর্তীকালে বিশেষ করে বাঙলা দেশে হিন্দুরা ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করতে আরম্ভ করলেন। এক্ষেত্রে দেখা গেল হিন্দুদের দাবিয়ে রাখবার প্রচেষ্টা চলল মুসলমানকে সাহায্য করার নাম করে। মুসলমানেরা সত্যি সত্যি কতখানি উপকৃত হলেন হিন্দুদের দাবানো প্রচেষ্টায় সেটি বিবেচ্য বিষয় নয়, আসল লক্ষণীয় হ'ল ভেদনীতির ব্যবস্থা যা এক সম্প্রদায়ের স্বচেষ্টায় অর্জিত সুবিধাগুলো থেকে তাদের বঞ্চনা করা হল। হিন্দুদের তরফ থেকে প্রতিবাদ উঠল নানা ঠাঁটে এবং এর প্রধান রূপ পেল সংযুক্ত জাতীয়তার দাবির মধ্যে। কিন্তু যতই সে চেষ্টা প্রবলতর হতে চলল ততই শাসক পক্ষ মরিয়া হয়ে পড়ল সে জাতীয়তার বেদী ভেঙ্গে ফেলবার জন্য। প্রতিরক্ষা উদ্দেশ্যে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য, এমনকি যা পরের যুগে বলা হয়েছিল Muslim mass contact, সেই স্বদেশী যুগ থেকে তাও যেমন শুরু হয়েছে তেমনি সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামাও সেই একই যুগ থেকে রাজনীতির হাতিয়ার হয়ে দেখা দিয়েছে। সুয়োরানী দুয়োরানীর যুগ সেটি।

জাতীয়তার প্রশ্ন কেবল হিন্দুদের নাড়া-চাড়া দিল, মুসলমানকে কেন দিল না? এমন কি ননকোঅপারেসন আন্দোলন যখন এল জালিনওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে, তখন কেন সে প্রতিবাদ মুসলমান সমাজকে তেমনভাবে ধাক্কা দিল না যেমন দিল হিন্দু সমাজকে? কেন মুসলমান সমাজকে একটা অবাস্তব

"খেলাফত" ইস্যু যোগ করে আহ্বান করতে হয়েছিল তখন? কেন এই খেলাফতি আন্দোলনের সুযোগে যেসব মুসলমান জননেতারা কংগ্রেসী আওতায় এসে পড়লেন পরিণামে ঘোর কংগ্রেস-বিরোধী হয়ে পড়লেন? সত্যি সত্যি তাঁ'রা কি চেয়েছিলেন এবং কোন্ কারণে কংগ্রেসকে দুশমন বলে ঠাহর করলেন? যে জাতীয়তাবাদ ভারতবর্ষের মাটিতে গঠিত হ'ল তাতে কি কোন ভুল ভ্রান্তি করে ফেলা হয়েছিল—না তার ধারাই হ'ল ঐ ধরণের?

দুটো প্রতিনিধিমূলক মন্তব্য পাশাপাশি রাখলে বিষয়টি বোঝা অনেক সহজসাধ্য হতে পারে। জবাহরলাল নেহরু লক্ষ্ণৌ (১৯৩৫ সালে) অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে বলেছিলেন: কম্যুনাল এ্যাওয়ার্ড বা সাম্প্রদায়িক ভিত্তির ওপর রচিত প্যাক্টগুলো তাঁকে কোনদিনই মুগ্ধ করে নি। I have not been enamoured of the Congress policy over the Communal Award and its attempts to make pacts and compromises. (দেশ বিভাগ তবে কি?) Yet I think it was based on sound interest; first of all Congress put independence first and then other questions. It (Communal Award) arose and enabled the third party to exploit other two. In order to solve it, one had either to get rid of the third party and that meant independence or get rid of that set of circumstances which meant a friendly approach by the parties concerned and to soften the prejudices and fears. Thirdly the majority community must show generosity in the matter to allay the fears of the minority. এইটিই ছিল ও এখনও হয়ে আছে কংগ্রেসী নীতি সেই

১৯৩৫ সাল থেকে। কতদূর সার্থক হয়েছে সে নীতি তা' আজ বিচার্য।

অপরদিকে ঐ একটি বিষয়ের ওপরই আর একটি প্রতিনিধিমূলক মন্তব্য ইতিহাসের পাতায় ধরা পড়ে আছে। কম্যুনাল এ্যাওয়ার্ড ঘোষিত হবার পর নয়াদিল্লীতে সর্বভারতীয় হিন্দু-শিখ প্রভৃতির এক কনফারেন্স বসে সে এ্যাওয়ার্ডের প্রতিবাদার্থে। রবীন্দ্রনাথ তখন ঐ বিষয় বস্তুটির ওপর তাঁর মন্তব্য কনফারেন্সের কর্তা-ব্যক্তিদের কাছে পাঠিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ জানালেন: If something is sincerely believed to be wrong to yield on the point for the sake of compromise does not, in my opinion, make for a lasting peace. Concession to unjust demand and undue advantage whether personal or communal is equally a mistaken policy. It only whets one's aptitude and makes one clamour for more and in the end we are left just from where we started or the position becomes even worse. এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই বিলেতের রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সে গান্ধীজী এ্যাওয়ার্ডের বিরোধিতা করে বলেছিলেন কংগ্রেস গোল্লায় যেতে কবুল, তবুও এ্যাওয়ার্ড স্বীকার করবে না। পরিণামে গান্ধীজীকে সে ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেওয়া হয়নি। দেওয়া হলে ইতিহাস আজ হয়ত অন্য পথে চলত।

*　　　*　　　*　　　*

লক্ষ্ণৌ মুসলিম লীগের অধিবেশন যে অবস্থার সৃষ্টি করল তার কথঞ্চিৎ আভাষ ভারতবর্ষের ও বাঙলা দেশের ঘটনা সমাবেশের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। ফজলুলের "সাতানা" বক্তৃতা যেমন উৎফুল্ল করল মুসলিম লীগ মহলকে, তেমনি উত্তেজনায় ভরপুর করল হিন্দু সমাজকে। পলিটিসিয়ানদের বক্তৃতা, বিশেষ করে সে পলিটিসিয়ান যদি ফজলুলের মত কেউ হন, যাঁর রসনা ছিল

সর্বদাই আলগা, তা যে কেবল বুদ্‌বুদ্‌ মাত্র বা তার পশ্চাতে থাকে কেবল প্রতিপক্ষকে ভীতিপ্রদর্শনের চেষ্টা সে দৃষ্টান্ত অন্যে পরে কা কথা স্বয়ং চিত্তরঞ্জন দাশই পূর্বে রেখে গেছেন। ফজলুলের "সাতানা" বক্তৃতার কোনই তাৎপর্য ছিল না। যে প্রকার আলগা ভঙ্গীতে ফজলুল থানেশ্বর, পাণিপথ, মহম্মদ বিন কাশিমের কথা পাড়তেন কথায় কথায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখাজ্জীর কাছ থেকে খোঁচা খেতেন সে সব উক্তির জন্য, "সাতানা" বক্তৃতা ছিল ঠিক তেমনি ধরণের পলিটিক্যাল ধাপ্পা।

পলিটিসিয়ানেরা যে অনেক সময় ধাপ্পা দিয়ে প্রতিপক্ষকে নীরব করতে চান তার বড় উদাহরণ চিত্তরঞ্জন দাশই দিয়েছিলেন। স্বরাজ পার্টি গঠন করে এবং নির্বাচনে জয়যুক্ত হয়ে চিত্তরঞ্জন ইংরেজকে ভীতি প্রদর্শন করবার উদ্দেশ্যে দেশে যে গভীর সন্ত্রাসবাদের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে সে কথা বলে ইংরেজ যাতে সংযত হয় সেজন্য সাবধান করেছিলেন। ইংরেজ সে কথা শুনেছিল বলে মনে হয় না। কিন্তু চিত্তরঞ্জন দাশের মন্তব্য পেশ করবার পরই তাঁর শিষ্যদের মধ্যে বড় বড় চাঁইদের জেলে পুরে ফেলেছিল ইংরেজ কর্তৃপক্ষ। অনেকেই সেদিন চিত্তরঞ্জন দাশের সে উক্তির তীব্র সমালোচনা করেছিলেন।

"সাতানা" বক্তৃতা একই ধরণের ধাপ্পা হলেও লক্ষ্ণৌ-এর লীগ অধিবেশনে কিন্তু কোন প্রকারেই ধাপ্পাবাজী ছিল না। সে অধিবেশন যে কি বিরাট সম্ভাবনা-পূর্ণ ছিল সে বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞ ছিল বাঙলা দেশ এবং ভারতবর্ষ। এবং অজ্ঞ ছিল বলেই লক্ষ্ণৌ-এর লীগ-মঞ্চে উপবিষ্ট পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খান এবং তদপেক্ষাও বিরাট পুরুষ বাঙলার প্রধানমন্ত্রী আবুল কাসেম ফজলুল হককে কংগ্রেসী নেতৃত্ব লক্ষ করতে অসমর্থ হয়েছিলেন। এই অধিবেশনের (অক্টোবর ১৯৩৮) পর থেকেই মুসলিম লীগ পলিটিকস নতুন পথে চলতে শুরু

করল। মহম্মদ আলি জিন্নার মুখে নতুন ভাষ্য রূপ পেল। কংগ্রেস যে জাতির একমাত্র মুখপাত্র বলে এতকাল ঘোষিত হ'ত সে দাবি অস্বীকার করে জিন্না লীগের প্রতি-দাবি এনে ফেললেন।

... ...

উনিশ শ' উনচল্লিশ সাল-তামামি হতে কয়েকদিন তখন বাকি আছে (২০শে ডিসেম্বর) যখন নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় ফজলুল হকের মন্ত্রিসভা থেকে সরে পড়তে বাধ্য হন। তাঁর পদত্যাগ অপ্রত্যাশিত ছিল না। কোয়ালিশন পার্টির মেম্বরদের নানাপ্রকার অভিযোগ আনবার প্রচেষ্টা দেখে এটুকু বুঝতে পারা সম্ভবপর ছিল যে ক্যাবিনেটে তাঁদের মতামত গ্রাহ্য করবার বড় একটা প্রতিবন্ধক জুটেছে। সে বাধা তখন একজনই দিতে পারতেন তিনি ছিলেন নলিনী বাবু।

নলিনীরঞ্জন সরকার পদত্যাগ করলেন যে কারণটি দেখিয়ে তা' নিতান্তই ছেঁদো কথা। বিধানসভায় যুদ্ধ বিষয়ে এক প্রস্তাব মন্ত্রিসভা আনে, নলিনী সে প্রস্তাবে সায় দিতে পারেন নি! এটি কিন্তু পদত্যাগের আসল কারণ নয়। আসল কারণ তার ষ্টেটমেণ্টের মধ্যে ধরা পড়ে আছে। তা'তে নলিনী বাবু প্রথম কবুল করলেন যে গত ছ'মাস ধরে এমন সব ঘটনা ঘটেছে যাতে তাঁর মন্ত্রিত্ব করবার সাধ আর ছিল না। He entered the Cabinet inspired by an ideal that he could do some service to the country. He had also hoped that if Hindus and Muslims would join hands to work for the amelioration of the economic condition of the masses the communal emphasis on the political life might be generally toned down.

"I am glad to acknowledge that during the first year or so the Cabinet worked handsomely and was

inspired by a desire to bring about a real improvement in the condition of the masses. But since then and particularly during last six months or so a significant change has come over the outlook of the Cabinet as well as in the relations between the Cabinet and the party with the result that I have to abandon hopes.

In the political sphere a communal outlook has unfortunately been getting force in the country at large whose repercussions have also been felt in this province. Even in the administrative sphere the former feeling of comradeship no longer obtains. Further, the Cabinet has also gradually lost its leadership to the party.

There appears to be a feeling among some Muslim members of the Coalition Party that I have either held up or thwarted the progress of proposals made for the advancement of their community. Nothing could be further from truth.

There is one fact which my experience of two and half years has revealed. I have found that under prevailing condition there is no possibility of doing any real work unless there is homogenity."

নলিনী বাবুর পদত্যাগ একটা বেশ বড় ঘটনা এবং এর প্রতিক্রিয়া আসতে একটুও দেরী হয়নি। যাঁরা সে সময়ের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তাঁরাই জানতেন যে ৩৫ সালের শাসন ব্যবস্থায় বাঙলা দেশ কি রূপ নেবে সে সম্পর্কে সম্যক

ধ্যান ধারণা একমাত্র নলিনীবাবুরই ছিল। অন্য প্রধানেরা নিজেদের পেশা এবং গতানুগতিক রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। ইংরেজ যে নতুন শাসন ব্যবস্থায় কি সুদূরব্যাপী অদল বদল এনে ফেলেছে বাঙলা দেশ সম্পর্কে সে বিষয়ে তাঁরা বিশেষ খোঁজ খবর রাখতেন না। অপরপক্ষে নলিনীই এগিয়ে এসে কৃষক-প্রজা পার্টি গঠনে ফজলুল হককে বিশেষ সাহায্য করেন। তিনিই পরিণামে ফজলুল-নাজেমুদ্দিন মিতালি সম্পন্ন করেছিলেন এবং অর্থমন্ত্রী হিসেবে বাঙলাদেশের শাসন ব্যবস্থায় অনেক নতুনত্ব আমদানি করেছিলেন।

বসু ভাইদের সঙ্গে নলিনী বাবুর মতান্তর ও মনান্তর তখন বেশ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। সুভাষ বাবু পরিণামে নলিনীকে একেবারেই সহ্য করতে নারাজ ছিলেন। সুভাষের সহকর্মীরা বরাবর তাঁকে উপদেশচ্ছলে বলতেন: নলিনী ভূত হতে পারে, কিন্তু চিত্তরঞ্জন দাশ সেই ভূতের সাহায্যেই অঘটন ঘটাতে পারতেন। ভূতকে কাজে না লাগালে সে ডাল ভাঙবেই। সে কথা কিন্তু তাঁরা আদৌ শুনতে রাজী হলেন না। ভূত পুরানো হিন্দুস্থান বিল্ডিং-এর ইম্পিরিয়াল রেষ্টুরেণ্টে বসে আগামী কালের ইতিহাস রচনা করে ফেললেন ফজলুল-নাজেমুদ্দিনের মিলন মারফৎ। "বোসেরা পিঁপড়ের মত আমাকে টিপে মেরে ফেলতে চায়, আমি মরব না"—নলিনী বলেছিলেন সেদিন।

এহেন নলিনীরঞ্জন সরকার যখন অবস্থার চাপে পড়ে পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন তখন চল্লিশ সাল এসে গেছে বাঙলায়। পটভূমিকা দ্রুত পরিবর্তিত হতে আরম্ভ করেছে। প্রতিক্রিয়ায় সবচেয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন ফজলুল হক নিজে। ক্যাবিনেটে তাঁর পক্ষে ওকালতি করবার মত লোক, নৌসের ও নলিনী চলে যাবার পর, আর কেউ থাকল না। সুরাবর্দ্দী অর্থমন্ত্রী হলেন।

ফজলুলের আবার টনক নড়তে লাগল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত লক্ষ

করে। প্রকাশ্যে বলতে শুরু করলেন, সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধান করা আশু কর্তব্য। ১৫ জন হিন্দু এবং ১৫ জন মুসলমান নিয়ে কনফারেন্সও ডাকলেন। প্রদেশসমূহে কোয়ালিসন মন্ত্রিসভা গঠন করা একান্তভাবে প্রয়োজন, সে কথাও ফজলুল হক প্রকাশ্যে বলতে শুরু করলেন। তার দেখাদেখি পাঞ্জাবে স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খানও সে মত সমর্থন করলেন। স্বনামধন্য ব্যারিষ্টার বি, সি, চ্যাটার্জী তখন হিন্দু মহাসভার ভাইস প্রেসিডেন্ট। তাঁর সঙ্গে একমত হয়ে ফজলুল বাঙলা দেশের হিন্দু মুসলমান প্রতিনিধি নিয়ে রাউণ্ড টেবল কনফারেন্স্ ডাকতে চাইলেন। (issued a joint statement urging the immediate necessity of a round table conference of Hindus and Musalmans of Bengal)

নয়াদিল্লীতে ফজলুল বললেন, (৪ঠা ফেব্রুয়ারী) "in the interest of the country the present deadlock must be solved. The Coalition Government in the provinces is the solution." স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খান ও ফজলুল হক এসময় গান্ধীজী ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সঙ্গেও আলাপ আলোচনা করেছিলেন। পরিণামে অবশ্য কায়েদে আজম জিন্নার লিখিত সম্মতি ছাড়া এ প্রকার আলাপ আলোচনা চালাতে উভয়কেই নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিল। সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

কিন্তু কেন এই দুই প্রধানমন্ত্রী এরূপভাবে কংগ্রেসী নেতাদের সঙ্গে গোপনে ও জিন্নার সমর্থন না পেয়ে আলাপ আলোচনা করবার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন সেই ৪০ সালের গোড়ায় ? অথচ এই বৎসরেই (মার্চ মাসে) লাহোর অধিবেশনে লীগ পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং ফজলুল হক সে প্রস্তাব পেশ করেন ! বাঙলায় লীগ-প্রজা পার্টির কোয়ালিসন সরকার ৩৭ সালে গঠন করে এবং প্রধান-

মন্ত্রী হয়ে ফজলুল ৪০ সাল পর্যন্ত লীগকেই সর্বপ্রকারে সহায়তা করে এসেছেন। কংগ্রেস ও কংগ্রেসী নেতৃত্বকে সুযোগ পেলেই যথারীতি ঠাট্টা বিদ্রুপ করতে বিরত হননি। কংগ্রেসী প্রদেশসমূহে মুসলমান-দের প্রতি অত্যাচার করা হচ্ছে এই অজুহাতে লক্ষ্ণৌতে "সাতানা" বা প্রতিশোধ নেবার হুমকি দিয়ে সারা ভারতবর্ষকে নাড়াচাড়া দিলেন যে ফজলুল হক তিনি ৪০ সালে কংগ্রেসের সঙ্গে আপোষ, প্রদেশসমূহে কোয়ালিশন সরকার গঠন প্রভৃতি লীগ বিরোধী মতামত দিতে গেলেন কেন? এমন কি লাহোরে পাকিস্তান প্রস্তাব পেশ করবার সময়ও যে যুক্তিজাল অবতারণা করলেন তা' এত জ'লো যে ফজলুলের পূর্বেকার বক্তৃতার সঙ্গে এর কোনই মিল দেখতে পাওয়া যায় না।

ফজলুলের চিন্তাধারায় যে বিরাট পরিবর্তন তখন এসে গেছে তা' অতি সহজেই ধরা পড়ে। তাঁর জ'লো বক্তৃতা উত্তপ্ত করতে কায়েদে আজমকে অনেক কাটখড় পোড়াতে হয়েছিল। ফজলুলের এই পরিবর্তন অনুধাবন করতে হলে সে সময়ের বাঙলা দেশের পলিটিক্স, নৌসের-নলিনীর পদত্যাগ, সুরাবর্দ্দী-সাহবুদ্দীন-ইস্পাহানীর প্রতিপত্তি লাভ এবং বাঙালী হিন্দুদত্ত প্রতিবন্ধকের দৃঢ়তা এবং সর্বোপরি লীগ কোথায় বাঙলা দেশকে নিয়ে চলেছে সে বিষয়ে ফজলুলের সন্দেহ—এ সব কারণগুলো মিলিয়ে দেখতে হয়। পূর্বেই বলেছি, ফজলুল ছিলেন সেকেলে বাঙালী রাজনীতিজ্ঞদের শেষ প্রতিনিধি, মূলতঃ বাঙালী মুসলমান সম্প্রদায়কে ও চাষীকে বাঙালী হিন্দু সম্প্রদায়ের মত উন্নত করা তাঁর কাম্য ছিল। তিনি সর্বভারতীয় লীগ পলিটিকসে যোগদান করলেও তাঁর দৃষ্টি সীমিত ছিল বাঙলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে।

যখন তিনি দেখলেন সেই সর্বভারতীয় পলিটিক্যাল আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে অ-বাঙালীরা বাঙলাকে হাতিয়ার করে অন্যান্য প্রদেশে তাঁদের প্রতিপত্তি বাড়াতে ব্যস্ত, বাঙলাদেশ গোল্লায় গেলেও তাঁদের

কিছু যায় আসে না, তখন থেকেই আবুল কাশেম ফজলুল হকের চোখ খুলেছিল। তিনি রাস ক'ষে টানতে চেষ্টা করেছিলেন।

প্রায় একই কার্যকারণ হেতু স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খাঁনও লীগ পলিটিকসে এসে পড়েছিলেন পয়ত্রিশ সালের শাসন-ব্যবস্থা চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে। যেমন বাঙলায় তেমনি পাঞ্জাবেও সেই ব্যবস্থানুযায়ী নির্বাচনের পূর্বে জিন্না লীগের তরফ থেকে নির্বাচন চালানর জন্য পাঞ্জাবে মিয়ান ফজলী হোসেনের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছিলেন কিন্তু বিশেষ সুবিধে করতে পারেন নি। ফজলী হোসেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খাঁন লীগকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সহায়তা করতে রাজী ছিলেন কিন্তু পাঞ্জাবে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা চালাতে তাঁরা যে ইউনিয়নিষ্ট পার্টি গঠন করেছিলেন তা' ক্ষুণ্ণ করতে একটুও সম্মত হন নি।

জিন্না পাঞ্জাবী মুসলিম নেতাদের মতামত অগ্রাহ্য করে লীগ মনোনীত প্রার্থী নির্বাচনে দাঁড় করিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যে সাফল্যলাভ করেন তা' হ'ল অকিঞ্চিৎকর। সারা পাঞ্জাবে তিনটির বেশী লীগ-মনোনীত প্রার্থী জয়লাভ করতে পারে নি। বাঙলার লীগনেতা, স্যার নাজেমুদ্দিনের ও পাঞ্জাবে লীগ প্রার্থীদের শোচনীয় পরাজয় ঘটল বলে জিন্না সাময়িকভাবে নিজেকে দুর্বল মনে করেছিলেন। জিন্নার সেই সাময়িক হৃদয় দৌর্বল্য থেকে মুক্তি এসেছিল যেদিন আবুল কাশেম ফজলুল হক এবং স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খাঁন লীগ অধিবেশনে যোগদান করলেন লক্ষ্ণৌতে।

জিন্নার অগ্রগতি আরম্ভ হয়েছিল সেদিন থেকেই। কিন্তু শীঘ্রই ফজলুল ও সেকেন্দার উভয়েই বুঝতে পারলেন প্রদেশের স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করে কেবল ভারতীয় পলিটিকসে দাবার বড়ের মত তাঁদের ব্যবহার করা হচ্ছে। দুই প্রধানমন্ত্রীই রাস টানবার চেষ্টা করলেন।

লাহোরে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হলে সব কিছু ওলটপালট হয়ে গেল। সিন্ধু দেশের প্রধানমন্ত্রী, খাঁ বাহাদুর আল্লা বক্সকে জিন্না কিছুতেই বাগে আনতে পারলেন না। লাহোর অধিবেশনের পর আল্লা বক্স সেই ওলোটপালটের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে বললেন :

What credentials beyond public meetings the League presents to be recognised as the representative of the Muslims ? The only way to test its representative character would be to send the League to the polls on the specific issue of the policy it has declared at Lahore. For whatever may have been its support in the provinces where the Muslims are in majority, it has definitely injured it beyond repair by suddenly throwing the minority Muslims overboard and pronouncing a wholly impractical scheme of creating a Sovereign State of some crores of Punjabees, Sindhis, Pathans and Beluchi Muslims in the north-west and another of about two and half crores of Assamese and Bengali Muslims in the the north-east separated by over one thousand miles. If the Muslim minorities in Hindu majority provinces are to wait for the protection of their rights till these independent and Sovereign States of the Punjab and Bengal come into existence, they will have to wait till the Greek calender. আল্লা বক্স যে কারণগুলো দেখালেন ঠিক তার উল্টো কারণগুলো ফজলুল হককে দ্বিধাগ্রস্ত করে ফেলেছিল।

কিন্তু দুই প্রধানমন্ত্রী, ফজলুল হক ও সেকেন্দার, রাস টানলেও

তখন লীগের রথচক্র অজানা সম্ভাবনা নিয়ে অগ্রগামী। কেউ বুঝতে পারুক বা না পারুক সে রথচক্রের গতি রোধ করা তখন এমন কি প্রধান রথী, কায়েদে আজমের পক্ষেও অসাধ্য। ফজলুল হকের "সাতানা" বক্তৃতার নকল করে মন্ত্রিত্বের পদাভিলাসী স্যার আবদুল্লা হারুণ সর্বভারতীয় হিন্দুদের সাবধান করে ঘোষণা করলেন যে মুসলমানদের প্রতি অত্যাচার করলে মুসলিম-গরিষ্ঠ প্রদেশে হিন্দুদের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া হবে। পাঞ্জাবে ডাঃ আলম যিনি এতদিন ধরে কংগ্রেসী পলিটিকসে যুক্ত ছিলেন পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

ঠিক এই সময়ে ভাইসরয় কর্তৃক জাতীয় প্রতিরক্ষা কাউনসিল (National Defence Council) বসানর প্রস্তাব দেশের সামনে এসে পড়ে। পাঞ্জাব ও বাঙলা দেশের উভয় প্রধানমন্ত্রীকে সে কমিটিতে যোগদান করতে তিনি অনুরোধ করলেন এবং উভয়েই তা'তে সম্মত হলেন। জিন্না সে সংবাদ পেয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে উভয়কেই তলব করে প্রশ্ন করলেনঃ কেন তাঁর সম্মতি না নিয়ে তাঁরা কমিটিতে যোগদান করতে রাজী হলেন ?

ইতিমধ্যে ফজলুল হক যেমন গান্ধীজীকে তেমনি কায়েদে আজমকে সাম্প্রদায়িক সমস্যার একটা মিটমাট করবার জন্য প্রকাশ্যে অনুরোধ করে ফেললেন। একচল্লিশ সালের জানুয়ারী মাসে (তখন ডিফেন্স কাউনসিলে যোগদান করার দরুণ ফজলুলকে কায়েদে আজমের কাছে জবাবদিহি করতে হচ্ছে) ফজলুল জিন্নাকে জানালেনঃ

S. me day or other communal differences will be made up but I do not see any reason why the Muslim League should not take the wind out of the sail of other organisations and secure for itself the credit of having done the greatest possible service

to India and her people. হায় ফজলুল! এ সমস্যা ইংরেজ বণিক নিরসনের জন্য সৃষ্টি করেনি। এতে উত্তরোত্তর ঘৃতাহুতিই দেবার সময় এসে পড়েছে তখন।

চারিদিকে আগুণ জ্বলে উঠল। ঢাকা-কুমিল্লার মানুষ পালাতে শুরু করল ত্রিপুরায়; কলকাতার রাজাবাজারে ফজলুল তো দূরের কথা, এমন কি নাজেমুদ্দিনও নাজেহাল হলেন; বোম্বাইতে জিন্না প্রকাশ্যে তেজবাহাদুর সপ্রুকে তেড়ে গালাগালি শুরু করলেন; আমেদাবাদ, বোম্বাই, বেহার-শরিফে দাঙ্গাহাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়ল; "আজাদ" এবং বাঙলার অন্যান্য কাগজগুলো যতপ্রকারে সম্ভব সে আগুনের ইন্ধন যোগান দিল। পাকিস্তান দাবি অটুট হয়ে পড়তে থাকল।

একচল্লিশ সালের এপ্রিল মাসে মাদ্রাজে লীগ অধিবেশন বসলে জিন্না প্রকাশ্যে তিন প্রধানমন্ত্রীর (সেকেন্দার, সা'দুল্লা ও ফজলুল হক) কাছ থেকে জবাব চাইলেন কেন তাঁরা তাঁর বিনানুমতিতে ভাইসরয়ের প্রতিরক্ষা কমিটিতে যোগদান করতে রাজী হলেন? লীগের ওয়ার্কিং কমিটি তিনজনকেই পদত্যাগ করতে উপদেশ দিলেন। সেকেন্দার ও সাদুল্লা তখনই সে প্রস্তাবানুযায়ী পদত্যাগ করেও ফেললেন।

কিন্তু ফজলুল হক রাজী হন নি। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হ'ল যে, তিনি গোপনে ভাইসরয়ের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে তবে ওয়ার কাউনসিলে আসন যোগাড় করেছেন। উত্তরে ফজলুল সে অভিযোগ অস্বীকার করে (২৫শে জুলাই ১৯৪১ সাল) জানালেন: I emphatically deny that I entered into any negotiation with the Viceroy or that I was tempted in any way to accept nomination on the War Council. I was offered a seat and I accepted it beacause I felt that in doing so I did nothing in violation of the policy of the League

or detrimental to the interests of the Muslim community.

তাঁর কথা গ্রাহ্য হ'ল না। কায়েদে আজম ফজলুল সমেত প্রতিরক্ষা কাউনসিলের অন্যান্য মুসলমান সদস্যদের, যথা স্যার সুলতান আহমদ ও ছত্রির নবাবকে তখুনি পদত্যাগ করতে হুকুম করলেন। ভয় পেয়ে ছত্রির নবাবও পদত্যাগ করলেন।

ফজলুল জিন্নার কাণ্ডকারখানা দেখে এক কড়া চিঠি লিখলেন (১০ই সেপ্টেম্বর) লীগ সেক্রেটারী লিয়াকত আলির কাছে।

ফজলুল হক লিখিত সেই অভিযোগ পত্র সবদিক দিয়ে ঐতিহাসিক। তিনি ছ'দফা অভিযোগ এনেছিলেন। আজ উভয়েই পরলোকে। সেজন্য ফজলুলের অভিযোগ কতদূর সত্য বা অসত্য তা' নিখুঁতভাবে বিচার করা সম্ভব। ফজলুল লিখেছেন (১) The Working Committee of the League endorse the action of the President (Jinnah) because they have no other alternative (2) It would amount to no-confidence if they did otherwise (3) But before I conclude I wish to record a most emphatic protest against the manner in which Muslim interests in Bengal and of the Panjab are being imperilled by Muslim Leaguers of the Muslim minority provinces in India. (আল্লা বক্স ঠিক উল্টো দিক থেকে এ সমস্যাটি দেখেছিলেন।) (4) As a mark of protest against the arbitrary use of power vested in its President I beg to tender my resignation from membership of the W. C. and of the League. Much as I deplore this course I feel that I cannot usefully continue to be a member of a body which shows scant courtesy to provincial

leaders and which abrogates to itself the functions which ought to be exercised by Provincial executives. (5) The President (Jinnah) has singularly failed to discharge the heavy responsibility of his office in a constitutional and reasonable manner (6) Recent events have forcibly brought home to me that the interests of Muslim India are being subordinated to the wishes of a single individual who seeks to rule as omnipotent over the destiny of 30 millions of Muslims in the Province of Bengal, who occupy the key position in Muslim India. ফজলুলের শেষ অভিযোগ রকম-ফের হলেও জীবন্ত হয়ে আছে।

লীগ থেকে পদত্যাগ করে ফজলুল একটি প্রেস ষ্টেটমেণ্ট (১২ই সেপ্টেম্বর) মারফত যে দীর্ঘমাত্রা দিয়ে বক্তব্য বলেছিলেন তাতে তাঁর বাঙালী বৈশিষ্ঠ্য প্রতিটি কথার মধ্যে ধরা পড়ে আছে। The genius of the Bengali race revolts against autocracy and I could not, therefore, help protesting against the autocracy of a single individual when I discussed the political situation in my letter to the Secretary of the Muslim League. এই বাঙালীত্ব বোধ সেদিন একমাত্র ফজলুল হকই মনে প্রাণে ধরতে এবং বুঝতে পারতেন, কারণ তিনি মানুষ হয়েছিলেন এমন এক সময় যখন বাঙালীরা স্বীয় প্রতিভায় ভারতবর্ষের একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন।

পরের যুগে ইস্পাহানী-সাহবুদ্দীন এবং খোদ বাঙালী হলেও সুরাবর্দ্দীর দাপটে সে জাত্যভিমানের দাবি ম্লান হয়ে পড়েছিল সাধারণ বাঙালী মুসলমানের কাছে। এর পুনঃ-প্রতিষ্ঠা হ'ল

যেদিন মাতৃভাষার দাবি গ্রাহ্য করাতে বুড়িগঙ্গার জল বাঙালীর রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল।

ফজলুল যে সেদিন বাঙালীত্বের কথা পেড়েছিলেন তা' ছিল তাঁর অন্তরের কথা। এর পশ্চাতে কোন পলিটিক্যাল অভিসন্ধিই ছিল না। এই বাঙালী হবার গৌরবের কথা ফজলুলের মুখে আরও জোরাল হয়ে পড়েছিল পরের অধ্যায়ে এবং দেশ বিভাগের পূর্ব মুহূর্তে।

প্রসঙ্গে ফিরবার পূর্বে ফজলুল হকের সঙ্গে সেকেন্দার হায়াৎ খাঁনের তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। স্যার সেকেন্দার নিশ্চয়ই বড় মুসলমান নেতা ছিলেন। তিনি যখন পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এসে গেছে। সে যুদ্ধে ভারতবর্ষের প্রদেশ-সমূহের মধ্যে সবচেয়ে লাভবান হয়ে পড়েছিল পাঞ্জাব। এহেন প্রদেশের সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করতে হ'ত স্যার সেকেন্দারকে। লীগের সমর্থক হয়েছিলেন সেকেন্দার এই সর্তে যে কায়েদে আজম পাঞ্জাবের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনই হস্তক্ষেপ করবেন না। যুদ্ধ চালনার কাজে কোন বাধাই সেকেন্দার সহ্য করতেন না। ১৯৪০ সালে গান্ধীজী পাঞ্জাবে সৈন্য সংগ্রহের (recruit ment) ওপর মন্তব্য করে বলেছিলেন যে পাঞ্জাবী সৈন্যরা "কেনা গোলাম" (mercenary soldiers.) সেকেন্দার প্রতিবাদ করে বললেন (Nov. 1. 1940) The Mahatma's campaign amounted not only to stabbing Britain in the back but also a betrayal of the best interest of India and Islamic world." অনুরূপ আর একটি ষ্টেটমেণ্টে সেকেন্দার দাবি করলেন that Gandhi withdraws his remark in the Harijan that the Panjab is the recruiting ground of mercenary soldiers. চৌধুরী খলিকুজ্জমান লিখেছেন যে একবার কথাপ্রসঙ্গে তিনি সেকেন্দারকে বলেছিলেন

যে যুদ্ধকালে ইংরেজ ইরাণের ওপর জবরদখল করে বসেছিল। শুনে সেকেন্দার কেবল প্রতিবাদ করেননি, রেগে আগুন হয়ে গিয়েছিলেন।

সেকেন্দারের মুসলমান প্রতিনিধিত্বের দাবি তাঁর ইংরেজ-আনুগত্যের দাবির অনেক নীচে স্থান পেত। যুদ্ধকালে তাঁর প্রতিটি কাজকর্মের উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা। খাকসার দল পাঞ্জাবের সহরে সহরে উৎপাত করতে শুরু করলে তা'রা মুসলমান হলে কি আসে যায়, সেকেন্দার চার্চিলের মতন পাঞ্জাবের বিধানসভার গোপন বৈঠক ডাকলেন। এ উৎপাত মুসলমান-খাকসারদের দ্বারা ঘটলেও তাঁর চোখে হয়ে পড়ল নাজী-জার্মেনীর অনুচরদের কাজ। সৈন্যদের হুকুম দিলেন খাকসারদের উৎখাত করতে। ১০।১২ গণ্ডা খাকসার বন্দুকের গুলিতে মরল। মসজিদের মধ্যে আশ্রয় নিয়েও পলাতক খাকসারেরা পরিত্রাণ পায়নি সেকেন্দারের হাতে। মসজিদের মধ্যেও গুলি চালাতে সেকেন্দার পেছপাও হননি।

বাঙলার বিধান সভার সদস্যেরা লাহোরে মুসলিম লীগ অধিবেশনে উপস্থিত হয়ে খাকসার-রক্তে রঞ্জিত মসজিদ বেদী দেখে নির্বাক হয়ে পড়েছিলেন এবং ফিরে এসে পাঞ্জাবী ধরণ ধারণের কথা অকপটে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছিলেন।

সেকেন্দারের কাছে ইংরেজ রাজত্ব ছিল "অজর, অমর" এবং মুসলিম লীগ ও কায়েদে আজম সেকেন্দারের সেই ধারণা সমর্থন করেছিলেন বলেই তাঁর কাছে পাত্তা পেয়েছিলেন। খাকসারেরা মার খেয়ে কায়েদে আজম মহম্মদ আলি জিন্নার কাছে নালিশ করেছিল। কিন্তু কনষ্টিটিউসনাল কায়েদ যিনি কংগ্রেস শাসিত প্রদেশে মুসলমানদের প্রতি অত্যাচার করে হচ্ছে বলে ভারতবর্ষের আকাশ চীৎকারে ফাটিয়েছিলেন তিনি খাকসারদের প্রতি এমন কি সমবেদনাও জানাননি সেদিন। এহেন বাঘা সেকেন্দার—সা'দুল্লার

কথা না উত্থাপন করাই ভাল—প্রথম দিকে জিন্নার উদ্দেশ্যে বড় বড় কথা শুনালেও (We will not brook any interference from whatever quarters it may be attempted) কায়েদের কাছে ধমকানি খেয়ে তোবা তোবা করে ভাইসরয়ের কাউনসিলে যোগদান করতে রাজী হয়েও, আবার পদত্যাগ করে ফেললেন।

কিন্তু বাঙালী ফজলুল হক! বাঙালী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিশেষ আলোচনা হয়নি। ইংরেজের পলিটিক্যাল সংস্কার নিয়ে লেখা কেতাবগুলো নাড়াচাড়া করে আমরা পাঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী, রাজপুত, বাঙালী চরিত্র আলোচনা করি মাত্র, অনুধাবন বা বিচার করি না। কেন বাঙলাদেশে নীলকর বিদ্রোহ গড়ে উঠল, অন্য স্থানে উঠল না? কেন স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন বাঙলাদেশকে তোলপাড় করে ফেল্‌ল অন্য প্রদেশে এলনা? কেন সন্ত্রাসবাদ বাঙলা দেশে বাসা বাঁধল অন্য প্রদেশে পাত্তা পেলনা? কেন বাঙালী রক্তে মাতৃভাষার দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে হ'ল, অন্য প্রদেশে তা' হল না? এ সব "কেন"র পেছনে কি জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে?

পরিণামে সেকেন্দারকেও লীগ ওয়াকিং কমিটি থেকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। কায়েদে আজম চৌধুরী খলিকুজ্জমানকে উপদেশ দিয়েছিলেন সেকেন্দারের সঙ্গে দেখা করতে এবং অনুরোধ করতে যাতে তিনি পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করেন। চৌধুরী সাহেব সেকেন্দারের কাছে গিয়েওছিলেন কিন্তু উত্তরে শুনলেন তাঁর অভিযোগগুলো: When I asked Sir Sikandar he detailed a long list of grievances against the Muslim League, some of which I have already mentioned.

এপ্রিল ১৯৪১ সালে মাদ্রাজের লীগ অধিবেশনে ফজলুল হককে সংযত করবার ব্যবস্থা গ্রহণ করবার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারা

গিয়েছিল বাঙলা দেশ নিয়ে এবার খেল খেলা শুরু হবে। এই অধিবেশনেই প্রদেশে প্রদেশে মুসলিম ন্যাশন্যাল গার্ড গড়ে তোলবার ব্যবস্থা করা হ'ল। ফজলুল তখনও প্রধানমন্ত্রী। নোয়াখালি অঞ্চল সমুদ্র উচ্ছ্বাসে বিধ্বস্ত হলে কায়েদে আজম সমবেদনা সূচক বাণী পাঠালেন—ফজলুল হকের কাছে নয়—হুসেন সৈয়দ সুরাবর্দ্দীর কাছে। ইঙ্গিত ধরতে দেরী হ ল না। প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি স্বনামধন্য বাঙালী মুসলমান, মৌলানা আক্রাম খাঁর নেতৃত্বে প্রস্তাব গৃহীত হ'ল যে, কায়েদে আজম ভাইসরয়ের প্রতিরক্ষা কাউনসিলে লীগের প্রতিনিধিদের যোগদান করতে নিষেধ করে ভালই করেছেন, কারণঃ The Muslim League was not ready to join a Defence Council in which Muslims were to be in minority and thus commit national suicide by practically recognising and establishing in fact the principle of majority rule at the centre. (12th Aug. 1941)

লীগ পলিটিক্যাল সার্কেলে যতটুকু বাদ বিসম্বাদ দেখা গেল ফজলুল-জিন্না ঝগড়ার মধ্য দিয়ে, তার চেয়ে ঢের বেশী গুরুতর অবস্থা এসে পড়ল বাঙলা দেশের বিধান সভার অভ্যন্তরে।

নলিনীরঞ্জন সরকার ক্যাবিনেট থেকে পদত্যাগ করলে ফজলুল হকের অবস্থা কেমন হয়ে পড়েছিল তা' ধরা পড়ল এই বাদ বিসম্বাদের সময়। ফজলুল-বিরোধী নাজেমুদ্দিন—এঁকেই পলিটিকসে পুনঃপ্রতিষ্ঠা ফজলুল করেছিলেন নলিনী সরকারের অনুরোধে—সুরাবর্দ্দী ও তমিজুদ্দীন খাঁ যুক্ত ষ্টেটমেণ্টের সাহায্যে সে গোপন ইতিহাস খানিকটা প্রকাশ করেছিলেন।

মাদ্রাজ অধিবেশনের পরই এঁরা ফজলুল হকের ওপর চাপ দিলেন যাতে তিনি কয়েদে আজমের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে যে অপরাধ করেছেন তা স্বীকার করে নেন। ফজলুল রাজী না হওয়াতে,

বাঙলার ক্যাবিনেট থেকে ফজলুলকে তাড়ানর জন্য তাঁরা উঠে পড়ে লাগলেন। সে চেষ্টা করতে গিয়ে কিন্তু নিজেরাই বিপন্ন হয়ে পড়েছিলেন। যুক্ত ষ্টেটমেণ্টে এঁরা বললেন "All are aware that Fazlul Huq had been off and on during last two years, if not longer, in secret consultation with Sarat Bose and certain Hindu members for the formation of an alternative Ministry. We did not pay much attention to that in the interest of the Muslims and in the belief that Bengal Muslims desired that we worked together as humanly possible. Matters however come to a crisis when Fazlul Huq wrote a letter to the Secretary of the All-India Muslim League casting aspersion against Mr. Jinnah and attepting to create a serious division in Muslim ranks by raising the Bengali and non-Bengali question in relation to All-India politics and threatening to disassociate Muslims of Bengal from the All-India Muslim League. He invited some members of Bengal Legislative Assembly of the Coalition Party to his house to bring a motion of no-confidence against one of us, (তিনি হলেন সুরাবর্দ্দী) as the Secretary of the Bengal Provincial Muslim League had the temerity to uphold the honour and prestige of the League.

ফজলুল হক যে বাঙালী ও অবাঙালীদের প্রশ্ন লীগ পলিটিকসে এনে ফেলেছেন তাই হল এঁদের চোখে তাঁর সবচেয়ে বড় অপরাধ। পরিণামে পাকিস্তান কায়েম হবার পর কিন্তু ঐ একটা প্রশ্নের

সহায়তায় এঁরা—বিশেষ করে সুরাবর্দী, পশ্চিমাদের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াতে পেরেছিলেন, নতুবা দরিয়ার অতল জলে এদের প্রত্যেকটির পলিটিক্যাল সমাধি হত।

ফজলুল হক উত্তরে জানলেন : I had no other option but to tender the resignation of both myself and of the Cabinet, but the reasons assigned by the signatories are entirely a travesty of truth. The position created by the signatories of the statement in combination with one or two erstwhile colleagues was such that no self-respecting Premier could continue in office any longer than I did.

লাট সাহেব হক ক্যাবিনেটের পদত্যাগ গ্রহণ করলেন ৭ই অক্টোবর ১৯৪১ সালে। জিন্নাকে শেষ তারযোগে ফজলুল যে মন্তব্য করেছিলেন তাও আজ ঐতিহাসিক। Interested persons are invoking the League for personal reasons. Request you as President to judge the situation impartially and postpone action until I have been given a full hearing.

কে কার কথা শোনে সে মুহূর্তে! বিলম্ব না করেই জিন্না প্রত্যুত্তরে জানালেন : you have defied the provincial League and its decision of which you happen to be the President without reference to the Working Committee of the All-India Muslim League or me. You have formed a coalition. It is not open to individual member of the League to form a clique or coalition without the approval of the Working Committee of the All-India Muslim League.

১১ই অক্টোবর তারিখে ফজলুল হক ঢাকার নবাব এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে নিয়ে নতুন ক্যাবিনেট গঠন করলেন এবং ঐ দিনেই বোম্বাই থেকে জিন্না ফজলুল হক, বেগম শানওয়াজ এবং আরও কয়েকজনের নাম লীগের খাতা থেকে কেটে দিলেন। মজার কথা যে এদের নাম খারিজ করলেও কায়েদে আজম ভাইসরয়ের কাউনসিলের নতুন মেম্বর স্যার আকবর হায়দারি ও স্যার ফিরোজ খাঁ নূন সম্পর্কে উচ্চ্য-বাচ্য কিছুই করেন নি।

ওপরে যে বিরাট পরিবর্তনের কথা বলা হ'ল তা' সম্পূর্ণভাবে ধরা অসম্ভব হবে যদি না পটভূমির পশ্চাতের ঘটনাগুলো সামনে না সাজান থাকে। ফজলুল হকের সঙ্গে মনান্তর হবার পরই কায়েদে আজম নিশ্চিতভাবে বুঝতে পেরেছিলেন বাঙলাদেশে লীগের প্রতিপত্তি অটুট রাখতে হলে সুরাবর্দ্দীকে সমর্থন করতে হবে এবং তিনি সেদিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। সুরাবর্দ্দীও দেখলেন এতকাল ধৈর্য ধরে থাকবার পর তাঁর সুসময় এসেছে। এর পূর্ণ সুযোগ না নিলে এতদিন ধরে—সেই চিত্তরঞ্জন দাশের সময় হতে—যেদিনের জন্য তিনি অপেক্ষা করে আসছেন তা বৃথাই যাবে। তিনি অযথা কালক্ষেপ না করে যাতে ফজলুল কৃত সংকটের নিরসন না হয় তার সব ব্যবস্থাই করে ফেললেন।

ইয়োরোপিয়ান গ্রুপ দেখলেন মুসলিম লীগে একবার ভাঙ্গন ধরলে তাঁদের প্রতিপত্তিও ম্লান হয়ে পড়বে। অপরদিকে সুরাবর্দ্দী 'বাদশাহ' হলে তাদেরও ভবিষ্যৎ অপরিচ্ছন্ন হয়ে পড়বে। এরা লীগের গোলমাল যাতে সহজে মিটে যায় তার জন্য স্যার নাজেমুদ্দিনের ওপর চাপ দিতে লাগল। স্যার নাজেমুদ্দিন নিজে দ্বিধাগ্রস্ত। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, লীগাধিপতি কায়েদে আজমের দৃষ্টি পড়েছে সুরাবর্দ্দীর ওপর অতএব তাঁকে চটালে আপন ভবিষ্যৎ অন্ধকারাছন্ন হয়ে পড়বে। সেজন্য সাহেবদের চাপ সত্ত্বেও তিনি এগুতে অনিচ্ছুক হলেন।

যখন বিধানসভার লীগের অন্দরমহলে এ সব ঘটনা চলেছে তখন কৃষক-প্রজা পার্টির তরফ থেকে সুরাবর্দ্দীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করা হ'ল। পরে সুরাবর্দ্দীর নামের সঙ্গে নাজেমুদ্দিন, তমিজুদ্দীন, বিজয়প্রসাদ সিংহরায়, মুকুন্দ মল্লিক প্রভৃতির নাম জুড়ে দেওয়া হয়।

অপরদিকে যেদিন ফজলুল হকের নাম লীগের খাতা থেকে জিন্না কেটে দিলেন সেদিনই শরৎচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে বিধানসভার হিন্দু ও মুসলমান সদস্য নিয়ে এক সভায় প্রগেসিভ কোয়ালিসন পার্টি গঠিত হয়। ফজলুল সে পার্টির নায়ক হলেন এবং ঘোষণা করলেন "that its formation was an augury not only for the cessation of communal strife but also for carrying out of a programme for the good of all sections of the people of the country." কংগ্রেস পার্টির নেতা, কিরণ শঙ্কর রায় জানালেন তাঁদের পার্টি এই নতুনকে সমর্থন করবে। এই অবস্থান্তর যদি সাঁয়ত্রিশের গোড়ায় হ'ত!

সুরাবর্দ্দী বুঝতে পারলেন ফজলুল হকের লক্ষ্ণৌতে 'সাতানা' বক্তৃতা এবং মুসলিম লঘিষ্ঠ প্রদেশে হিন্দুদের দ্বারা মুসলমানদের প্রতি অত্যাচার কাহিনীর যে অলীক অভিযোগ ফজলুলের মুখ দিয়ে এতদিন করা হয়েছে তা' সত্ত্বেও ফজলুল হিন্দু-মুসলমান বাঙালীর কাছে জনপ্রিয়ই হয়ে আছেন। কায়েদে আজমের সমর্থনে এবং অ-বাঙালী মুসলমানদের মুরুব্বী হয়েও এবং ইস্পাহানীর সাহায্যেও তাঁকে সরান তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভব। এ অবস্থায় বিধানসভাতে অনাস্থা প্রস্তাবের সম্মুখীন হলে নিজেদের ভবিষ্যৎ চিরকালের মত নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা। অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হলে এবং বিধানসভার "আস্থা" প্রকাশ্যে একবার হারালে ভবিষ্যতে লাট সাহেবের পক্ষেও তাঁদের মন্ত্রীপদ দেওয়া কঠিন হয়ে পড়তে পারে।

সুরাবর্দ্দীরা তখন অনাস্থা প্রস্তাব বানচাল করতে ঠিক

করলেন। সব মন্ত্রী, যাঁদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছিল, একযোগে পদত্যাগ পত্র দাখিল করে ফজলুলকে গোটা ক্যাবিনেটের পদত্যাগে বাধ্য করালেন। পয়লা ডিসেম্বর তারিখে ক্যাবিনেট পদত্যাগ করলে লাট সাহেব তা' গ্রহণ করলেন। তেসরা তারিখে নতুন পার্টি গঠিত হল ফজলুলের নেতৃত্বে।

শরৎ বসু নিজে ফজলুল হককে নতুন পার্টির নেতা করার প্রস্তাব এনেছিলেন, সামসুদ্দীন আহমদ সে প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, ঢাকার নবাব, নবাব মুসারফ হোসেন, খান বাহাতুর হাসেম আলি, হেম নস্কর এবং চিপেনডেন সে প্রস্তাবে সায় দিয়েছিলেন। নতুন পার্টিতে ১১৯ জন মেম্বর যোগদান করেছিলেন; শরৎ বসুর ২৮, কৃষক প্রজার ১৯, প্রগ্রেসিভ কোয়ালিসন ৪২, ইণ্ডিপেনডেন্ট সিডউলল্ড কাষ্ট-এর ১২, ন্যাশান্যালিস্টদের ১৪, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান তিনজন, শ্রমিক একজন।

মুসলিম লীগ পার্টিরও সভা বসল। এবার তাঁরা সরাসরি লীগ পার্টি বলে নিজেদের জাহির করলেন এবং অ-মুসলমানদের মধ্যে একমাত্র আধা-মোসলেম লীগাইট মুকুন্দবিহারী মল্লিক স-ভ্রাতা সে লীগ পার্টিতে যোগদান করেছিলেন। এদের সদস্য সংখ্যা হয়েছিল ৭২।

১১ই অক্টোবর ফজলুল হক নতুন ক্যাবিনেট গঠন করলেন ঢাকার নবাব ও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে নিয়ে। পরে সে ক্যাবিনেটে যোগদান করেছিলেন সন্তোষ বোস, আবতুল করিম, প্রমথ ব্যানার্জি হাসেম আলি, সামসুদ্দীন এবং উপেন্দ্র বর্মন।

যা' ঘটা উচিত ছিল ১৯৩৭ সালে তা' ঘটল ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে। ভারতবর্ষের ইতিহাস তখন বিদ্যুৎগতিতে পটপরিবর্তনে ব্যস্ত। বাঙলাদেশের ল্যাবরেটরিতে ক্ষুদ্রাকারে জন্মপ্রাপ্ত নবজাতক অখন মহীরাবণ, কে তার গতিরোধ করবে সেদিন? তবুও যে ক্ষীণ আশা করা গিয়েছিল এই নতুন পরিবর্তনের মধ্যে তাও নিমেষে নিঃশেষিত হয়ে গেল যখন, এই নতুন পার্টি যিনি কল্পনা করেছিলেন

তাঁকে সেদিনই অন্তরীণে ধরে নিয়ে গেল ইংরেজ সরকার। তিনি হলেন শরৎচন্দ্র বসু।

ইতিহাসের গতি সর্পিল, রঙ বর্ণচোরা, প্রকৃতি ক্রূর ও প্রতিহিংসাপরায়ণ। সমাজ অথবা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সদাসর্বদা সজাগ অবস্থায় এর গতি নির্ধারণ না করলে সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। ভাল মানুষকে খাতির করা অথবা পাত্তা দেওয়া ইতিহাসের কাজ নয়। এ কেবল সেই দেশকে, সেই জাতকে সম্মান করে যে সব কিছুরই পশ্চাতে এর অবস্থান সম্পর্কে নির্ভুল থাকবার চেষ্টা করে। সুদূর অতীতের ইতিহাসকে আমরা আপন মন-গড়া কাহিনীতে পরিণত করে রেখেছি তাই আমরা ব্যহত হয়েছি পদে পদে। নিকট অতীতে এমন কি সত্ত বর্তমানেও, ইতিহাসের সে দুর্বার গতিকে যে আমরা স্বীকার করেছি তাও তো মনে হয় না।

ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে (২৬।২৭ ডিসেম্বর) সর্বভারতীয় মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের নাগপুর অধিবেশনে কায়েদে আজম সভাপতির আসন থেকে ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন: I make a Christmas present of Fazlul Huq to Lord Linlithgow and I make a New-Year's gift of Nawab of Dacca to the Governor of Bengal. I am glad that the Muslim league is rid of them.

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ফজলুলী যুগ শেষ

যে আবহাওয়া এবং পরিবেশের মধ্যে ফজলুল হক নতুন মন্ত্রিসভা গড়লেন (১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসে) তা' দেশের পরিস্থিতি সহজ করতে যে আদৌ সাহায্য করতে পারবে না, শ্যামা-হক মন্ত্রিত্বের জন্মকাল থেকেই বুঝতে পারা গেছিল। যুদ্ধ এসে গেছে বাড়ীর কাছে, বার্মা থেকে লোকজন হাঁটাপথে, জলপথে ভারতবর্ষ অভিমুখে ছুটছে এবং এদের গন্তব্য স্থল কলকাতা। জাপানীদের গতিরোধ করতে এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীদের দৃষ্টি অন্য দিকে ফেরাবার জন্য যেমন একদিকে চল্‌ল নতুন করে ধর-পাকড় (শরৎ বসু হলেন প্রধান বলি) অন্যদিকে "ডিনায়েল পলিসির" মারফৎ নৌকা-পোড়ান এবং চাল-ডাল সরান কারবার এবং পূর্ববঙ্গে বিশেষ করে চট্টগ্রাম অঞ্চলে গ্রামের পর গ্রাম থেকে বাসিন্দাদের উৎখাতের কাজ শুরু হল। ক্ষিতীশ নিয়োগী মহাশয় কেন্দ্রীয় বিধান সভায় সে সময় বলেছিলেন যে, এক সপ্তাহের মধ্যে নোয়াখালির ৩৫টি গ্রাম নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছিল। ক্ষতিপূরণেরই নমুনাই বা কত বাহারের ছিল! বিহারের গ্রাম থেকে মানুষ সরালে ক্ষতিপূরণ যদি শতকরা ১১৫ ঠিক করা হত নোয়াখালির ফেণী অঞ্চলে সে রেট শতকরা ৫০এ নামান হয়।

ফজলুল নতুন করে প্রধানমন্ত্রী হ'লে এলাহাবাদে মুসলিম লীগের অধিবেসনে (এপ্রিল, ১৯৪২) প্রস্তাব পেশ করে তাঁর নাম লীগের খাতা থেকে যেমন কেটে দেওয়া হল তেমনি ইস্পাহানীর প্রস্তাবে ক্রীপস্ মিশন সম্পর্কে লীগ কি করবে তা' ঠিক করবার জন্য কায়েদে আজমকে সর্বপ্রকার ডিক্টেটরিয়াল ক্ষমতা দেওয়া থাকল।

ভারতীয় লীগ যেমন ফজলুল হককে বরখাস্ত করল তেমনি

প্রাদেশিক লীগ আবদার রহমান সিদ্দীকের সভাপতিত্বে শ্যামা-হক মন্ত্রিসভার ঢাকার নবাবকে এবং খান বাহাদুর হাসেম আলিকে লীগ থেকে তাড়িয়ে দিল।

অপর যে কর্মপন্থা লীগ নিল তা' সেদিন ততটা দৃষ্টি 'আকর্ষণ করেনি যা' পরে করেছিল। হুসেন সৈয়দ সুরাবর্দ্দীর প্রস্তাবানুযায়ী লীগ ঠিক করল প্রতিটি গ্রামে মুসলিম ন্যাশন্যাল গার্ড (আনসার বাহিনী) গড়ে তুলবে। পরিণামে এ প্রস্তাব বিশেষ করে কলকাতায় ও পূর্ববঙ্গে বিস্তার লাভ করে এবং তার প্রত্যক্ষ ফলাফল বাঙালীরা, বিশেষ করে হিন্দু বাঙালীরা, হাড়ে হাড়ে ভোগ করেছিল।

কংগ্রেসের দিক থেকেও এটি সন্ধিকাল। "ভারত ছাড়ো" মুভমেণ্ট ক্রীপ্‌স্ সাহেব ফিরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়ে।

এতগুলি শক্তি সমাবেশের মধ্যে পড়ে শ্যামা-হক্ মন্ত্রিসভা যে বাঙলা দেশকে আর সেই সাঁইত্রিশের কোটায় ফিরিয়ে নিতে পারবে না তা' তো জানা কথা।

ভারতবর্ষের পলিটিক্‌সের নতুন অধ্যায় শুরু হল আবার বাঙলা দেশের কলকাতায়। পুরান অধ্যায়ের কাজ শেষ হয়ে গেল ১৯৪১ সালের সালতামামির সঙ্গে সঙ্গে।

কুপল্যাণ্ড সাহেব, প্রফেসর মানুষ, তখন ভারতবর্ষের নাড়ী পরীক্ষায় এসেছেন। পরিণামে তিনি যে দেশ ভাগাভাগির ইঙ্গিত দেন তাই রদবদল করে হিন্দুস্থান পাকিস্তান হ'ল। কুপল্যাণ্ড একচোখো মানুষ ছিলেন না কিন্তু। জিন্না-পলিটিক্‌সের গোড়ায় যে অপবাদ অধ্যায় যুক্ত ছিল, যখন পীরপুর কমিটির মারফৎ সে অপবাদ প্রমাণের চেষ্টা চলেছিল এই অজুহাতে যে কংগ্রেস শাসিত অঞ্চলে মুসলমানদের জীবন বিপন্ন, কুপল্যাণ্ড সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করে বললেন: বাজে কথা। "The case against the Congress Government as deliberately pursuing an anti-Muslim

policy was certainly not proved." লীগ মহল মনে মনে সাহেবের এই মন্তব্য পেশ করাতে নিশ্চয়ই হেসে থাকবেন। এতদিন লাগল এই ধাপ্পা ধরতে! তবে পলিটিক্সের নতুন সম্ভাবনা যে কি সে সম্পর্কে কুপল্যাণ্ড যে মন্তব্য করলেন তা' লীগ মহলকে নিশ্চয়ই পুলকিত করেছিল। সাহেব পাকিস্তানকে স্বাগতঃ জানালেন, "Pakistan, originally a dream, is becoming a definite political idea." সিভিল ওয়ারের কথা ভারতবর্ষের আকাশে বাতাসে শোনা যাচ্ছে ঃ মন্তব্য করলেন কুপল্যাণ্ড।

কেমন ধারা সে সিভিল ওয়ার হতে পারে প্রথম ঘোষণা শুনতে পারা গেল কনস্টিটিউসনাল জিন্নার মুখে। সিরাজগঞ্জের প্রাদেশিক লীগের অধিবেশনে জিন্না—বাঙলা দেশে সেই মুহূর্তে শ্যাম-হক মন্ত্রিত্ব তখন চলছে—ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া রুলস কেবল মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হচ্ছে এই অভিযোগ আনেন। এ আইন নিশ্চয়ই তখন পূর্ণমাত্রায় ব্যবহৃত হচ্ছিল। শরৎ বসু নিজেই তো প্রধানতম বলি। কিন্তু কে বা কাহারা সে আইন তখন চালু রেখেছিল তার ইতিহাস জিন্নাজী যে জানতেন না তা' নয়।

তবুও যখন সুযোগ পেলেন তখন অস্ত্র ব্যবহার করতে কি ক্ষতি এই মনে করে অভিযোগ করে কায়েদে আজম যে সাবধান-বাণী ঘোষণা করলেন তাই হল বাঙলা দেশের ভবিষ্যৎ চিত্র-রেখা।

জিন্না বললেন, বাঙলা দেশে এমন অবস্থা আসবে যার নজীর অতীতে পাওয়া যাবে না! Let me say from this platform that if His Excellency the Governor of Bengal does not stop this without delay, in Bengal there will arise a situation for which there is no parallel in the history of Bengal during the British Raj. যারা ছেচল্লিশের কলকাতার রাজপথে অথবা নোয়াখালির পল্লী অঞ্চলে যে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ঘটেছিল তার ইতিহাস উদ্‌ঘাটন করতে চান

তাদের পর্যালোচনা জিন্নার ঐ উক্তি থেকে শুরু করা ঠিক হবে। পরে অবশ্যই এ ধ্বনি অপর লীগ নেতাদের কণ্ঠে উচ্চগ্রামে পৌঁছেছিল। কিন্তু স্বর প্রথম ধ্বনিত হয়েছিল বাঙালী কণ্ঠে নয়, কায়েদে আজম মহম্মদ আলি জিন্নার কণ্ঠে।

কংগ্রেসের "কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট" সম্পর্কে জিন্না যে মন্তব্য করেছিলেন তা' অন্যস্থানে উদ্ধার করেছি। যখন জিন্না মারমুখো হয়ে পড়েছেন, যখন কংগ্রেস জেলে, তখন ভারতবর্ষের দুই প্রধান মন্ত্রী আবুল কাসেম ফজলুল হক এবং আল্লাবক্স এবং অন্যান্য প্রধানেরা (সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ সাল) এক যুক্ত বিবৃতিতে, দেশের পরিস্থিতি আলোচনা করে বিলেতের প্রাইম মিনিস্টারকে অনুরোধ করে জানালেন যা'তে কেন্দ্রে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এ যুক্ত বিবৃতিতে স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খাঁ (তখনও জীবিত ছিলেন কিন্তু লীগ হতে তাড়িত) আপন স্বাক্ষর দেননি।

তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল: ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল হলে, তিনি সেই পরিস্থিতিতে কি করতেন? উত্তরে জানিয়েছিলেন: "আত্মহত্যা করতাম!" He replied, "Commit suicide. ভারতবর্ষের পরিস্থিতি কি রূপ সে মুহূর্তে নিয়েছিল তা ধরা পড়ে আছে সেকেন্দারের সেই শেষ মন্তব্যের মধ্যে।

ঘটনার বাহুল্যে ১৯৪২ সাল অবিস্মরণীয়। সালতামামিও ঘটল অপ্রত্যাশিত চক্রব্যূহে। শরৎ বসুর অক্লান্ত চেষ্টার ফলে ফজলুলী-ক্যাবিনেট গঠনে বাধ্য হয়েছিলেন স্যার জন হারবার্ট। তাঁর যে কোন ইচ্ছাই ছিল না এ মন্ত্রিসভা গঠনে তা' তাঁর গড়িমসিতেই প্রকাশ পায়। যখন স্যার নাজেমুদ্দিন কোন প্রকারেই হিন্দু সমর্থন পেলেন না তখনই ফজলুলকে মন্ত্রিসভা গড়তে অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু যখন শেষ শলা-পরামর্শ করতে ফজলুল ও শ্যামাপ্রসাদ শরৎ বসুর বাড়ীতে উপস্থিত তখন পুলিস তাঁকে জেলে নিয়ে যাবার আয়োজন করছে। শরৎ বাবুর অবর্তমানে

পলিটিক্যাল দায়িত্ব আপনা থেকেই গিয়ে পড়ল শ্যামাপ্রসাদের ওপর।

তখন পোর্টার রাজত্ব এসে পড়বার উপক্রম হয়েছে। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদকে ডিঙ্গিয়ে সে রাজত্ব সম্ভবপর নয় তা' যেমন হারবার্ট তেমনি পোর্টার বুঝতে পেরেছিলেন। ফলে বাধল ঝগড়া। এ ঝগড়ার কিছুটা বিবরণী শ্যামাপ্রসাদ তাঁর মন্ত্রিত্বের গদী ছাড়বার সময় (২১শে নভেম্বর ১৯৪২ সালে) দিয়েছিলেন ঃ One I. C. S. officer beacuse he was a Bengali was superseded inspite of Ministerial advice. Another British I. C. S. officer had the audacity to put down in writing that the rates of payment to evacuees in East Bengal were much higher then they deserved and as "an Imperial officer"—the words not mine but his—he refused to carry out the orders of the provincial Government. This officer still remains in position of trust and responsibility. "কলেকটিভ ফাইন" হিন্দুদের উপর ধার্য করা হতে লাগল, মন্ত্রীদের উপদেশ অগ্রাহ্য করে। Denial policy চালু করা থাকল এবং জোর করে বাঙলা দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বনেদটি ধ্বংস করবার জন্য যা' কিছু প্রয়োজন তা' মন্ত্রীদের অগ্রাহ্য করে পোর্টার হারবার্টের সহায়তায় করতে লাগল।

পলাশীর লুটতরাজ ও হেস্টিংসের অত্যাচারের অধ্যায়ের শেষে যেদিন থেকে ইংরেজ ভারতবর্ষ শাসনের অধিকার অর্জন করেছিল এবং সেদিন থেকে যে এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাঠামো গড়ে তুলেছিল সেই কাঠামো তখন থেকে ভাঙতে শুরু হল। দেশ বিভাগের পূর্বে বাঙলা দেশে চল্লিশের গোড়ায় যে ভাঙনের পরীক্ষা করা হয়েছিল, তাই সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এই সব ইম্পিরিয়াল অফিসারেরা শুরু করলে

জবাহরলাল নেহরু ও প্যাটেলের জ্ঞানচক্ষু প্রথম উন্মীলিত হয়। কিন্তু যখন বাঙলা দেশে এ পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছিল তখন এটি যে একটা বড় ধরণের ষড়যন্ত্র, এর প্রতিক্রিয়া সুদূর প্রসারিত হবার সম্ভাবনা, সে ধারণা কি বাঙলা দেশে বা বাহিরের কারও মনে আসেনি।

সে এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাঠামো পুনর্নিমাণের চেষ্টা দেশ বিভাগের পরেও যে হয়েছে তাও মনে হয় না। স্বাধীন ভারতবর্ষ-গড়ার কাজ চলেছে সেই ভাঙা, অকেজো, তুষ্ট ও পূতিগন্ধময় ইংরেজী এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাঠামোর সাহায্যে !!! কত নাইট, রায় বাহাদুর বা রায় সাহেব, খান বাহাদুর বা খান সাহেব, ব্যানার্জি, মুখার্জী, চ্যাটার্জী বা বোস, ঘোষ, মিত্র অথবা সেনগুপ্ত, দাসগুপ্তদের মুখগুলো মনের কোণে ভেসে ওঠে আজও। কেবল পুলিসের ডেপুটী কমিশনার দোহার কথা বল্‌লে চলবে কেন? বরং পুলিসে যাঁরা সেদিন ছিলেন, তা'রা হিন্দুই হন আর মুসলমানই হন সাম্প্রদায়িক আগুনে যখন স্ব স্ব সম্প্রদায় পুড়তে শুরু করেছে তখন "কেরিয়ার"-এর ভবিষ্যৎ অগ্রাহ্য করেও মানুষগুলোকে রক্ষা করতে অনেক ক্ষেত্রে এগুতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু এই সব আই. সি. এস; ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও অন্যান্য সিভিল সার্ভিস দপ্তরের অফিসরেরা সে যুগে কে কি করেছিলেন তার ইতিহাস অজ্ঞাতই থাকল।

থাকুক, কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু ভারতবর্ষের এবং বাঙলা দেশের দুর্ভাগ্য যে এঁরাই নতুন পটভূমিকায় দেশ গঠনের ভারপ্রাপ্ত হলেন। কেবল একটি ছোটখাট উদাহরণ দিয়ে এ প্রসঙ্গ তাড়াতাড়ি শেষ করতে চাই। সে উদাহরণ দেবার একমাত্র উদ্দেশ্য হ'ল এঁদের মানসিক দৃষ্টিকোণটি যে কি ছিল বা থাকতে পারে তাই ধরতে চেষ্টা করা। এক রায়বাহাদুর জাতীয় জীব সরকারী চাকরে নির্বাচনের ভার পেলেন। প্রার্থী হলেন জেল থেকে পাস করা এক গ্র্যাজুয়েট। সরকারী ফরমে যথাবিহিত লেখা ছিল কোন্ কলেজ থেকে পদপ্রার্থী পাস করেছেন তার নির্দেশ। প্রার্থী "ভারত ছাড়ো" (quit India)

মুভমেণ্টের আসামী। যে জেল থেকে পরীক্ষা দিয়েছিলেন তার নাম লিখে দিয়েছেন।

চাকরি-দেনেওয়ালা রায় বাহাদুর সে লিখিত ফরমটি পড়ে অবাক হয়ে প্রার্থীকে প্রশ্ন করলেন: দমদমে কি কোন কলেজ ছিল?

উত্তরে প্রার্থী বললেন: না। আমি জেল থেকে পরীক্ষা দিয়েছিলাম। মন্তব্য শুনলেন: আপনি তবে "সাবভারসিভ একটিভিটিতে" যুক্ত ছিলেন? গোটা ইংরেজ রাজত্বের সময় স্বদেশের কাজে জেলযাত্রা যে কৌলিন্য লাভ করেছিল সেটাকে অস্বীকার করল এইসব রায়বাহাদুরের দল। এরাই আজ নতুন বাঙলা দেশ গড়ে তুলছে!!

প্রসঙ্গান্তরে অনেক দূরে এসে পড়েছি। যাই হোক ১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। আবুল কাশেম ফজলুল হক নীরব থাকলেও তখন অনেকরই ধারণা হয়েছিল যে ফজলুলের দিনও আগত।

১৯৪৩ সালের বাজেট বিধান সভায় পেশ করা হল। শ্যামা-হক মন্ত্রিত্বের অবস্থান হেতু সাহেব কর্মচারীরা যথেচ্ছানুসারে শাসন ব্যবস্থা চালাতে অসুবিধাবোধ করছিল। তাদের সাহায্যার্থে বিধান সভার ইয়োরোপিয়ান সদস্যেরা তাদের তথাকথিত দর্শকের ভূমিকা পরিত্যাগ করে ফজলুলী শাসন শেষ করতে এগিয়ে এলেন।

সেই লিটন যুগে তাঁরা এই কাজ একবার করেছিলেন। ম্যাকডোনাল্ডী রোয়েদাদে যাতে তাঁদের আর সামনে না আসতে হয় তার সবকিছু ব্যবস্থাই—বিশেষকরে বাঙলা দেশ সম্পর্কে—স্যার সামুয়েল হোর করেছিলেন; তবুও ঘটনা পরম্পরায় এই পেটো-সাহেবদের সামনে না এসে আর উপায়ন্তর থাকল না হারবার্ট-পোর্টার যুগে। সরাসরি গর্ভনমেণ্টের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এঁদের দলের তরফ থেকে কে. এ. হ্যামিল্টন ছাঁটাই প্রস্তাবে ভোট দাবী করলেন

(মার্চ ২৭, ১৯৪৩ সাল)। ভোটে হ্যামিল্টন হেরে গেলেন। তাঁর স্বপক্ষে ছিল ৯৯ এবং বিপক্ষে ছিল ১০৯ সদস্য।

সোজা আঙুলে যখন ঘি উঠল না দেখতে পেলেন তখন হারবার্ট নিজে হাল ধরলেন এবং আবুল কাসেম ফজলুল হককে পদত্যাগ করতে হল ২৯ মার্চ, ১৯৪৩ সালে। অর্থাৎ হ্যামিল্টনের প্রস্তাব বাতিল হয়ে যাবার পরেই।

ফজলুল যে পরিস্থিতিতে পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন তার মোটামুটি সমগ্র কাহিনী তিনিই লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন— Bengal Today পুস্তিকায়। এর ভূমিকাতে ফজলুল লিখেছেন: The statement made in the Assembly regarding the circumstances under which I was decoyed into signing a letter of resignation of my office as Chief Minister was written at a time when I had hardly recovered from the shock of the great treachery of which I was made the victim, and of which the Chief actors were some of the highest officials of Bengal including some of the present Ministers.

ফজলুল হক তাঁর পদত্যাগের বিষয় নিয়ে বিধান সভায় যে বিবৃতি দিয়েছিলেন, সেটি হল খাঁটি ঐতিহাসিক মাল-মসলা পূর্ণ দলিল। ১৯৪১ সালের শেষ থেকে জিন্নার সঙ্গে মতান্তর হলে তাঁর মন্ত্রী-বন্ধুরা তাঁকে সরানর জন্য যে ষড়যন্ত্র করতে শুরু করলেন ক্ষমতা প্রাপ্তির আশায় এবং ঐ সালের ডিসেম্বর মাসে একযোগে প্রথমে দু'জন (এঁরা মুসলমান) আর পরে দুজন (এঁরা হিন্দু) পদত্যাগ করে তাঁর মন্ত্রী-সভাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন তিনি তাঁর উল্লেখ করেছিলেন।

কি ঘটনা পরম্পরায় আদিতে তাঁকে হারবার্ট মন্ত্রিসভা গঠন

করতে বাধ্য হয়েছিলেন তার কাহিনী বিবৃতি করে তিনি বলেছিলেন যে হাউসে তার দলের সংখ্যা বেশী, তবুও হারবার্ট নাজেমুদ্দিনকে মন্ত্রিসভা গঠন করতে সুযোগ দেবার জন্য অপেক্ষা করে বিফল মনোরথ হলেই তাঁকে আহ্বান করেছিলেন। মন্ত্রিত্বের পদ গ্রহণ করবার জন্য শপথ নেবার পূর্বেই তাঁর সমর্থক শরৎ চন্দ্র বসুকে আটক করা হল। এসব বাধা সত্ত্বেও তার প্রগেসিভ কোয়ালিসন দলের দ্বারা গঠিত মন্ত্রিসভা যতটা প্রতিনিধিত্ব দাবী করতে পারত তা অন্য কোন মন্ত্রিসভা কি অতীতে কি বর্তমানে (তখন নাজেমুদ্দিন মন্ত্রী হয়েছেন) করতে পারেনা। It was for the first time that Muslims belonging to various point of view, Hindus belonging to the Congress and of other schools of thought, together with various small groups and Scheduled Caste groups—all combined to cooperate in the administration on purely national and patriotic lines. I suspect that such a Cabinet did not appeal to Sir John Herbert and he therefore hesitated to agree to the formation of such a Cabinet and continued to evade its formation till at last he was compelled to give in. It is well-known that the union of Hindus and Muslims and of other communities in a common endeavour for the political advancement of the country does not commend itself to Britishers with imperialistic views. Secondly the group represented by Sir Nazimuddin was at that time a great political asset in the hands of the British imperialists. It was through this school of politicians that British

statesmen hoped to fight the Congress and indeed all nationalist activities.

শ্যামাপ্রসাদ পদত্যাগ করবার পূর্ব থেকেই যে ফজলুলকে হারবার্টের সঙ্গে ঝগড়া করতে হচ্ছে তা তাঁর হারবার্টকে লিখিত পত্রের সাহায্যে (আগষ্ট; ১৯৪২) উদ্ঘাটন করলেন সে বিবৃতিতে।

সেই একই অভিযোগ : I have detected your personal interference in almost every matter of administrative detail এবং you have directly or indirectly encouraged sections of permanent officials to flout the authority of Ministers, leading them to ignore Ministers altogether and to deal directly with you as if the Ministers did not exist অন্য স্থানে বলেছেন : I refer to your attitude in Cabinet meetings where you monopolise all the discussions and practically force decisions on your Ministers, decisions which are in many cases the outcome of advice tendered to you by permanent officials belonging to Service whose traditions are fundamentally opposed to genuine spirit of sympathy with the feelings and aspirations of the people.

যে সব ঘটনার উল্লেখ ফজলুল হারবার্টের কাছে লেখা চিঠিতে করেছিলেন সেগুলো আজ অনুসন্ধান করলে কেমন করে পরিণামে বাঙলাদেশে দুর্ভিক্ষ আনল হারবার্ট এবং তার অনুচরেরা তার গোপন ইতিহাস প্রকাশ পায়। হারবার্ট কমার্স ও লেবর ডিপার্টমেন্টের জয়েণ্ট সেক্রেটারীকে হুকুম (mandate) দিয়েছিলেন in the matter of rice removal policy. The joint

Secretary in his haste and hurry to oblige you advanced twenty lakhs of rupees to a nominee of a friend to begin the work without any terms having been settled or without any arrangements having been made for the safety of public money solely for the purpose of showing that he had started carrying out your orders. When we came to know of all this at a later stage, we did what we could to retrieve the unfortunate position into which Government had been placed, but even then we could not avert the disaster. নৌকা অপসারণ ব্যাপারে লিখলেন : it is enough for me to emphasize that the whole scheme was planned in consultation with Military authorities and some permanent officials without the knowledge not merely of the Cabinet but even of the Home Minister অফিসার নিয়োগ এবং তাঁদের কাজ কর্ম নিয়ে হারবারট যা' করতেন সে বিষয়ের উল্লেখ করে ফজলুল লিখলেন : During the last few days I have discovered that orders have been passed by Secretaries either on their own responsibility or with your approval, explicit or implicit by totally ignoring the Ministers.

অন্য ব্যাপার যা ঘটেছিল সে সম্পর্কে উল্লেখ করে ফজলুল বললেন : নোয়াখালির গ্রামের মেয়েদের ওপর সৈন্যেরা অত্যাচার করেছে। ফেনীর ডেপুটী কলেক্টর সে কথা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে লিখিলে কলকাতা থেকে চীফ সেক্রেটারী, চিফ মিনিস্টারকে সে বিষয়ে কোন কিছু না বলে, সেই ডেপুটি কলেক্টরকে সরাসরি অন্য জায়গায় বদলী করে দিলেন।

ধান-চাল সংকট দেখা দিলে কনট্রোলার, সমরসেট বাটলার (Somersett Butler) এর পদে ম্যাক্ইনেস (MacInnes)কে নিয়োগ করা ঠিক হলে ফজলুল আপত্তি করে বললেন, একজন ভারতীয়কে সে পদ দেওয়া হোক। তাঁর আপত্তি অগ্রাহ্য করা হল। এর পর এল পিনেল (Pinnel)। হারবারটের হুকুম থাকল : they should be allowed to go on unchecked with their own policy and any interference on the part of the Ministers with their work should be reported to the Governor.

আবার বিবাদ শুরু হল। ফজলুল হক জানালেন : Various events, however, brought to the surface the latent feelings of dissatisfaction which the Governor, the permanent officials and the European Party bore towards me and some of my colleagues. Matters came to a head when Dr. Syama Prosad Mookerjee made his statement to the House on the 12th February regarding the circumstances leading to his resignation. The statement made by Dr. Mookerjee added fuel to the fire. We were asked to dissociate ourselves from the statement made by Dr. Mookerjee and practically to make a statement in the House that the Governor had been acting in a most constitutional manner and that the measures taken by the Government had not only been amply justified but had been carried out under circumstances of exceptional clemency under great provocation. Personally, I was not prepared categorically

to deny all that Dr. Mookerjee had said, there was much in that statement with which I certainly agreed and I could not reconcile my conscience with the suggestion that had been made to me, namely, to condemn a statement with which I was more or less in agreement. There cannot be the slightest doubt that the European Party became violently inflamed against me (হ্যামিল্টন সাহেবের ছাঁটাই প্রস্তাব হল তাদের প্রতিবাদ) and I now suspect that from February onwards there was a sort of an agreement between my political adversaries on the one hand and high officials and the European party on the other to oust me from office.

ঝগড়া তখনও লোকচক্ষুর অন্তরালে এবং পত্র ব্যবহারের মধ্য দিয়ে চলেছে। কিন্তু যেদিন ফজলুল হক বিধানসভায় (এক ইয়োরোপিয়ান পার্টি ব্যতীত) বিরোধীপক্ষের দাবি স্বীকার করে মেদিনীপুরে যে অত্যাচার চলেছিল সে সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য কমিটি বসাবেন বলে ঘোষণা করলেন, তখন একদিকে যেমন গভর্ণর হারবারট ও পোর্টার-কার্টার বেসামাল হয়ে পড়ল তেমনি অপরদিকে ইয়োরোপিয়ান পার্টি তাঁকে মন্ত্রিত্বের গদি থেকে তাড়াতে বদ্ধপরিকর হল। The allegations (about Midnapur) were of too serious character and yet so specific that it was felt that it would be in the interest of officials themselves to put the accusers to prove their accusations. I agreed—বলেছিলেন হক সাহেব।

সে ঘোষণার খবর পাওয়া মাত্র লাটসাহেব তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন এবং তখুনি ফজলুলের কাছে এমন ভাষায় কৈফিয়ত

দাবি করলেন যাতে তাঁর অস্থিরচিত্তের পরিচয় প্রতিটি বাক্যে ধরা পড়ে।

হারবারট ফজলুলকে চিনতে পারেননি, যেমন অতীতে লর্ড লিটন ফজলুলের আইন-গুরু স্যার আশুতোষ মুখার্জীকে চিনতে পারেননি। ফজলুল উত্তরে তাঁর বক্তব্য যেমন পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন তার উপমায় কেবল আশুতোষের সেই ঐতিহাসিক কনভোকেসনের বক্তৃতা উদ্ধার করা যায়। উত্তরে ফজলুল বললেন: I write to say that I owe you no explanation whatever in respect of my 'conduct'in failing to consult you before announcing what, according to you, is the decision of the Government. But I certainly owe you a duty to administer a mild warning that indecorous language such as has been used in your letter under reply should, in future, be avoided in any correspondence between the Governor and his Chief Minister.

যেদিন এ চিঠি ফজলুল লিখলেন সেদিন হারবারটের সঙ্গে সকালে তাঁর সাক্ষাৎকারের কথা ছিল। সে কথার উল্লেখ করে ফজলুল জানালেন: It will not be possible for me to go and see you, because I consider that unless sufficient amends are made for the language used in your letter under reply, no useful purpose would be served by an interview.

এর পর যেসব ঘটনার সমাবেশ হ'ল তা অনেকটা প্রকাশ্য ভাবেই। ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, সরকারী কর্মচারীদের মন্ত্রী-নিরপেক্ষ হয়ে কাজ করা, পলিটিক্যাল পার্টিগুলোর, বিশেষ করে সুরাবর্দ্দী-নাজেমুদ্দিনের আঁতাত এবং সর্বোপরি লাটসাহেব

হারবারটের নিজের ঔদ্ধত্য ও যুদ্ধকালীন ব্রিটিশ পলিসি চালাবার নির্দ্দেশ দেখে বাঙলা দেশের ভবিষ্যৎ কি হতে পারে তা বুঝতে পেরে ফজলুল সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা (All-parties Cabinet) গড়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে তাঁর মতামত প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেছিলেন।

হারবারট ফজলুলের এই দুর্বলতা জানতে পেরে তার পূর্ণ সুযোগ নিলেন। সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা গড়া হবে এই অজুহাতে ফজলুলকে লাটেরকুঠীতে এনে দরজা বন্ধ করে (তাঁর এক সহযোগীর কাছ থেকে এ কথা শুনেছিলাম) পদত্যাগ পত্র (পূর্বেই সে পত্র হারবারট টাইপ করে রেখেছিলেন) আদায় করে নিয়েছিলেন। As soon as I had handed over that document to the Governor, he turned to the Secretary and asked him to telephone something to the European Party.

হারবারটের কাণ্ডকারখানার সমালোচনা করে ফজলুল বিবৃতিতে বলেছিলেন : To come now to the activities of Sir John Herbert after he had once managed to secure my so-called letter of resignation. All ideas of having an All-parties Ministry were cast to the winds and the Governor began to act as if the only end he had in view was somehow to smuggle Sir Nazimuddin into power. He forgot his solemn promises given to me that he would consult the leaders of all the parties and try to form a national Cabinet. He forgot also his solemn assurances given to me on the night of the 28th of March that he was anxious to retain me as his Chief Minister and that I had not forfeited his confidence but that he was asking me

to sign the so-called letter of resignation only to enable him to parley with party leaders. I possess abundant documentary evidence. Sir John Herbert knew that I would consent to voluntary resignation only, and only if such resignation appeared to be indispensably necessary for the purpose of the formation of an All-parties Cabinet.

পরে ফজলুল বলেছেন যে স্যার নাজেমুদ্দিনকে দিয়ে এবং নিজে তদ্বির করে হারবারট যে ক্যাবিনেট গড়লেন তা' ১৯৪১ সালে তিনি যে ক্যাবিনেট গড়েছিলেন তার চেয়ে much less representative and is in fact a Cabinet composed of a single party in the House under the domination of a political caucus composed of the members of the family of the Khwajas of Dacca. (বিধান সভায় বিবৃতি, জুলাই ৫, ১৯৪৩ সাল)

ফজলুলের সঙ্গে যখন ঝগড়া শুরু হয়েছে তখন একদিকে নাজেমুদ্দিনের দল অপরদিকে পেটো সাহেবরা তৎপর হয়ে পড়লেন। আবার মন্ত্রিত্ব প্রাপ্তির আশা যেমন একদলকে প্রলুব্ধ করল তেমনি "শ্যামা-হকের" দাপট থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে এমন আশা অপর দলকে উৎসাহী করেছিল। ফজলুল হক যদি ক্যাবিনেটে না থাকেন তা'হলে যে লীগ নির্দ্দিষ্ট পলিসি বাঙলা দেশে চালু করা সহজ হবে এ ধারণা তখনও বিশেষভাবে ব্যাপক হয়নি।

বিধান সভায় মেদিনীপুর সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে ফজলুল বল্লেন: I have got to do things contrary to what I would have done if I were a free agent. In these circumstances there are moments when I do

feel that the best course for me would be to walk out. If that moment does arise, I shall not be slow to adopt that course, because I am fed up with the position which gives me little opportunity of conceding to what I know is public opinion.

এক প্রশ্নের উত্তরে ফজলুল স্বীকার করলেন তাঁর পরামর্শ লাট সাহেব অগ্রাহ্য করে চলেছেন, তবে কতবার তা তিনি বলতে রাজী নন।

ইয়োরোপিয়ান পার্টির তরফ থেকে স্টর্ক সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন: প্রধান মন্ত্রী কি ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর বিবৃতি সমর্থন করেন?

স্পিকার, নৌসের আলি প্রশ্নটি অগ্রাহ্য করে দেন।

তমিজুদ্দীন খাঁ প্রশ্ন করেন: ডাঃ মুখার্জীর বিবৃতি কি সত্য?

ফজলুল হক উত্তরে জানালেন: It contains various statements of facts. Some of them might be true, some might not be true and some might be matters of opinion.

হাওয়া কোন দিকে বইছে জেনে লীগ-ইয়োরোপিয়ানদের ষড়যন্ত্র ক্রমশই সঠিক রূপ নিতে লাগল। এমনকি ফজলুল হকের ক্যাবিনেটে যে সব হিন্দু মন্ত্রী ছিলেন তাঁদের কাছেও চর যেতে শুরু হল।

কিন্তু বাধা এল ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ও কিরণশঙ্কর রায়ের তরফ থেকে।

তখন দলছাড়াদের সঙ্গে ঘন ঘন আলাপ পরিচয় চলেছে। এদিকে সংকট (crisis) ঘটাবার জন্য তমিজুদ্দীন খাঁ সরাসরি বাজেটের ছাঁটাই প্রস্তাব—অনাস্থা প্রস্তাব বলেই ঘোষণা করেছিলেন—পেশ করে ডিভিশন দাবি করলেন (২২-২৪ মার্চ)। বিষয়টি হল,

The failure of the Ministry to assume responsibility for the action of officers of the Government. মনে করা যেতে পারে, ইয়োরোপিয়ান পার্টি অন্তত এমন একটা বিদ্‌ঘুটে প্রস্তাব সমর্থন করতে রাজী হবে না। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এ প্রস্তাব তাঁরাও (David Hendry) সমর্থন করে বললেন: The events of this and the last session of the Assembly had shown that not only was the motion justified but it was urgent necessity.

কিরণশঙ্কর ও শ্যামাপ্রসাদ প্রস্তাবটির বিরুদ্ধে বক্তব্য পেশ করলেন।

সুরাবর্দী জানালেন: They of the Muslim League were to come to an agreement with any group that could deliver the goods but they refused to be pawns. Dr. Syama Prosad Mookerjee's suggestion was to create disunity among Muslims so that his community may rule in Bengal. মোসলেম লীগের শাসন সম্পর্কে নামগন্ধও সুরাবর্দী করেননি সেদিন, কেবল তাঁরা যে অন্য ভারী দলগুলো—যথা কংগ্রেস, যথা প্রগ্রেসিভ কোয়ালিসন সঙ্গে আঁতাত করতে উন্মুখ হয়ে আছেন সেই অবস্থার আভাস দিয়েছিলেন সেই অনাস্থা প্রস্তাব সমর্থন করে।

প্রস্তাবটি ভোটে টিকল না। ৮৬ জন সদস্য প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং ১১৬ জন বিরোধিতা করেন। হৈ হৈ পড়ে গেল বিধানসভায়। নাজেমুদ্দিন-সুরাবর্দী-ইস্পাহানী-পেটো সাহেব এবং ইংরেজ কর্মচারীদের সমবেত আঁতাত নাকচ করে দিলেন ফজলুল হক।

পেটো সাহেবরা কিন্তু হাল ছাড়ল না। আবার তোড়জোড় চলল। এবার ফজলুল বেশ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। এক

শ্যামাপ্রসাদ ও কিরণশঙ্কর ও তাঁদের দল ছাড়া তিনি এমন কি তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের ওপরেও যেন আস্থা রাখতে পাচ্ছেন না। না পারবার কারণ যে এবার নাজেমুদ্দিন-সুরাবর্দ্দী নয়, সাহেবরা নিজেদের হাতে ষড়যন্ত্র চালাবার ভার নিয়েছে।

ডেভিড হেনড্রি "কালো-বাজার এবং অতি মুনাফার" অভিযোগের অজুহাতে ছাঁটাই প্রস্তাব আনলে কিরণশঙ্কর তার বিরোধিতা করে প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হককে জিজ্ঞাসা করলেন: If the Chief Minister was frustrated in his efforts to check black marketing and profiteering by permanent officials ?

গোলমেলে হয়ে উঠল ব্যাপারটি। হেনড্রী সাহেব থতমত খেলেন।

সুরাবর্দ্দী কিরণশঙ্করের বক্তব্য ও মন্তব্য শুনে চমকে বললেন: সিভিল সাপ্লায়ের ডিরেক্টরকে এ অবস্থার জন্য দায়ী করে কিরণশঙ্কর অন্যায় করলেন। Did Kiran Shankar Roy expect the House to believe that 25 or 30 shops allowed to Kali Babu was done for the benefit of the Director of Civil Supplies ?

সুরাবর্দ্দীর ঘটনা-বিন্যাসে সভা উৎকর্ণ হয়ে উঠল। তবে কি সত্য সে মন্ত্রিসভাই কালোবাজার চালু রাখতে চায় ?

হঠাৎ নলিনাক্ষ সান্যাল সুরাবর্দ্দীকে প্রশ্ন করে ফেললেন: Who is this Kali Babu ? Is he Kali Bose ?

Suhrawardy : yes.

Sanyal : He is your friend !

সুরাবর্দ্দী ঘাবড়ে গিয়ে পাশ কাটাতে চাইলেন: Dr. Sanyal is entirely mistaken এবং মন্তব্য করলেন যে, সিভিল সাপ্লাই ডিরেকটরেট প্রতিষ্ঠিত হবার আগে থেকে কালো বাজার চালু

হয়েছে। The dangerous nature of hoarding should have been realised from the beginning.

সান্যাল আবার প্রশ্ন করলেন: Who are the biggest hoarders? Are they not those Europeans?

Suhrawardy: It does not matter who are the biggest hoarders বলেই বুঝতে পারলেন বেফাঁশ হয়ে যাচ্ছে ষড়যন্ত্র। যে ইয়োরোপীয় বণিকেরা তাদের স্ব-গোত্র কর্মচারীদের সহায়তায় বাজার থেকে চাল উধাও করে ফেলেছে, তাদের কাহিনী প্রকাশ হয়ে পড়লে সমূহ বিপদ। বক্তব্যের মোড় ঘুরিয়ে সুরাবর্দ্দী বললেন: People can bear up to a point. The Chief Minister does not understand mass psychology, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সুরাবর্দ্দীর সেদিনকার বক্তৃতা যারা শুনেছিলেন তারাই বুঝতে পেরেছিলেন পটভূমিকার অন্তরালে কি ষড়যন্ত্র চলেছে। বক্তৃতা শেষ করে সুরাবর্দ্দী তাঁর আসল উদ্দেশ্য জানালেন। It was often said that British Government could remain in power only by dividing the Hindus and the Muslims. That was exactly the position here. They of the Muslim League party could come to an agreement if that particular person (ফজলুলকে উদ্দেশ্য করে সে তাচ্ছিল্য ভরা ইঙ্গিত) was not propped up. He could make this declaration with a full sense of responsibility of the Muslim League that should this impediment (আবার ইঙ্গিত) be removed they could sit together and on the part of the Muslim League there could be no stone unturned to come to an agreement between the Hindus and the Muslims.

ফজলুল উপযুক্ত জবাব সেদিন সুরাবর্দ্দীর মুখের ওপর দিয়েছিলেন। হাতে ফাইল ধরে উচ্চকণ্ঠে বলেছিলেন যদি সুরাবর্দ্দী রাজী থাকেন তবে তিনি এই ফাইল থেকে পুলিস-রির্পোট উদ্ধার করে প্রমাণ করবেন, কে কালোবাজারীকে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে, কে পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে বড়বাজার-কলুটোলা ও ক্লাইভ স্ট্রিটের মাতব্বরদের হাত করে কালো-বাজার চালু রাখতে উঠে পড়ে লেগেছে? আমি এই কনফিডেনসিয়াল ফাইলের তথ্য উদ্ধার করতে চাই, যদি সুরাবর্দ্দী আপত্তি না করেন। ফজলুল হকের সে চ্যালেন্‌জের সামনে উচ্চবাচ্য না করে একদম চুপ হয়েছিলেন সুরাবর্দ্দী সেদিন।

সুরাবর্দ্দীর বক্তৃতার শেষ অংশের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে ফজলুল বলেছিলেন: Suhrawardy was in a communicative mood because he was apparently in high spirit that the dissolution of the Cabinet was at hand and that he would once again have the Commerce portfolio.

এ ছাটাই প্রস্তাবও হাউস অগ্রাহ্য করেছিল।

একদিন পরে (২৯ মার্চ) ফজলুল হককে পদত্যাগ করতে হয়। যে অবস্থায় পড়ে তাকে পদত্যাগ করতে হয় তা' নাটকীয়। নাজেমুদ্দিনকে সামনে রেখে সুরাবর্দ্দীর রাজত্ব শুরু হল।

মোসলেম লীগের নাম করে যে আঁতাত করবার প্রতিশ্রুতি সুরাবর্দ্দী দিয়েছিলেন তা অচিরেই ভুলে গেলেন। নাজেমুদ্দিনের রাজত্বে পোয়াবারো অবস্থা এল হারবার্টের, পোর্টারের এবং সাহবুদ্দীনের। সুরাবর্দ্দী ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে পলিটিক্যাল দিকটা অধিকার করে রাখলেন।

মোসলেম ন্যাশানেল গার্ড গড়ে উঠল, দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হল, দুর্ভিক্ষ এল, কলকাতায় সিভিলওয়ার ঘটল।

পাকিস্তান জন্ম নিল।

সুরাবর্দ্দী তখন ঘাবড়ে পড়লেন। সে কথার উল্লেখ অন্যস্থানে করেছি।

পলিটিক্যাল ব্যারোমিটার ক্রমাগত উঠতে লাগল, যেমন বাঙলা দেশে তেমনি ভারতবর্ষে।

ফজলুল হকের গদিচ্যুত করা ঘটনাটি কনস্টিটিউসনাল কায়েদে আজমের কাছে কোনক্রমে দৃষ্টিকটু হয়নি। তিনি দিল্লীতে পদত্যাগের সংবাদ পেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে বললেন: আর ফজলুল হকের নাম ভূ-ভারতে কেউ শুনবেনা!

ভাগ্যের বিড়ম্বনা। পাকিস্তান কায়েম হলে আবার ফজলুল "ভাইস্তা" উঠলেন। ফজলুলের স্নেহ ভাজন হতে পেরেছিলেন বলেই পূর্ববঙ্গে সুরাবর্দ্দী আবার পাত্তা পেলেন। তা' না হলে কোন অতল জলে তাঁকে ডুবতে হত কে বলতে পারে?

২৯ মার্চ এর বিধান সভার যে অধিবেশন বসেছিল তা বিস্মৃত হওয়া অসম্ভব। কিরণ শঙ্কর রায় সভা বসলে প্রশ্ন করলেন: বাজারে গুজব যে প্রধান মন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন—সে কথা কি সত্য?

উত্তরে ফজলুল স্বীকার করলেন। তিনি পদত্যাগ করবার পূর্বে দলের সঙ্গে বিষয়টি আলোচনা করবার সুযোগ চেয়েছিলেন। হারবারট সে সুযোগ তাঁকে দেননি।

Nalinakshya Sanyal: Is it a fact that the letter of resignation was kept typed and ready at the Government House?

Fazlul Huq: If he insists for a reply, I will.

Sanyal: Yes, I do.

Huq: It is true. (cries of shame, shame)

Khan Bahadur Mahammad Ali (Bogra): On your suggestion?

Sanyal (to Mahammad Ali) : would you kindly enlighten us ?

Proceeding Dr. Sanyal said : In the circumstances we feel that the House would be unanimous in demanding the recall of the Governor, Sir Jhon Herbert.

Nausher Ali (Speaker) : Order, order. Let us finish the business of the House. You may consider it on a subsequent occasion.

Sanyal : In view of the situation we want, first of all, a vote of confidence in Fazlul Huq.

Nausher Ali : In view of the statement of the Chief Minister no business can be done until a new Ministry is formed. The House stands adjourned.

৩১ মার্চ, সেকসন ৯৩-এর সহায়তায় লাট সাহেব প্রাদেশিক শাসনভার গ্রহণ করেন এবং ২৪এ এপ্রিল নাজেমুদ্দিন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।

হারবারটের মৃত্যুর পর আর. জি. কেসি. বাঙলার লাট সাহেব (জানুয়ারী ১৯৪৪) এবং লিনলিথগাউয়ের পরে ওয়াভেল বড় লাট হলেন (ফেব্রুয়ারী)। পেটো সাহেব ও ইংরেজ কর্মচারীদের ষড়যন্ত্রে এবং যুদ্ধের ডামাডোলে, "শ্যামা-হক" মন্ত্রিত্বের অবসানে এবং নাজেমুদ্দিন-সুরাবর্দ্দী-সাহবুদ্দীন-ইস্পাহানীর আগমনে বাঙলা দেশ গোরস্থানে পরিণত হতে চলল।

দুর্ভিক্ষ যতই ক্ষয় ক্ষতি করে থাকুক না কেন, নতুন ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোসলেম লীগ এই সব নারকীয় কাজে পেটো সাহেব এবং তাদের স্বদেশী কর্মচারীদের কাজগুলো অপ্রতিবাদে যতটা সহ্য করে থাকুন না কেন, এযুগের সবচেয়ে বড় দ্রষ্টব্য বিষয় ছিল যে কি কলকাতায়

কেবল অর্থনীতির দাপট এলনা, এর ওপর চাপান্ থাকল ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের, বিশেষ করে সংযুক্ত (বর্তমানে উত্তর) প্রদেশের—অ-বাঙালী রাজনীতির যার সঙ্গে বাঙলার কোন পূর্ব পরিচয় ছিলনা। মুক্তি দিবস (Deliverence Day), Committee of Action, National Guard কাদের জন্য এল বাঙলা দেশে? দুর্ভিক্ষে যে ক্ষয় ক্ষতি বাঙালী সহ্য করল তার চেয়ে অধিকতর সর্বনেশে হল সাধারণ বাঙালীর কাছে এইসব নতুন বিধি ব্যবস্থাগুলো।

সত্য বটে ছেচল্লিশ সালে নেতাজী সুভাষের সৃষ্ট আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতাদের দণ্ডাজ্ঞার প্রতিবাদে বাঙালী সর্বপ্রকার সরকারী বাধা অগ্রাহ্য করেও পুরানো জাতীয় ঐতিহ্যের ধারা কতকটা রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা' হল প্রদীপের শেষ রশ্মি। সে ক্ষেত্রেও সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন জাগাবার প্রয়াস করা হয়েছিল। যে সংহতি, যে ভাবের উন্মাদনা গত শতাব্দীতে নীলকর প্রতিবাদে বাঙালী দেখিয়েছিল, যা বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে স্বদেশী আন্দোলনে ফুলে-ফলে প্রস্ফুটিত করেছিল বাঙালী, যা বোমার বারুদ, রিভলভারের নল ও ফাঁসির দড়িকে প্রতীক করে রেখেছিল, সে সংহতি বিশের কোঠায় খেলাফতের ভেজাল সত্ত্বেও বাঙালীর কাছে নষ্ট হয়নি। ত্রিশের কোঠায় আবুল কাশেম ফজলুল হক সেই পুরানো বাঙালী সৃষ্ট-ঐতিহ্যে আর একটি নতুন ধারা সংযোগ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন—বাঙালী মুসলমানকে সঙ্গে নিয়ে।

যে মুহূর্তে ফজলুলের সেই নতুন ধারা সংযোগের কাজে বাধা এল তখন থেকেই বাঙলা দেশের ইতিহাস নতুন গতিপথ খুঁজে নিল। সে গতি পথে বাঙালীর নিজস্ব-ধারা কার হাতে কতটা রুদ্ধ হল, রং বদলালো, পাড় ভাঙ্গলো বা প্লাবন আনলো তাও আজ বড় কথা নয়। বড় কথা হল বাঙালী তার নিজের সৃষ্টি থেকে বিচ্যুত

হয়ে পড়ল। আজ বাঙালী মনের কামনা ছিন্ন ভিন্ন, বুড়ী-গঙ্গা ও ভাগীরথী-গঙ্গার পাড়ে। সে আজ পরমুখাপেক্ষী, অপর কেন্দ্রবিন্দু থেকে প্রেরণা না পেলে তার চলেনা। সে ভিক্ষুক, সে দয়ার পাত্র। বাঙালী হিন্দু হয়ে অতীতে ভারতবর্ষের পলিটিক্যাল ঐক্য ছাড়তে যেমন চায়নি, তেমনি মুসলমান হয়ে তার বাঙালীত্বের বনেদ যেখানে পড়ে আছে তা থেকে, অন্ততঃ আবুল কাশেম ফজলুল হক যত দিন সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন, স্থানচ্যুত হতে চায়নি।

কিন্তু আজ কি ভারতবর্ষে, কি ভারতবর্ষের বাইরে বাঙালী একটি নতুন জীব, তার নেই অতীত, নেই বর্তমান বা ভবিষ্যৎ।

চুয়াল্লিশ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বিধানসভায় নাজেমুদ্দিন মন্ত্রিসভার তরফ থেকে ফাইনান্স মন্ত্রী সুরাবর্দী যে বাজেট পেশ করলেন তাতে দেখালেন ২০ কোটি টাকা ঘাটতি হবে। ফজলুল তখন অসুস্থ। চিকিৎসকের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি সভায় উপস্থিত হলেন বাজেট সম্পর্কে তাঁর মতামত জানাতে। স্পীকার নৌসের আলিকে অনুরোধ করলেন, তাঁকে আসনে বসে বক্তব্য পেশ করতে অনুমতি দেওয়া হোক।

নৌসেরের আপত্তি ছিল না। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেরিত সদস্য ফজলুর রহমান আপত্তি করে মন্তব্য করলেন যে ফজলুল হককে আসনে বসে বক্তৃতা দেবার অনুমতি দিলে একটা bad precedent করা হবে। সে কথা হয়ত আজ ফজলুর রহমান নিজে ভুলে থাকবেন কিন্তু সাংবাদিকেরা ভোলেনি।

ফজলুল দ্বিতীয়বার অনুমতি প্রার্থনা করেননি। দাঁড়িয়ে লিখিত বক্তৃতা পাঠ করলেন। লিখিত বক্তৃতা ফজলুল হক আর একবার মাত্র পড়েছিলেন বিধানসভায়—সেকেণ্ডারী এডুকেশন বিল পেশ করবার সময়।

এই বাজেট সম্পর্কে যে মন্তব্য ফজলুল হক চুয়াল্লিশ সালে করেছিলেন তাই হয়েছিল তাঁর শেষ বক্তব্য—swan song। এই

বক্তৃতার মাধ্যমে ফজলুল হক রাজনীতির ক্রমবিকাশ, বাঙালীর ঐতিহ্য ও বাঙালী জীবনের দৌর্বল্য কোথায় তা' চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিলেন।

নিশ্চয়ই সুরাবর্দ্দী-সাহবুদ্দীনের পক্ষে সে বক্তৃতা অসহনীয় হয়ে পড়েছিল। এঁরা উভয়েই তখন বাঙলা দেশটাকে কুক্ষিগত করে ফেলে মন্বন্তরের পথে ঠেলে দিয়েছেন, নতুন বাঙলা দেশ গড়ে তুলবার উদ্দেশ্যে। বক্তৃতায় এক স্থানে ফজলুল বলেছিলেন : I have said that there is, constitutionally speaking, no Government in Bengal. কেন? তার উত্তরে জানালেন Here the Ministers are not responsible to the legislature at all, but are responsible to Mr. Jinnah as the head of the Muslim League. So long as the Ministers have the approval of Mr. Jinnah, they need not concern themselves about the views of individual members, because they know that the members supporting them do not care for the opinions of their constituencies but are anxious to secure the good opinion of Mr. Jinnah. This may sound surprising but it is nevertheless a fact.

মুসলমানদের পলিটিক্যাল শ্রেণী বিন্যাস করে দেখালেন তাদের দুটো দল আছে। Muslims outside the Muslim League belong to two classes; firstly those who accept the League but who cannot join the League on account of the autocracy of Mr. Jinnah, secondly those who are opposed to the very ideology of the League and cannot, therefore, conscientiously become members of the League and accept the leadership of Mr. Jinnah.

It so happens however that although the Muslims outside the League are numerically superior to those in the League they are utterly disorganised and are no match for the political and diplomatic manoeuvres of Mr. Jinnah. এ অবস্থা কেমন করে এল ফজলুল তাও জানিয়েছিলেন : Unforeseen circumstances have also helped the Muslim League. During the Congress regime of Provincial Autonomy in seven provinces the Congress volunteers and officials were in many cases guilty of indecent excesses which were strongly resented by Muslims as encroachments on their legitimate rights and which created a strong anti-Hindu feeling in the minds of the Muslims throughout India. The Muslim League was quick to seize the opportunity. By unceasing propaganda and clever distortions of facts they managed to rouse the passions of the Muslim multitude against the Congress and as a next step against the Hindu community. Muslims were thus naturally drawn towards the Muslim League as the only organised political body among the Muslims and as their only heaven of refuge against Hindu opposition.

British Imperialistic policy also favoured the growing political strength of the Muslim League as the Government expected to be able to set up the Muslim League against the political ascendeney of the Congress. The result is that the Muslim League

has now got a foothold in hand which is not justified by the extent to which it can truly claim to be representative of the Muslim interests.

এ বিষয়ে নিজের বক্তব্য সুস্পষ্ট করে ফজলুল হক জানালেন: It is not the Ministers functioning under the Government of India Act that are ruling Bengal but it is the autocracy of Mr. Jinnah which guides the Administration. And Mr. Jinnah is exercising all this authority without being hampered by any responsibility to anybody.

বাঙলাদেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করে ফজলুল বলেছিলেন তাঁর অভিজ্ঞতার কথা—সেই ১৯১২ সালের মিণ্টো-মর্লে রিফরম্স্ এর সময় থেকে যখন তিনি বিধান সভায় প্রথম এসেছিলেন। বাঙলাদেশের এমন দুর্গতি কখনও তিনি দেখেন নি। Bengal is also one of the poorest of the Indian provinces, not merely from the economic point of view but also in the matter of dearth of public men to fight for the rights of the people.

I have always been proud of Bengal, proud of its achievements in the fields of Science, Literature and Art ; of Law and Medicine ; of Philosophy and Politics and also in all those elements of culture which are the pride and glory of every civilised nation. I will not talk of other matters but I will only refer briefly to the political bankruptcy into which Bengal has fallen. This pitiable and much despised Bengal of today is the Bengal which produced W.

C. Banerjee, Surendra Nath Banerjea, Narendra Nath Sen. Motilal Ghosh, Bhupendra Nath Bose, Lalmohon Ghosh, Shamsul Huda, Abdul Rasul, Ashwini Dutt, Ambica Majumdar and others too mumerous to mention. I remember the days previous to the introduction of Minto-Morley Reforms when Bengal was supposed to be under the administration of irresponsible bureaucrats and when the political privileges now enjoyed by the people were utterly unknown. But in those days of autocracy if anything were to happen which was likely to go against the interests of the people in a slightest degree, the public platform and the press would ring with denunciations of the Government conduct and Government policy, and in the vast majority of cases public protests used to prevail. But what is the case to-day ? On their own showing and according to their own admission, the Ministers by their irresponsible policy and reckless extravagance have brought about one of the most devastative famines known to history. And when the cup of misery of the people was full, horrible atrocities were perpetuated on the poor and the helpless destitutes of Calcutta on the plea of removing them to suitable habitations elsewhere. I have seen dire scenes of horror which it is impossible for me to describe but not even the hundredth part of these atrocities

would have been possible even 30 years ago. Now everything is possible because there is none to protest. Throughout Bengal there is none who seems prepared to raise his little finger to save his people from oppression or from the policy of the Ministers which may bring about ruin and devastation in the country.

ফজলুলের সাবধান বাণী সজোরে উচ্চারিত হলেও আর দেশ সাড়া দেয়নি। তখন থেকে বাঙালীর দৃষ্টি পড়ল বাঙলার বাইরে এমন সব চরিত্রের ওপর যাঁরা দেশের মর্মবাণী কোনদিন ধরতে পারেন নি বা পারবার চেষ্টা করেন নি। বাঙলা দেশ হল পরীক্ষা-নিরীক্ষার কেন্দ্র (laboratory) বাঙালী হল খরগোস বা গিনিপিগ এবং তাঁর ওপরে এবং সমাজে চলল নতুন নতুন পরীক্ষা যার কোনই নজীর অতীতে ছিল না।

কেমন করে পরিণামে নাজেমুদ্দিন মন্ত্রিসভার অবসান হল, কেমন করে পাকিস্তান দাবি সর্বগ্রাসী হয়ে পড়তে লাগল তা বিবৃত করেছি। নাজেমুদ্দিন মন্ত্রিসভা যে বেশীদিন চলতে পারবেনা তা' বুঝতে পারা গেল যখন বিধানসভায় (১৫ই জুন ১৯৪৪ সাল) মন্ত্রী বরদা প্রসন্ন পাইনের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এল। অনাস্থা প্রস্তাব বাতিল হল বটে—মন্ত্রীর স্বপক্ষে ১১৯ ও বিরুদ্ধে ১০৬ ভোট পড়েছিল—কিন্তু নলিনাক্ষ সান্যাল সেদিন যেরূপ মুখ-খোলা বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাতে মন্ত্রিসভার মর্যাদা সম্পূর্ণভাবে ধুলিসাৎ হয়ে পড়েছিল। তাড়াতাড়ি সভা বন্ধ করে রেহাই পেলেন স্যার নাজেমুদ্দিন।

উনিশ শ' পয়তাল্লিশ সাল এসে পড়ল। বাজেটের একটা দফা ভোটের জোরে পেশ করতে না পারাতে স্পিকার নৌসের আলি তাঁর ঐতিহাসিক রায় (ruling) দিলেন। লাটসাহেবকে মন্ত্রি-সভা বাতিল করতে হল।

আবার নির্বাচন এসে পড়ছে। কংগ্রেস ও মোসলেম লীগের কর্তা-ব্যক্তিদের মনের ভাবটা কি প্রকার তখন হয়ে পড়েছিল তার আভাস পাওয়া যায় কায়েদে আজমের এবং জবাহরলাল নেহরুর বক্তব্য থেকে। করাচীতে (১৩ই জানুয়ারীতে) কায়েদে আজম বললেন: Pakistan is a certainty if we are united. We assure the Hindus and the Christians and other communities that in fighting for Pakistan we are fighting for the whole country.

ভারতীয় জাতীয় আর্মির (Indian National Army) প্রধানদের বিচার চলছে। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক নিয়ে এমন অবস্থান্তর এসে পড়েছে যে মিয়া ইফতিখারউদ্দীন যিনি এতদিন ধরে লীগকে অগ্রাহ্য করে পাঞ্জাবের প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনিও পদত্যাগ করে লীগে ঢুকে পড়লেন। নেহরু সে সময়ে বলেছিলেন (৫ই অক্টোবর ১৯৪৫ সাল) There is much talk about War criminals. The time is not far off when we shall prepare our list of anti-national criminals—those who mercilessly crushed the spirit of our patriots, who opened fire on them, who accepted bribe and sucked the blood of the poor, we shall never forget them. এ সবই স্বপ্নবিলাসীর কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। বাস্তব মাটির ওপর দাঁড়াতে তখনও কংগ্রেসী নেতৃত্ব নারাজ।

কেবল বল্লভভাই প্যাটেল, মনে হয়, আগামী দিনের অবস্থা সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে পেরেছিলেন। কম্যুনাল এ্যাওয়ার্ড স্বীকার করে দেশে—বিশেষ করে বাঙলাদেশে—যে ভুলের বীজ বপন করা হয়েছিল তখন ফলপ্রসূ। বোম্বেতে সর্ব-ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে—এখানেই কম্যুনিস্টদের কংগ্রেস থেকে তাড়িয়ে দেওয়া

হয় (২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ সাল)—ইফতিখারউদ্দীন লীগের সঙ্গে বোঝাপড়া করবার যুক্তি শুনালে প্যাটেল তাঁকে লীগে যোগদান করতে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন: Congress had done everything to meet the League in the past. Every possible concession, Communal Electorate, fifty-fifty reprsentation (হায়, ভুলাভাই দেশাই!) parity had been made to the League. But Mr. Jinnah wanted to pull out Moslems from the Congress. The League had proclaimd those Moslems in the Congress as kaffirs and then declared that the Congress did not represent Moslems.

এর পরে যা বলেছিলেন সেখানেই ভারতবর্ষের সর্বনাশ কোথায় এবং কবে করা হয়েছিল সে কথা নিজেই স্বীকার করে গেছেন অকপট ভাষায়: The acceptance of the principle of Communal Electorate was a mistake. It has created the problem.

ত্রিশের কোঠায়—বিশের কোঠার কথা ছেড়ে দিলেও—যখন সে কম্যুনাল এ্যাওয়ার্ড এল তখন বাঙলার বা সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব কেউই সেদিকে দৃষ্টিপাত করেন নি বরং সে এ্যাওয়ার্ডের বিরোধিতা সাম্প্রদায়িক দুষ্ট মনোভাব বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

*　　　*　　　*　　　*

অ-বাঙালী মুসলমানেরা এবং পেটো সাহেবদের সরকারী মুখপাত্র, গভর্ণর হারবারট, ষড়যন্ত্র করে ফজলুল হককে গদীচ্যুত করবার পর থেকেই বাঙলা দেশের নব জাগ্রত মুসলমান জনতার নেতৃত্ব করবার অধিকারী লীগের তরফ থেকে কে করবে তা' নিয়ে সুরাবর্দ্দী ও নাজেমুদ্দিনের মধ্যে মনান্তর এসে পড়েছিল।

সুরাবর্দ্দীই কলকাতার অ-বাঙালী মুসলমানদের সঙ্গে সেই

স্বরাজী যুগ থেকে পরিচিত। পরে খেলাফত আন্দোলন বন্ধ হলে অতৃপ্ত মোসলেম আকাঙ্ক্ষা নতুন কোন পথে নিয়ন্ত্রণ করবার সুযোগ বের করতে অসমর্থ হয়ে সেই পুরানো সাম্প্রদায়িক দুষ্ট রন্ধ্রে প্রবেশ করাতে সুরাবর্দ্দীই নায়ক। নাজেমুদ্দিনকে ইংরেজ সিভিলিয়ানেরা হাতে খড়ি দিয়ে তালিম দিলেও কোনদিনই তিনি সুরাবর্দ্দীর মতন কলকাতার এবং সহরের আশে পাশে কল-কারখানার অ-বাঙালী শ্রমিকদের কাছে বিশেষ পাত্তা পাননি। রাজাবাজারে তিনি হোম মিনিস্টার হয়েও এবং খাস উর্দু বাতচিত করেও মহরম মিছিল-কারীদের কাছ থেকে ইঁট পাটকেল খেয়ে পালাতে বাধ্য হয়েছিলেন। সুরাবর্দ্দী ও নাজেমুদ্দিনের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব নিয়ে, ফজলুল হকের নেতৃত্বের অবসানে, কলকাতার সাহেবী ও অ-বাঙালী মুসলমান মহলে দুটো ভাবধারা প্রকট হল।

সাহেবরা বাঙালী হিন্দুদের জব্দ করতে আগ্রহী, মুসলমানের সাহায্যে। কিন্তু কে নেতৃত্ব করবে? সুরাবর্দ্দী না নাজেমুদ্দিন? সাহেবরা চাইল নাজেমুদ্দিনকে—কারণ তা'রা সুরাবর্দ্দীকে পূর্ব থেকেই চিনত। সুরাবর্দ্দী চতুর, জনপ্রিয় এবং ভবিষ্যতে কি করে নেতৃত্ব রক্ষা করতে হবে সেদিকে তাঁর দৃষ্টি সতত প্রখর। এই নেতৃত্ব রক্ষার জন্যই প্রথম স্বরাজী ডেপুটি-মেয়র হয়ে, যখন চিত্তরঞ্জন দাশ নিজে মেয়র, তখন পীরের মৃতদেহ জোর করে কবরস্থ করে ফেলেছিলেন হগ মার্কেটে, সব প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে। তখনও হগ মার্কেটে সাহেবী দাপট বা প্রতিপত্তি অব্যাহত। সাহেবরা বিস্মিত হল সুরাবর্দ্দীর কাণ্ডকারখানা দেখে! বে-সরকারী ও সরকারী সাহেবী মহলে সুরাবর্দ্দী সেদিন থেকেই অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে পড়েছিলেন।

হারবারট ফজলুল হককে যখন গদিচ্যুত করলেন তখন এই ধারণা নিয়েই করেছিলেন যে নাজেমুদ্দিনকে প্রধানমন্ত্রী করে হবে। সুরাবর্দ্দী জানতেন, সাহেবরা কিছুতেই তাঁকে সেই অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী করতে রাজী হবে না। কিন্তু চল্লিশের কোঠায় লীগ

পলিটিক্স যে রূপ নিয়েছে, যে দাবি করেছে তাকে সজোরে পেশ করতে যে কলিজার দরকার তা নাজেমুদ্দিনের ছিল না। অ-বাঙালী মুসলমান জনতাও পূর্বযুগের সাহেবদের মতামত লক্ষ্য রেখেই নাজেমুদ্দিনকে বাঙলার নেতৃত্ব দিতে রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু হতভাগা বাঙালীরা তা অগ্রাহ্য করে ফজলুলকে সিংহাসনে বসাল। আবার সেই হেরো-সর্দার নাজেমুদ্দিনকে নেতা বানাতে লীগের অ-বাঙালী কর্মকর্তাদের তেমন ইচ্ছা ছিল না। ছিল না বলেই যেদিন থেকে ফজলুলের সঙ্গে লীগ নেতৃত্বের মতান্তর শুরু হয়েছিল (সেই মাদ্রাজ লীগ সেসন থেকে) সেদিন থেকে বাঙলা দেশ সম্পর্কে লীগের কর্মধারা চালু করবার সব উপদেশই সুরাবর্দ্দীর কাছে আসত। অ-বাঙালী মুসলমানদের কর্ণধার ইস্পাহানী দেখলেন সুরাবর্দ্দীকে সামনে রেখে কাজ করতে অনেক সুবিধে। পাকিস্তান দিবস, মুক্তিদিবস, কমিটি অফ্ একসন, ন্যাশানেল গার্ড প্রভৃতি তখন বড় বড় হাতিয়ার। এসব হাতিয়ার গড়ে তুলতে হলে সুরাবর্দ্দী কলকাতার অ-বাঙালী মুসলমানের সহায়তায়, যেমন কর্মকুশলতা দেখাতে পারবেন নাজেমুদ্দিনের পক্ষে তা' একেবারে অসম্ভব।

কিন্তু এ সব বিচারের ওপর স্থান পেল জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালনা, দুর্ভিক্ষের দ্বারা বাঙালীকে মুষড়ে ফেলবার প্রচেষ্টা, মেদিনীপুর ও অন্যান্য স্থানে হিন্দু বাঙালী দত্ত বাধাগুলো উপড়ে ফেলবার ব্যবস্থা। এ সব কাজে নাজেমুদ্দিনকে দিয়ে কাজ চালনা যতটা সহজসাধ্য সুরাবর্দ্দীকে দিয়ে করান ততোধিক অনিশ্চিত।

সুরাবর্দ্দী অবস্থা বুঝে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আবার অপেক্ষা করতে রাজী হলেন।

নাজেমুদ্দিন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু আগামী কালে যে তিনি আর কোন পাত্তা পাবেন না তা' প্রধানমন্ত্রী হয়েই বুঝতে পেরেছিলেন। অধিকার সব কিছুতেই—কেবল এক হোম-ডিপার্টমেণ্ট ছাড়া—

সুরাবর্দ্দীর। নাজেমুদ্দিনের পাত্তা আর কোনখানেই থাকল না। আর হোম ডিপার্টমেণ্ট! সেও তখন চালাচ্ছে পোর্টার, হারবার্টের সহায়তায়। নাজেমুদ্দিন রবার-সীল মাত্র।

সে রাজত্বও যখন নৌসের আলির রুলিংএ টিকতে পারল না তখন সুরাবর্দ্দীর প্রতিপ্রত্তি চারিদিকে ব্যাপ্ত। আবার নির্বাচন এসে পড়ল (১৯৪৬)। এবার সুরাবর্দ্দী লীগের নায়ক। নাজেমুদ্দিনের নামগন্ধও কেউ আর করলেন না। লীগের অন্দরমহলে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে সুরাবর্দ্দী তাঁকে কোন-ঠাসা করে ফেলেছেন। লীগ সেক্রেটারী ও সুরাবর্দ্দী-আত্মীয় আবুল হাসেম তাঁর সহায়। নাজেমুদ্দিনের সমর্থক আজাদ-সম্পাদক, মৌলানা আক্রাম খাঁন, সুরাবর্দ্দীর বিরুদ্ধে হাতিয়ার চালিয়েও তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারেন নি। মনের দুঃখে মধুপুর থেকে কাগজে স্টেটমেণ্ট দিয়ে জানালেন যে ছে-চল্লিশে কলকাতার বুকের ওপর যে 'সিভিল ওয়ার' শুরু হল এবং যে 'সিভিল ওয়ার' পাকিস্তান রূপায়নে সর্বাপেক্ষা বেশী কার্যকরী হল তার জন্য দায়ী সুরাবর্দ্দী স্বয়ং।

নির্বাচনে প্রতিপক্ষে আবার আবুল কাশেম ফজলুল হক। এবারকার লীগ সেই পঁয়ত্রিশের লীগ নয় এবং এবার নায়ক নাজেমুদ্দিন নন, হুসেন সহিদ সুরাবর্দ্দী, যিনি বাঙালী হলেও মানুষ হয়েছেন উর্দু-মহলে। বাঙলা যেন তাঁর কাছে জোর করে শেখা ভাষা। কি করে পলিটিক্যাল প্রতিপত্তি গড়তে হয় তা' শিক্ষা পেয়ে এসেছেন স্বরাজী যুগ থেকে। সঠিক ধরতে পেরেছেন যে মুসলমানদের "জাতীয়তাবোধ" সম্পূর্ণভাবে লুকিয়ে আছে হিন্দু-দ্বারা গঠিত সবকিছু ভাবধারার বিকল্পাচরণের মধ্যে। সে জাতীয়তা বোধের কোন অস্তিবাচক (positive) প্রোগ্রাম নেই, বা সে প্রকার কোন প্রোগ্রাম-এর কাঠামো প্রস্তুত করতে যে কাঠ-খড়ের প্রয়োজন হয় সমাজ-সেবার দ্বারা এবং তা' জোগাড় করতে হলে যে অধ্যবসায় ও যে পরিশ্রমের প্রয়োজন তা' সেদিন বা সে-যুগে

সুরাবর্দ্দী দেখাতে পারেন নি। সোজা পথ হল সর্বপ্রকারে হিন্দুর বিরুদ্ধাচরণ করা। লীগের তরফ থেকে সুরাবর্দ্দী সেই সহজ কর্মপন্থা গ্রহণ করলেন।

উনিশ শ ছেচল্লিশের নির্বাচনে বাঙলার বিধান সভায় নির্বাচিত হলেন ৮৬ কংগ্রেস, ১১০ লীগ, হিন্দুমহাসভা তিন, কম্যুনিস্ট তিন, অ-লীগ মুসলমান বারজন এবং ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট বারজন। সাহেবরা ২৪ জন ত' থাকলই। সুরাবর্দ্দী নিজে এই নির্বাচন যুদ্ধ চালিয়েছিলেন। সেদিন প্রতিবাদ উঠেছিল যে বাঙলা-দেশে লীগের তরফ থেকে নির্বাচন 'ক্যাম্পেনে' সরকারী সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। সুরাবর্দ্দী অস্বীকার করেছিলেন সে অভিযোগ।

আজ এতদিন পরে সে বিষয়ে মন্তব্য করতে হলে স্বীকার করতে হবে যে সুরাবর্দ্দী সঠিকই বলেছিলেন। একটু আধটু, এদিকে ওদিকে হস্তক্ষেপ যাই কিছু হয়ে থাকুক না কেন, এপারের এবং ওপারের বাঙালী মুসলমান মাত্রই যে ১৯৪৬ সালে লীগ-পন্থী হয়ে পড়েছিলেন তা' অনস্বীকার্য। ঠিক তেমনি বাঙালী হিন্দুর মনোভাবেরও যে পরিবর্তন তখন এসে পড়েছে তাও পরিষ্কার ভাবে ধরা যায় বিধান সভাতে সমসংখ্যক হিন্দু-মহাসভা ও কম্যুনিস্ট প্রতিনিধি প্রেরণের মধ্যে।

সে নির্বাচনে সুরাবর্দ্দী আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন একমাত্র আবুল কাশেম ফজলুল হককে হটাতে। বেশ বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই বৃদ্ধ বাঙালী-প্রধানকে বিধান-সভা থেকে দূরে রাখতে পারলেই তাঁর পলিটিক্যাল কৃতিত্ব স্বীকৃতি পাবে। সুরাবর্দ্দী লীগের তরফ থেকে এবং "আজাদের" সহায়তায় ফজলুলের বিরুদ্ধে যত কিছুই নোংরামী দেখান না কেন, পূর্ব বাঙলার বাঙালী মুসলমান ফজলুলকে ভোলেননি। বারজন অনুচর দিয়ে ফজলুলকে বিধান সভায় তাঁরা সেবারও পাঠিয়েছিলেন তাঁদের প্রতিনিধি করে।

লীগ-বিদ্রোহী ফজলুলের রাজনৈতিক শেষ অবদান এল

কনস্টিটুয়েণ্ট এসেমব্লীর নির্বাচন উপলক্ষে। বিধানসভায় সেদিন ঘোরতর উত্তেজনা। সুরাবর্দ্দীর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যাতে লীগ প্রতিনিধি ছাড়া আর কেউ নির্বাচিত না হয়। ফজলুল সেদিন সহায় সম্বলহীন। তাঁর আজন্ম-অর্জিত বাঙালীত্বের দাবি সে মুহূর্তে বাঙালী মুসলমানের কাছেও ধিক্কার পাচ্ছে—অ-বাঙালী মুসলমানদের কথা না বলাই ভাল। তবুও তিনি ছিলেন অবিচলিত এবং কনস্টিটুয়েণ্ট এসেমব্লীতে বাঙালী কৃষক-প্রজার তরফ থেকে দাঁড়াবেন স্থির করে নাম পাঠালেন।

এত বড় স্পর্ধা! সুরাবর্দ্দীর সমস্ত আক্রোশ সেদিন ভেঙ্গে পড়েছিল ফজলুল হকের ওপর। বাঙালী মুসলমানদের এবং লীগের তাঁবেদার মল্লিক ভাইদের সিডিউল্ড কাস্ট ভোটের জোরে লাক্ষ্ণৌএর নবাবজাদা লিয়াকৎ আলি খাঁ এবং ডাঃ আমবেদকরকে বাঙলার বিধানসভা থেকে সে এসেমব্লীতে পাঠান যেতে পারে। কিন্তু ফজলুল হককে? কদাপি নয়।

ভোটের ফলাফল যখন প্রকাশ পেল তখন দেখা গেল আবুল কাশেম ফজলুল হক, সুরাবর্দ্দীর সর্বপ্রকার বাধা অগ্রাহ্য করে, বাঙালী মুসলমানের ভোটের সাহায্যে কনস্টিটুয়েণ্ট এসেমব্লীতে নির্বাচিত হয়েছেন। বাঙালী মুসলমান বাঙালী-প্রধানের সম্মান রক্ষার্থে ইতিহাসের সেই যবনিকা পতনের মুহূর্তে পশ্চাৎপদ হননি। মাথা উঁচু করে শের-ই-বঙ্গাল সহাস্যে বিধানসভা থেকে বেরিয়ে এলেন।

কনস্টিটুয়েণ্ট এসেমব্লীতে নির্বাচনপ্রার্থী হয়ে সাফল্যলাভ হল অবিভক্ত বাঙলায় ফজলুল হকের রাজনৈতিক জীবনের শেষকৃত্য।

উনিশ'শ ছেচল্লিশ এবং সাতচল্লিশ সালের প্রতিটি দিন বাঙলা দেশের ইতিহাসের মাল মশলা নিয়ে ভরপুর। কত চরিত্রেরই না উত্থান-পতন সে দুটি বছরে ঘটেছে! কিছুটা ইঙ্গিত এ লেখার কোন কোন স্থানে খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু সে কাহিনী

এখানে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। প্রকৃতি যে দেশকে অখণ্ড করে করে রেখেছে, যে দেশের মাটির সঙ্গে যে মানুষের দেহ এবং মন নিবিড়ভাবে যুক্ত, কেমন করে কেবল বৈদেশিক ষড়যন্ত্রে, ঘটনার সমারোহে এবং ব্যক্তি-বিশেষের আজব কাণ্ড কারখানায় দ্বিখণ্ডিত হ'ল তারই অবতারণা এখানে।

যে সর্বনাশক থিয়োরীর ওপর দাবি প্রতিষ্ঠা করে দেশ দ্বিখণ্ড করা হ'ল তার সমর্থকেরা এর ওপর যে মন্তব্য পেশ করে গেছেন তা' যখন ভবিষ্যতের অনুসন্ধিৎসু বাঙালী বিচার করবেন তখন তাঁদের ধারণা করতে একটুও বাধা থাকবে না যে অতীতে যেমন "নীল বানরে সোনার বাঙলা" একদা ছারখার করেছিল তেমনি বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের কোঠা থেকে সাতচল্লিশ সাল তক পশ্চিমাগত পঙ্গ-পালের দল পূর্বাপেক্ষা অধিকতর মারাত্মক ধরনের বিষ সমাজ-দেহে প্রয়োগে সে সর্বনাশ সাধন করেছিলেন। এই বিষ হ'ল দ্বি-জাতি থিয়োরী—Two Nation theory. হিন্দু ও মুসলমান এক দেশের মানুষ এবং এক ভাষার অংশীদার হলেও, এমনকি এক পরিবারে জন্ম-গ্রহণ করলেও কেবল হিন্দু বা মুসলমান বলেই তা'রা দুই জাতীয় মানুষ বলে গণ্য হবে। এই থিয়োরীর ওপরই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত।

পাকিস্তান রূপায়িত হলে এই থিয়োরীর উদ্‌গাতা কায়েদে আজম মহম্মদ আলি জিন্না গভরনর-জেনারেল হয়ে করাচী যাত্রার পূর্বে এই দ্বি-জাতি তত্ত্বের বিষে তাঁর নিজের সম্প্রদায় কিভাবে জর্জরিত হবে সে চিন্তায় মুষড়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তখন নান্যপন্থা বিদ্যতে।

সাতচল্লিশ সালের পয়লা আগষ্ট তারিখে দিল্লীর ১০নং আওরঙ্গজেব রোড বাসভবনে কেন্দ্রীয় বিধানসভার মুসলমান-সদস্যদের এক বিদায়-ভোজে জিন্না নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সেই সভাতে মুসলমান-সদস্যদের কেউ কেউ যখন বাস্তব-চিত্রখানা তাঁর

চোখের সামনে তুলে ধরলেন তখন দ্বি-জাতি তত্ত্বের পরিণাম দেখে কায়েদে আজম হতবাক। সে চিত্রের প্রতি দিকপাত করতে জিন্না আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। চৌধুরী খলিকুজ্জমান সে বিদায়-ভোজে উপস্থিত ছিলেন এবং লিখেছেন, আমি কখনও জিন্নাকে এত বিষাদগ্রস্ত হতে দেখিনি (I had never before found Jinnah so disconcerted as on that occasion.)

যে সংখ্যানুপাতের অঙ্কের ওপর নির্ভরশীল হয়ে জিন্না-চালিত মোসলেম লীগ দেশ-বিভাগ দাবি সুপ্রতিষ্ঠিত করে ফেল্‌ল সেই একই অঙ্কের মাধ্যমে যে প্রদেশ-বিভাগ দাবি আসতে পারে তা' যেমন অপ্রত্যাশিত ছিল একদেশ-দর্শী লীগ-নায়কের কাছে তেমনি ছিল তাঁর একান্ত অনুগত লীগ-উপনায়কদের কাছে। প্রথম দাবি আর প্রত্যাহার করবার শক্তি কায়েদে আজমের ছিল না, ফলে দ্বিতীয় দাবিও অস্বীকার করতে পারলেন না। প্রদেশ-বিভাগ দাবি কি প্রতিক্রিয়া এনেছিল তারও পরিচয় তাঁর মন্তব্যগুলোর মধ্যে ধরা পড়ে আছে। লেংড়া ও ঘুণ-ধরা পাকিস্তান অথবা পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে পূর্ব-বাঙলা পর্যন্ত "করিডর" প্রার্থনা সেই মানসিক বিকারগুলোর প্রকাশ মাত্র।

সর্বোপরি এল এই দ্বি-জাতি তত্ত্বের শেষ দান। যা'রা এতদিন ধরে বুঝিলাম বা বুঝিলাম-না দ্বন্দ্বের কোন প্রকার মীমাংশা না করে কায়েদে আজমের দ্বি-জাতি তত্ত্বের মহিমা কেবল কীর্তন করে এসেছেন, পাকিস্তান রূপ নেবার পর দেখলেন যে তাদের অনেককেই হিন্দু-অধ্যুষিত ভারতবর্ষেই থাকতে হবে! যে নতুন ধরণের ইতিহাস-পাট কায়েদে-আজমের নির্দেশে তা'রা এতদিন ধরে করে এসেছিলেন, এ অবস্থান্তরে তাদের কি হবে? বিদায়ী ভোজে দ্বিজাতি তত্ত্বের ইতিহাসের ভাষ্যকার মহম্মদ আলি জিন্না নিরুত্তর।

করাচীতে পৌঁছে জিন্না এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। স্বীকার করেননি যে তিনি ভুল বুঝেছেন বা ভুল করেছেন, যে ভুলের মাসুল

সহস্র সহস্র নর-নারীকে দিতে হয়েছে এবং হচ্ছে। তবে প্রকারান্তরে এবং উকিলী-চালে এ দ্বি-জাতি তত্ত্ব প্রকাশ্যে প্রত্যাহার করেছিলেন সাতচল্লিশ সালের এগারোই সেপ্টেম্বর তারিখে পাকিস্তান কনস্টি-টুয়েন্ট এসেমব্লী উদ্বোধনে জিন্না করাচীতে যে ভাষণ দেন তাতেই ধরা পড়ে তাঁর শেষ বক্তব্য এই দ্বি-জাতি তত্ত্বের ওপর।

জিন্না আবেদন করলেন: অতীতকে ভুলে যাও, সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধি প্রত্যাহার করো, হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ অস্বীকার করো এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে নতুন রাষ্ট্র গড়ো। তোমরা যে কোন ধর্মাবলম্বী হওনা কেন, তোমাদের সামাজিক বিধিব্যবস্থা যাই থাকুক না কেন, রাষ্ট্র পরিচালনে সে সবের কোনই স্থান নেই।

দ্বি-জাতি তত্ত্বের আবিষ্কারক ও উদ্গাতা মহম্মদ আলি জিন্নার এই ভাষণ তার পাকিস্তান রূপায়ণের সমগ্র চেষ্টার ওপর ব্যঙ্গ স্বরূপ চিরকাল বিরাজ করবে। সে ভাষণ তিনি যথাযথ ভাবে ইংরেজীতেই দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন: Now if you want to make this great State of Pakistan happy and prosperous we should wholly and solely concentrate on the well-being of the people and specially the masses and the poor. If you will work in cooperation forgetting the past burying the hatchet, you are bound to succeed. If you change your past and work together in a spirit that every one of you, no matter to what community he belongs, no matter what relations he had with you in the past, no matter what is his colour or creed, is first, second and last a citizen of this State with equal rights, privileges and obligations there will be no end to the progress you will make........I

cannot emphasise it too much. We should begin to work in that spirit and in course of time all these angularities of the majority and the minority communities, the Hindu community and the Moslem community—because even as regards Moslems you have Pathans, Punjabees, Shias, Sunnis and so on and among the Hindus you have Brahmins, Vaisyas, Khatris, also Bengalis, Madrasis and so on—will vanish. Indeed, if you ask me, this has been the biggest hindrance in the way of India to attain freedom and independence, and but for this we would have been free people long ago.... you may belong to any religion or caste or creed that has nothing to do with the business of the State.

সদ্য নিকট-অতীতকে ভুলে, পাকিস্তান রূপায়ণের পূর্বমুহূর্তে যে-সব ঘটনা ঘটেছিল তা' অস্বীকার করে, যে সব দাবির ওপর দেশ-বিভাগ হ'ল তা অগ্রাহ্য করবার শক্তি সমাজে তখন থাকুক বা নাই থাকুক, জিন্নার এই ভাষ্য যে দ্বি-জাতি তত্ত্বকথার অভিনব ব্যাখ্যা মাত্র হয়ে থাকল নতুন রাষ্ট্রের কাছে তা' বলাই বাহুল্য।

দ্বি-জাতি থিয়োরীর ওপরে ভিত্তি করে যে পাকিস্তান সৌধ নির্মাণ করা হ'ল তার বাস্তব-রূপ দেখে কায়েদে আজমের মতন অন্যান্য উপনেতারাও কম চমকিত হন নি। হোসেন শহীদ সুরাবর্দী নাটকের পঞ্চম অঙ্কে অভিনয় করতে গিয়ে দেখলেন—সাজানো বাগান শুকিয়ে গেছে। আত্মীয় ও লীগ-সেক্রেটারী আবুল হাসেম, ক্যাবিনেট-সহযোগী মহম্মদ আলি (বগুড়া), ফজলুর রহমান (ঢাকা ইউনিভারসিটি) এবং ডাঃ আবদুল মালেককে (নদীয়া) সঙ্গে করে শরৎচন্দ্র বসু ও কিরণশঙ্কর রায়ের সঙ্গে "সভারেন বেঙ্গল" গঠনে

তখন ব্যস্ত। গান্ধীজী সে প্রস্তাব বিবেচ্য মনে করেছিলেন কিন্তু রাজনৈতিক তাপ-মাত্রা এমন পয়েণ্টে তখন পৌঁছেছে যে বাঙালীরা বা গান্ধীজী যথাসাধ্য চেষ্টা করেও যা' অবশ্যম্ভাবী তা' রোধ করতে পারেন নি। কিরণশঙ্কর সে মুহূর্তে একবার বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে যা' শুনেছিলেন তাই সঠিকভাবে সেদিনকার ভারতবর্ষের বিকার-দশার অবস্থা নির্ণয় করে। মাউণ্টব্যাটেন নাকি কিরণশঙ্করকে বলেছিলেন যে গোটা দেশের মধ্যে কেবল দুটো প্রাণীই দেশ-বিভাগ চায় না—এক তিনি (মাউণ্টব্যাটেন) এবং অপর জন হলেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।

বাঙালীদের সেই শেষ যুক্ত চেষ্টা, "সভারেন বেঙ্গল" কল্পনা, কতদূর গড়িয়েছিল তা' গান্ধীজীর সেক্রেটারী পিয়ারীলাল গান্ধী-জীবনীতে লিপিবদ্ধ করেছেন। গান্ধীজী বলেছিলেন যে "সভারেন বেঙ্গল" অথবা পরে যদি বাঙলা দেশ পাকিস্তান অথবা ভারতবর্ষের সঙ্গে যুক্ত হতে চায় তবে সে সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য হবে কেবল মাইনরটী হিন্দুদের তিনভাগের দুইভাগ সমর্থন করলে। It seems that till last Sarat Bose could not get either Suhrawardy or Moslem League to agree to Gandhiji's stipulation that every act of the Government—including the decision about Sovereign Bengal or its subsequent joining India or Pakistan—must carry with it the cooperation of at least two-thirds of the Hindu minority in the execution and in the legislature. What appeared in its place in the amended clauses (of the draft) was an overall two-thirds majority.

সাতচল্লিশ সালের ৬ই জুন দিল্লীতে শরৎ বসু "সভারেন বেঙ্গলের" শেষ খসড়া রদ-বদল করে গান্ধীজীর কাছে পেশ করলেন, কিন্তু তার পূর্বেই লীগ ও কংগ্রেস নেতৃবর্গ মাউণ্টব্যাটেনের দেশ-

বিভাগ প্রস্তাব গ্রহণ করে ফেলেছেন। "সভারেন বেঙ্গল" কল্পনা আপনা থেকেই বাতিল হয়ে গেল।

শরতের সঙ্গে গান্ধীজী এই বিষয়ে যে শেষ পত্রালাপ করেছিলেন তা'তে জানিয়েছিলেন যে বিষয়টী নিয়ে সর্দার প্যাটেল ও জবাহরলাল নেহরুর সঙ্গে তাঁর যে আলাপ-আলোচনা হয়েছিল তা' সার্থক হয়নি। তাঁদের মতে "সভারেন বেঙ্গল" কল্পনা চাল মাত্র, হিন্দু ও সিডিউল্ড কাস্টের সদস্যদের ধোঁকা দেবার চেষ্টা। তাঁদের মতে তখন এমনকি টাকার থলে অবাধে চালান করা হচ্ছিল সিডিউল্ড কাস্টের ভোট গড়বড় করবার উদ্দেশ্যে। অতএব গান্ধীজীর মতে, এ প্রস্তাব নিয়ে অগ্রসর হওয়া সমীচীন নয়। বিধান সভায় দেশ-বিভাগ প্রস্তাব পেশ করবার পূর্বে কারেনসি নোটে থলে ভর্তি করে নবাবজাদা লিয়াকত্ আলি যে কলকাতায় উপস্থিত হয়েছিলেন সে সংবাদ কলকাতার তদানীন্তন মুসলমান-চালিত ইংরেজী দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছিল।

পিয়ারীলালের মতে গান্ধীজী "সভারেন বেঙ্গল" কল্পনা-রূপায়ণে আগ্রহী হলেও সুরাবর্দী যে সে কাজে সত্যি সত্যি সাহায্য করতে পারেন, এ ভরসা আর করতে পারছিলেন না। He (Suhrawardy) was playing for high tricks but lacked the courage or the will or perhaps both to face up to Quaide-i-Azam who suffered no nonsense in the Moslem League camp and was trying to tread on a thin wire. And Sarat Bose and his friends, with more zeal than prudence, were permitting themselves unwittingly to be drawn into Saheed's desprate gamble.

"সভারেন বেঙ্গল" কল্পনা বানচাল হলেও সুরাবর্দীকে নানা কারণে ভারতবর্ষে কিছুকাল থাকতে হয়েছিল। দ্বি-জাতি তত্ত্বের

মহিমায় কি অবস্থান্তর হতে চলেছে সে সম্পর্কে তখন তাঁর দৃষ্টি সুপ্রসারিত। করাচীতে এগারোই সেপ্টেম্বর তারিখে পাকিস্তান কনস্টিটুয়েণ্ট এ্যাসেমব্লী উদ্বোধনে কায়েদে আজম যেমন স্বয়ং আবিষ্কৃত দ্বি-জাতি থিয়োরী নিয়ে তোবা, তোবা করলেন, তেমনি তার পূর্বদিনে ভারতবর্ষে অবস্থিত উপনায়ক হোসেন শহীদ সুরাবর্দী তাঁর কলিকাতাস্থ ৪০ নম্বর থিয়েটার রোডের বাড়ী থেকে লেখা পত্রে সম-গোত্রের চৌধুরী খলিকুজ্জমানকে একই বিষয় নিয়ে আপন মতামত সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছিলেন।

সে পত্রে সুরাবর্দী জানালেন: হিন্দু-অধ্যুষিত অঞ্চলে লঘিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ের কি ভবিষ্যৎ? এ বিষয়টি নিয়ে তো পূর্বে কোন আলোচনাই আমরা করিনি! আমরা কোনদিনই আশা করতে পারিনি যে বাঙলা দেশ বিভক্ত হবে এবং এখানেও অঞ্চল-বিশেষে মুসলমানেরা সংখ্যায় লঘিষ্ঠ হবে! (We are now all thinking very hard as to what should be the position of the minorities, particularly of the minority Moslems in the Hindu majority provinces. We had not thought about it earlier, as we did not expect Bengal to be partitioned and Moslems being reduced to a minority in any part of Bengal)

সে দীর্ঘ পত্রে সুরাবর্দী মুসলমানের ভবিষ্যৎ আলোচনা করে জানালেন, যদি আমরা ভারতবর্ষে ইসলামিক ঐতিহ্য নিয়ে মোসলেম লীগ-নিয়ন্ত্রিত দ্বি-জাতি থিয়োরী নিয়ে বসে থাকি তবে পাকিস্তানের কাছ থেকে সমর্থন পেতে পারি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের হিন্দুর বিষ নজরে পড়তে হবে। আমি নিজে মুসলমান-সম্প্রদায়কে দেশের অন্যান্য সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখবার পক্ষপাতী নই, অথবা দ্বি-জাতি থিয়োরী যে ধরনের সমাজ গঠন চায় তাও সমর্থন করি না। (continue to live as Moslems in the best Islamic

traditions connected with the Moslem League and holding fast to the Two-nation theory........I am, therefore, not in favour of adopting an attitude of aloofness dependent upon the Two-nation theory.)

চিঠির অন্যস্থানে সুরাবর্দী জানালেন: যে অঞ্চলে মুসলমান জন-সংখ্যা সমধিক সেখানে পাকিস্তান রূপায়ণে মুসলমানেরা স্ব-দেশ (homeland) খুঁজে পেয়েছেন, কিন্তু ভারতীয় মুসলমানের এমন অভিজ্ঞতা লাভ হয়নি। (Personally I think that Pakistan has provided a homeland for the Moslems in those majority areas, but not a homeland for the Moslems of India. The Moslems of the Indian Union have been left high and dry and must shape their destiny and the question arises what should be our future organisation ?)

চৌধুরী খলিকুজ্জমান সে চিঠির কোন উত্তর দেন নি। কিন্তু তাঁর গ্রন্থে তিনিও দ্বি-জাতি তত্ত্বের ওপর মন্তব্য করেছেন। সে মন্তব্যে কোনই আবছায়া নেই। তবে সে মন্তব্যের কোন সার্থকতাও ছিল না। দ্বি-জাতি থিয়োরী যা' করবার তা' করে ফেলেছে তখন। যখন আগুন জ্বলে উঠেছিল তখন তো প্রধান ইন্ধন-দাতা ছিলেন এই দ্বি-জাতি তত্ত্বের আবিষ্কারক মহম্মদ আলি জিন্না এবং তাঁর সমর্থকেরা যথা হোসেন শহীদ সুরাবর্দী ও চৌধুরী খলিকুজ্জমান! চৌধুরী সাহেবের মন্তব্য হ'ল: He (Suhrawardy) doubted the utility of the Two-nation theory which to my mind also had not paid any dividends to us. But after the Partition it proved positively injurious to the Moslems of India and on a long view basis for Moslems everywhere.

Many of the quaries in Suhrawardy's letter are also offshoots of the first question concerning the Two-nation theory. I would have replied to him in detail but certain events intervened.

দ্বি-জাতি থিয়োরী ইতিহাসের দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে অতীতের অনেক বিষয়ের আলোচনা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যেদিন থেকে বাঙালী মধ্যবিত্ত হিন্দু ইংরেজের সমালোচক হ'ল সেদিন থেকেই এই থিয়োরা জন্মলাভ করেছিল, কেবল এর সুদূর-প্রসারী কর্মক্ষমতা সেদিন অজ্ঞাত ছিল। যখন মধ্যবিত্ত বাঙালী হিন্দু-পরিচালিত আন্দোলন, বিশেষ করে ইলবার্ট-বিল পর্বের পর, দানা বাঁধতে শুরু করল এবং কংগ্রেস জন্মলাভ করল তখন থেকেই প্রথমে আমীর আলি এবং তিনি বিলেতে চলে গেলে (১৮৮৫-৬ সাল) আলিগড়ের সৈয়দ আহমদকে ক্রীড়নক-স্বরূপ ব্যবহার করে এ ভাবধারা সিঞ্চিত করা হয়েছে। ধাপে ধাপে যতই পোলিটিক্যাল আন্দোলন জোরদার হতে লাগল ততই শাসককুল-পরিচালিত ভেদ-বুদ্ধি মুসলমান-মনকে অন্যদিকে চালিত করেছে। সিপাই-বিদ্রোহে যে মোটামুটি হিন্দু-মুসলমান ঐক্য বজায় ছিল সে কথা এমনকি ঘুণাক্ষরেও স্মরণে রাখবার প্রয়োজন বোধ হয়নি। মর্লে-মিণ্টো শাসন-সংস্কারকালে অতি গোপন ব্যবস্থায় বিভেদের বীজ প্রথম অঙ্কুরিত হল। অবস্থান্তর আনতে গিয়ে লক্ষ্ণৌএ আপোষ-ব্যবস্থা-পত্রে (১৯১৬ সাল) বিভেদটাই বড় করে দেখান হল। পরিণামে দেশ-বিভাগের দাবি রূপায়ণে দ্বি-জাতি থিয়োরীর একান্ত প্রয়োজন ছিল। সে দাবি মিটলে যখন দৃষ্টি স্বচ্ছ হ'ল তখন প্রথম ধরা পড়ল সর্বনাশের পরিমাণ।

এ সর্বনেশে পরিণতির জন্য কেবল মুসলমান নেতৃত্বের সমালোচনা নিরর্থক। কারণ, অতীতে যে বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল দেশ-বিভাগের পূর্ব-মুহূর্তে তখন তা' মহীরুহ। বিশের বা ত্রিশের এমনকি চল্লিশের কোঠাতেও সমস্ত মুসলমান-দাবি মেনে নিলেও এ পরিণাম

এড়ান যেত কিনা সন্দেহ। কারণ সমস্ত দাবি-দাওয়ার ভিত্তিই ছিল সাম্প্রদায়িক বিভেদের ওপর। মুখে স্বীকৃতি না পেলেও কাজে-কর্মে স্বীকৃতি পেয়ে গেছে যে হিন্দু ও মুসলমান বিভিন্ন গোষ্ঠী। সাতচল্লিশ সালের তেসরা জুন তারিখে কংগ্রেস ও লীগ পার্টিসন-ব্যবস্থা স্বীকার করে নিয়ে অতীতের সেই ইংরেজের উস্কানিতে সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক ভেদ-ধারা সরাসরি এবং সরকারী ভাবে গ্রহণ করল মাত্র।

কংগ্রেস-নেতৃত্ব এই পরিণতিকে কোন প্রকারে প্রতিরোধ করতে পারতেন কি? আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে পারতেন না এবং সে চেষ্টা অতীতের মতন কেবল ভেদ-বুদ্ধিই অধিকতর তীব্র করে তুলত। কিন্তু নানা ধরনের অভিজ্ঞতায় লব্ধ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর বক্তব্য সঠিকভাবে (সেই মুহূর্তে দেশের সামনে নানা কারণে ধরা না পড়লেও) অনুধাবন করলে মনে হয়, তাঁর নির্দিষ্ট পথে দেশকে এগুতে সহায়তা করলে ভবিষ্যতে হয়ত দেশ-বিভাগ ছাড়া অন্য কোন গন্তব্যে পৌঁছতে পারা যেতও বা।

পিয়ারীলাল তাঁর গ্রন্থে একদিকে যেমন শরৎ-সুরাবর্দীর "সভারেন বেঙ্গল" কল্পনা নিয়ে যে আলোচনা গান্ধীজীর সঙ্গে চলেছিল তা' বর্ণনা করেছেন অপরদিকে সে কল্পনা-বিরোধী ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর বক্তব্যও উদ্ধার করেছেন। সেদিন প্যাটেল-নেহরুর এই বিষয়ের অন্যতম মন্ত্রদাতা ছিলেন তিনি। গান্ধীজীর সঙ্গে আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ পরিষ্কারভাবে মন্তব্য করেছিলেন, যে "সভারেন বেঙ্গল" কল্পনা, তাঁর মতে, সাহেবদের মাথায় প্রথম গজিয়ে থাকবে। (Sovereign Bengal move was inspired by European vested interests for reasons of their own.) উত্তরে গান্ধীজী জানালেন: কিন্তু সুরাবর্দী তো দুই সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সম্মতি নিয়ে সে কল্পনা রূপায়ণ করতে ইচ্ছুক? শ্যামাপ্রসাদ প্রতি-প্রশ্ন করলেন: "সভারেন বেঙ্গল" হয়ে

যাবার পর যদি হিন্দুরা ভারতবর্ষে এবং মুসলমানেরা পাকিস্তানে যোগদান করতে চায়—তখন কি হবে ?

সে প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী যা' বলেছিলেন তাতেই সেই অজানা সম্ভাবনার কথা স্বতই মনে উদয় হয়। গান্ধীজী জানালেন: সে অবস্থা এলে অন্ততঃ ইংরেজের কোন কিছু করবার থাকবে না। দ্বিতীয়তঃ তা'তে জিন্নার দ্বি-জাতি থিয়োরীর কোন স্থান থাকবে না। (It would not be participated by a third party on the basis of Jinnah's two-nations.)

সেদিন এ আলোচনার মর্মার্থ সাধারণের কাছে ধরা পড়েনি। কিন্তু পাকিস্তান-কল্পনা বাস্তবরূপ নেবার পরই এবং ইংরেজের রাজদণ্ড অন্তর্হিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই কায়েদে আজম ও তাঁর শিষ্য-উপশিষ্যদের সেই দ্বি-জাতি তত্ত্বের ওপর নতুন ধরনের মতামত যে-ভাবে তড়িৎ গতিতে এসেছিল তা'তে মনে হয়, তৃতীয় পক্ষের যুগ-যুগ ধরে উস্কানি দেবার দরুণ যে দ্বি-জাতি থিয়োরীর ওপর ভিত্তি করে দেশ বিভাগ ঘটল তা' যদি ঠেকানো যেত, তবে হয়ত অন্য কোনদিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা সম্ভবপর হ'ত এবং অন্য কোন সমাধান খুঁজে বের করবার অবকাশ মিলতও বা।

ইতিহাস এত সহজে অতীতকে ভুলতে অথবা নতুন সুযোগ গ্রহণ করতে দেয় না এবং সেদিনও দেয়নি। গান্ধীজীর বক্তব্য অগ্রাহ্য হ'ল, দেশও বিভক্ত হ'ল। মনের দুঃখে গান্ধীজী তাঁর মর্মকথা চিরকালের জন্য ইতিহাসের পাতায় জুড়ে রাখলেন: I find myself all alone. Even the Sardar (Patel) and Jawaharlal (Nehru) think that my reading of the situation is wrong and peace is to return if partition is agreed upon........They did not like my telling the Viceroy that even if there was to be partition it should not be through British intervention or under

British rule........We may not feel the full effect immediately but I can see clearly that the future of independence gained at this price is going to be dark. I pray that God may not keep me alive to witness it.

জালিনওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের কাহিনী শোনবার পর তাঁর বাক-রুদ্ধ স্বদেশবাসীর পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথ যে পত্র ভাইসরয়-কে লেখেন সে পত্র যেমন অন্য কোন ভাষায়, এমনকি মাতৃভাষাতেও, রূপান্তর করা অসম্ভব—কবি নিজেও সে চেষ্টা করেছিলেন—তেমনি গান্ধীজীর এই মর্মস্পর্শী শেষ প্রার্থনা ভাষান্তরিত করা অসম্ভব। অশোকের শিলা-লেখের মতন চিরকাল ভারতবর্ষের ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ের শেষ পাতা জুড়ে গান্ধীজীর এই শেষ প্রার্থনা ভাবী কালের বাঙালীর মনে প্রশ্ন জাগাবে।

ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে বাঙালীত্বের ওপর চরম আঘাত হেনে এবং পশ্চিমপ্রান্তে পাঠান-ভূমি নিশ্চিহ্ন করবার ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করে ইংরেজ বিদায় নিল।

এ কৃতকর্মের সহায়ক কে নয়? জোর-জবরদস্তি করে ইতিহাসের রায় চিরকালের জন্য কে প্রতিরোধ করতে সক্ষম? কে সেই ধুরন্ধরেরা যা'রা বলতে সাহসী যে ইংরেজের পরমশত্রু এবং আজন্ম স্বাধীনতাপ্রিয় বলিষ্ঠ পাঠানকে যবনিকার অন্তরালে এবং অতি গোপন সতর্কতার সঙ্গে বলি দেওয়া হয়নি? আজীবন যে খান আবদুল গফ্ফর খান তাঁর অগুণতি পাঠান সহকর্মীদের নিয়ে গোটা ভারতবর্ষের জাতীয়তা-বোধ জাগ্রত ও প্রতিষ্ঠিত করতে অকাতরে সহযোগী হয়েছিলেন, তাঁকে শেষ মুহূর্তে নির্মম আততায়ীর কাছে "জিম্মা" করে কী দেওয়া হয়নি? You have thrown us to wolves—সীমান্ত পাঠানের এই মর্মঘাতী বিশ্বাসঘাতকতার নালিশ আজ, এক মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

ব্যতীত, কে ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে অস্বীকার করবার সৎসাহস রাখেন ?

*   *   *   *

যাদের উদ্দেশে এ গ্রন্থ নিবেদিত কেবল তাদেরই কথা স্মরণে রেখে বুড়ো-খোকাদের এই আত্মঘাতী কাহিনীর ওপর শেষ মন্তব্য বিষাদের সুরের মধ্যে বিলুপ্ত করতে আদৌ উৎসাহী নই।

বরং অন্য প্রসঙ্গের ছোট কাহিনী জুড়ে এ লেখা শেষ করি।

যাকে বলা হয় "শ্যামা-হক" মন্ত্রিসভা তা কিন্তু আদিতে ঠিক ছিল না। আদি-কল্পনা ছিল "শরৎ-হক" মন্ত্রিসভা। ইংরেজ সরকার তা করতে দেয় নি। শরৎ বসু পূর্বেই জানতে পেরেছিলেন সুভাষের অন্তর্ধানের অপরাধে তাঁকে নির্বাসন-দণ্ড পেতে হবে। শরৎ শ্যামাপ্রসাদের নাম করেছিলেন। শরৎ বসুর বাড়ীতে এসে ফজলুল হক শ্যামাপ্রসাদকে ডেকে যখন সে প্রস্তাব দিলেন, তখন শ্যামাপ্রসাদ হাঁ, না, কিছুই বলতে পারেন নি। কেবল বলেছিলেন, স্যার মন্মথ মুখার্জীর মতামত না নিয়ে তিনি কোন সিদ্ধান্তই করতে পারবেন না। ফজলুল হক টেলিফোনের হাতল উঠিয়ে স্যার মন্মথকে ডাকলেন "মন্মথ" নামেই। সে অধিকার একমাত্র তাঁরই ছিল। বিনা বাক্যব্যয়ে স্যার মন্মথ শ্যামাপ্রসাদকে ফজলুল হকের মন্ত্রিসভায় যোগদান করতে উপদেশ দিয়েছিলেন।

উনিশ-শ' সাতচল্লিশের বিশে জুন তারিখে বিধানসভায় দেশ-বিভাগ করবার প্রস্তাব আসে। "নবযুগে" এর পূর্বেই গোটা বাঙলা-দেশ autonomous এবং sovereign করা হোক এই প্রস্তাব ফজলুল হক করেছিলেন।

*   *   *   *

সেদিন বিধানসভায় (ছুটো সভা বসেছিল) যা দেখেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশী কিছু দেখেছিলাম বাইরে। দক্ষিণের বাইরের মহলে (এখন সেখানে বড় বাড়ী হয়েছে) চলেছিল পশ্চিম বাঙলার

এবং উত্তরের বাইরের মহলে পূর্ব-বাঙলার ভোজন উৎসব। সে উৎসবের ছবিগুলো কতই না করুণ!

অতুল্য ঘোষ মহাশয়কে দেখেছিলাম একদা দেওঘরে বোমা ও রিভলভার নিয়ে ষড়যন্ত্রে ধৃত হুগলী জেলার আসামীর পক্ষে তদারক করতে। আর সেদিন দেখলাম সেই দক্ষিণ মহলে পশ্চিম বাঙলার প্রতিনিধিদের আহার-ব্যবস্থা তদারক করতে। ইংরেজ-তাড়ন-যজ্ঞে আহুতি দিতে বাঙালী যুবকেরা শ্রীহট্টের হাইলাকান্দী, জলপাইগুড়ির চা বাগান এবং হুগলীর পল্লী অঞ্চল থেকে এসে জুটেছিল সেই দেওঘরে ষড়যন্ত্র পাকাতে এবং অতুল্য ঘোষ প্রভৃতিরা ছুটেছিলেন তাদের মুক্ত করতে।

ষাট বছর ধরে এপারের এবং ওপারের বাঙালী রাজবন্দীরা যে ইতিহাস রচনা করেছেন তার গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যে চোখ ঝলসে যায়। কী আলিপুর, কী দক্ষিণেশ্বর, কী চট্টগ্রাম, কী মেছুয়াবাজার, কী দেওঘর, কা মীরাট, কী পাঞ্জাব, কী দমদম, কী ঢাকা—সবারই পশ্চাতে ছিল একই ভাবধারা। কী স্বপ্ন সে ছেলেগুলিকে পাগল করেছিল?—দেওঘরে বসে তা' মনে মনে প্রশ্ন করেছিলাম একদিন। অতুল্য বাবুকে পুনরায় সেই বিধানসভার দক্ষিণ মহলে দেখে ভেবেছিলাম বাঙলার আবার কী রূপায়ণ হতে চলেছে?

* * * *

রাইটার্স বিল্ডিংস-এ দেশবিভাগের শ্রাদ্ধকৃত্যের জন্য মিলিত হয়েছেন শেষবারের মত ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান সরকারের প্রধানেরা। একদিকে দুই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি ক্ষিতীশ নিয়োগী এবং স্যার গোলাম মহম্মদ, অপর দিকে পশ্চিম বাঙলার বিধান রায় ও পূর্ব বাঙলার (তখনও পূর্ব পাকিস্তান হয়নি) খাজা নাজেমুদ্দিন।

শ্রাদ্ধ-তর্পণ কার্য সুসম্পন্ন হ'ল রাইটার্স বিল্ডিংসএর বারান্দায়। দর্শক আমরা সকলে। চারজনই দুই-একটা কথা বলেছিলেন।

তিন জনের ভাষা বা মন্তব্য অত্যন্ত ছেঁদো, আটপৌরে ধরনেই ছিল। একজন কিন্তু এমন যায়গায় ঘা দিলেন, যা আমার কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল একান্তভাবেই।

গোলাম মহম্মদ আশা প্রকাশ করলেন যে বাঙালী হিন্দু-মুসলমানেরা ভবিষ্যতে ভ্রাতৃত্ব-সম্বন্ধ অটুট রাখতে পারবেন, কেন না—this is the land of Swami Vivekananda and Rabindranath Tagore.

চমকে উঠেছিলাম। এক পাঞ্জাবী স্মরণ করিয়ে দিলেন সে নাম ছুটো! এবং সে পাঞ্জাবী হিন্দু নন, মুসলমান!

সেদিনকার সংবাদপত্রে গোলাম মহম্মদের সে উক্তি স্থান পায়নি এবং নিজেও দিতে পারিনি। দীর্ঘমাত্রা তখন পড়েছিল অন্যত্র। কিন্তু মনের পাষাণে গোলাম মহম্মদের মুখে শোনা—The land of Swami Vivekananda and Rabindranath Tagore—এখনও খোদাই করা অবস্থায় পড়ে আছে।

"গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই—আবার তোরা মানুষ হ'।"

নির্দেশিকা

(ব্যক্তি)

স্থান, বিষয়বস্তু, সংস্থা, পত্র-পত্রিকা